

উসুলুস সুন্নাহ

ইমাম আবু বাকর আল-হুমাইদি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

উসুলুস সুন্নাহ

সর্বস্বত্ব © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৬

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ মুদ্রণ এবং বই কিংবা পত্রিকায় প্রকাশ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা দাওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ অবৈধ। আর বইটি মলাটবদ্ধ করে প্রকাশ করার অনুমোদন একান্তই বইয়ের সত্বাধিকারী কর্তৃক সংরক্ষিত। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

প্রকাশকাল : ১৬ রমজান ১৪৪৭ হিজরি মোতাবেক ৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

অনলাইন প্রকাশক : সালাফী: ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজে।

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/SunniSalafiAthari.

টেলিগ্রাম চ্যানেল : https://t.me/SunniSalafiAthari.

হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAYver5fM5T7m01dw3U.

অর্পণ

মহান আল্লাহর তৌফিকে আকিদার গভীর পাঠ
শিখেছি যাঁর মাধ্যমে; দোয়া করি, আল্লাহ তাঁকে
ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন—

এঞ্জিনিয়ার শাইখ মাহির আমির
শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয়সূচি

ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা **21**

ইমাম হুমাইদির জীবনী **29**

জন্ম ও পরিচয় 29

ইলম-অর্জন 29

শিক্ষকবৃন্দ 31

ছাত্রবৃন্দ 32

সালাফ ও ইমামদের দৃষ্টিতে ইমাম হুমাইদি 33

লিখিত গ্রন্থ 38

মৃত্যু 39

'উসুলুস সুন্নাহ' পুস্তিকার পরিচয় **40**

শিরোনাম 40

তাহকিক ও পরিশীলন 40

বিষয়বস্তু 42

গুরুত্ব 42

ব্যাখ্যাসমূহ 43

ইজমার পরিচয় ও প্রামাণিকতা **44**

একটি সংশয় ও তার নিরসন 47

ইজমা কীভাবে কাজ করে? 51

ফাহমুস সালাফ : গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা **56**

সালাফ কারা? 56

ফাহমুস সালাফের প্রামাণিকতা 58

ফাহমুস সালাফ কীভাবে কাজ করে? 62
ফাহমুস সালাফ দিয়ে দলিল দেওয়ার পদ্ধতি 65
উসুলুস সুন্নাহ পুস্তিকার সম্পূর্ণ মূলপাঠ 67

অধ্যায় ১ : তাকদিরের প্রতি ইমান 74
'আস-সুন্নাহ' পরিভাষার মর্মার্থ 76
তাকদির কাকে বলে? 77
তাকদির বিষয়ে লেখকের কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 79
তাকদিরের প্রতি ইমান রাখার গুরুত্ব 83
আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যে কি মন্দ আছে? 86
ভাগ্যের ভালো-মন্দ এবং মিষ্টতা-তিক্ততার মধ্যে পার্থক্য কী? 87
তাকদিরের প্রতি ইমানের চারটি স্তম্ভ 88
প্রথম স্তম্ভ : আল্লাহর জ্ঞান 88
দ্বিতীয় স্তম্ভ : আল্লাহর লিখন 89
তৃতীয় স্তম্ভ : আল্লাহর ইচ্ছা 90
চতুর্থ স্তম্ভ : আল্লাহর সৃষ্টি 91
আল্লাহর তাকদির এবং বান্দার কাজের মধ্যকার সম্পর্ক 94
তাকদিরের দোহাই দিয়ে পাপকাজের দায় এড়ানোর বিধান 98
তাকদির বিষয়ক আকিদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 106

অধ্যায় ২ : ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদা 108
ইবাদতমূলক কথা ও কাজ ইমানের অন্তর্ভুক্ত 109
ইমানের আভিধানিক অর্থ 109
প্রথম মত 109

দ্বিতীয় মত 111
ইমানের শরয়ি অর্থ 112
কুরআন থেকে দলিল 114
সুন্নাহ থেকে দলিল 117
ইজমা থেকে দলিল 119
এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 121
ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে 129
কুরআন থেকে দলিল 129
সুন্নাহ থেকে দলিল 131
ইজমা থেকে দলিল 132
এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 135
আমলবিহীন ইমানের বিধান 140
সকল ফরজ আমল পরিত্যাগকারী কাফির 142
এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 146
নিয়তবিহীন ইমানের বিধান 157
সুন্নাহর অনুসরণবিহীন ইমান 164

অধ্যায় ৩ : সাহাবি বিষয়ক আকিদা 169
সাহাবি কাকে বলে? 172
আভিধানিক অর্থ 172
পারিভাষিক অর্থ 172
সকল সাহাবির জন্য দোয়া করা 174
কোনো সাহাবিকে গালিগালাজ না করা 182
গালি কাকে বলে? 182

সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার ভয়াবহতা 185
প্রথম দিক 185
দ্বিতীয় দিক 186
তৃতীয় দিক 187
চতুর্থ দিক 190
পঞ্চম দিক 193
সাহাবিগণকে গালিদাতার ব্যাপারে সালাফদের অবস্থান 195
সাহাবিগণকে গালিদাতার বিস্তারিত বিধান 205
প্রথম প্রকার 205
দ্বিতীয় প্রকার 205
তৃতীয় প্রকার 206
চতুর্থ প্রকার 206
পঞ্চম প্রকার 206
ষষ্ঠ প্রকার 207
সাহাবিগণকে গালিদাতা 'ফাই' সম্পদ পাবে না 208
সাহাবিগণকে গালি দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 216
প্রথম সম্প্রদায় : রাফিদি শিয়া 216
দ্বিতীয় সম্প্রদায় : নাসিবি ফের্কা 222
আধুনিক যুগে সাহাবিদের গালি দিয়েছেন যারা 225
'ইসলামের ইতিহাস' বইয়ে সাহাবিদের প্রতি গালি 232
নমুনা-১ 232
নমুনা-২ 234
নমুনা-৩ 235

নমুনা-৪ 236
নমুনা-৫ 239
নমুনা-৬ 240
নমুনা-৭ 241
নমুনা-৮ 243
নমুনা-৯ 244
নমুনা-১০ 247

অধ্যায় ৪ : কুরআন বিষয়ক আকিদা 251
কুরআন আল্লাহর কথা 253
কুরআন থেকে দলিল 253
সুন্নাহ থেকে দলিল 257
ইজমা থেকে দলিল 258
কুরআন মাখলুক নয় 261
কুরআন থেকে দলিল 261
সুন্নাহ থেকে দলিল 270
ইজমা থেকে দলিল 273
কুরআনকে মাখলুক মনে করার বিধান 277
যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তাদের ব্যাপারে সালাফদের সিদ্ধান্ত 281
কুরআন বিষয়ক আকিদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 290
প্রথম সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা 290
দ্বিতীয় সম্প্রদায় : মুতাজিলা ফের্কা 290
তৃতীয় সম্প্রদায় : আশারি-মাতুরিদি 292

তাহলে আশারিদের মতে
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কার কথা? 296
আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদার বিধান 300
ইমান কমতে-কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না 302
'ইমান কমতে-কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট
থাকে না'—কথাটির ব্যাখ্যা কী? 304

অধ্যায় ৫ : পরকালে আল্লাহকে দেখার প্রতি ইমান 306
পরকালে আল্লাহকে দেখার দলিলপ্রমাণ 308
কুরআন থেকে দলিল 308
সুন্নাহ থেকে দলিল 309
ইজমা থেকে দলিল 311
পরকালে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার সারকথা 314
কাফিররা কি মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে? 314
পরকালে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করার বিধান 316
আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 318
প্রথম সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা 318
দ্বিতীয় সম্প্রদায় : মুতাজিলা ফের্কা 320
তৃতীয় সম্প্রদায় : আশারি-মাতুরিদি 321
চতুর্থ সম্প্রদায় : চরমপন্থি সুফি গোষ্ঠী 326
আল্লাহর দিদার—আহলুস সুন্নাহর জন্য সুসংবাদ,
কিন্তু বিদাতিদের জন্য দুঃসংবাদ 330

অধ্যায় ৬ : আল্লাহর গুণাবলির প্রতি ইমান **335**
সিফাত বিষয়ে লেখকের কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 338
আল্লাহর গুণাবলির প্রতি ইমান আনয়নের কয়েকটি বুনিয়াদি মূলনীতি **344**
প্রথম মূলনীতি : আল্লাহর গুণাবলি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর **344**
আল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ার বিষয়টি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর নয় 346
দ্বিতীয় মূলনীতি : তাহরিফ ও তাতিল এবং তাকয়িফ ও তামসিল-বিহীন ইমান **348**
পরিভাষা চারটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 349
তাহরিফের পরিচয় 349
তাতিলের পরিচয় 350
তাকয়িফের পরিচয় 356
তামসিলের পরিচয় 356
তৃতীয় মূলনীতি : সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করা **359**
‘প্রকাশ্য অর্থ’ বলতে কী বোঝায়? 360
একটি আপত্তি ও তার খণ্ডন 362
প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করার আবশ্যকতা 364
চতুর্থ মূলনীতি : সিফাতের অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু ধরন অজ্ঞাত **368**
ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তি ও তার ব্যাখ্যা 369
‘আমরা সিফাতের ব্যাখ্যা করি না’ – কথাটির মর্মার্থ **375**
তাফবিদকারীদের দাবির অপনোদন 376
প্রথম অর্থ 380

দ্বিতীয় অর্থ 383
আল্লাহর হাত সিফাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা 386
কুরআন থেকে দলিল 388
সুন্নাহ থেকে দলিল 393
ইজমা থেকে দলিল 394
আল্লাহর ডান হাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা 398
মহান আল্লাহর কি বাম হাত আছে? 401
আল্লাহর হাত সিফাত অস্বীকারের বিধান 404
আল্লাহর হাত সিফাতের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 406
প্রথম সম্প্রদায় : মুশাব্বিহা ফের্কা 406
দ্বিতীয় সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা 407
আল্লাহর হাত মানে 'তাঁর ক্ষমতা বা অনুগ্রহ' বলে ব্যাখ্যা করা কি আহলুস সুন্নাহর আকিদা? 410
আল্লাহর 'শরীর' সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর হাতকে 'অঙ্গ' বলার বিধান 427
প্রথম বিষয় : আল্লাহর দেহ সাব্যস্ত করা 429
আরবি ভাষায় এবং শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 'দেহ' শব্দের মর্মার্থ ও বিধান 429
প্রথম অর্থ ও তার বিধান 430
দ্বিতীয় অর্থ ও তার বিধান 434
তৃতীয় অর্থ ও তার বিধান 436
চতুর্থ অর্থ ও তার বিধান 440
অর্থ চতুষ্টয়ের সারকথা 442

দেহ সাব্যস্তের ব্যাপারে মুহাক্কিক বিদ্বানদের বক্তব্য 447
দ্বিতীয় বিষয় : আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা 453
আরবি ভাষায় 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দের মর্মার্থ ও বিধান 454
'জাওয়ারিহ' শব্দের অর্থ ও তার বিধান 454
'আদাউন' শব্দের অর্থ ও তার বিধান 460
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তের ব্যাপারে মুহাক্কিক বিদ্বানদের বক্তব্য 464
'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' কি লাফজুন মুজমাল—যা সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না? 472
আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করা মানে 'আল্লাহর অঙ্গ সাব্যস্ত করা'—দাবির খণ্ডন 477
'আল্লাহর হাত' বলতে আহলুস সুন্নাহ কী বোঝায়? 478
আলোচ্য দাবির খণ্ডনে উলামাগণের বক্তব্য 483
আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা 493
কুরআন থেকে দলিল 493
ইজমা থেকে দলিল 494
সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতে আরশের পরিচয় 499
আরশের বৈশিষ্ট্যসমূহ 500
প্রথম বৈশিষ্ট্য 500
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 500
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 501
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য 502

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য 502
পথভ্রষ্ট ফের্কাদের মতে আরশের পরিচয় 504
সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতে 'ইস্তিওয়া' শব্দের অর্থ 507
সালাফদের থেকে ইস্তিওয়া সিফাতের যেসব অর্থ পাওয়া যায় 511
'আরশের ওপর আরোহণ' সিফাত অস্বীকার করার বিধান 518
'আরশের ওপর আরোহণ' সিফাতের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 521
প্রথম সম্প্রদায় : মুশাব্বিহা ফের্কা 521
দ্বিতীয় সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা 522
'আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন' মানে 'তিনি আরশ দখল করেছেন' বলে ব্যাখ্যা করা কি আহলুস সুন্নাহর আকিদা? 524
আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ থেকে প্রতীয়মান হয়—আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন 534
'আরশের ওপর আরোহণ' এবং 'ঊর্ধ্বতা' সিফাতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য 536
আল্লাহর ঊর্ধ্বতা সিফাতের দলিল 537
ঊর্ধ্বতা সিফাতের প্রকারভেদ 540
আল্লাহর ঊর্ধ্বতা সিফাত অস্বীকারের বিধান 542
ঊর্ধ্বতা ও সাথে থাকা—সিফাতদুটি পরস্পরবিরোধী নয় 545
প্রথম পয়েন্ট 546
'সাথে থাকা' সিফাতের প্রকারভেদ 546
প্রথম প্রকার : সার্বজনিকভাবে সাথে থাকা 546

দ্বিতীয় প্রকার : সুনির্দিষ্টভাবে সাথে থাকা 550
দ্বিতীয় পয়েন্ট 553
তৃতীয় পয়েন্ট 553
চতুর্থ পয়েন্ট 554
পঞ্চম পয়েন্ট 556
ষষ্ঠ পয়েন্ট 556
ইজমা থেকে দলিল 557
তাবিলের অভিযোগ ও তার অপনোদন 564

অধ্যায় ৭ : বড়ো কুফর নয় এমন গুনাহকারীকে কাফির না বলা 571
পাপের প্রকারভেদ 574
কুফর নয় এমন গুনাহকারীকে কাফির বলার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা 577
প্রথম দলিল 577
দ্বিতীয় দলিল 578
তৃতীয় দলিল 578
চতুর্থ দলিল 579
পঞ্চম দলিল 580
কবিরা গুনাহগারকে কী বলা হবে সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতভেদ 582
কবিরা গুনাহগারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা 585
প্রথম দল : খারেজি সম্প্রদায় 585
দ্বিতীয় দল : মুতাজিলা সম্প্রদায় 588

তৃতীয় দল : মুরজিয়া সম্প্রদায় 589
শাহাদাতাইন পরিত্যাগের বিধান 591
নামাজ পরিত্যাগের বিধান 593
নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির না বলা কি মুরজিয়াদের আকিদা? 599
নামাজ পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা 610
জাকাত পরিত্যাগের বিধান 612
রোজা পরিত্যাগের বিধান 614
হজ পরিত্যাগের বিধান 615
নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজের কাজা আদায় করার বিধান 616

উপসংহার 629
পরিভাষাকোষ 630
বিব্লিয়োগ্রাফি 652

بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَيَّضَ لِهٰذَا الدِّينِ حَمَلَةً عُدُولًا، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ؛ وَبَعْدُ:

ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণের আকিদা ও মানহাজ কী ছিল, তা জানার কিছু মৌলিক উৎসগ্রন্থ আছে। সেসব উৎসগ্রন্থের অন্যতম—ইমাম হুমাইদি বিরচিত *'উসুলুস সুন্নাহ'* শীর্ষক পুস্তিকা। কলেবরের দিক থেকে পুস্তিকাটি অনেক ছোটো হলেও ফায়দার দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ। সালাফদের যুগের ইমাম আবু বাকর আল-হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এই পুস্তিকায় সালাফদের আকিদার সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে আগত আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ যুগ যুগ ধরে পুস্তিকাটির প্রতি গুরুত্বারোপ করে এসেছেন। এরই ফলস্বরূপ পুস্তিকাটি সমাদৃত হয়েছে সালাফদের আকিদা-মানহাজ জানার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে।

বিদাতি গোষ্ঠীর অপব্যাখ্যামূলক আকিদার খণ্ডন করতে যেয়ে ইমাম হুমাইদির এই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—হাম্বালি মাজহাবের যশস্বী বিদ্বান শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.)।[1] মহান আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে সালাফদের আদর্শ কেমন ছিল, তা ইমাম হুমাইদির এই পুস্তিকা থেকে

[1] মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি, ***জাম্মুত তাবিল,*** তাহকিক : বাদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাদর (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ২৪।

প্রমাণ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.)।[2]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতার পক্ষে সালাফের আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে এই পুস্তিকার রেফারেন্স দিয়েছেন এবং ইমাম হুমাইদিকে 'সালাফদের যুগের বিদ্বান' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।[3] অনুরূপভাবে আল্লাহর ঊর্ধ্বতা বিষয়ে সালাফদের আকিদা কী ছিল, তা বর্ণনা করতে ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) এই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইমাম হুমাইদির নিরুপম প্রশংসা করেছেন।[4]

মহান আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে সকল সালাফের মতাদর্শ কী ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ উক্ত পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২৪২ হি.)।[5] একইভাবে মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতার পক্ষে সালাফের আকিদা

---

[2] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন হাসান কায়িদ (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১০।

[3] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা আলা হারবিল মুয়াত্তিলাতি ওয়াল জাহমিয়্যা,*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

[4] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার ফি ইদাহি সহিহিল আখবারি ওয়া সাকিমিহা,*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৬৭-১৬৮।

[5] আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজদি, ***জাওয়াবু আহলিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি নাকদি কালামিশ শিয়াতিজ জাইদিয়্যা*** (***'আর-রাসায়িলু ওয়াল মাসায়িলুন নাজদিয়্যা'*** *অমনিবাসের অন্তর্গত*) (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১০০।

বর্ণনা করতে যেয়ে এই পুস্তিকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রখ্যাত নাজদি বিদ্বান শাইখ হামাদ বিন নাসির ইবনু মুআম্মার রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২২৫ হি.)।[6]

মহান আল্লাহর দরবারে লাখোকোটি শুকরিয়া নিবেদন করছি, যার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা এই মূল্যবান পুস্তিকার অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখতে পেরেছি। যদিও আমি নিজেকে ব্যাখ্যা লেখার উপযুক্ত মনে করি না এবং এই ব্যাখ্যাও স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখিনি! ইচ্ছা ছিল—ইমাম হুমাইদির *'উসুলুস সুন্নাহ'* পুস্তিকাটি অনুবাদ করব এবং ফুটনোটে হালকা কিছু টীকা যুক্ত করে দিব। কিন্তু টীকা লিখতে লিখতে একটা সময়ে গিয়ে বুঝতে পারি—কিছু টীকা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। মূল পুস্তিকার কলেবরের সাথে এত লম্বা টীকা মাননসই নয়। তখন ব্যাখ্যা লেখার কথা মাথায় আসে। যদিও আমি ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা লিখেছি নিজে শেখার জন্য; বই আকারে প্রকাশের জন্য নয়। তবুও অনেক দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম—বই আকারে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। টীকা লেখা বন্ধ করে আবার শুরু থেকে ব্যাখ্যা লেখা আরম্ভ করলাম। আমার কোনো লেখার প্রতিই আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না। তবে রব্বে কারিমের কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন অধমকে ক্ষমা করে—দয়া করে অধমের এই নগণ্য নজরানা কবুল করে নেন এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর উপকার করেন। আমিন।

---

[6] হামাদ বিন নাসির ইবনু মুআম্মার আন-নাজদি, ***আত-তুহফাতুল মাদানিয়্যা ফিল আকিদাতিস সালাফিয়্যা,*** তাহকিক : আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দিল কারিম (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৭৯।

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমরা যেসব কাজ করেছি, তা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি—

১. প্রথমেই একটি দীর্ঘ 'ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা' লিখেছি। ব্যাখ্যাকারের ভূমিকায় যথাক্রমে ছয়টি পরিচ্ছেদ/বিভাগ লিখেছি। যথা :

- **প্রথম ভাগ :** ব্যাখ্যাকারের ভূমিকার সূচনাপর্ব। এখন আমরা সূচনাপর্বের মধ্যেই আলোচনা করছি।
- **দ্বিতীয় ভাগ :** উসুলুস সুন্নাহর লেখক ইমাম হুমাইদির জীবনী।
- **তৃতীয় ভাগ :** 'উসুলুস সুন্নাহ' পুস্তিকার পরিচয়।
- **চতুর্থ ভাগ :** ইজমার পরিচয় ও প্রামাণিকতা।
- **পঞ্চম ভাগ :** ফাহমুস সালাফের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা।
- **ষষ্ঠ ভাগ :** 'উসুলুস সুন্নাহ' পুস্তিকার সম্পূর্ণ মূলপাঠ। এখানে আমরা ইমাম হুমাইদি রচিত বিখ্যাত ও কাঙ্ক্ষিত 'উসুলুস সুন্নাহ' পুস্তিকাটির সম্পূর্ণ আরবি টেক্সট এবং তার সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করেছি। যাতে করে ব্যাখ্যায় ঢোকার আগেই সম্পূর্ণ পুস্তিকাটির মূলভাব মাথায় চলে আসে।

২. ব্যাখ্যাকারের ভূমিকার পর আমরা যথাক্রমে সাতটি অধ্যায় লিখেছি। যেহেতু ইমাম হুমাইদি তাঁর পুস্তিকায় আকিদার সাতটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, সেহেতু আমরা স্বতন্ত্র সাতটি অধ্যায়ে সেই মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। সাধারণত প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংশ্লিষ্ট মূলনীতির আরবি টেক্সট ও তার বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করেছি 'মূলপাঠ' উপশিরোনামে। এরপর 'ব্যাখ্যা' উপশিরোনাম দিয়ে মূলপাঠের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লিখেছি।

৩. ব্যাখ্যাগ্রন্থের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলো লেখক রচনা করেননি। বরং আলোচনাকে বোধগম্য করার জন্য আমরা সেগুলো সংযোজন করেছি।

৪. আলোচনা দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক পরিভাষার সংজ্ঞা আমি ইচ্ছা করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিনি। একই কারণে আমি বিভিন্ন বিদাতি আকিদার গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক সমালোচনায় ব্যস্ত হইনি। এসবের বিপরীতে আমি সালাফদের আকিদা উদ্ধৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। যাতে পাঠকগণ সহজেই বুঝে যান—কাদের আকিদা সালাফদের পরিপন্থি, আর কাদের আকিদা সালাফদের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল। বিশেষত একদল লোক যখন অভিযোগ করে, আমরা নাকি আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর অন্ধ-অনুসরণ করি! উক্ত অভিযোগের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে। প্রতিভাত হয়ে যাবে, ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর পূর্বে—যুগের পর যুগ ধরে আগত ইমামগণ আমাদের আকিদার পক্ষে রয়েছেন; উম্মতের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ আমাদের আকিদার পক্ষে আছেন। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

৫. সালাফদের আকিদার মূলনীতিগুলো কারা মানেনি, কারা এসব মূলনীতিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে—সেটাও আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেও কিছু আলোচনা করেছি। যাতে পাঠকগণ সেসব বিষয়ের সাথে সংযোগ অনুভব (relate) করতে পারেন এবং বর্তমান সময়ের বাতিল আকিদা-মানহাজ থেকে সতর্ক-সাবধান থাকতে সক্ষম হন।

৬. আলোচনার ছন্দ বজায় রাখতে ফুটনোটে টীকা না দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরেও প্রয়োজনে খুবই সামান্য কিছু টীকা সংযোজন করতে হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের যাবতীয় টীকা আমার সংযোজিত।

৭. যেসব হাদিস সহিহুল বুখারি কিংবা সহিহ মুসলিমে আসেনি, সেগুলোর 'বর্ণনার মান' শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিক

অনুযায়ী উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে অন্য মুহাদ্দিসগণের তাহকিক থেকেও 'বর্ণনার মান' উল্লেখ করেছি।

৮. সম্পূর্ণ পুস্তিকার ব্যাখ্যা শেষে আমরা একটি 'পরিভাষাকোষ' লিখেছি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোর মর্মার্থ জানা থাকলে আলোচনা সুপাঠ্য হবে বলে আমরা মনে করি। তাই উক্ত পরিভাষাকোষে আমরা চল্লিশের অধিক পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।

৯. এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতে যেয়ে প্রচুর গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিয়েছি এবং যথাস্থানে সেসব গ্রন্থ থেকে নিয়মমাফিক রেফারেন্সও দিয়েছি। এ সত্ত্বেও আমরা যেসব উৎসগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেসব উৎসগ্রন্থের বিশদ তালিকা উল্লেখ করেছি—*'বিব্লিয়োগ্রাফি'* শিরোনাম দিয়ে।

কোনো সম্মাননীয় পাঠক যেন ভুল না বোঝেন, সেজন্য একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি। ইমাম হুমাইদি বিরচিত *'উসুলুস সুন্নাহ'* স্রেফ কয়েক পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। শাইখ সালিহ আল-উসাইমির তাহকিক অনুযায়ী, ইমাম হুমাইদির *'উসুলুস সুন্নাহ'* কেবল চার পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট পুস্তিকা। বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমরা সেই চার পৃষ্ঠারই বিশদ ব্যাখ্যা লিখেছি। ইমাম হুমাইদির কথাগুলোকে আমি সূচিপত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি। অথবা বলতে পারেন, বিষয়-শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছি। এরকম কাজের দৃষ্টান্ত আমাদের বড়ো বড়ো ইমামের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন আশারি আকিদার ওপর রচিত বিখ্যাত পুস্তিকা *'আকিদা আসবাহানিয়্যা'* কেবল এক পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তক। শাইখ মুহাম্মাদ বিন রিয়াদ আল-আহমাদের তাহকিক অনুযায়ী, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সেই এক পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকটি দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা

করেছেন; যা *'শারহুল আকিদাতিল আসবাহানিয়্যা'* নামে সুপরিচিত। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদের ফিকহের ওপর রচিত *'মুখতাসারুল খিরাকি'* মাত্র ১৫০ পৃষ্ঠার একটি ছোটো পুস্তিকা। শাইখ আব্দুল্লাহ আত-তুর্কির তাহকিক অনুযায়ী, ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ পনেরো খণ্ডে উক্ত পুস্তিকার ব্যাখ্যা করেছেন; যা *'আল-মুগনি'* নামে সুপ্রসিদ্ধ।

সুপ্রিয় পাঠক, আমি বিনীতভাবে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক করছি। আকিদাবিষয়ক আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই এ জাতীয় কথা চলে আসে—'এই কাজ করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়,' কিংবা 'ওই কাজ করলে ব্যক্তি বিদাতি হয়ে যায়।' মনে রাখবেন, এগুলো অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্টভাবে 'অমুক কাফির' কিংবা 'অমুক বিদাতি' বলতে হলে স্রেফ অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানা যথেষ্ট নয়। নির্দিষ্টভাবে কাউকে 'কাফির' কিংবা 'বিদাতি' বলার শরয়ি নীতিমালা আছে। যিনি 'কাফির' বা 'বিদাতি' বলবেন, তার জন্যও শরয়ি নীতিমালা আছে; আবার যাকে বলা হবে, তার জন্যও শরয়ি নীতিমালা আছে। আপনি যদি সেই নীতিমালা সম্পর্কে গভীরভাবে না জানেন, তাহলে জেনে রাখুন, এই পথ আপনার জন্য নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এই জগতে ঢুকবেন না। আপনি উম্মতের গ্রহণযোগ্য কিবার উলামাগণের সাথে থাকুন। তাঁদের কথা শুনুন, মানুন। কিন্তু নিজে থেকে রায় দিয়েন না—'অমুক কাফির,' কিংবা 'অমুক বিদাতি।' দিন শেষে, আমাদের সবাইকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। স্বল্পজ্ঞানের দরুন কারও প্রতি জুলুম করে ফেললে মহান আল্লাহর সামনে আমরা কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াব? আল্লাহর পানা চাই—আল-ইয়াজু বিল্লাহ।

সূচনাপর্বের শেষে এসে নিবেদন করছি, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতে পেরেছি কেবল আল্লাহর তৌফিকে। তাই যাবতীয় প্রশংসা জ্ঞাপন

করছি মহান আল্লাহর প্রতি। আলহামদুলিল্লাহ। এরপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আব্বু-আম্মুর প্রতি। যাঁরা সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেন। বিধায় আমি নির্বিঘ্নে পড়াশোনা ও লেখালেখিতে সময় দিতে পারি। পাশাপাশি আমার নিকটবর্তী কয়েকজন দ্বীনী ভাইকেও সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাঁরা এই গ্রন্থটি পড়ে আমাকে অনেকগুলো সংশোধনী ও পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের সহযোগিতা, সংশোধনী ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হয়েছি। দোয়া করি, মহান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে সর্বোত্তম পারিতোষিক দিয়ে সম্মানিত করুন। আমিন।

পরিশেষে আরও বলছি, আমাদের কথায় যদি কোনো সত্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তাহলে তা একমাত্র মহান রবের অনুগ্রহে। আর যদি কোথাও ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার দুর্বলতা এবং শয়তানের প্ররোচনার ফল। মহিমার্ণব ক্ষমাশীল আল্লাহ আমার সেসব বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন। আমিন।

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদ, লা ইলাহা ইল্লা আনতাল মান্নান, বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দি ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, ইন্নি আসআলুকা। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের রচয়িতা, মূলপাঠের লেখক ইমাম হুমাইদি, এবং আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক, প্রচারক ও পাঠক—সকল ইমানদার বান্দার জন্য আপনি একে বরকতের আধার করে দিন। আপনার এই নগণ্য বান্দার অগণ্য কাজকে স্রেফ আপনারই সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি ও একনিষ্ঠ করে দিন। আমিন।

গফুরুর রহিমের ক্ষমাভিখারী—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

ইমাম হুমাইদির জীবনী

জন্ম ও পরিচয় :

তিনি হলেন আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর ইবনু ইসা আল-কুরাশি আল-আসাদি আল-মাক্কি আল-হুমাইদি। তাঁর সুনির্দিষ্ট জন্মসন জানা যায় না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, তিনি ১৫০ হিজরির পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।[7]

ইলম-অর্জন :

ইমাম হুমাইদি অনেক ইমামের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন; বিশেষত ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৮ হি.) এবং ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) থেকে।

ইমাম হুমাইদি নিজেই বলেছেন :

«جَالَسْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَهَا».

"আমি উনিশ বছর অথবা তার কাছাকাছি সময়কাল যাবৎ সুফইয়ান ইবনু উয়াইনার সাহচর্য লাভ করেছি।"[8]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-হারাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০১ হি.) বলেন :

---

[7] আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর আল-হুমাইদি, ***মুসনাদুল হুমাইদি,*** তাহকিক : হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি (দামেস্ক : দারুস সাক্কা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫; *'মুহাক্কিকের ভূমিকা'* অংশ থেকে।

[8] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.), ***সিয়ারু আলামিন নুবালা*** (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৬১৭।

«قدمت مكة سنة ثمان وتسعين، ومات ابن عيينة في أول السنة قبل قدومي لسبعة أشهر؛ فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة، فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه».

"আমি ১৯৮ হিজরি সনে মক্কায় এসেছিলাম। সেই বছরের শুরুর দিকে আমার আগমনের সাত মাস আগেই ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ মারা যান। তখন আমি ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করি। আমার কাছে হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়। তখন আমি হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর হাদিস লিখে নিই।"[9]

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহরও নিবিড় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইমাম হুমাইদি। এ প্রসঙ্গে **ইমাম হুমাইদি উল্লেখ করেছেন :**

"একবার আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ মক্কায় আমাদের নিকটে—সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর কাছে অবস্থান করেছিলেন। একদিন আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'কুরাইশদের এক ব্যক্তি আছেন। যিনি জ্ঞানগরিমা ও বাগ্মিতায় অনন্য।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কে?' তিনি জবাব দিলেন, 'মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ি।'

ইতঃপূর্বে আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ ইরাকে শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর মজলিসে বসেছেন (তাঁর থেকে ইলম নিয়েছেন)। তিনি আমাকে বারবার শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে ইলম নিতে উৎসাহিত করছিলেন। একপর্যায়ে তিনি আমাকে শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর কাছে টেনে নিয়ে গেলেন।

---

[9] আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি, ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল*** (হায়দ্রাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৭।

আমরা ইমাম শাফিয়ির মজলিসে বসলাম। সেখানে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা হলো।

পরবর্তীতে আমরা যখন মজলিস থেকে উঠে গেলাম, ইমাম আহমাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন? তিনি কুরাইশ বংশের মানুষ। তাঁর জ্ঞানগরিমা ও বাগ্মিতা দেখে কি আপনি সন্তুষ্ট হবেন না?' আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহর এই কথা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটল। এরপর আমি নিয়মিত ইমাম শাফিয়ির মজলিসে যেতে শুরু করলাম। এমনকি আমি শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ থেকে ইলমগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেলাম!"[10]

এ কারণে বলা হয়, তিনি ছিলেন ইমাম শাফিয়ির প্রধান ছাত্র।

ইমাম জাকারিয়া আস-সাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেন :

«قُلْتُ لأَبِي دَاوُدَ: مَنْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ؟ فَقَالَ: أَوَّلُهُمْ: الحُمَيْدِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَالبُوَيْطِيُّ».

"আমি আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৭৫ হি.) জিজ্ঞেস করলাম, 'শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র কারা?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাঁর প্রধান ছাত্র হলেন—আল-হুমাইদি, আহমাদ বিন হাম্বাল এবং আল-বুওয়াইতি'।"[11]

শিক্ষকবৃন্দ :

ইমাম হুমাইদির কয়েকজন উল্লেখযোগ্য উস্তাজ হলেন—

১. ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা (মৃ. ১৯৮ হি.)

২. ইমাম শাফিয়ি (মৃ. ২০৪ হি.)

---

[10] ইবনু আবি হাতিম, ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল,*** খ. ৭, পৃ. ২০২-২০৩।

[11] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১০, পৃ. ৫৯।

৩. ইমাম ইবরাহিম বিন সাদ (মৃ. ১৮৫ হি.)
৪. ইমাম আনাস বিন ইয়াদ (মৃ. ২০০ হি.)
৫. ইমাম বিশর বিন বাকর (মৃ. ২০৫ হি.)
৬. ইমাম হাম্মাদ বিন উসামা বিন জাইদ (মৃ. ২০১ হি.)
৭. ইমাম আব্দুল আজিজ ইবনু দিনার (মৃ. ১৮৪ হি.)
৮. ইমাম আব্দুল আজিজ আদ-দারাওয়ার্দি (মৃ. ১৮৭ হি.)
৯. ইমাম ফুদাইল বিন ইয়াদ (মৃ. ১৮৭ হি.)
১০. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ (মৃ. ১৯৭ হি.)।[12]

ছাত্রবৃন্দ :

ইমাম হুমাইদির কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন—
১. ইমাম বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)
২. ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি (মৃ. ২৬৪ হি.)
৩. ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি (মৃ. ২৭৭ হি.)
৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আজ-জুহলি (মৃ. ২৫৮ হি.)
৫. ইমাম আহমাদ বিন আজহার (মৃ. ২৬৩ হি.)
৬. ইমাম ইসমায়িল আল-আসবাহানি (মৃ. ২৬৭ হি.)
৭. ইমাম বিশর আল-আসাদি (মৃ. ২৮৮ হি.)
৮. ইমাম সালামা আন-নাইসাবুরি (মৃ. ২৪৭ হি.)
৯. ইমাম উবাইদুল্লাহ আন-নাসায়ি (মৃ. ২৪১ হি.)
১০. ইমাম হার্ব আল-কিরমানি (মৃ. ২৮০ হি.)।[13]

---

[12] আল-হুমাইদি, ***মুসনাদুল হুমাইদি,*** খ. ১, পৃ. ৫০-৫২।

[13] আল-হুমাইদি, ***মুসনাদুল হুমাইদি,*** খ. ১, পৃ. ৫৩-৫৪।

সালাফ ও ইমামদের দৃষ্টিতে ইমাম হুমাইদি :

১. ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেন :

«مَا رَأَيْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ، أَحْفَظَ مِنَ الحُمَيْدِيِّ، كَانَ يَحْفَظُ لِسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ عَشْرَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ».

"আমি কফ-শ্লেষ্মাজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে আল-হুমাইদির চেয়ে অধিক মুখস্থশক্তিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনার দশ হাজার হাদিস মুখস্থ জানতেন।"[14]

২. ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :

«الْأَئِمَّةُ فِي زَمَانِنَا: الشَّافِعِيُّ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ».

"আমাদের যুগের ইমাম হলেন—শাফিয়ি, হুমাইদি এবং আবু উবাইদ।"[15]

৩. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :

«الحُمَيْدِيُّ عِنْدَنَا إِمَام».

"আল-হুমাইদি আমাদের নিকটে ইমাম।"[16]

৪. ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেন :

---

[14] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১০, পৃ. ৬১৮।

[15] হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-জাওরাকানি, ***আল-আবাতিল ওয়াল মানাকির ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহির,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আল-ফুরাইওয়ায়ি (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ভারত : মুআসসাসাতু দারিদ দাওয়াতিত তালিমিয়্যাতিল খাইরিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪৯।

[16] আবু বাকর আহমাদ বিন আলি বিন সাবিত আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***তারিখু বাগদাদ,*** তাহকিক : বাশার আওয়াদ মারুফ (বৈরুত : দারুল গারবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৬২।

«الحُمَيْدِيُّ إِمَامٌ فِي الحَدِيْثِ».

“হুমাইদি হলেন হাদিসশাস্ত্রের ইমাম।”[17]

৫. ইমাম হুমাইদির ব্যাপারে ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৭৭ হি.) প্রশ্ন করা হলে **তিনি জবাবে বলেন :**

«ثِقَةٌ إِمَامٌ».

“তিনি হলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম।”[18]

৬. ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন :

«أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ابْنِ عُيَيْنَةَ الحُمَيْدِيُّ، وَهُوَ رَئِيْسُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ».

“সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর হাদিসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষ হলেন আল-হুমাইদি। তিনি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনার প্রধান শিষ্য।”[19]

৭. ইমাম ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন :

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ عِيسَى الْحُمَيْدِيِّ أَبُو بَكْرٍ- وَمَا لَقِيتُ أَنْصَحَ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ».

“আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর ইবনু ইসা আল-হুমাইদি। ইসলাম

---

[17] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম,*** তাহকিক : উমার আব্দুস সালাম আত-তাদমুরি (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ. ২১৩।

[18] ইবনু আবি হাতিম, ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল,*** খ. ৫, পৃ. ৫৭।

[19] ইবনু আবি হাতিম, ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল,*** খ. ৫, পৃ. ৫৭।

ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর চেয়ে অধিক কল্যাণকামী মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।”[20]

৮. ইমাম হুমাইদির ব্যাপারে **ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) বলেছেন :**

«ثقة مأمون؛ ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به».

“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.) যখন হুমাইদি থেকে বর্ণিত কোনো হাদিস পেতেন, তখন তিনি সেই হাদিস হুমাইদি ছাড়া অন্য কারও সূত্রে বর্ণনা করতেন না। হুমাইদির প্রতি তাঁর আস্থা থাকার কারণে তিনি এমনটি করতেন।”[21]

৯. ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السُّنة؛ كأحمد بن حنبل لأهل العراق، إلا أنه أقدم من أحمد».

“তিনি ছিলেন মক্কাবাসী জনসাধারণের মুফতি ও মুহাদ্দিস। সুন্নাহর ক্ষেত্রে ইরাকবাসীদের কাছে আহমাদ বিন হাম্বালের যেমন মর্যাদা, হেজাজবাসীদের কাছে হুমাইদিরও ছিল

---

[20] ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাবি, ***আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ,*** তাহকিক : আকরাম দিয়া আল-উমারি (বাগদাদ : মাতবাআতুল ইরশাদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৪।

[21] আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***তাহজিবুত তাহজিব*** (হায়দ্রাবাদ : মাতবাআতু দারিল মাআরিফিন নিজামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩২৬ হি.), খ. ৫, পৃ. ২১৬।

তেমন মর্যাদা। তবে তিনি আহমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী যুগের মানুষ ছিলেন।"[22]

১০. ইমাম হুমাইদির পরিচয় দিতে যেয়ে **ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :**

«وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ النُّبَلاءِ الثِّقَاتِ وَالْحُفَّاظِ الْمَأْمُونِينَ أَخَذَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ صَاحِبُهُ وَالْمُتَحَقِّقُ بِهِ».

"তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত ফাকিহ মুহাদ্দিসদের অন্যতম; ছিলেন বিশ্বস্ত হাফিজুল হাদিস। তিনি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন ইবনু উয়াইনার ঘনিষ্ঠ ছাত্র এবং ইবনু-উয়াইনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।"[23]

১১. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام صاحبُ الشافعي».

"আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর আল-হুমাইদি হলেন আশ-শাফিয়ির ছাত্র। আল-হুমাইদি হলেন ইমাম।"[24]

---

[22] আলাউদ্দিন মুগালতাই বিন কালিজ আল-হানাফি, ***ইকমালু তাহজিবিল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উসমান (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৯৩।

[23] আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি, ***আল-ইনতিকা ফি ফাদায়িলিস সালাসাতিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা মালিক ওয়াশ শাফিয়ি ওয়া আবি হানিফা*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তাবি), পৃ. ১০৪।

[24] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***জাওয়াবুল ইতিরাদাতিল মিসরিয়্যা আলাল ফুতইয়া আল-হামাবিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৬।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র ইমাম হুমাইদিকে *'সুন্নাহর ইমাম'* আখ্যা দিয়েছেন।[25]

১২. শাফিয়ি মাজহাবের বিশিষ্ট বিদ্বান **ইমাম শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন :**

«الإِمَامُ، الحَافِظُ، الفَقِيْهُ، شَيْخُ الحَرَمِ، أَبُو بَكْرٍ القُرَشِيُّ، الأَسَدِيُّ، الحُمَيْدِيُّ، المَكِّيُّ، صَاحِبُ (المُسْنَدِ)، ... وَلَيْسَ هُوَ بِالمُكْثِرِ، وَلَكِنْ لَهُ جَلاَلَةٌ فِي الإِسْلاَمِ».

"তিনি হলেন আল-ইমাম, আল-হাফিজ, আল-ফাকিহ, হারামের শাইখ, আবু বাকর আল-কুরাশি আল-আসাদি আল-হুমাইদি আল-মাক্কি। তিনি *'আল-মুসনাদ'* গ্রন্থের লেখক। ... যদিও তিনি বিপুলসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেননি, তথাপি ইসলামে তাঁর বিরাট মর্যাদা রয়েছে।"[26]

১৩. ইমাম জাহাবি অন্যত্র বলেছেন :

«وقد كان من كبار أئمة الدين».

"হুমাইদি ছিলেন দ্বীনের কিবার ইমামদের অন্যতম।"[27]

১৪. ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন :

---

[25] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি নাকদি কালামিশ শিআতিল কাদারিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৪৪।

[26] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১০, পৃ. ৬১৬।

[27] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***তাজকিরাতুল হুফফাজ*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩।

«عبد الله بن الزبير الحُميدي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه».

"আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাইখদের একজন। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারির শাইখ, স্বীয় যুগে আহলুল হাদিস ও ফুকাহাদের ইমাম। তিনিই হলেন প্রথম মানুষ, যাঁর নাম দিয়ে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *'সহিহুল বুখারি'* গ্রন্থের সংকলন শুরু করেছেন।"[28]

১৫. ইমাম হুমাইদির পরিচয় দিতে যেয়ে **হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন :**

«وَهُوَ إِمَامٌ كَبِيرٌ مُصَنِّفٌ».

"তিনি হলেন বিরাট ইমাম এবং হাদিসগ্রন্থের সংকলক।"[29]

লিখিত গ্রন্থ :

ইমাম হুমাইদি বিরচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

১. কিতাবুদ দালায়িল।

২. কিতাবুর রদ্দি আলান নুমান।

৩. কিতাবুত তাফসির।

৪. আল-মুসনাদ। এটি হাদিসের কিতাব। দুঃখজনক বিষয় হলো—স্রেফ এই একটি কিতাব আমাদের কাছে পৌঁছেছে; বাকি

---

[28] ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ৩৩২।

[29] আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি,*** পরিশীলন : মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব (বৈরুত : দারুল মারিফা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১০।

গ্রন্থগুলো এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আল্লাহুল মুস্তাআন।[30]

মৃত্যু :

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ ২১৯ হিজরিতে পরলোকগমন করেন।[31] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই মহান ইমামকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং আমাদের তরফ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করুন। আমিন।

---

[30] আল-হুমাইদি, ***মুসনাদুল হুমাইদি,*** খ. ১, পৃ. ৫৭-৫৮।

[31] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি, ***আত-তারিখুল আওসাত,*** তাহকিক : মাহমুদ ইবরাহিম জাইদ (আলেপ্পো ও কায়রো : দারুল ওয়ায়ি ও মাকতাবাতু দারিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৩৯।

‘উসুলুস সুন্নাহ’ পুস্তিকার পরিচয়

শিরোনাম :

লেখক রাহিমাহুল্লাহ এই পুস্তিকার কোনো স্বতন্ত্র নাম দেননি। কারণ এটা মূলত তাঁর বিখ্যাত *‘আল-মুসনাদ’* কিতাবের পরিশিষ্ট বা সর্বশেষ অধ্যায়। তবে ‘আল-মুসনাদ’ গ্রন্থের একাধিক ম্যানুস্ক্রিপ্টে দেখা যায়—সর্বশেষ পরিচ্ছেদের সূচনায় বড়ো-বড়ো অক্ষরে *‘উসুলুস সুন্নাহ’* লেখা আছে।[32] যদিও সকল ম্যানুস্ক্রিপ্টে শিরোনামটি পাওয়া যায় না। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আলোচ্য অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানেও *‘উসুলুস সুন্নাহ’* শিরোনামটি লেখা আছে।[33] আর ‘উসুলুস সুন্নাহ’ মানে—সুন্নাহর মূলনীতিসমূহ।

তাহকিক ও পরিশীলন :

কয়েকজন সমকালীন শাইখ আলোচ্য অধ্যায়টুকু তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। সেসবের মধ্যে আমার হস্তগত হয়েছে যেসব তাহকিক, সেগুলো হলো—

১. শাইখ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি রাহিমাহুল্লাহর তাহকিক। শাইখ রাহিমাহুল্লাহ মূল্যবান কিছু কিতাবের তাহকিক করেছিলেন। সেসবের মধ্যে ইমাম হুমাইদির ‘আল-মুসনাদ’ কিতাব অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই কিতাবটির পরিশিষ্টে ‘উসুলুস সুন্নাহ’

---

[32] আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর আল-হুমাইদি, ***উসুলুস সুন্নাহ,*** তাহকিক : মিশআল মুহাম্মাদ আল-হাদ্দাদি (আল-জাহরা : দারু ইবনিল আসির, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৮ ও ৩১।

[33] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার,*** পৃ. ১০।

পুস্তিকাটি বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর তাহকিককৃত গ্রন্থের নাম—***মুসনাদুল হুমাইদি।***

২. শাইখ সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহর তাহকিক। তিনি 'মুসনাদুল হুমাইদি' থেকে আকিদা বিষয়ক পরিশিষ্টটুকু তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। তিনি পুস্তিকাটির নাম দিয়েছেন—***উসুলুস সুন্নাহ।***

৩. শাইখ আদিল আলু হামদানের তাহকিক। তিনি তাঁর *'আল-জামি ফি আকায়িদি ওয়া রাসায়িলি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল আসার'* গ্রন্থে ইমাম হুমাইদি বিরচিত বিখ্যাত পরিশিষ্টটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে পুস্তিকাটির নাম দিয়েছেন—***ইতিকাদু আব্দিল্লাহ ইবনিজ জুবাইর আল-কুরাশি আবি বাকর আল-হুমাইদি।***

৪. শাইখ মিশআল মুহাম্মাদ আল-হাদ্দাদির তাহকিক। তিনিও 'মুসনাদুল হুমাইদি' থেকে আকিদা বিষয়ক পরিশিষ্টটুকু তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর তাহকিককৃত পুস্তিকার নাম—***উসুলুস সুন্নাহ।***

আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত শাইখ উসাইমি, শাইখ হুসাইন ও শাইখ মিশআলের তাহকিক অনুসরণ করেছি। অনুবাদের সাথে কিতাবের আরবি টেক্সট যুক্ত করেছি। আরবি টেক্সট নিয়েছি শাইখ উসাইমির তাহকিক থেকে। কারণ শাইখের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অত্যন্ত প্রগাঢ়। এছাড়াও শাইখের তাহকিক আমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়েছে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করি, মহান আল্লাহ যেন সকল তাহকিককারীকে উত্তম পারিতোষিক দিয়ে সম্মানিত করেন। আমিন।

বিষয়বস্তু :

ন্যায়নিষ্ঠ সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যেসব মূলনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা পথভ্রষ্ট বিদাতিদের থেকে আলাদা হয়েছিলেন। প্রয়োজন বিবেচনা করে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এই পুস্তিকায় কিছু ফিকহি মাসআলাও আলোচনা করেছেন।

গুরুত্ব :

এই পুস্তিকাটির অনেক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি—

প্রথমত, পুস্তিকাটির ইলম প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই দরকারি। বিশেষত যারা নিজেদের আকিদা শুদ্ধ ও দৃঢ় করতে চান।

দ্বিতীয়ত, আকিদার কতিপয় মূলনীতির বিবরণ। ইমাম হুমাইদি এই পুস্তিকায় আহলুস সুন্নাহর আকিদার কয়েকটি মূলনীতি আলোকপাত করেছেন। কেউ জেনেবুঝে এসব মূলনীতির কোনো একটিরও বিপরীতে গেলে তিনি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যান। আল্লাহর পানা চাই—আল-ইয়াজু বিল্লাহ।

তৃতীয়ত, পুস্তিকার লেখক ইমাম হুমাইদির উচ্চ মর্যাদা। তিনি স্বয়ং সালাফদের যুগের ইমাম ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত আকিদা অবশ্যই পরবর্তীদের বর্ণিত আকিদার চেয়ে নির্ভরযোগ্য। উপরন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্নাহপন্থি ইমামগণ তাঁর ইলম ও আকিদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

চতুর্থত, যুগে যুগে সুন্নাহপন্থি উলামাগণ এই পুস্তিকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, নিজেদের কিতাবপত্রে এই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি

দিয়েছেন এবং একাধিক সমকালীন সালাফি শাইখ পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্যাখ্যাসমূহ :

আলোচ্য পুস্তিকার ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংখ্যা অনেক কম। আমার হস্তগত হয়েছে যেসব ব্যাখ্যাগ্রন্থ, সেগুলো হলো—

১. শারহু উসুলিস সুন্নাহ লি আবি বাকর আল-হুমাইদি; রচয়িতা : শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি হাফিজাহুল্লাহ।

২. ফাতহু জিল জালালি ওয়াল মিন্নাহ ফি শারহি উসুলিস সুন্নাহ; রচয়িতা : শাইখ উবাইদ আল-জাবিরি রাহিমাহুল্লাহ।

৩. শারহু উসুলিস সুন্নাহ; রচয়িতা : শাইখ সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ।

৪. আত-তালিকুল জালি আলা উসুলিস সুন্নাহ লিল ইমামিল হুমাইদি; রচয়িতা : শাইখ আব্দুল কাদির আল-জুনাইদ হাফিজাহুল্লাহ।

উপরিউক্ত চারটি গ্রন্থই সম্মাননীয় শাইখদের দারস থেকে ট্রান্সক্রাইব করে লেখা হয়েছে। সম্প্রতি *'আল-ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ ফি শারহি উসুলিস সুন্নাহ'* নামে শাইখ ড. মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি বিরচিত আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়নি।

এছাড়াও সমকালীন সালাফি শাইখদের মধ্যে শাইখ সালিহ আস-সুহাইমি হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ আব্দুল আজিজ আশ-শিবল হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ ইবরাহিম আর-রুহাইলি হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মাদ সায়িদ রাসলান হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ বদর আল-উতাইবি হাফিজাহুল্লাহ প্রমুখ তাঁদের দারসে এই পুস্তিকার ব্যাখ্যা করেছেন; যা ইউটিউবে অ্যাভেইলেবল। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

ইজমার পরিচয় ও প্রামাণিকতা

বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমরা ইজমা থেকে প্রচুর দলিলপ্রমাণ উল্লেখ করেছি। সকল পাঠক এই দলিলের গুরুত্ব ও পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই ইজমার পরিচয় ও প্রামাণিকতা বিষয়ে খুবই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি। ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ—ঐক্যমত, মতৈক্য, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[34] বিশেষজ্ঞ উলামাগণের পরিভাষায়—এই উম্মতের কোনো এক যুগের সকল মুজতাহিদ বিদ্বান যখন শরিয়তের কোনো বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তখন সেই সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ইজমা বলা হয়।[35]

সুসাব্যস্ত ইজমা আমাদের শরিয়তের একটি অন্যতম দলিল। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾.

“যে ব্যক্তি হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের বিরোধিতা করে, এবং **মুমিনদের পথ** বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে; আমি তাকে সে পথেই ফিরাব, যে পথে সে ফিরে যায়। আর তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে। কতইনা মন্দ সে আবাস!”[36]

---

[34] মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)*** (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৩৭।

[35] নাজমুদ্দিন আবুর রাবি সুলাইমান বিন আব্দুল কাউয়ি আত-তুফি, ***শারহু মুখতাসারির রওদা,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৬।

[36] সুরা নিসা ৪:১১৫।

ইজমার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করতে যেয়ে আয়াতটি উল্লেখ করার পর **ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.) বলেছেন :**

«وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين، ويُحرِّم مخالفتهم».

"মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে প্রতীয়মান হয়, মুমিনদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং তাঁদের পথের বিপরীতে যাওয়া হারাম।"[37]

এছাড়াও সালাফদের যুগের ইমাম আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) এই আয়াত দিয়ে ইজমার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন—যেই ইজমার বিপরীত মত গ্রহণ করা হারাম।[38]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

"তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে তোমরা তা আল্লাহ ও রসুলের কাছে ফিরিয়ে দাও।"[39]

অর্থাৎ, মতভেদের সময় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ইজমার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করতে যেয়ে আয়াতটি উল্লেখ করার পর **ইমাম খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন :**

---

[37] মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি, ***রওদাতুন নাজির ওয়া জুন্নাতুল মুনাজির,*** তাহকিক : শাবান মুহাম্মাদ ইসমায়িল (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৮০।

[38] আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দিন (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

[39] সুরা নিসা ৪:৫৯।

«فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ يَجِبُ فِي حَالِ الِاخْتِلَافِ، وَلَا يَجِبُ فِي حَالِ الْإِجْمَاعِ».

"এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মতভেদের সময় বিষয়টিকে কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু ঐক্যমতের সময় আবশ্যক নয়।"[40]

আয়াতটি উল্লেখ করার পর **শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন :**

"এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, মতভেদ ও মতানৈক্যের সময় মহান আল্লাহ কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়াকে আবশ্যক করেছেন। কিন্তু আমরা যখন কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যাব, তখন আর সেই বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"[41]

ইজমা যে শরিয়তের দলিল, সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর সবাই একমত। ইজমার প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছিল মুতাজিলিদের শীর্ষনেতা ইবরাহিম বিন সাইয়্যার আন-নাজ্জাম (মৃ. ২২১ হি.) এবং প্রাক্কালীন রাফিদি শিয়া সম্প্রদায়।[42] **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

---

[40] আবু বাকর আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,*** তাহকিক : আদিল বিন ইউসুফ আল-গারাজি (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০৭।

[41] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহু নাজমিল ওয়ারাকাত ফি উসুলিল ফিকহ*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, তাবি), পৃ. ১৭২।

[42] আল-বাগদাদি, ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৯৭।

«الْإِجْمَاعُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ».

"সার্বিকভাবে ইজমার প্রামাণিকতা বিষয়ে সকল মুসলিম একমত। এই উম্মতের ফাকিহ, সুফি, মুহাদ্দিস, কালামশাস্ত্রবিদ প্রমুখের সবাই এটা মান্য করেছেন। কেবল মুতাজিলা ও শিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় বিদাতি এটা অস্বীকার করেছে।"[43]

একটি সংশয় ও তার নিরসন :

ইজমার প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে অনেকে নানারকম সংশয় ও আপত্তি পেশ করে। সেসবের মধ্যে একটি বহুলপ্রচলিত সংশয় হলো—ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ইজমা থাকার দাবি করে, সে মিথ্যুক।' এটা খুবই নিম্নমানের কুযুক্তি। বাংলাদেশী কিছু লেখকের বইপত্রে এই কুযুক্তি না দেখলে আমি হয়তো এটা সম্পর্কে আলোচনা করতাম না। মূলত এটা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহর সম্পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ না করে ধোঁকা দেওয়ার শামিল। কিছু ধর্মচ্যুত লোক যেরকম বলে, কুরআনে আছে, 'তোমরা নামাজের কাছেও যেও না।' অথচ তারা পরের অংশটুকু আর বলে না। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায়।'[44] অর্থাৎ, তোমরা নামাজের কাছেও যেও না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। ইজমাবিরোধীদের কুযুক্তিও অনেকটা এরকম।

---

[43] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৪১।

[44] সুরা নিসা ৪:৪৩।

ইমাম আহমাদের সম্পূর্ণ কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ রাহিমাহুমাল্লাহ। সেই বর্ণনা অনুযায়ী **ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«من ادعى الإِجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَريسي والأصم».

"যে ব্যক্তি ইজমা দাবি করেছে, সে মিথ্যুক। হয়তো মানুষজন (পূর্ববর্তী সালাফগণ) এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা বিশর আল-মারিসি ও আল-আসাম্মের দাবিকৃত ইজমা।"[45]

বিশর আল-মারিসি এবং আল-আসাম্ম—দুজনই ছিল ইমাম আহমাদের যুগের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের শীর্ষনেতা। তারা নিজেদের বাতিল মতাদর্শের পক্ষে মিথ্যা ইজমা দাবি করত। এ প্রসঙ্গে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين».

"বিশর আল-মারিসি এবং আল-আসাম্ম প্রমুখের মতো কালামশাস্ত্রবিদ ফুকাহারা বিভিন্ন বিষয়ে ইজমা দাবি করত। অথচ তারা আবু হানিফা ও মালিক প্রমুখের অভিমত ছাড়া অন্য কারও মত জানত না। সাহাবি ও তাবেয়িগণের মতামত সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল না।"[46]

---

[45] কাদি আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-ফার্রা আল-হাম্বালি, ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** তাহকিক : আহমাদ আল-মুবারাকি (প্রকাশনার নামবিহীন, ২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০৫৯।

[46] মাজদুদ্দিন আব্দুস সালাম ইবনু তাইমিয়া, শিহাবুদ্দিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া ও তাকিউদ্দিন আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া, ***আল-মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল***

ইমাম আহমাদের আলোচ্য বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) উল্লেখ করেছেন :**

«وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِهَذَا اسْتِبْعَادَ وُجُودِ الْإِجْمَاعِ، وَلَكِنَّ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ بُلُوا بِمَنْ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهَا، فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى كَذِبٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَدُّ السُّنَنِ بِمِثْلِهَا».

“ইমাম আহমাদের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইজমা থাকতে পারে না—ইজমার অস্তিত্ব একটি সুদূরপরাহত বিষয়। মূলত ইমাম আহমাদ ও হাদিসশাস্ত্রের ইমামগণ এমন লোকদের পাল্লায় পড়েছিলেন, যারা তাঁদের সামনে সুন্নাহর বিপরীতে ইজমা দাবি করে—বিশুদ্ধ সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করত। তাই ইমাম শাফিয়ি ও আহমাদ রাহিমাহুমাল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের এসব দাবি মিথ্যা। এসব দাবির অজুহাতে সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা না-জায়েজ।”[47]

এ কারণে আমরা দেখতে পাই, ইমাম আহমাদ নিজেই বিভিন্ন মাসআলায় ইজমা দাবি করেছেন। কারণ এগুলো ছিল সত্যিকারের প্রমাণিত ইজমা। একবার বিখ্যাত মুজতাহিদ বিদ্বান ইমাম আবু সাওর রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪০ হি.) ইজতিহাদ করে ফতোয়া দিয়েছিলেন, ‘মাজুসি তথা অগ্নিপূজক নারীদেরকে মুসলিম পুরুষরা বিয়ে করতে পারবে।’ ইমাম আহমাদ এই ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন

ফিকহ, সংকলন : আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হার্রানি, তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ (দামেস্ক : দারুল কিতাবিল আরাবি, তাবি), পৃ. ৩১৬।

[47] শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা,*** তাহকিক : সাইয়্যিদ ইবরাহিম (কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৬১২।

এবং নিজের মতের পক্ষে ইজমা থেকে প্রমাণ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে **ইমাম আবু বাকর আল-মাররুজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেন :**

«سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عون، عن محمد، أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره، وقال: الأخبار على خلافه، قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قَالَ: لا. فقلت: إن أبا ثور يحتج بأنهم من أهل الكتاب؟ قَالَ: وأي كتاب لهم؟ قلت: يحتج بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . فقال: ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم، قد اختلفوا في اليهود والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا. وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه».

“একদা আমি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদকে) একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। হাদিসে এসেছে, মুহাম্মাদের সূত্রে ইবনু আওন বর্ণনা করেছেন, ‘হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মাজুসি নারীকে বিয়ে করেছিলেন।’ হাদিসটি শুনে ইমাম আহমাদ বিরোধিতা করেন। তিনি বলে ওঠেন, ‘সকল হাদিস এর বিপরীত।’ তখন আমি আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করি, ‘হাদিসটি কি আপনার কাছে প্রমাণিত?’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘না; প্রমাণিত নয়।’ আমি বললাম, ‘আবু সাওর রাহিমাহুল্লাহ যুক্তি দিয়েছেন—মাজুসিরাও আহলে কিতাব তথা কিতাবধারী ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত (সুতরাং ইহুদি ও খ্রিষ্টান নারীদের মতো মাজুসি নারীদেরও বিয়ে করা যাবে)।’ ইমাম আহমাদ বলে ওঠলেন, ‘মাজুসিদের কাছে আবার কোন কিতাব নাজিল হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘আবু সাওর রাহিমাহুল্লাহ একটি হাদিস দিয়ে যুক্তি দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, “তোমরা মাজুসিদের জন্য আহলে কিতাবদের

নিয়মনীতি প্রয়োগ করো”।’ এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ বললেন, ‘মাজুসিদের বিয়ে করার ব্যাপারে এবং মাজুসিদের জবাইকৃত পশু খাওয়ার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি (অর্থাৎ এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সালাফগণ একমত ছিলেন)। মতভেদ করেছেন কেবল ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে। কিন্তু মাজুসিদের ব্যাপারে সালাফগণ কোনো মতভেদ করেননি।’ এসব বলে আবু আব্দুল্লাহ মাজুসি নারীদের বিয়ে করার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত বিয়ের পক্ষে বর্ণিত সকল বর্ণনাকে ‘দুর্বল’ আখ্যা দেন।”[48]

অনুরূপভাবে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ ইজমা দিয়ে দলিল দিয়েছেন।[49]

ইজমা কীভাবে কাজ করে?

ইজমা কীভাবে সংঘটিত হয়, কীভাবে প্রমাণিত হয়—তা অনেকে বুঝতে পারেন না। ফলে নানারকম ভ্রমাত্মক ধারণা নিয়ে বসে থাকেন। কেউ কেউ প্রমাণিত ইজমার ব্যাপারে মন্তব্য করে বসেন, “অমুক বিষয়ে ইজমা দাবি করলেই হলো? আমি নিজেই তো ওই মত মানি না।” তাঁরা মনে করেছেন, ইজমা সংঘটিত হতে হলে সকল মুসলিমকে একমত হতে হবে। অথচ এটা ভুল ধারণা। সকল মুসলিম নয়, বরং ইজমা সংঘটন করতে হলে কোনো যুগের সকল মুজতাহিদ বিদ্বানকে একমত হতে হয়। ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন—এমন

---

[48] আবু বাকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-বাগদাদি আল-হাম্বালি, ***আহকামু আহলিল মিলালি ওয়ার রিদ্দাহ মিনাল জামিয়ি লি মাসায়িলিল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল,*** তাহকিক : সাইয়্যিদ কাসরাবি হাসান (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৬০।

[49] **উদাহরণস্বরূপ দেখুন :** আবু ইয়ালা, ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** খ. ৪, পৃ. ১০৫৯-১০৬০।

প্রত্যেক মুজতাহিদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তই ইজমা। অতএব কোনো যুগের সকল মুজতাহিদ বিদ্বান যদি কোনো বিষয়ে একমত হন, তাহলে সেই ঐক্যমত মেনে নেওয়া সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য।[50]

আমরা বুঝতে পারলাম, কোনো বিষয়ে ইজমা হয়েছে কিনা, তা স্রেফ মুজতাহিদদের মতামত থেকে জানতে হয়। ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে। শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখযোগ্য দুটো শর্ত আলোচনা করেছেন।[51] যথা :

প্রথম শর্ত : ইজমাটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে। ইজমা সাধারণত দুভাবে প্রমাণিত হয় :

(১) ইজমার বিষয়টি উলামাগণের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন ক্রয়বিক্রয় বৈধ, ভাড়া দেওয়া বৈধ। এগুলোর বৈধতা বিষয়ে ইজমা হয়েছে এবং সেই ইজমা উলামাগণের কাছে প্রসিদ্ধ। সুতরাং এটা প্রমাণিত ইজমা।

(২) ইজমা বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং সুপরিসর জ্ঞানের অধিকারী হন, তাহলে তাঁর বর্ণিত ইজমা থেকেও ইজমা প্রমাণিত হয়। যেমন ইবনুল মুনজির, ইবনু কুদামা, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু হাজার প্রমুখ বিদ্বান যেসব ইজমা বর্ণনা করেন, সাধারণত সেগুলো প্রমাণিত ইজমা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শর্ত : ইজমা সংঘটিত হওয়ার আগে কোনো সুসাব্যস্ত স্থিতিশীল মতভেদ থাকা যাবে না। তবে যদি ইজমা সংঘটিত হওয়ার

---

[50] আবু ইয়ালা, ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** খ. ৪, পৃ. ১১৩৩; ইবনু কুদামা, ***রওদাতুন নাজির,*** খ. ১, পৃ. ৩৭৮।

[51] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল*** (দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওজি, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৬।

সামান্য পূর্বে মতভেদ হয়ে থাকে—যা অনেকটা সময় ধরে স্থিতিশীলতা লাভ করেনি—তাহলে সেই মতভেদ ধর্তব্য হবে না। বরং ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে। যেমন সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নিযুক্ত করা হবে কিনা, অথবা জাকাত দিতে অস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কিনা, কিংবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আম্মিজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কক্ষে দাফন করা হবে কিনা—এসব বিষয়ে সাহাবিগণের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য মতভেদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা সবাই একমত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইজমা সংঘটিত হওয়ার আগে কোনো সুসাব্যস্ত স্থিতিশীল মতভেদ হয়ে থাকলে এবং সেই মতভেদ অনেকটা সময় ধরে স্থিতিশীলতা লাভ করলে—সেই ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না।[52]

ইজমার যাবতীয় শর্ত যদি পূরণ হয় এবং ইজমাটি যদি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয় (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়), তাহলে তাকে 'অকাট্য ইজমা (الإجماع القطعي)' বলা হয়।[53] অকাট্য ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো দ্বীনের মৌলিক বিষয় হয়ে থাকে। আর দ্বীনের মৌলিক বিষয় ফিকহসংক্রান্তও হতে পারে, আবার আকিদাসংক্রান্তও হতে পারে।[54] কিন্তু ফিকহসংক্রান্ত হোক,

---

[52] গাজি বিন মুরশিদ আল-উতাইবি, ***তাকরিবুল হুসুল আলা লাতায়িফিল উসুল মিন ইলমিল উসুল*** (দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.), পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[53] আত-তুফি, ***শারহু মুখতাসারির রওদা,*** খ. ৩, পৃ. ১২৭।

[54] সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি, ***কানুনুত তাসিসিল আকাদি*** (মারকাজু তাকবিন লিদ্দিরাসাতি ওয়াল আবহাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ২৩৫-২৩৬।

চাই আকিদাসংক্রান্ত—দ্বীনের কোনো অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে গেলে ব্যক্তি হয় কাফির হবে, আর নয়তো বিদাতি হবে।[55]

পক্ষান্তরে ইজমার দুয়েকটি শর্তে ঘাটতি থাকলে, কিংবা ইজমাটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত না হলে, তাকে 'প্রবল-ধারণানির্ভর ইজমা (الإجماع الظني)' বলা হয়।[56] এ ধরনের ইজমাও শরিয়তের দলিল। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য উলামাদের অনুসরণ করে কেউ এই ইজমার বিপরীতে গেলে তাকে 'কাফির' কিংবা 'বিদাতি' বলা যায় না।[57]

অনেকে ইজমার স্বরূপ বুঝতে ভুল করেন। ফলে উলামাদের বিরল মত নিয়ে এসে তাঁরা ইজমায়ি বিষয়ের বিরোধিতা করে বসেন! যেমন একদল মৌলানাকে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা বাদ্যযন্ত্র ও মিউজিককে হালাল দাবি করেন। তাঁরা বলেন, "এটা মতভেদপূর্ণ বিষয়। দলিল—স্পেনের আলিম ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহ! ইবনু হাজম (মৃ. ৪৫৬ হি.) মিউজিককে হালাল বলেছেন।" অথচ ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহর জন্মের আগে মিউজিক হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে। ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহর জন্মের বহুপূর্বে ইমাম আবু বাকর আল-আজুর্রি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬০ হি.) উলামাদের ইজমা বর্ণনা করেছেন—বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম, মিউজিক শোনা

---

[55] আল-উমাইরি, ***কানুনুত তাসিসিল আকাদি,*** পৃ. ২৮৭।

[56] আত-তুফি, ***শারহু মুখতাসারির রওদা,*** খ. ৩, পৃ. ১২৭।

[57] ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ আল-গাফিস, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*** (ই-বুক, দারসের ট্রান্সক্রিপ্ট, তাবি), পৃ. ২২১-২২৩।

হারাম।[58] আর ইজমা হয়ে যাওয়ার পরে কোনো মুজতাহিদ বিদ্বান এসে ভিন্ন মত দিলে সেই মত কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।[59]

সুপ্রিয় পাঠক, এই ছিল ইজমা বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন, ইসলামি শরিয়তে ইজমা অনেক বিস্তৃত একটি অধ্যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে উসুলুল ফিকহের আকর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন।

---

[58] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***নুজহাতুল আসমা ফি মাসআলাতিস সামা (রাসায়িলুল হাফিজ ইবনি রজাব আল-হাম্বালি-র অন্তর্গত),*** তাহকিক : আবু মুসআব তালআত বিন ফুআদ আল-হুলওয়ানি (কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৪।

[59] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৩, পৃ. ২৬।

ফাহমুস সালাফ : গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা

বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমরা ফাহমুস সালাফ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাই ফাহমুস সালাফের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। 'ফাহমুস সালাফ' মানে—সালাফদের বুঝ, সালাফদের সমঝ। মুসলিম মাত্রই কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের দাবি করে থাকেন। কিন্তু সবাই তো আর প্রকৃত হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নন। যারা সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করেন, কেবল তাঁরাই হলেন সত্যিকারের হকপন্থি। শরয়ি বিষয়াদির ক্ষেত্রে সালাফগণ সামগ্রিকভাবে যেই মত পোষণ করতেন, সেটাই ফাহমুস সালাফ তথা সালাফদের বুঝ।

সালাফ কারা?

'সালাফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—পূর্বসূরি, পূর্বপুরুষ, অগ্রবর্তী।[60] পরিভাষায়, সালাফ হলেন এই উম্মতের প্রথম তিন প্রজন্মের সেই ব্যক্তিবর্গ—যাঁরা বিদাতি হিসেবে অভিযুক্ত হননি।[61] কারণ প্রথম তিন প্রজন্মের ব্যাপারে আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন। **তিনি বলেছেন :**

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ».

---

[60] আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস আর-রাজি, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন (দামেস্ক : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), ভুক্তি : سلف, খ. ৩, পৃ. ১৪৯।

[61] আবুল আওন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা ওয়া সাওয়াতিউল আসরারিল আসারিয়্যা লি শারহিদ দুর্রাতিল মুদিয়্যা ফি আকদিল ফিরকাতিল মারদিয়্যা*** (দামেস্ক : মুআসসাসাতুল খাফিকিনা ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০।

“আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম মানুষ, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী।”[62]

এই হাদিসের ভিত্তিতে অনেক উলামা বলেছেন, ‘সালাফ হলেন—সাহাবিবর্গ, তাবেয়িগণ এবং তাবে-তাবেয়িগণ।’[63] আর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ[64] এবং হাফিজ ইবনু রজব আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহর[65] বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁরা ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১ হি.), ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুইয়াহ (মৃ. ২৩৮ হি.), ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হি.) প্রমুখকেও সালাফদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ এই মহামতি ইমামগণ খোদ তাবে-তাবেয়ি ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাবে-তাবেয়িদের জামানা পেয়েছিলেন; তাঁরা তাবে-তাবেয়িদের যুগের মানুষ ছিলেন। **হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,** “উলামাগণ একমত—২২০ হিজরি পর্যন্ত সর্বশেষ তাবে-তাবেয়ি জীবিত ছিলেন।”[66]

---

[62] সহিহুল বুখারি, হা. ২৬৫২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

[63] মুহাম্মাদ বাকারিম মুহাম্মাদ বা-আব্দুল্লাহ, ***ওয়াসাতিয়্যাতু আহলিস সুন্নাহ বাইনাল ফিরাক*** (দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯৮।

[64] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (সৌদি আরব : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৭।

[65] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***ফাদলু ইলমিস সালাম আলা ইলমিল খালাফ (রাসায়িলুল হাফিজ ইবনি রজাব আল-হাম্বালি-র অন্তর্গত),*** তাহকিক : আবু মুসআব তালআত বিন ফুআদ আল-হুলওয়ানি (কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪।

[66] ইবনু হাজার, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ৭, পৃ. ৯৩। **আরবি টেক্সট :**

«وَاتَّفَقُوا أَنَّ آخِرَ مَنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَنْ عَاشَ إِلَى حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ».

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে ২২০ হিজরি অবধি সময়কালের যেসব মুসলিম বিদাতি ছিলেন না—তাঁরাই হলেন ন্যায়নিষ্ঠ সালাফ।

ফাহমুস সালাফের প্রামাণিকতা :

ফাহমুস সালাফ অনুসরণ করা ফরজ। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾.

“যে ব্যক্তি হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের বিরোধিতা করে, এবং **মুমিনদের পথ** বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে; আমি তাকে সে পথেই ফিরাব, যে পথে সে ফিরে যায়। আর তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে। কতইনা মন্দ সে আবাস!”[67]

এই আয়াত প্রসঙ্গে **ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.) বলেছেন :**

«فَمن أحب الْكَوْن مَعَ السّلف فِي الْآخِرَة، وَأَن يكون موعودا بِمَا وعدوا بِهِ من الجنات والرضوان، فليتبعهم بِإِحْسَان؛ وَمن اتبع غير سبيلهم، دخل فِي عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى﴾ الْآيَة».

“যে ব্যক্তি পরকালে সালাফদের সাথে থাকতে চায় এবং তাঁদেরকে যেই জান্নাত ও সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিজের জন্যও প্রস্তুত পেতে পছন্দ করে, সে যেন উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সালাফদের পথ বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথের অনুসরণ

[67] সুরা নিসা ৪:১১৫।

করে, সে মহান আল্লাহর এই ব্যাপক কথার আওতাভুক্ত হবে। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের বিরোধিতা করে, এবং **মুমিনদের পথ** বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে; আমি তাকে সে পথেই ফিরাব, যে পথে সে ফিরে যায়। আর তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে। কতইনা মন্দ সে আবাস!' (*সুরা নিসা ৪:১১৫*)"[68]

ফাহমুস সালাফ অনুসরণ না করার কারণে যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছিল প্রথম যুগের খারেজিরা। যারা সালাফদের বুঝ অনুসরণ না করে নিজেদের মতো কুরআন-সুন্নাহ বুঝে নিয়ে সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'কাফির' ফতোয়া দিয়েছিল এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সেই খারেজিদের সাথে মুফাসসিরকুল শিরোমণি সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইলমি বিতর্ক করেছিলেন। **সেই বিতর্কে তিনি খারেজিদের উদ্দেশে বলেছিলেন :**

«أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ وَصِهْرِهِ، وَعَلَيْهِمْ نُزِّلَ الْقُرْآنُ، **فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ**».

"আমি তোমাদের কাছে এসেছি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিবর্গের নিকট থেকে—মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের তরফ থেকে, এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে। তাঁদের ওপরই কুরআন

[68] ইবনু কুদামা, ***জাম্মুত তাবিল,*** পৃ. ৯-১০।

নাজিল হয়েছে। **সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে তাঁরাই ভালো জানেন। অথচ তোমাদের মধ্যে তাঁদের কেউ নেই।"**[69]

এসব তো গেল কুরআন-হাদিসের কথা। এগুলো ছাড়াও সুস্থ বিবেক ও ইজমা থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে—ফাহমুস সালাফ একটি শক্তিশালী দলিল। আমরা জানি, কোনো কথার সর্বোত্তম সমঝ ও সবচেয়ে সঠিক মর্মার্থ জানতে চাইলে সেই ভাষার মানুষদের কাছেই ফিরে যেতে হয়, যারা সেই ভাষায় কথা বলে। অনুরূপভাবে যাঁরা সংশ্লিষ্ট কথার প্রচারকের সাথে বসবাস করেছেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা নিয়েছেন, তাঁর সামনে সেই কথার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকেই সেই কথার মর্মার্থ রপ্ত করেছেন; উক্ত কথার সঠিক মর্মার্থ জানার জন্য তাঁদের কাছে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন সেই কথাগুলো যদি তাঁদের হেদায়েতের জন্যই নাজিল হয়ে থাকে, এবং প্রধানত তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে; তাহলে তো কোনো কথাই নেই। বিনাবাক্যে তাঁদের বুঝটাই গ্রহণ করতে হবে।

এরপর যখন দেখা যায়, কথাগুলোর প্রচারক নিজেই একদল মানুষের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের অনুসরণ করতে বলেছেন, তাঁদের ইলম ও আমলের প্রশংসা করেছেন; তখন সুস্থ বিবেক এবং সত্যিকারের আনুগত্য—দুটোই দাবি করে, সেই প্রশংসিত মানুষদেরকেই 'প্রচারকের কথা বোঝার মানদণ্ড' হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রচারক নিজেই যাদের প্রশংসা ও অনুমোদন দিয়েছেন, তাঁর কথার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ বুঝতে তাঁরাই সবচেয়ে যোগ্য। আর

---

[69] নাসায়ি, ***আস-সুনানুল কুবরা,*** হা. ৮৫২২; বর্ণনার মান : শাইখ মুকবিল আল-ওয়াদিয়ি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

এসব গুণ সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[70]

এতদ্ব্যতীত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সবাই একমত—কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক সমঝ এবং কুরআন-সুন্নাহমাফিক আমলের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন এই উম্মতের প্রথম তিন প্রজন্ম। সুতরাং প্রথম তিন প্রজন্মের মানুষজন যেসব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন, সেসব বিষয়ে তাঁদের বুঝ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যেই হক সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে অন্যদের বুঝের চেয়ে প্রথম তিন প্রজন্মের বুঝই অগ্রগণ্য ও অনন্য।[71]

এজন্য শাইখুল ইসলাম **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছিলেন :**

«لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَزَى إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ. فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا».

“যে ব্যক্তি সালাফদের আদর্শ প্রকাশ করে, উক্ত আদর্শের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত ও যুক্ত করে (অর্থাৎ সালাফদের আকিদা-মানহাজ অনুসরণের দাবি করে), তার কোনো দোষ নেই। বরং উক্ত আদর্শ গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। কারণ সালাফদের আদর্শ হক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।”[72]

---

[70] মাহির আমির আব্দুল কারিম, ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা*** (মারকাজু তাফাক্কুর লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, তাবি), পৃ. ২৮।

[71] মাহির আমির, ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ২৯।

[72] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৪, পৃ. ১৪৯।

ফাহমুস সালাফ কীভাবে কাজ করে?

আমরা যখন বলি, "সালাফদের বুঝ অনুযায়ী আমাদের আকিদা-মানহাজ নির্ধারণ করতে হবে।" তখন কোনো কোনো গুণীজন এই কথার মর্ম ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁরা মন্তব্য করে বসেন, "এটা কীভাবে সম্ভব? সালাফদের মধ্যে অনেক মাসআলায় মতভেদ হয়েছে। তাহলে কোনটা অনুসরণ করব?!" আসলে তাঁরা 'ফাহমুস সালাফের' স্বরূপ বুঝতে ভুল করেছেন। ফাহমুস সালাফ বলে আমরা 'সালাফদের ইজমা' বোঝাই। সকল সালাফ যেই বুঝের ব্যাপারে একমত ছিলেন, সেটাই ফাহমুস সালাফ।[73] এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, **তাহলে ইজমার সাথে ফাহমুস সালাফের পার্থক্য কী?** অনেকে এই প্রশ্নটি আপত্তি হিসেবেও উত্থাপন করেন। এসব আপত্তির মাধ্যমে তাঁরা ফাহমুস সালাফের গুরুত্ব হালকা করতে চান। আমরা তাঁদের জবাবে বলব, ইজমার সাথে ফাহমুস সালাফের উল্লেখযোগ্য দুটি পার্থক্য আছে। যথা :

প্রথম পার্থক্য : ইজমার প্রামাণিকতা স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত হয়। আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জানতে পেরেছি, ইজমা-ও একটি স্বতন্ত্র দলিল। কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত স্রেফ সুস্থ বিবেক থেকে এটা জানা যায় না। পক্ষান্তরে ফাহমুস সালাফের প্রামাণিকতা কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি সুস্থ বিবেক থেকেও সাব্যস্ত হয়। ফলে আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে ফাহমুস সালাফের প্রামাণিকতা না-ও জানতাম; তথাপি মহান আল্লাহর তৌফিকে

---

[73] সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি, ***আল-বারাহিনুল জালিয়্যা ফিদ দিফায়ি আন উসুলিল মাদরাসাতিস সালাফিয়্যা*** (ই-বুক, ইন্টারনেটে প্রকাশিত আর্টিকেলের পিডিএফ, তাবি), পৃ. ৬-৭।

আমাদের সুস্থ বিবেকই আমাদের জানিয়ে দিত—সালাফদের বুঝ-ও একটি দলিল; এটাকে উল্লঙ্ঘন করা যাবে না।[74]

দ্বিতীয় পার্থক্য : সালাফদের মতভেদ ইজমার আওতাভুক্ত নয়। কেননা মতভেদের বিপরীতই ইজমা। অপরদিকে, সালাফদের মধ্যকার মতভেদও ফাহমুস সালাফের অন্তর্ভুক্ত। ফলে সালাফগণ যদি কোনো বিষয়ে দুটো মতে মতভেদ করেন, তাহলে পরবর্তী কোনো বিদ্বান এসে তৃতীয় আরেকটি মত দিতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, নামাজের মধ্যে রুকু থেকে ওঠার পর সিজদায় যাওয়ার সময় আগে দুই হাত জমিনে রাখতে হবে, না দুই হাঁটু জমিনে রাখতে হবে—এ বিষয়ে সালাফগণ মতভেদ করেছেন। প্রত্যেক মতের পক্ষেই দলিলপ্রমাণ আছে। উক্ত মতদুটো থেকে বের হওয়া না-জায়েজ। এখন কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাত এবং দুই হাঁটু একসাথে জমিনে রাখতে হবে।" তাহলে আমরা বলব, "এটা নতুন মত। আপনি সালাফদের মতামত থেকে বের হয়ে গেছেন।"[75]

এ কারণে সালাফদের যুগের ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলতেন :**

«إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ يختار من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم».

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ করেন, তখন তাঁদের মতগুলো থেকেই কোনো একটি মত চয়ন করতে হবে।

---

[74] মাহির আমির, ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ২৯।

[75] সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ আর-রুহাইলি, ***দিরাসাতুন ফিল মানহাজ*** (ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই মাকতাবুল ইমামিল মুজানি, তাবি), পৃ. ৩৫-৩৭।

তাঁদের মতামত থেকে বের হয়ে পরবর্তীদের মতের দিকে যাওয়া যাবে না।"[76]

সালাফদের মানহাজ পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা আরও দেখতে পাই—**ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল :**

«في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم؟».

"সাহাবিগণ যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ করেন, তাহলে তাঁদের মতামত থেকে কি বের হওয়া যাবে না?"

ইমাম আহমাদ উত্তরে বলেছিলেন :

«أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا».

"আপনার কী অভিমত? সাহাবিগণ যদি কোনো বিষয়ে একমত হন, তাহলে সাহাবিদের সেই ঐক্যমত থেকে কি বের হওয়া যাবে? (জেনে রাখুন) এটা একটা নিকৃষ্ট কথা। এটা বিদাতিদের কথা। সাহাবিগণ মতভেদ করলেও তাঁদের মতামত থেকে বের হওয়া বৈধ নয়।"[77]

---

[76] আবুল খাত্তাব মাহফুজ বিন আহমাদ আল-কালওয়াজানি, ***আত-তামহিদ ফি উসুলিল ফিকহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আলি বিন ইবরাহিম (মক্কা : মারকাজুল বাহসিল ইলমি, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩১০।

[77] আবু ইয়ালা, ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** খ. ৪, পৃ. ১০৫৯; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** পৃ. ৩১৫।

ফাহমুস সালাফ দিয়ে দলিল দেওয়ার পদ্ধতি :

ফাহমুস সালাফ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারি এবং ফাহমুস সালাফ দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দলিল দিতে পারি। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক আলোচনা করছি।

প্রথম দিক : ফাহমুস সালাফ দিয়ে আমরা বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় এবং নির্দিষ্ট বক্তব্য সাব্যস্ত করতে পারি। যেমন আমরা বলতে পারি, 'মহান আল্লাহ সত্যিকারার্থেই সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন,' কিংবা বলতে পারি, 'আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত।' এভাবে আমরা অনেক আনুষঙ্গিক মাসআলা সাব্যস্ত করতে পারি ফাহমুস সালাফ থেকে।

দ্বিতীয় দিক : ফাহমুস সালাফ দিয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মপন্থা এবং সর্বজনীন মূলনীতি সাব্যস্ত করতে পারি। যেমন আমরা বলতে পারি, "কুরআন-সুন্নাহর 'প্রকাশ্য অর্থ' গ্রহণ করা আবশ্যক," কিংবা বলতে পারি, 'আকিদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে যাবতীয় বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া যায়।' অনুরূপভাবে ফাহমুস সালাফ থেকে আমরা অনেক মূলনীতি ও কর্মপন্থা সাব্যস্ত করতে পারি, যেসব মূলনীতির আওতায় প্রচুর আনুষঙ্গিক মাসআলা ও প্রায়োগিক বিষয় থাকে।

তৃতীয় দিক : ফাহমুস সালাফ দিয়ে আমরা বাতিলপন্থিদের তৈরিকৃত বিভিন্ন আনুষঙ্গিক মাসআলা ও সর্বজনীন মূলনীতিকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। কেউ যদি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা করে **এমন পরিভাষার আলোকে,** যেই পরিভাষার অস্তিত্বই ছিল না সালাফদের যুগে, তার সেই ব্যাখ্যাকে আমরা বাতিল ঘোষণা করতে পারি। যদিও সালাফগণ থেকে ওই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হরফও বর্ণিত না হয়, তবুও আমরা বলে দিতে পারি, পরবর্তীদের অমুক ব্যাখ্যা বাতিল। কারণ সালাফদের যুগে উক্ত পরিভাষার অস্তিত্বই ছিল না। একইভাবে

কেউ যদি এমন মানহাজ (methodology) দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা করে, যেই মানহাজ সালাফগণ জানতেন না, সেই ব্যাখ্যাকেও আমরা বাতিল ঘোষণা করতে পারি। কারণ উক্ত মানহাজ সম্পর্কে সালাফগণ জানতেন না। উদাহরণস্বরূপ, একদল লোক দাবি করে, "মহান আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং বলতে হবে, প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না, কেবল আল্লাহ জানেন।" তাদের এই দাবিকে আমরা বাতিল ঘোষণা করি। কারণ সালাফগণ এই মূলনীতি জানতেন না। বরং যুগের পর যুগ ধরে তাঁরা এর বিপরীত কাজ করে গেছেন—আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন গুণের অর্থ করেছেন।[78]

[78] মাহির আমির, ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৩০-৩১।

উসূলুস সুন্নাহ পুস্তিকার সম্পূর্ণ মূলপাঠ

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন :

السُّنَّةُ عِنْدَنَا : أَنْ يُؤْمِنَ الرَّجُلُ بِالقَدَرِ : خَيْرِهِ وَشَرِهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ قَضَاءُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আমাদের মতে, সুন্নাহ হলো—ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি ইমান রাখবেন; তাকদিরের ভালো, মন্দ এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি। আর তিনি এটা জেনে রাখবেন যে, তিনি যা পেয়েছেন, তা তার না-পাওয়ার ছিল না; আর যা পাননি, তা তাঁর পাওয়ার ছিল না। এবং তিনি এটাও জেনে রাখবেন যে, এগুলোর সবই মহান আল্লাহর ফয়সালা।

وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا عَمَلٌ وَقَوْلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ بِنِيَّةٍ إِلَّا بِسُنَةٍ.

ইমান হলো কথা ও কাজ; এটা বাড়ে এবং কমে। আমল ছাড়া স্রেফ কথা কোনো উপকারে আসবে না। আবার নিয়ত ছাড়া স্রেফ কথা ও কাজ কোনো উপকারে আসবে না। আর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া স্রেফ নিয়তসংবলিত কথা ও কাজও কোনো উপকারে আসবে না।

وَالتَّرَحُّمُ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كُلِّهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر : ١٠] فَلَنْ يُؤْمِنَ إِلَّا بِالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করা। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে।"[79] বস্তুত তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করে কোনো ব্যক্তি কখনোই ইমানদার হতে পারবে না।

فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الفَيْءِ حَقٌّ.

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদেরকে গালি দেয়, কিংবা তাঁদের মর্যাদাহানি করে, অথবা তাঁদের কোনো একজনকে গালি দেয় বা তাঁর মর্যাদাহানি করে, সে সুন্নাহর ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। *'ফাই'* সম্পদের মধ্যে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : «قسم اللَّهُ تَعَالَى الفَيءَ، فَقَالَ : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا﴾ [الحشر: ١٠]؛ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَهُمْ، فَلَيْسَ مِمَّنْ جُعِلَ لَهُ الفَيءَ».

আমাদেরকে একাধিক ব্যক্তি মালিক ইবনু আনাস থেকে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি (ইমাম মালিক) বলেছেন, "মহান আল্লাহ *'ফাই'* বণ্টন করেছেন এবং বলেছেন, '(এই *ফাই*) সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়েছে।'[80] এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের পরে এসেছে,

---

[79] সুরা হাশর ৫৯:১০।

[80] সুরা হাশর ৫৯:৮।

তারা বলে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে”।[81] সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁদের জন্য উক্ত কথা বলে না, সে তাদের আওতাভুক্ত নয়—যাদের জন্য ‘*ফাই*’ নির্ধারণ করা হয়েছে।”

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ.

কুরআন আল্লাহর কথা।

سمعتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «القُرآنُ كَلَامُ اللهِ، وَمَنْ قَالَ : مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, “কুরআন আল্লাহর কথা। যে বলে, ‘কুরআন সৃষ্ট,’ সে বিদাতি। আমরা কাউকে এই কথা বলতে শুনিনি।”

وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «الإِيمَانُ قَولٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بن عُيَيْنَةَ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ لَا تَقُلْ يَنْقُصُ»، فَغَضِبَ؛ وَقَالَ : «اسْكُتْ يَا صَبِيٌّ؛ بَلْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شيء».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে আরও বলতে শুনেছি, “ইমান হলো কথা ও কাজ; তা বাড়ে এবং কমে যায়।” এ শুনে তাঁর ভাই ইবরাহিম বিন উয়াইনা বললেন, “হে আবু মুহাম্মাদ, ‘*ইমান কমে যায়*’—এটা বলবেন না।” তখন তিনি রেগে যেয়ে বললেন, “চুপ করো, হে বালক! বরং (ইমান এমনও কমে যেতে পারে যে, কমতে-কমতে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।”

وَالْإِقْرَارُ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ المَوْتِ.

[81] সুরা হাশর ৫৯:১০।

মৃত্যুর পর যে আল্লাহকে দেখা যাবে, সেটা স্বীকার করা।

وَمَا نَطَقَ بِهِ القُرآنُ وَالحَدِيثُ مِثْلُ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٦٤]، وَمِثْلُ: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر : ٦٧]، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالحَدِيثِ، لَا نَزِيدُ فِيهِ، وَلَا نُفَسِّرُهُ، نَقِفُ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

কুরআন ও হাদিসে যেসব কথা বলা হয়েছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "ইহুদিরা বলেছে, 'আল্লাহর হাত আবদ্ধ।' বরং তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে।"[82] মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "কেয়ামতের দিন আসমানরাজি তাঁর ডান হাতে গুটানো অবস্থায় থাকবে।"[83] কুরআন ও হাদিসে এ জাতীয় যত আয়াত ও হাদিস আছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি। আমরা এতে কিছু সংযোজন করি না এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও করি না। কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে থেমে গেছে, আমরাও সেখানে থেমে যাই।

وَنَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]. وَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا، فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهْمِي.

আমরা বলি, "দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।"[84] যে ব্যক্তি এর বিপরীত আকিদা পোষণ করে, সে জাহমি মুআত্তিল (সিফাত-অস্বীকারকারী)।

وَأَلَّا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ : مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ. وَلَا تَكْفِيرَ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، إِنَّمَا الْكُفْرُ فِي تَرْكِ الخَمْسِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «بُنِيَ

[82] সুরা মায়িদা ৫:১৬৪।

[83] সুরা জুমার ৩৯:৬৭।

[84] সুরা তহা ২০:৫।

الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ».

আমরা খারেজিদের মতো একথা বলি না যে, "কেউ কোনো কবিরা গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায়।" কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না। কেবল সেই পাঁচটি বিষয় পরিত্যাগ করলেই কুফর হয়, যেসবের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি ভিত্তির ওপর— **(১)** এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল, **(২)** নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, **(৩)** জাকাত প্রদান করা, **(৪)** রমজান মাসের রোজা রাখা, **(৫)** বাইতুল্লাহর হজ করা।"[85]

فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهُ : مَنْ لَمْ يَتَشَهَدْ، وَلَمْ يُصَلِّ، وَلَمْ يَصُمْ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ وَقْتِهِ، وَلَا يُجْزِئُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَفْرِيطِهِ فِيهِ عَامِدًا عَنْ وَقْتِهِ.

এই পাঁচটির মধ্যে সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয় কেউ পরিত্যাগ করলে তার সাথে বিতর্ক করা যাবে না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুই সাক্ষ্য দেয়নি, নামাজ আদায় করেনি এবং রোজা রাখেনি। কারণ এগুলোর কোনোটিই নির্ধারিত সময়ের পর বিলম্ব করা যায় না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময় পার করে দেয়, সে পরে কাজা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَأَمَّا الزَّكَاة فَمَتَى مَا أَدَّاهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَكَانَ آثِمًا فِي الْحَبْسِ.

[85] সহিহুল বুখারি, হা. ৫০; সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

পক্ষান্তরে জাকাতের ক্ষেত্রে, যখনই সে তা আদায় করবে, তার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে জাকাত আটকে রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে।

وَأَمَّا الحَجُّ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَوَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ = وَجَبَ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ.

আর হজের ক্ষেত্রে, যার ওপর হজ ফরজ হয়ে যায় এবং হজ করার সামর্থ্যও তার আছে, তার ওপর তা ফরজ বলেই বিবেচিত হবে। আর (যে বছর হজ ফরজ হয়েছে) সে বছরই হজ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। যতক্ষণ না সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হজ বিলম্ব করার আর কোনো উপায় বাকি থাকে না।

مَتَى أَدَّاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا، وَلَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي تَأْخِيرِهِ إِذَا أَدَّاهُ، كَمَا كَانَ آثِمًا فِي الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لمُسْلِمِينَ مَسَاكِينَ حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَكَانَ آثِمَا حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِذَا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَّى.

ফলে যখনই সে হজ আদায় করবে, তখনই তা আদায় হয়ে যাবে। আর সে এতে দেরি করলেও গুনাহগার হবে না, যদি শেষ পর্যন্ত তা আদায় করে নেয়। তবে জাকাতের ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে সে গুনাহগার হবে। কারণ জাকাত হলো দরিদ্র মুসলিমদের অধিকার, যা সে তাদেরকে না দিয়ে আটকে রেখেছিল। সুতরাং তাদের কাছে জাকাত না পৌঁছা অবধি সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। কিন্তু হজ হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যকার একটি বিষয়। যখনই সে তা আদায় করে, তখনই সে 'আদায় সম্পন্ন করেছে' বিবেচিত হয়।

وَإِنْ هُوَ مَاتَ وَهُوَ وَاجِدٌ مُسْتَطِيعٌ وَلَمْ يَحُجَّ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ يَحُجَّ. وَيَجِبُ لأَهلِهِ أَنْ يَحُجُّوْا عَنْهُ، وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا عَنْهُ؛ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

পক্ষান্তরে সে যদি হজ না করেই সক্ষম ও সামর্থ্যবান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে (পরকালে গিয়ে) কামনা করবে, যেন তাকে হজ আদায়ের জন্য পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হয়। আর উক্ত মৃতের পক্ষ থেকে হজ করা তার পরিবারের জন্য ওয়াজিব। আমরা আশা করি, উক্ত হজ তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন তার ওপর কোনো ঋণ থাকলে, এবং তার মৃত্যুর পর অন্যরা তা পরিশোধ করলে, সেটা আদায় হয়ে যায়। **সম্পূর্ণ মূলপাঠ সমাপ্ত।**

অধ্যায় ১

তাকদিরের প্রতি ইমান

মূলপাঠ

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :

السُّنَّةُ عِنْدَنَا : أَنْ يُؤْمِنَ الرَّجُلُ بِالقَدَرِ : خَيْرِهِ وَشَرِهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ قَضَاءٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আমাদের মতে, সুন্নাহ হলো—ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি ইমান রাখবেন; তাকদিরের ভালো, মন্দ এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি। আর তিনি এটা জেনে রাখবেন যে, তিনি যা পেয়েছেন, তা তাঁর না-পাওয়ার ছিল না; আর যা পাননি, তা তাঁর পাওয়ার ছিল না। এবং তিনি এটাও জেনে রাখবেন যে, এগুলোর সবই মহান আল্লাহর ফয়সালা।

ব্যাখ্যা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ***'উসুলুস সুন্নাহ'*** পুস্তিকাটি *'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'* দিয়ে শুরু করেননি। কেননা তিনি এই পুস্তিকা লিখেছিলেন তাঁর একটি বড়ো হাদিসগ্রন্থের উপসংহার হিসেবে। গ্রন্থটি *'মুসনাদুল হুমাইদি'* নামে পরিচিত। তিনি যেহেতু গ্রন্থের শুরুতে *'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'* বলে নিয়েছেন, তাই উপসংহারে গিয়ে তা আর পুনরাবৃত্তি করেননি।

আমরা আগেই বলেছি, ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ ***'উসুলুস সুন্নাহ'*** পুস্তিকায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার সাতটি মূলনীতি আলোচনা করেছেন। সুন্নাহর সেই সাতটি মূলনীতির মধ্যে প্রথম মূলনীতি হলো—তাকদিরের প্রতি ইমান। আমরা প্রথমে ইমাম হুমাইদির কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব, তারপর আলোচ্য মূলনীতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ শাস্ত্রীয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকার শুরুতেই ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"আমাদের মতে, সুন্নাহ হলো—ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি ইমান রাখবেন; তাকদিরের ভালো, মন্দ এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি।"**

এখানে ***'আমাদের মতে'*** কথাটির অর্থ—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে। সালাফদের বক্তব্যে এ ধরনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করার সময় উক্ত অর্থে ***'আমাদের মতে'*** কথাটি উল্লেখ করেছেন।[86]

---

[86] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***উসুলুস সুন্নাহ*** (আল-খার্জ : দারুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.), পৃ. ১৪।

‘আস-সুন্নাহ’ পরিভাষার মর্মার্থ

ইমাম হুমাইদি তাঁর পুস্তিকার সূচনাতেই ***‘সুন্নাহ’*** পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। *‘সুন্নাহ’* শব্দের আভিধানিক অর্থ—রীতি, পন্থা ইত্যাদি (الطريق أو الطريقة)।[87] পরিভাষায় *‘সুন্নাহ’* শব্দটি অনেকগুলো অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সুন্নাহ মানে সমগ্র দ্বীন,[88] সুন্নাহ মানে কুরআনের অনুরূপ ওহি তথা শরিয়তের উৎস,[89] সুন্নাহ মানে বিদাতের বিপরীতে শরিয়তের অনুসরণ,[90] আবার সুন্নাহ মানে ‘আবশ্যক নয়’ এমন ভালো আমল।[91] *‘সুন্নাহ’* পরিভাষার এরকমই একটি প্রসিদ্ধ অর্থ হলো—এমন বিশুদ্ধ আকিদা, যা বিদাতের বিপরীত। ন্যায়নিষ্ঠ সালাফ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ এই অর্থে *‘সুন্নাহ’* অভিধাটি ব্যবহার করতেন। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা *‘আস-সুন্নাহ’* নাম দিয়ে আকিদার কিতাবপত্র লিখেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মুজানি, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইমাম বারবাহারি, ইমাম আবু বাকর আল-আসরাম, ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল, ইমাম তাবারানি, ইমাম লালাকায়ি প্রমুখ। তাঁরা বিদাতিদের সাথে আহলুস

---

[87] আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরয়িব (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), ভুক্তি : سن, খ. ১২, পৃ. ২১০।

[88] সহিহুল বুখারি, হা. ৫০৬৩; সহিহ মুসলিম, হা. ১৪০১।

[89] সহিহুল বুখারি, হা. ৭২৭৬।

[90] সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, হা. ৪১।

[91] আবুল বাকা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি আল-হাম্বালি, ***শারহুল কাওকাবিল মুনির,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ জুহাইলি ও নাজিহ হাম্মাদ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬০।

সুন্নাহর পার্থক্য সাব্যস্ত করার জন্য আকিদার কিতাবপত্রকে *'আস-সুন্নাহ'* নামে নামকরণ করতেন।[92]

সুতরাং, ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে ***'সুন্নাহ'*** বলে আহলুস সুন্নাহর এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন, যেসব বিষয়ে বিদাতিরা আহলুস সুন্নাহর বিপরীত আকিদা পোষণ করেছে।

তাকদির কাকে বলে?

লেখক রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পুস্তিকার শুরুতেই তাকদিরের প্রতি ইমান আনার কথা আলোকপাত করেছেন। তাই তাকদির বলতে কী বোঝায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। আরবি *'আল-কাদার'* তথা *'তাকদির'* শব্দের আভিধানিক অর্থ—হুকুম, ফয়সালা, নির্ধারণ ইত্যাদি (القضاء والحكم والتقدير)।[93] উলামাগণ বিভিন্নভাবে তাকদিরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[94] সেসবের মধ্যে একটি চমৎকার সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করছি। **ইমাম সাফফারিনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেছেন :**

---

[92] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৯, পৃ. ৩০৭।

[93] ইবনু ফারিস, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** ভুক্তি : قدر, খ. ৫, পৃ. ৬২।

[94] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*** (মদিনা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি.), পৃ. ২৭; আব্দুর রহমান বিন সালিহ আল-মাহমুদ, ***আল-কাদা ওয়াল কদার ফি দুয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ওয়া মাজাহিবুন নাসি ফিহি*** (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৯; সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা আলা মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (সৌদি আরব : দারু মাদারিজ, ২য় প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৯।

«الْقَدَرُ عِنْدَ السَّلَفِ مَا سَبَقَ بِهِ الْعِلْمُ وَجَرَى بِهِ الْقَلَمُ، مِمَّا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، وَأَنَّهُ - عز وجل - قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَزَلِ، وَعَلِمَ - سبحانه وتعالى - أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ - تَعَالَى -، وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، فَهِيَ تَقَعُ عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا».

“সালাফদের কাছে তাকদির বলতে বোঝায়—যা কিছু সম্পর্কে মহান আল্লাহর জ্ঞান আগে থেকেই স্থির হয়ে গেছে এবং যা কলম লিপিবদ্ধ করেছে। কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই অনাদিকালে সেগুলো নির্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ আগে থেকেই জানেন—কোন ঘটনা কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঘটবে এবং কী কী বৈশিষ্ট্য ও অবস্থায় ঘটবে। ফলে সব কিছু ঠিক সেভাবেই সংঘটিত হয়, যেভাবে তিনি ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন।”[95]

[95] আস-সাফফারিনি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৮।

তাকদির বিষয়ে লেখকের কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **"আমাদের মতে, সুন্নাহ হলো—ব্যক্তি তাকদিরের প্রতি ইমান রাখবেন।"** অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাহর আকিদা অনুযায়ী সবাইকে তাকদিরের প্রতি ইমান আনতে হবে। তারপর বলেছেন, **"তাকদিরের ভালো, মন্দ এবং মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি।"** তাকদিরের যেসব বিষয়ে বান্দা কষ্ট পায়, এবং যেসব বিষয়ে প্রশান্তি লাভ করে, সেগুলোর সবই যে মহান আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত, তার প্রতি ইমান আনতে হবে। জ্ঞাতব্য যে, ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান আনার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে। পক্ষান্তরে ভাগ্যের মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি ইমান আনার বিষয়টি যেসব হাদিসে এসেছে, সেগুলোর বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়।[96] কিন্তু উক্ত কথার মর্মার্থ সঠিক। এজন্য সালাফগণ *'ভাগ্যের মিষ্টতা ও তিক্ততা'*—শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।[97]

এরপর লেখক বলেছেন, **"আর তিনি এটা জেনে রাখবেন যে, তিনি যা পেয়েছেন, তা তাঁর না-পাওয়ার ছিল না; আর যা পাননি, তা তাঁর পাওয়ার ছিল না।"** লেখক রাহিমাহুল্লাহ এই কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে নিয়েছেন। **হাদিসে এসেছে :**

---

[96] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***জিলালুল জান্নাহ ফি তাখরিজিস সুন্নাহ*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৫-৭৬।

[97] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***শিফাউল আলিল ফি মাসায়িলিল কাদায়ি ওয়াল কাদারি ওয়াল হিকমাতি ওয়াত তালিল,*** তাহকিক : জাহির বিন সালিম বালফাকিহ (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ **حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ**».

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন বান্দাই মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে তাকদির ও তার ভালো-মন্দের প্রতি ইমান আনবে। এবং যে পর্যন্ত না এটা জেনে রাখবে যে, **সে যে পেয়েছে, তা তার না-পাওয়ার ছিল না; আর যা পায়নি, তা তার পাওয়ার ছিল না।**"[98]

এই কথার মানে—আপনি ভালো-মন্দ যা পেয়েছেন, সেটা না-পাওয়ার ছিল না। কেননা সেটা তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, আপনি তা পাবেন। তদ্রূপ আপনি ভালো-মন্দ যা কিছুই পাননি, সেটা আপনার পাওয়ার ছিল না। কেননা সেটাও তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, আপনি তা পাবেন না। তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত নয়—এমন কিছু মানুষকে স্পর্শ করে না। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

"(হে নবি) আপনি বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য (লাওহে মাহফুজে) যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই ঘটবে না। তিনিই আমাদের সাহায্যকারী। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।"[99]

---

[98] তিরমিজি, হা. ২১৪৪, বর্ণনার মান : সহিহ।

[99] সুরা তাওবা ৯:৫১।

এ কারণেই ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উদ্দেশে **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :**

«وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

"জেনে রেখ, যদি পুরো উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে তারা স্রেফ ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তবে স্রেফ ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। (তাকদির লেখার) কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে।"[100]

তারপর ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"এবং তিনি এটাও জেনে রাখবেন যে, এগুলোর সবই মহান আল্লাহর ফয়সালা।"** এর মানে—আপনি যা পেয়েছেন এবং যা পাননি, সেগুলোর সবই আল্লাহর ফয়সালা। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

"আল্লাহর ফয়সালা ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে, তার অন্তরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।"[101]

---

[100] তিরমিজি, হা. ২৫১৬, বর্ণনার মান : সহিহ।

[101] সুরা তাগাবুন ৬৪:১১।

অর্থাৎ, মানুষের ওপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা মহান আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদির মোতাবেকই ঘটে। যে ব্যক্তি ইমান রাখে যে, আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ফয়সালা ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আপতিত হয় না, তার অন্তরকে আল্লাহ হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন। তার অন্তরকে মহান আল্লাহ স্বীয় ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট হবার এবং আত্মসমর্পণ করার তৌফিক দেন।[102]

এজন্য হাদিসে বলা হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ».

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকল বিষয় তাকদির মোতাবেক হয়—এমনকি অপারগতা ও কর্মতৎপরতাও।"[103]

---

[102] আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ১১।

[103] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৫৫।

তাকদিরের প্রতি ইমান রাখার গুরুত্ব

১. তাকদিরের প্রতি ইমান আনা—ইমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম। প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে এসেছে, **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

"ইমান মানে—তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ ও রসুলবর্গের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি; আরও ইমান আনবে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি।"[104]

২. তাকদিরের প্রতি ইমান না রাখলে ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, অমুসলিম রয়ে যায়। **বর্ণিত হয়েছে :**

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ».

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো বান্দাই ইমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে চারটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনবে : (১) সে এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল, তিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন; (২) মৃত্যুর প্রতি ইমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর

[104] সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনবে; (৪) আর তাকদিরের প্রতি ইমান আনবে।”[105]

৩. তাকদিরের প্রতি ইমান না থাকলে ব্যক্তির সকল আমল পণ্ড বিবেচিত হয়। আল্লাহর কাছে তার কোনো আমল গৃহীত হয় না। সাইয়্যিদুনা জায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :**

«وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ».

“তোমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে, আর তুমি ওই তাবৎ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও, তবুও তিনি সেই দান কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত না তুমি পূর্ণরূপে তাকদিরের প্রতি ইমান আনছ। এবং যে পর্যন্ত না তুমি জেনে রাখছ যে, তুমি যা পেয়েছ, তা তোমার না-পাওয়ার ছিল না; আর যা পাওনি, তা তোমার পাওয়ার ছিল না। আর তুমি যদি এর বিপরীত আকিদা নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে।”[106]

৪. তাকদিরকে অস্বীকার করলে ব্যক্তি ইমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। তাই সাহাবিগণ তাকদির-অস্বীকারকারীদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে যখন জানানো হয়, একদল লোক দাবি করে, “পূর্বনির্ধারিত তাকদির বলে কিছু নেই, যা

---

[105] তিরমিজি, হা. ২১৪৫; ইবনু মাজাহ, হা. ৮১; বর্ণনার মান : সহিহ।

[106] ইবনু মাজাহ, হা. ৭৭, বর্ণনার মান : সহিহ।

কিছু ঘটে সেটা মহান আল্লাহ কেবল ঘটার সময়ই জানতে পারেন," তখন **তিনি বলেছিলেন :**

«فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ».

"ওদের সাথে যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি ওদেরকে জানিয়ে দেবে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আর আমার সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই সত্তার কসম, যার নামে আব্দুল্লাহ বিন উমার কসম করে থাকে, এদের কারও কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে, আর সে ওই তাবৎ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়, তবুও আল্লাহ সেই দান কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত না সে পূর্ণরূপে তাকদিরের প্রতি ইমান আনছে।"[107]

[107] সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যে কি মন্দ আছে?

তাকদিরের ভালো-মন্দ মানে 'আল্লাহর নির্ধারণে মন্দ আছে'—বিষয়টি এমন নয়। কেননা মহান আল্লাহর নির্ধারণ এবং মহান আল্লাহর কাজ সদাসর্বদাই ভালো ও কল্যাণকর। মন্দকে কখনোই আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। এ কারণে **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন :**

«وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».

"আর মন্দ বিষয়কে আপনার দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না।"[108]

তাই *'তাকদিরের ভালো-মন্দ'* বলা হয়, মাখলুকের বিবেচনায়।[109] যেমন দণ্ডবিধি কার্যকর করা, হত্যার বদলে হত্যা করা প্রভৃতি শাস্তিপ্রাপ্ত মাখলুকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ। কিন্তু এসব বিধান সকল দিক থেকে মন্দ নয়। বরং অন্য মাখলুকদের বিবেচনায় এগুলো কল্যাণকর। কারণ এসবের মধ্যে অন্যায় প্রতিরোধ, জুলুমের প্রতিবিধান প্রভৃতির মতো বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তদ্রূপ মানুষের ওপরে আপতিত বিপদাপদ, রোগবালাই তার জন্য আপাতদৃষ্টিতে মন্দ হলেও, এসবের মধ্যে নানাবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ পাপী মুসলিমের পাপ মোচন করেন, সৎকর্মশীল মুসলিমের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ

---

[108] সহিহ মুসলিম, হা. ৭৭১।

[109] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***কায়িদাতুন জামিআ ফি তাওহিদিল্লাহি ওয়া ইখলাসিল ওয়াজহি ওয়াল আমালি লাহু ইবাদাতান ওয়া ইস্তিআনাতান,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুসাইরি (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৭৫-৭৬।

তাকদিরে, কিংবা শরিয়তে যেসব বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তা বিলকুল ভালো, কল্যাণকর, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত।[110]

ভাগ্যের ভালো-মন্দ এবং মিষ্টতা-তিক্ততার মধ্যে পার্থক্য কী?

তাকদিরের মিষ্টতা ও তিক্ততা বলতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার কাজের তাৎক্ষণিক অনুভূতি। আর ভালো-মন্দ বলতে বোঝানো হয়েছে কাজের শেষ পরিণাম। অর্থাৎ, কোনো কাজ শুরুতে মিষ্টি বা তিতা হতে পারে, কিন্তু তার শেষ ফলাফল ভালো কিংবা মন্দ হয়।

মহান আল্লাহর নিয়ম হলো—দুনিয়ায় যা শুরুতে মিষ্টি লাগে, তার পরিণামে তিতা স্বাদ আসে; আর যা শুরুতে তিতা লাগে, তার পরিণামে মিষ্টি স্বাদ আসে। তাই দুনিয়ার মিষ্টতা হলো আখেরাতের তিক্ততা; আর দুনিয়ার তিক্ততা হলো আখেরাতের মিষ্টতা।[111]

---

[110] ইবনুল কাইয়্যিম, ***শিফাউল আলিল,*** খ. ২, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

[111] ইবনুল কাইয়্যিম, ***শিফাউল আলিল,*** খ. ২, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

তাকদিরের প্রতি ইমানের চারটি স্তম্ভ

তাকদিরের প্রতি পূর্ণরূপে ইমান আনতে হলে চারটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইমান রাখতে হবে। এগুলোকে তাকদিরের প্রতি ইমানের চারটি স্তর[112] বা চারটি স্তম্ভ[113] বলা হয়। যথা : **(১)** আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান, **(২)** আল্লাহর লিখন, **(৩)** আল্লাহর ইচ্ছা, **(৪)** আল্লাহর সৃষ্টি।

প্রথম স্তম্ভ : আল্লাহর জ্ঞান

এই স্তম্ভের মানে—পূর্বে যা হয়েছে এবং আগামীতে যা হবে, মহান আল্লাহ তা জানেন। কোনো বিষয় ঘটার আগেই মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে সূচনাহীন অতীত থেকে জানেন। আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপনীয় নয়। অতীতের ও ভবিষ্যতের যে অদৃশ্য বিষয়াবলি রয়েছে, তারও কোনো কিছু তাঁর কাছে গোপনীয় নয়। এগুলোর সবকিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞানে সমান স্তরের। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি (বা ধনভাণ্ডার) তাঁর নিকটেই রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। জল ও স্থলের সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। তাঁর অবগতির বাইরে গাছ থেকে একটি পাতাও পড়ে না। জমিনের গহীন অন্ধকারে এমন কোনো শস্যদানা নেই, নেই এমন

---

[112] ইবনুল কাইয়্যিম, ***শিফাউল আলিল,*** খ. ১, পৃ. ১০০-১৭০।

[113] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ১১২।

কোনো ভেজা ও শুকনো জিনিস, যা কিনা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।”[114]

দ্বিতীয় স্তম্ভ : আল্লাহর লিখন

এই স্তম্ভের মানে—মহান আল্লাহ লাওহে মাহফুজে তথা সুরক্ষিত ফলকে সৃষ্টিকুলের তাকদির লিখে রেখেছেন। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তিনি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যা ঘটবে, তা লিখে রেখেছেন। **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ : اكْتُبْ. قَالَ : ربِّ مَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَومِ القِيامَة».

“মহান আল্লাহ (এই জগতের মধ্যে) সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তিনি কলমকে বলেন, ‘লিখ।’ কলম বলে, ‘কী লিখব, হে প্রভু?’ আল্লাহ বলেন, ‘কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যা ঘটবে সব লিখ’।”[115]

আশারিদের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশআরি** রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু (মৃ. ৩২৪ হি.) কিংবা তাঁর ছাত্র **ইবনু মুজাহিদ** রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) **বলেছেন :**

«وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون».

“তাঁরা (সালাফগণ) এ বিষয়ে সর্বসম্মত হয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির আগেই তাদের যাবতীয় কাজকর্ম,

---

[114] সুরা আলে ইমরান ৩:৫৯।

[115] আবু দাউদ, হা. ৪৭০০; তিরমিজি, হা. ২১৫৫; বর্ণনার মান : সহিহ।

আয়ু ও রিজিক নির্ধারণ করেছেন। এবং কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের তরফ থেকে যা কিছু সংঘটিত হবে, তার সবই তিনি লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন।"[116]

উল্লেখ্য, *'রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর'* আবুল হাসান আল-আশআরির লেখা, না তাঁর ছাত্র ইবনু মুজাহিদের লেখা—তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।[117]

তৃতীয় স্তম্ভ : আল্লাহর ইচ্ছা

এই স্তম্ভের মানে—সকল কিছু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার মাধ্যমে কোনো কিছুর ইচ্ছা করবেন, তখন অবশ্যই তা সংঘটিত হবে। আর সৃষ্টিজগতে কোনো কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ঘটে না। **যেমন মহান আল্লাহ নিজের কর্মাবলির ব্যাপারে বলেছেন :**

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾.

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম।"[118]

আবার সৃষ্টিরাজির কর্মাবলি সম্পর্কে **তিনি বলেছেন :**

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

---

[116] আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশআরি, ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর বিবাবিল আবওয়াব,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ শাকির আল-জুনাইদি (মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, প্র. ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৪০।

[117] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-গিজ্জি, ***আল-মাসাদিরুল আসলিয়্যাতুল মাতবুআহ লিল আকিদাতিল আশআরিয়্যা*** (বৈরুত : মারকাজু নামা লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২০৮-২০৯।

[118] সুরা সাজদা ৩২:১৩।

“আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা এমন কাজ করতে পারত না।”[119]

এই স্তম্ভের ব্যাপারে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :**

«وهذه المرتبة قد دلَّ عليها إجماعُ الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميعُ الكتب المنزلة من عند الله، والفطرةُ التي فَطَر عليها خلقه، وأدلةُ العقول والعيان».

“এই স্তরটির প্রমাণ বহন করে—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগত সকল রসুলের সর্বসম্মত অভিমত, আল্লাহর নাজিলকৃত যাবতীয় কিতাব, আল্লাহ যেই ফিতরাত তথা প্রকৃতির ওপর তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন সেই ফিতরাত, এবং বিবেকগত দলিলপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষ দলিলপ্রমাণ।”[120]

চতুর্থ স্তম্ভ : আল্লাহর সৃষ্টি

এই স্তম্ভের মানে—সৃষ্টিজগতের সকল কিছু মহান আল্লাহর মাখলুক তথা সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়েছে এবং আগামীতে হবে, তার সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ মাখলুকের স্রষ্টা এবং মাখলুকের কাজেরও স্রষ্টা। **আল্লাহ তাআলা বলেছেন :**

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

“আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মাবলিকে সৃষ্টি করেছেন।”[121]

---

[119] সুরা আনআম ৬:১১২।

[120] ইবনুল কাইয়্যিম, ***শিফাউল আলিল,*** খ. ১, পৃ. ১৪৭।

[121] সুরা সাফফাত ৩৭:৯৬।

হাদিসে এসেছে :

عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ».

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সকল কর্তা এবং তাদের কাজের স্রষ্টা।"[122]

উক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর **ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন :**

«فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّنَاعَاتِ وَأَهْلَهَا مَخْلُوقَةٌ».

"নবিজি জানিয়ে দিয়েছেন, যাবতীয় কর্ম এবং কর্মের কর্তা মাখলুক।"[123]

আলোচ্য স্তম্ভের বিষয়টি সর্ববাদিসম্মত। **ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১৮ হি.) বলেছেন :**

«سِيَاقُ مَا فُسِّرَ مِنَ الْآيَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَمَا رُوِيَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَمَا نُقِلَ مِنْ **إِجْمَاعِ** الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ كُلَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ ﷻ طَاعَاتِهَا وَمَعَاصِيَهَا».

"তাকদিরের প্রমাণ হিসেবে আল্লাহর কিতাবের যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাকদিরের প্রমাণস্বরূপ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, আর সাহাবিবর্গ, তাবেয়িবৃন্দ ও তাঁদের পরবর্তী উম্মাহর আলিমগণের যেই **ঐক্যমত** বর্ণিত

---

[122] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আমিরা (রিয়াদ : দারুল মাআরিফিস সাউদিয়্যা, তাবি), পৃ. ৪৬; সিলসিলা সহিহা, হা. ১৬৩৭; বর্ণনার মান : সহিহ।

[123] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৪৬।

হয়েছে—আমরা তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে যাচ্ছি। এসব দলিল থেকে প্রমাণিত হয়, বান্দাদের সকল আমলই আল্লাহর সৃষ্টি; চাই তা আনুগত্যমূলক ভালো আমল হোক, কিংবা নাফরমানিমূলক মন্দ আমল।"[124]

প্রশ্ন আসতে পারে, কাজগুলো যখন মানুষের, তখন সেগুলো কীভাবে আল্লাহর সৃষ্টি? কয়েকদিক থেকে এর জবাব দেওয়া যায়। যেমন—

প্রথম দিক : মানুষের কাজ মূলত মানুষের সিফাত তথা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য মিলিয়েই একজন মানুষ হয়; যার সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। মহান আল্লাহ মানুষের সত্তাকেও সৃষ্টি করেছেন, আবার মানুষের বৈশিষ্ট্যকেও সৃষ্টি করেছেন।[125]

দ্বিতীয় দিক : মানুষ কাজ করে ইচ্ছা ও সক্ষমতার মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা ও সক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ চাইলে উক্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন। তখন আর বান্দার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। আবার যদি কারও সক্ষমতা থাকে কিন্তু ইচ্ছা না থাকে, তাহলেও কাজ সংঘটিত হবে না। কেউ জোরপূর্বক বাধ্য হলে সে কথা ভিন্ন। সুতরাং আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দিয়ে কাজ করি। আর সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতা সৃষ্টিকারী হলেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ।[126]

---

[124] আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আত-তাবারি আর-রাজি আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ,*** তাহকিক : আহমাদ আল-গামিদি (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল বাসিরা, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৮৯।

[125] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা*** (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৩২৩-৩২৪।

[126] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ২, পৃ. ৬৮-৬৯।

আল্লাহর তাকদির এবং বান্দার কাজের মধ্যকার সম্পর্ক

তাকদিরের প্রতি ইমানের আলোচনায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিভিন্ন ফের্কার লোকজন এই বিষয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা দুটো গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

প্রথম মূলনীতি : বান্দার কাজ আল্লাহর মাখলুক এবং আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছার আওতাভুক্ত। বান্দার ভালো-মন্দ যাবতীয় কাজের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। অনুরূপভাবে বান্দার ভালো-মন্দ যাবতীয় কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। আল্লাহর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারে না।[127] এ বিষয়ক দলিলপ্রমাণ কিছুপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি : বান্দা নিজের কাজকর্মে মুখতার—ভালো-মন্দ চয়ন করে কাজ করতে সক্ষম। বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা আছে, যার মাধ্যমে সে কোন কাজ করবে, আর কোন কাজ করবে না—সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[128]

এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। যেমন **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾.

---

[127] আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-হার্রানি, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা,*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০৭-১০৮।

[128] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ১২৫।

“তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো।”[129]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

“তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্য (ক্ষমতা) অনুযায়ী ভয় করো।”[130]

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতদ্বয়ে বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সাব্যস্ত করেছেন।[131] তবে বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা মহান আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। **এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন :**

﴿إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

“এটা কেবল সৃষ্টিকুলের জন্য (আল্লাহর) উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলার ইচ্ছা করে, তার জন্য। তবে তোমরা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না।”[132]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا * وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

---

[129] সুরা বাকারা ২:২২৩।

[130] সুরা তাগাবুন ৬৪:১৬।

[131] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***মুজাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, প্র. ১৪২৬ হি.), পৃ. ৭০।

[132] সুরা তাকবির ৮১:২৭-২৯।

“নিশ্চয় এটা উপদেশ। সুতরাং যে ইচ্ছা করে, সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে। তবে তোমরা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[133]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«وَمِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا مَعَ إِيمَانِهِمْ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ الْعِبَادَ لَهُمْ مَشِيئَةٌ وَقُدْرَةٌ يَفْعَلُونَ بِمَشِيئَتِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ مَا أَقْدَرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْعِبَادَ لَا يَشَاءُونَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. ... وَالْقُرْآنُ قَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْعِبَادَ يُؤْمِنُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَكْسِبُونَ وَيُطِيعُونَ وَيَعْصُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيَزْنُونَ وَيَسْرِقُونَ وَيَصْدُقُونَ وَيَكْذِبُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُحَارِبُونَ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِفَاعِلِ وَلَا مُخْتَارٍ وَلَا مُرِيدٍ وَلَا قَادِرٍ. وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إنَّهُ فَاعِلٌ مَجَازًا بَلْ مَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ بِلَفْظِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ حَقِيقَةً وَاَللَّهُ تَعَالَى خَالِقُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ».

“তাকদির ও ফয়সালার প্রতি ইমান আনয়নের পাশাপাশি উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ একমত হয়েছেন—আল্লাহই

[133] সুরা মুরসালাত ৭৬:২৯-৩০।

সকল কিছুর স্রষ্টা, এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন সেটাই ঘটে, আর যা ইচ্ছা করেন না তা কখনো ঘটে না। তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। বান্দাদের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে এমন কাজ সম্পাদন করে, যা সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সালাফ ও ইমামগণ এটাও বলেছেন যে, 'বান্দারা কিছুই ইচ্ছা করতে পারে না, যদি না আল্লাহ তা ইচ্ছা করেন।'...
আর কুরআন জানিয়ে দিয়েছে, বান্দারা ইমান আনে এবং কুফরি করে, তারা কাজ করে, কর্ম করে, উপার্জন করে, আনুগত্য করে, অবাধ্য হয়, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয়, হজ করে, ওমরা করে, হত্যা করে, ব্যভিচার করে, চুরি করে, সত্য বলে, মিথ্যা বলে, পানাহার করে, এবং যুদ্ধ ও লড়াই করে। কিন্তু সালাফ ও ইমামগণের মধ্যে কেউ বলেননি, 'বান্দা কাজ-সম্পাদনকারী নয়, মুখতার (ভালো-মন্দ চয়ন করে কাজ করতে সক্ষম) নয়, তার কোনো ইচ্ছা নেই, ক্ষমতা নেই।' এবং তাঁদের মধ্যে কেউই বলেননি, 'বান্দা কেবল রূপক অর্থে কাজ-সম্পাদনকারী।' বরং যারা সত্যিকার অর্থ ও রূপক অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সবাই একমত হয়েছেন—বান্দা বাস্তবিক অর্থেই কাজ-সম্পাদনকারী। আর আল্লাহই বান্দার সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দার গুণরাজি ও কর্মাবলিকেও সৃষ্টি করেছেন।"[134]

[134] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৮, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

তাকদিরের দোহাই দিয়ে পাপকাজের দায় এড়ানোর বিধান

বান্দাদের কাজ যদিও তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত, তথাপি এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, বান্দা অন্যায় করলেও তার কোনো দোষ নেই। কেননা বান্দা নিজের ইচ্ছায় কাজ করে। এজন্য বান্দার কাজকে বান্দার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয় এবং বান্দার কাজের ভিত্তিতেই বান্দাকে ভালো কিংবা মন্দ প্রতিদান দেওয়া হয়। যে কোনো বিবেকবান লোক এই বক্তব্যের সাথে একমত হবেন।

এ কারণে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«إِنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ (أي : بالقدر) بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَذَوِي الْعُقُولِ، وَإِنَّمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْقَبَائِحِ وَالْمَظَالِمِ مَنْ هُوَ مُتَنَاقِضُ الْقَوْلِ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ».

“সকল ধর্মের মানুষ এবং সমুদয় বিবেকবান লোক একমত—তাকদির দিয়ে (অন্যায়কাজের পক্ষে) দলিল পেশ করা বাতিল। বরং নিকৃষ্ট কাজ ও অন্যায়-জুলুমের পক্ষে তাকদির দিয়ে দলিল পেশ করে কেবল সেই লোক, যে তার কথাবার্তায় দ্বিচারিতা করে এবং নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে।”[135]

[135] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ২৩।

তাকদিরকে পাপকাজের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো যে বাতিল কাজ—শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) সেটা স্বতন্ত্র সাতটি পয়েন্ট দ্বারা প্রমাণ করেছেন।[136]

- **প্রথম পয়েন্ট : তাকদিরের দোহাই দিয়ে পাপকাজকে সমর্থন করা মুশরিকদের কাজ।** মহান আল্লাহ বলেছেন, "মুশরিকরা অচিরেই বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শির্ক করতাম না এবং কোনো কিছুই হারাম সাব্যস্ত করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও (রসুলগণকে) মিথ্যা-প্রতিপন্ন করেছিল। অবশেষে তারা ভোগ করেছিল আমাদের শাস্তি।"[137]
- **দ্বিতীয় পয়েন্ট : তাকদিরের দোহাই দেওয়া যদি সঠিক দলিল হতো, তাহলে রসুলগণকে প্রেরণের পরেও তার সঠিকতা অটুট থাকত। অথচ মহান আল্লাহ রসুলগণকে প্রেরণ করে মানুষের দলিল ও অজুহাতকে নাকচ করে দিয়েছেন।** কেয়ামতের দিন পাপাচাররা বলতে পারবে না, 'আমরা কিছু জানতাম না, আমাদের কোনো দোষ নেই।' এজন্য আল্লাহ বলেছেন, "আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রসুলগণকে প্রেরণ করেছি; যাতে রসুলগণ আসার পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাতের সুযোগ না থাকে।"[138]

---

[136] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***নুবজাতুন ফিল আকিদাতিল ইসলামিয়্যা*** (মক্কা : দারুস সিকাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬১-৬৩।

[137] সুরা আনআম ৬:১৪৮।

[138] সুরা নিসা ৪:১৬৫।

❖**তৃতীয় পয়েন্ট : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদিরের ওপর ভরসা করে শরিয়তের আমল বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তাকদিরের দোহাই দিয়ে পাপকাজ করা লোকগুলো সেই নিষেধ অমান্য করেছে।** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি।" জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসুল, "আমরা কি তাহলে এর ওপর নির্ভর করব না?" তিনি বললেন, "না, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে বিষয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই বিষয়ের আমলকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে।"[139]

❖**চতুর্থ পয়েন্ট : মহান আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত ভার চাপিয়ে দেননি। 'তাকদিরকে দোহাই দেওয়া' পাপকাজকারীদের মতবাদ যদি সঠিক হতো, তাহলে বান্দাকে সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতো।** অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো।"[140] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ কারও ওপর সাধ্যাতীত ভার চাপিয়ে দেন না।"[141]

❖**পঞ্চম পয়েন্ট : অন্যায়কাজের পক্ষে তাকদিরকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো যদি সঠিক হতো, তাহলে তাকদিরের গোপন কথা মানুষের জানা থাকত।** অথচ তাকদির হলো আল্লাহর গোপন রহস্য। তাকদিরে নির্ধারিত বিষয় বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার আগে সে সম্পর্কে জানা যায় না। সুতরাং

---

[139] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৬০৫; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৪৭।

[140] সুরা তাগাবুন ৬৪:১৬।

[141] সুরা বাকারা ২:২৮৬।

অজুহাত পেশকারী চাইলে তো ভালো কাজও করতে পারত। কোনো কাজ করার আগেই সে কীভাবে জানল যে, তার তাকদিরে 'অন্যায় কাজ' করার কথাই লেখা আছে?!

❖**ষষ্ঠ পয়েন্ট : দুনিয়াবি কাজের ক্ষেত্রে যেটা মানুষের জন্য উপকারী, মানুষ কেবল সেটাই অর্জন করতে চায়। মানুষ কখনো নিজের স্বার্থের বিপরীতে কাজ করে না। তাকদিরের অজুহাত দিয়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করতে এতটুকু কসুর করে না।** তাকদিরের দোহাই দিয়ে অন্যায়কাজ সম্পাদনাকারী লোকের প্রতি আমাদের প্রশ্ন হলো—দুনিয়াবি ক্ষেত্রে সে নিজের স্বার্থের প্রতি এত সচেতন; অথচ দ্বীন-ধর্ম ও পরকালের ক্ষেত্রে তাকদিরের অজুহাত দেয় কেন?!

❖**সপ্তম পয়েন্ট : তাকদিরের দোহাই দিয়ে অন্যায়কারী লোকের মালসামান যদি কেউ ছিনিয়ে নেয়, আর বলে, 'এগুলো সব তাকদিরের লিখন। তাকদির মোতাবেকই আমি তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাকে দোষ দিয়ো না!' তাহলে কি অজুহাতদাতা লোক সেটা মেনে নেবে?!** সে যদি এটা মেনে না নেয়, তাহলে সে নিজে কেন তাকদিরের অজুহাতে পাপকাজ করে কিংবা নিজের অন্যায় অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে?!

সুতরাং তাকদিরকে অজুহাত বানিয়ে পাপ ও অন্যায়ের পক্ষ নেওয়া যাবে না। কিন্তু মুসিবতের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে দলিল দেওয়া যাবে। এ কারণে **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি মূলনীতি হচ্ছে—**

«الاحتجاج بالقدر على المصائب، لا على المعائب».

“বিপদাপদের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে দলিল দেওয়া যায়; কিন্তু অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে দলিল দেওয়া যায় না।”

আমার ক্ষুদ্র অনুসন্ধানে, এ জাতীয় আলোচনা পূর্ববর্তীদের মধ্যে পাওয়া গেলেও সর্বপ্রথম এই মূলনীতি ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.)।[142] পরবর্তীতে ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ-সহ (মৃ. ৭৯২ হি.) অনেকেই এই মূলনীতি আলোকপাত করেছেন।[143]

ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেছেন :

«الاحتجاج بالقدر على المصائب حسن».

“বিপদাপদের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে দলিল পেশ করা—ভালো কাজ।”[144]

কারণ হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি কোনো

---

[142] ইবনুল কাইয়্যিম, ***শিফাউল আলিল,*** খ. ১, পৃ. ৫৮।

[143] আলাউদ্দিন আলি বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** তাহকিক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১০ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩৬।

[144] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজাব আল-হাম্বালি, ***লাতায়িফুল মাআরিফ ফি মা লিমাওয়াসিমিল আমি মিনাল ওয়াজায়িফ,*** তাহকিক : আমির বিন আলি ইয়াসিন (রিয়াদ : দারু ইবনি খুজাইমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৪২।

মুসিবতে পড়লে এরকম কথা বলবে না যে, 'আমি যদি এরকম করতাম, তাহলে এরকম-এরকম হত।' বরং তুমি বলবে, 'এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই করেছেন।' কারণ 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।"[145]

সুতরাং কেউ অন্যায়-অপরাধ করে বলতে পারবে না, "আমার কোনো দোষ নেই। আল্লাহ তাকদিরে লিখেছেন বলেই উক্ত অপরাধ করেছি।" কিন্তু বিপদাপদে আক্রান্ত হলে নিজেকে দায়মুক্ত করে বলতে পারবে, "এটা আল্লাহর তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত ছিল। আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই করেছেন।" মুমিন ব্যক্তির আদর্শ হলো—বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং পাপকাজের কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। পক্ষান্তরে মূর্খ জালিম লোকের আদর্শ হলো—তাকদিরের দোহাই দিয়ে নিজের অপরাধকে সমর্থন করা।[146]

উলামাগণের একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আদম আলাইহিস সালাম মুসিবতের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন।[147] **হাদিসে এসেছে :**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ؛ قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلاَثًا».

---

[145] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৬৪।

[146] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৭, পৃ. ৯৮।

[147] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৮, পৃ. ১০৮।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একবার আদম আলাইহিস সালাম ও মুসা আলাইহিস সালাম পরস্পরে বাদানুবাদে লিপ্ত হন। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, ‘হে আদম, আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদেরকে বের করে দিয়েছেন।’ আদম আলাইহিস সালাম তাঁর উদ্দেশে বললেন, ‘হে মুসা, মহান আল্লাহ তো আপনাকে নিজের কথার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য নিজ হাত দিয়ে (তাওরাত) লিখেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের ব্যাপারে তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই মহান আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন?!’ তখন আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের ওপর বিতর্কে জয়ী হলেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের ওপর বিতর্কে জয়ী হলেন।” কথাটি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছিলেন।[148]

জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়াটা ছিল একটা মুসিবত। আদম আলাইহিস সালাম সেই মুসিবতের ক্ষেত্রে তাকদির দিয়ে দলিল দিয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে তাকদিরকে অজুহাত হিসেবে পেশ করেননি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٖۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمۡ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ

[148] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৬১৪; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৫২।

إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوّٞ مُّبِينٞ * قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾.

"অতঃপর শয়তান প্রতারণার মাধ্যমে তাদের দুজনকে (আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে) ধীরে ধীরে ভুল পথে নামিয়ে আনল। তারপর যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের কাছে নিজেদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদের দুজনকে ওই গাছটি থেকে নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?' তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'"[149]

[149] সুরা আরাফ ৭:২২-২৩।

তাকদির বিষয়ক আকিদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

তাকদিরের প্রতি ইমানের ক্ষেত্রে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদেরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

প্রথম ভাগ : যারা তাকদির অস্বীকার করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এরা হলো **'কাদারিয়া সম্প্রদায়'।** এদের প্রধান ভ্রান্তির জায়গা—বান্দার কর্মাবলিও যে আল্লাহর তাকদিরে পূর্বনির্ধারিত, সেটা অস্বীকার করা। এদের আবার দুটো উপদল আছে—

- **প্রথম উপদল :** আল্লাহর ইলমকে অস্বীকারকারী (نفاة العلم)। এরা বলে, "বান্দার কর্মাবলি সংঘটিত হওয়ার আগে আল্লাহ তা জানতে পারেন না। সংঘটিত হওয়ার পরে জানতে পারেন।" এদের থেকেই ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, যেমনটি আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি।[150] এদেরকে 'চরমপন্থি কাদারিয়া (غلاة القدرية)' এবং 'প্রাক্কালীন কাদারিয়া (القدرية الأولى)' বলে অভিহিত করা হয়। এদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, "বর্তমানে এদের সংখ্যা নগণ্য।"[151]
- **দ্বিতীয় উপদল :** যারা বলে, "বান্দার কাজের স্রষ্টা বান্দা নিজেই।" এদেরকে 'পরবর্তী যুগের কাদারিয়া' বা 'দ্বিতীয় কাদারিয়া (القدرية الثانية)' বলা হয়। মূলত মুতাজিলা সম্প্রদায় এই উপদলের প্রতিনিধিত্ব করে। কাদারিয়া

---

[150] সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

[151] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ১০৬।

সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এরাই; যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ জানিয়েছেন।[152]

দ্বিতীয় ভাগ : যারা তাকদির সাব্যস্ত করতে যেয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এরা হলো **'জাবারিয়া সম্প্রদায়'।** এদের প্রধান ভ্রান্তির জায়গা—বান্দার কর্মাবলিতে বান্দার ক্ষমতারও যে প্রভাব আছে, সেটা অস্বীকার করা। এদেরও দুটো উপদল আছে—

- **প্রথম উপদল :** যারা বলে, "বান্দার কর্মাবলিতে বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই, ভালো-মন্দ চয়ন করার সামর্থ্যও নেই।" এদেরকে 'খাঁটি জাবারিয়া (الجبرية الخالصة)' বা 'পাক্কা জাবারিয়া (الجبرية المحضة)' বা 'চরমপন্থি জাবারিয়া (غلاة الجبرية)' বলা হয়।[153] জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল খাঁটি জাবারিয়া।
- **দ্বিতীয় উপদল :** যারা বলে, "বান্দার কাজ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রভাব নেই।" এদেরকে 'মধ্যপন্থি জাবারিয়া (الجبرية المتوسطة)' বলা হয়।[154] মূলত আশারি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই উপদলের প্রতিনিধিত্ব করে।[155]

---

[152] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ১০৮।

[153] আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*** (মুআসসাসাতুল হালাবি কর্তৃক প্রকাশিত, তাবি), খ. ১, পৃ. ৮৫।

[154] আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল,*** খ. ১, পৃ. ৮৫।

[155] আহমাদ বিন মুসা আল-খায়ালি, ***হাশিয়াতুন আলা শারহিস সাদ আলাল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*** (তুরস্ক : মাতবাআতু মাহমুদ বেগ, প্র. ১৩২২ হি.), পৃ. ৭৬।

অধ্যায় ২

ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ



وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا عَمَلٌ وَقَوْلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ بِنِيَّةٍ إِلَّا بِسُنَةٍ.

ইমান হলো কথা ও কাজ; এটা বাড়ে এবং কমে। আমল ছাড়া স্রেফ কথা কোনো উপকারে আসবে না। আবার নিয়ত ছাড়া স্রেফ কথা ও কাজ কোনো উপকারে আসবে না। আর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া স্রেফ নিয়তসংবলিত কথা ও কাজও কোনো উপকারে আসবে না।

ব্যাখ্যা



ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্নাহর দ্বিতীয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন। কারণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার একটি অন্যতম মূলনীতি—ইমান হলো কথা ও কাজের নাম। এজন্য **ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন :**

«لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بالأمصارِ، ... فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ: أَنَّ الإِيْمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ».

“আমি বিভিন্ন অঞ্চলের হাজারের অধিক আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। ... আমি তাঁদের কাউকে এসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখিনি যে, ইমান হলো কথা ও কাজ।”[156] অর্থাৎ, এ বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত ছিলেন।

ইবাদতমূলক কথা ও কাজ ইমানের অন্তর্ভুক্ত

ইমাম হুমাইদি আলোচ্য মূলনীতির শুরুতেই বলেছেন, **“ইমান হলো কথা ও কাজ।”** অর্থাৎ, যাবতীয় ইবাদতমূলক কথা এবং যাবতীয় ইবাদতমূলক আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত। এটা ইমানের শরয়ি পরিভাষা বা শরয়ি অর্থ। পক্ষান্তরে ইমানের আভিধানিক অর্থ কিছুটা আলাদা।

ইমানের আভিধানিক অর্থ :

ইমানের আভিধানিক অর্থ কী হবে, তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ মতভেদ করেছেন। আমরা প্রসিদ্ধ দুটো মত এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম মত :

ইমানের অভিধানিক অর্থ—বিশ্বাস করা বা সত্যায়ন করা (التَّصْدِيْق)। আহলুস সুন্নাহর অনেক খ্যাতনামা বিদ্বান এই মত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি আরবি ভাষার ইমাম আল-আজহারি রাহিমাহুল্লাহ এই মতের পক্ষে আরবি ভাষাবিদদের ইজমা (ঐক্যমত) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন; যেমনটি আমরা সামনে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

---

[156] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৯৪-১৯৫; আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১, পৃ. ৫০।

আহলুস সুন্নাহর মহামতি মুফাসসির **ইমাম ইবনু জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন :**

«وَمَعْنَى الْإِيمَانِ عِنْدَ الْعَرَبِ : التَّصْدِيقُ فَيُدْعَى الْمُصَدِّقُ بِالشَّيْءِ قَوْلًا مُؤْمِنًا بِهِ، وَيُدْعَى الْمُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِفِعْلِهِ مُؤْمِنًا».

"আরবদের নিকটে *'ইমান'* শব্দের অর্থ—*তাসদিক (সত্যায়ন করা)*। এজন্য কথার মাধ্যমে কোনোকিছুকে সত্যায়নকারীকে *'সে বিষয়ের প্রতি ইমান আনয়নকারী'* বলে অভিহিত করা হয়। আবার কাজের মাধ্যমে নিজের কথাকে সত্যায়নকারীকেও *'মুমিন'* বলা হয়।"[157]

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :

«أَمَّا الْإِيمَانُ فِي اللُّغَةِ فَيُطْلَقُ عَلَى التَّصْدِيقِ الْمَحْضِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقُرْآنِ وَالْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ».

"আরবি ভাষায় *'ইমান'* শব্দ স্রেফ *'তাসদিক (সত্যায়ন করা)'* অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও এই শব্দ কখনো-কখনো উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।"[158]

আরবি ভাষাশাস্ত্রের ইমাম **মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেছেন :**

«وَاتفقَ أهل الْعلم من اللُّغويين وَغَيرهم أَن (الْإِيمَان) مَعْنَاهُ : التَّصْديق».

"আরবি ভাষাবিদ ও অন্যান্য শাস্ত্রবিশারদদের মধ্যকার আহলুল ইলমগণ একমত পোষণ করেছেন, ইমান মানে তাসদিক তথা সত্যায়ন করা।"[159]

---

[157] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ১, পৃ. ২৪১।

[158] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ১, পৃ. ৭৬।

[159] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** খ. ১৫, পৃ. ৩৬৮।

দ্বিতীয় মত :

ইমানের আভিধানিক অর্থ কেবল *'তাসদিক'* তথা *'সত্যায়ন'* নয়; বরং এরচেয়েও বেশি কিছু। যেমন স্বীকার করা বা স্বীকৃতি দেওয়া (الْإِقْرَار), প্রশান্ত হওয়া (الطُّمَأْنِينَة) প্রভৃতি।[160] বেশ কিছু বিদ্বান এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.)। **তিনি ইমানের আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন :**

«فَكَانَ تَفْسِيرُهُ بِلَفْظِ الْإِقْرَارِ أَقْرَبَ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِلَفْظِ التَّصْدِيقِ».

"সুতরাং *'তাসদিক (সত্যায়ন)'* শব্দ দিয়ে ইমানের অর্থ করার চেয়ে *'ইকরার (স্বীকার করা)'* শব্দ দিয়ে ইমানের অর্থ করাই অধিক বিশুদ্ধ।"[161]

মুরজিয়া ফের্কার অনেক বিদ্বান ইমানের আভিধানিক অর্থ দিয়ে ইমানের শরয়ি অর্থ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "যেহেতু ইমানের আভিধানিক অর্থ *'তাসদিক (সত্যায়ন করা, বিশ্বাস করা)'*, সেহেতু শরিয়তেও ইমানের পরিচয় কেবল *তাসদিক।* সুতরাং আমল ইমানের পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।" ইমানের আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর যেসব আলিম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাঁরা মুরজিয়াদের জবাবে বলেন, কোনো শব্দের আভিধানিক অর্থ শরিয়তেও একই থাকা জরুরি নয়। বরং শরিয়ত কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। যেমন সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ প্রভৃতি শব্দের

---

[160] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ইমান,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (আম্মান : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২২৮ ও ৩৩১।

[161] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমান,*** পৃ. ২২৮; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ২৯১।

শরয়ি অর্থ আর আভিধানিক অর্থ একই নয়। শরিয়তে এসব শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমান শব্দটিও এমন।[162] ইমান শব্দের শরয়ি অর্থ সম্পর্কে প্রমাণ্য আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যেহেতু আমরা জানতে পারলাম, ইমানের আভিধানিক অর্থ নিয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ মতভেদ করেছেন, সেহেতু এসবের কোনো একটি মত গ্রহণ করার কারণে সুন্নাহপন্থি কারও ওপর চড়াও হওয়া কিংবা আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করার কোনো সুযোগ নেই। **আমাদের দেশে অনেককে ইমানের আভিধানিক অর্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে অন্য মতকে বাতিল ঘোষণা করা এবং অন্যায়ভাবে *'বিদাতি'* আখ্যা দেওয়া—*'বিদাতি'* বলার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকারী *'হাদ্দাদি ফের্কার'* কাজ।** মহান আল্লাহ হাদ্দাদিদের বিষাক্ত থাবা থেকে মুসলিম উম্মতকে রক্ষা করুন।

ইমানের শরয়ি অর্থ :

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ ইমানের শরয়ি অর্থ উল্লেখ করেছেন। শরয়ি পরিভাষায়, **"ইমান হলো কথা ও কাজের নাম।"** অর্থাৎ, যাবতীয় ইবাদতমূলক কথা এবং যাবতীয় ইবাদতমূলক আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত। ইবাদতমূলক কথা ও কাজ বলতে কী বোঝায়, তার বিবরণ দিতে যেয়ে **শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

---

[162] আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কারনি, ***উসুলুল মুখালিফিনা লি আহলিস সুন্নাহ ফিল ইমান*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ১১৮-১১৯।

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ ثُمَّ قَوْلُ اللِّسَانِ وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ».

"সালাফগণ একমত পোষণ করেছেন, ইমান হলো কথা ও কাজ; এটা বাড়ে এবং কমে। এর মানে অন্তরের কথা এবং অন্তরের কাজ, এরপর জবানের কথা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ।"[163]

ইবাদতমূলক কথা দুটো বিষয়কে সন্নিবেশ করে—

এক. অন্তরের কথা : এর মানে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সত্যায়ন।

দুই. জবানের কথা : এর মানে ইমানের মৌখিক স্বীকৃতি এবং জবানের মাধ্যমে কৃত ইবাদতসমগ্র; যেমন জিকির-আজকার, তাসবিহ-পাঠ, দোয়া প্রভৃতি।

তদ্রূপ ইবাদতমূলক কাজও দুটো বিষয়কে সন্নিবেশ করে—

এক. অন্তরের কাজ : এর মানে অন্তরের নিয়ত এবং অন্তরে সংঘটিত সমুদয় ভালো আমল; যেমন ইখলাস (একনিষ্ঠতা), তাওয়াক্কুল (ভরসা), ভালোবাসা, ভয়, আশা প্রভৃতি।

দুই. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ : এর মানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃত সমুদয় ভালো আমল; যেমন নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ প্রভৃতি।[164]

ইমানের শরয়ি অর্থকে কোনো কোনো বিদ্বান সহজ করে বলেন—

«الْإِيمَانُ : التَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ».

---

[163] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬৭২।

[164] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬৭২; ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৪৭৮; আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

“অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলকে ইমান বলা হয়।”[165]

এসব বিষয় যে ইমানের অন্তর্ভুক্ত, তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআন থেকে দলিল :

১. কতিপয় বেদুইন লোকের ব্যাপারে **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ﴾.

“তোমাদের অন্তরে এখনও ইমান প্রবেশ করেনি।”[166]

২. মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ﴾.

“আল্লাহ তাদের অন্তরে ইমান লিখে দিয়েছেন।”[167]

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, **অন্তরে সত্যায়ন করা ইমানের অন্তর্ভুক্ত।**[168]

৩. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

---

[165] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৪৫৯; আস-সাফফারিনি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৪২৬।

[166] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৪।

[167] সুরা মুজাদিলা ৫৮:২২।

[168] আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন বিন মাসউদ ইবনুল ফার্রা আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল ফি তাফসিরিল কুরআন,*** তাহকিক : আব্দুর রাজ্জাক আল-মাহদি (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৮, খ. ৫, পৃ. ৫০।

“তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহিম, ইসমায়িল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মুসা ও ইসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্য নবিগণকে তাঁদের রবের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেসবের প্রতিও ইমান এনেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (বরং সবার প্রতিই ইমান আনি) এবং আমরা তাঁর (আল্লাহর) কাছে আত্মসমর্পণকারী।’”[169]

এরপর পরের আয়াতেই **আল্লাহ তাআলা বলেছেন :**

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾.

“তোমরা যেসবের প্রতি ইমান এনেছ, তারা যদি সেরূপ ইমান আনে, তাহলে অবশ্যই তারা সুপথ পাবে।”[170]

আল্লাহ প্রথম আয়াতে মুমিনদেরকে ‘আমরা ইমান এনেছি’ বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর জানিয়ে দিয়েছেন, তারা যদি তোমাদের মতো ইমান আনে, তাহলে তারা হেদায়েত পাবে। এর মানে দাঁড়াল—তারা যদি তোমাদের মতো একই কথা বলে, তবে সেটাই ইমান গণ্য হবে। **এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইমান প্রকাশের কথা তথা ইমানের মৌখিক স্বীকৃতি হলো ইমান।** মুখে স্বীকার করাও ইমানের অন্তর্ভুক্ত।[171]

৪. আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

---

[169] সুরা বাকারা ২:১৩৬।

[170] সুরা বাকারা ২:১৩৭।

[171] আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন হাসান আল-হালিমি, ***আল-মিনহাজ ফি শুআবিল ইমান,*** তাহকিক : হিলমি মুহাম্মাদ ফুদা (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬।

“আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি **তোমাদের ইমানকে** ব্যর্থ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের প্রতি অতি সহানুভূতিশীল, পরম করুণাময়।”[172]

আয়াতে ***‘তোমাদের ইমান’*** মানে—‘তোমাদের সালাত’। কারণ *‘সহিহুল বুখারি’* গ্রন্থে এসেছে, সাহাবিগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কিবলা পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের নামাজের কী হবে?’ তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়।[173]

বহুশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত **আল্লামা হালিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৩ হি.) বলেছেন :**

«وأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس. **فثبت أن الصلاة إيمان.** وإذا ثبت ذلك، **فكل طاعة إيمان،** إذ لم أعلم فارقا فرق في هذه التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات».

“মুফাসসিরগণ একমত পোষণ করেছেন, এখানে মহান আল্লাহ *‘বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে তোমাদের আদায়কৃত নামাজকেই’* উদ্দেশ্য করেছেন। **এ থেকে প্রমাণিত হয়, নামাজ হলো ইমান।** আর এটা যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু এটাও সুসাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, **প্রতিটি আনুগত্যমূলক কাজই ইমান।** কারণ এক্ষেত্রে নামাজ ও অন্যান্য আনুগত্যমূলক কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই।”[174]

---

[172] সুরা বাকারা ২:১৪৩।

[173] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৯ ও ৪৪৮৬।

[174] আল-হালিমি, ***আল-মিনহাজ,*** খ. ১, পৃ. ৩৭।

সুন্নাহ থেকে দলিল :

১. বিখ্যাত *'হাদিসে জিবরিলে'* **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :**

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

"ইমান মানে—তুমি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ ও রসুলবর্গের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি; আরও ইমান আনবে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি।"[175]

'তুমি ইমান আনবে...'—এই বাক্যাংশ থেকে প্রতীয়মান হয়, এসব বিষয়ের প্রতি **অন্তরে বিশ্বাস** রাখা ইমানের অন্তর্ভুক্ত।[176]

২. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

"ইমানের শাখা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই—বলা, এবং এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ইমানের অন্যতম শাখা।"[177]

এই হাদিস থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলা **জবানের কথা**, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

---

[175] সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

[176] মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মারওয়াজি, ***তাজিমু কাদরিস সালাত,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল জাব্বার (মদিনা : মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

[177] সহিহুল বুখারি, হা. ৯; সহিহ মুসলিম, হা. ৩৫।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল, আর লজ্জা **অন্তরের আমল।** এগুলোর সবই ইমানের অন্তর্ভুক্ত।[178]

৩. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :**

«آمُرُكُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الإِيْمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ».

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান, আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কাকে বলে? তা হলো—'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই' – এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ পড়া, জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা দেওয়া।"[179]

উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে **ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :**

«وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ تَكُونُ إِيمَانًا بِاللَّهِ بِدُونِ إِيمَانِ الْقَلْبِ، لِمَا قَدْ أَخْبَرَ فِي مَوَاضِعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِيمَانِ الْقَلْبِ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذِهِ مَعَ إِيمَانِ الْقَلْبِ هُوَ الْإِيمَانُ. وَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ فَوْقَ هَذَا الدَّلِيلِ؟ فَإِنَّهُ فَسَّرَ الْإِيمَانَ بِالْأَعْمَالِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّصْدِيقَ، لِلْعِلْمِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لَا تُفِيدُ مَعَ الْجُحُودِ».

---

[178] আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি, ***আত-তাওদিহ ওয়াল বায়ান লিশাজারাতিল ইমান*** (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, তাবি), পৃ. ৫৭-৫৮।

[179] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৩৬৮; সহিহ মুসলিম, হা. ১৭।

“এটা সুবিদিত বিষয় যে, আন্তরিক ইমান ব্যতিরেকে স্রেফ এসব আমল *‘আল্লাহর প্রতি ইমান’* হতে পারে না। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক জায়গায় জানিয়ে দিয়েছেন, অবশ্যই অন্তরের ইমান লাগবে। সুতরাং বোঝা গেল, অন্তরের ইমানের সাথে মিলিত হয়ে এই আমলগুলো ‘ইমান’ বিবেচিত হয়। এরচেয়ে শক্তিশালী দলিল আর কী হতে পারে যে, আমলসমূহ ইমানের পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত? কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানকে আমল দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু (ইমানের ব্যাখ্যা হিসেবে) তিনি এখানে *‘তাসদিক’* তথা *‘অন্তরের বিশ্বাস’* উল্লেখ করেননি। কেননা এটা জানা কথা যে, অন্তরে অস্বীকৃতি জিইয়ে রেখে এসব আমল করলে তা কোনোই উপকারে আসবে না।”[180]

ইজমা থেকে দলিল :

অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সবগুলোই যে ইমানের অন্তর্ভুক্ত, এ মর্মে সালাফগণ একমত পোষণ করেছেন। আমরা ইতোমধ্যে ‘হাদিসের আমিরুল মুমিনিন’ ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত ইজমা (ঐক্যমত) উল্লেখ করেছি। এখানে আরও কতিপয় ইমাম থেকে ইজমার বর্ণনা পেশ করছি।

১. বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়িদ আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৮ হি.) বলেছেন :**

«كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ الأَئِمَّةِ كَانُوا يَقُوْلُوْنَ: الإِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ».

[180] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭।

“আমি যতজন ইমামকে পেয়েছি, তাঁরা সবাই বলতেন, ইমান হলো কথা ও কাজ। ইমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়।”[181]

২. ইমামু আহলিস সুন্নাহ **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف، وفقهاء الأمصار على: أن السنة التي توفّى عنها رسول الله ﷺ، ... الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية».

“তাবেয়িবর্গ, মুসলিমদের ইমামগণ, সালাফদের ইমামগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ফাকিহবৃন্দের মধ্যে নব্বইজন ব্যক্তি একমত হয়েছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সুন্নাহর ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তা হলো—কথা ও কাজের নাম ইমান; আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে ইমান কমে যায়।”[182]

৩. ইমাম ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৬ হি.) বলেছেন :

«فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: ... وأن الإيمان قول باللسان، و إخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية».

“দ্বীন সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে এই উম্মাহর ঐক্যমত হয়েছে, এবং যেসব সুন্নাহর বিপরীতে চলা হলো বিদাত ও ভ্রষ্টতা, সেসবের মধ্যে

---

[181] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ৯, পৃ. ১৭৯।

[182] আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকি (বৈরুত : দারুল মারিফা, প্র. ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩০।

রয়েছে—ইমান হলো জবানের স্বীকৃতি, অন্তরের ইখলাস (আন্তরিক বিশ্বাস), এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ; এটি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কমে যায়।"[183]

৪. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :

«أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَالْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ».

"ফিকহ ও হাদিসের আলিমগণ সর্বসম্মত হয়েছেন, ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি। আর নিয়ত ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, ইমান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কমে যায়।"[184]

এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা :

মুরজিয়া সম্প্রদায় এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা আমলকে ইমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। মুরজিয়া সম্প্রদায়ের কেউ কেউ মৌখিক স্বীকৃতিকেও ইমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। অথচ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়নের কোনো একটিকেও যদি কেউ ইমানের পরিচয় থেকে বের করে দেয়, তাহলে

---

[183] আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি, ***আল-জামি ফিস সুনানি ওয়াল আদাবি ওয়াল মাগাজি ওয়াত তারিখ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আবুল আজনাফ ও উসমান বাত্তিখ (বৈরুত ও তিউনিসিয়া : মুআসসাসাতুর রিসালা ও আল-মাকতাবাতুল আতিকা, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১০৭-১১০।

[184] আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি, ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানি ওয়াল আসানিদ,*** তাহকিক : মুস্তাফা আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি (মরক্কো : মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্র. ১৩৮৭ হি.), খ. ৯, পৃ. ২৩৮।

সে আর আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ইমানের গণ্ডি থেকেও বের হয়ে যেতে পারে। আল্লাহুল মুস্তাআন।

বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮৭ হি.) বলেছেন :**

«أَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، وَتَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ».

"মুরজিয়ারা বলে, 'আমল ব্যতীত স্রেফ কথাই হলো ইমান।' জাহমিরা বলে, 'আমল ও কথা ব্যতীত স্রেফ আল্লাহ সম্পর্কে জানাই হলো ইমান।' আর আহলুস সুন্নাহ বলে, 'ইমান হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং কথা ও কাজের সমন্বয়'।"[185]

আরেক প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৭ হি.) বলেছেন :**

«وَالْمُرْجِئَةُ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا فِعْلٍ، وَهَذَا بِدْعَةٌ».

"মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে, 'আমল ব্যতীত স্রেফ কথাই হলো ইমান।' অথচ এটা বিদাত।"[186]

আমাদের দেশেও মুরজিয়াদের এই আকিদা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। আমার একাধিক প্রবন্ধে আমি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। বিষয়টি গুরুতর হওয়ায় এখানেও আলোচনা করছি। উপমহাদেশের হানাফি মাতুরিদি মাদরাসাগুলোর সিলেবাসভুক্ত বহুলপঠিত একটি কিতাব—*'শারহুল আকায়িদিন*

---

[185] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***আস-সুন্নাহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কাহতানি (দাম্মাম : দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৭।

[186] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৩৪।

নাসাফিয়্যা'। বলা বাহুল্য, বাই ডিফল্ট হানাফি দেওবন্দিগণ মাতুরিদি আকিদাধারী হয়ে থাকেন। তবে নিজেকে *'দেওবন্দি'* পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মাতুরিদি আকিদা পোষণ করেন না—এমন নজিরও আছে অনেক। বাংলাদেশে হানাফি কওমি মাদরাসার বেফাক বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী মেশকাত জামাতে—*'দাওরায়ে হাদিস'* ক্লাসের আগের বর্ষে—উক্ত কিতাব পড়ানো হয়। এই কিতাবে মাতুরিদি আকিদার সুপ্রসিদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ *'আল-আকায়িদুন নাসাফিয়্যার'* ব্যাখ্যা করেছেন প্রখ্যাত আশারি দার্শনিক সাদুদ্দিন আত-তাফতাজানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.)। বিশুদ্ধ মতানুসারে, আত-তাফতাজানি আশারি সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন। সমকালীন উলামাদের কেউ কেউ তাঁকে 'মাতুরিদি' বলে থাকলেও তা সঠিক নয়।[187]

আল্লামা তাফতাজানি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন :

«هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء وهو اختيار الإمام شمس الأيمة، وفخر الإسلام رحمهما الله، وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما أن تصديق القلب أمر باطن لا بدّ له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا، ومن أقر

[187] আল-গিজ্জি, ***আল-মাসাদিরুল আসলিয়্যা,*** পৃ. ৩০৯-৩১০।

بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله، والنصوص معاضدة لذلك».[188]

বাংলাদেশে দেওবন্দি কওমি মাদরাসাগুলোতে খুবই পরিচিত ও আস্থাভাজন একজন লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত বই থেকে আল্লামা তাফতাজানির উদ্ধৃত বক্তব্যটির অনুবাদ পেশ করছি। ঢাকা মিরপুরে অবস্থিত 'মাদরাসা দারুর রাশাদের' শাইখুল হাদীস, জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত ***'সহজ শরহে আকাইদ' গ্রন্থে*** **তাফতাজানির উপরিউক্ত বিবরণের অনুবাদ এভাবে এসেছে :**

> "উপরিউক্ত এ আলোচনা অর্থাৎ তাসদীক বা আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম ঈমান সংখ্যা লঘু উলামায়ে কিরামে মাযহাব। ইমাম শামসুল আইম্মা ও ইমাম ফখরুল ইসলাম রহ. এর পছন্দীয় অভিমত এটিই। আর জমহুরে মুহাককিকীন এর মাযহাব হল, ঈমান কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। স্বীকারোক্তি শুধু দুনিয়াতে বিধি-বিধান কার্যকর করার জন্য শর্ত। কেননা আন্তরিক বিশ্বাস একটি গোপনীয় বিষয়। এর জন্য কোন আলামত থাকা আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর থেকে তাসদীক বা বিশ্বাস করবে; মুখে স্বীকার করবে না, সে আল্লাহর নিকট মুমিন; যদিও দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রে সে মুমিন নয়। আর যে ব্যক্তি মুখে স্বীকার করল অথচ অন্তরে বিশ্বাস করল না। যেমন— মুনাফেক, তার হুকুম ঐ ব্যক্তির বিপরীত হবে (অর্থাৎ সে দুনিয়াবী হুকুমে মুমিন বটে; কিন্তু আল্লাহর

[188] আবু সায়িদ মাসউদ বিন উমার আত-তাফতাজানি, ***শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*** (করাচি : মাকতাবাতুল মাদিনা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি., *জামউল ফাওয়াইদ* নামক টীকা-সহ), পৃ. ২৭৮।

নিকট মুমিন নয়)। এমতই শাইখ আবু মানসুর মাতুরিদীর এর পছন্দীয় মত। একাধিক নছ এ মতের সমর্থন করে।"[189]

অর্থাৎ, মাতুরিদিদের অফিসিয়াল মতানুযায়ী, ইমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম; মুখে স্বীকৃতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কিছু হানাফি বিদ্বানের মতে, ইমান হচ্ছে, অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকৃতির নাম; কাজে বাস্তবায়ন করা ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে আশারি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উক্ত দুটো মত বিদ্যমান রয়েছে। এবং আশারি সম্প্রদায়ের অফিসিয়াল আকিদা মোতাবেকও ইমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম; মুখে স্বীকৃতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।[190] উল্লিখিত দুটো অভিমতই মুরজিয়াদের আকিদা। যারা আমলকে ইমানের পরিচয় থেকে বের করে দিয়েছে, তারা সালাফদের সর্বসম্মতিক্রমে পথভ্রষ্ট মুরজিয়া।

সকল সালাফের আকিদা বর্ণনা করার সময় **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ؛ فَهُوَ مُرْجِئٌ».

"যে ব্যক্তি মনে করে, 'ইমান স্রেফ কথা; আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়,' সে মুরজিয়া।"[191]

---

[189] মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান (সম্পা.), ***সহজ শরহে আকাইদ*** (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৮ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৫-৩৪৭।

[190] ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ আলা জাওহারাতিত তাওহিদ,*** তাহকিক : আলি ঘুমা (কায়রো : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯২-৯৪।

[191] হার্ব বিন ইসমায়িল আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফি ফিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : সাদ আজ-জাতারি (কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে সাইয়্যিদুল হুফফাজ **ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন :**

«الإيمان عندنا قول وعمل، يزيد وينقص. ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ».

"আমাদের (আহলুস সুন্নাহর) মতে, ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; ইমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলবে, সে মুরজিয়া বিদাতি।"[192]

যারা কেবল অন্তরের বিশ্বাসকে *'ইমান'* বলত, তাদেরকে সালাফগণ *'কাফির'* আখ্যা দিয়েছেন। আর ফাকিহদের একটা গোষ্ঠী কেবল অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সমষ্টিকে *'ইমান'* বলত; যাদেরকে *'মুরজিয়াতুল ফুকাহা'* বলে অভিহিত করা হয়। এদেরকে সালাফগণ *'বিদাতি'* আখ্যা দিয়েছেন।

এ মর্মে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«حَتَّى إِنَّ الْأَئِمَّةَ: كَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ كَفَّرُوا مَنْ قَالَ فِي «الْإِيمَانِ» بِهَذَا الْقَوْلِ؛ بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ».

"এমনকি যারা ইমান বিষয়ে এই মতবাদ ব্যক্ত করেছে (অর্থাৎ ইমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস), তাদেরকে ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ, আহমাদ বিন হাম্বাল, আবু উবাইদ প্রমুখ ইমাম *'কাফির'* বলেছেন। পক্ষান্তরে যারা 'মুরজিয়াতুল ফুকাহা' সম্প্রদায়ভুক্ত—যারা বলে থাকেন, 'ইমান হলো

[192] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ২০২।

অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি,' তাদের কাউকে কোনো ইমাম 'কাফির' বলেননি। ইমামগণ তাঁদেরকে কেবল *'বিদাতি'* বলেছেন।"[193]

আমলকে ইমানের গণ্ডি থেকে আলাদাকারী 'মুরজিয়াতুল ফুকাহা' সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সালাফদের সুদৃঢ় অবস্থান বর্ণনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«إِنَّ «السَّلَفَ وَالْأَئِمَّةَ» اشْتَدَّ إِنْكَارُهُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَبْدِيعُهُمْ وَتَغْلِيظُ الْقَوْلِ فِيهِمْ؛ وَلَمْ أَعْلَم أَحَدًا مِنْهُمْ نَطَقَ بِتَكْفِيرِهِمْ؛ بل هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُكَفَّرُونَ فِي ذَلِكَ».

"নিশ্চয় সালাফ ও ইমামগণ তাদের (মুরজিয়াতুল ফুকাহাদের) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা-সমালোচনা করেছেন, তাদেরকে *'বিদাতি'* বলেছেন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে ইমামদের মধ্যে এমন কাউকে আমি জানি না, যিনি তাদেরকে 'কাফির' বলেছেন। বরং ইমামগণ একমত হয়েছেন, এই মতবাদের কারণে তাদেরকে *'কাফির'* বলা যাবে না।"[194]

মুরজিয়াদের অনেকগুলো ফের্কা আছে এবং বিভিন্ন মতবাদও আছে। সেসব বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা দরকার। কিন্তু বক্ষ্যমাণ কিতাব সেসব আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ আমরা অন্য কোনো কিতাবে করব ইনশাআল্লাহ। তবে আগ্রহী পাঠকবর্গ সংক্ষেপে মুরজিয়াদের

---

[193] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১০, পৃ. ৭৪৮।

[194] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** তাহকিক : আলি বিন বাখিত আজ-জাহরানি (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, প্র. ১৪২৩ হি.), পৃ. ৫৭৭; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৩৭৩।

অনেকগুলো মতবাদ সম্পর্কে জানতে আমাদের অনূদিত ***'মুরজিয়াদের আকিদা'*** বইটি পড়তে পারেন।

আরেকটি কথা না বললেই নয়—ইমান বিষয়ক আকিদায় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের আলোচনায় উলামাগণ খারেজি সম্প্রদায় সম্পর্কেও আলোকপাত করে থাকেন। বাস্তবে খারেজিরা ইমানের পরিচয় দেওয়ার সময় আহলুস সুন্নাহর মতোই পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের ভ্রান্তির জায়গাটা ভিন্ন। তারা যে কোনো ফরজ আমল ছেড়ে দিলেই মানুষকে *'কাফির'* আখ্যা দেয়, *'কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহ'* কিংবা অন্য কোনো *'পাপকাজ'* করলেও মানুষকে অন্যায়ভাবে 'কাফির' বলে দেয়। এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **“এটা বাড়ে এবং কমে।”** অর্থাৎ, ইমান বাড়ে এবং কমে। সমগ্র আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হলো—ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; ভালো আমলের দরুন ইমান বেড়ে যায় এবং পাপকাজের দরুন ইমান কমে যায়। এই আকিদাও কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ **فَزَادَهُمْ إِيمَانًا** وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

“যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো।’ কিন্তু **এতে তাদের ইমান বেড়ে গিয়েছিল** এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।”[195]

২. মহান আল্লাহ আরও বলেন :

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ **زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا** وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

“মুমিন তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়, তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে **তা**

[195] সুরা আলে ইমরান ৩:১৭৩।

তাদের ইমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।"[196]

৩. আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾.

"আর যখন কোনো সুরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন কেউ কেউ বলে, **'এই সুরা তোমাদের মধ্যে কার ইমান বৃদ্ধি করল?'** যেসব লোক ইমান এনেছে, এই সুরা তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করেছে এবং তারাই হয়েছে আনন্দিত। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সুরা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরও অপবিত্রতা (কুফরের সাথে আরও কুফর) বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফির অবস্থাতেই মারা গেছে।"[197]

উক্ত আয়াতের তাফসির করতে যেয়ে **ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :**

«وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَكْبَرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ، بَلْ قَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ».

"এই আয়াতটি এ বিষয়ের সবচেয়ে বড়ো দলিলগুলোর একটি যে, ইমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়। এটা সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ আলিম-ইমামের অভিমত। বরং একাধিক বিদ্বান এ বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন।"[198]

---

[196] সুরা আনফাল ৮:২।

[197] সুরা তওবা ৯:১২৪-১২৫।

[198] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৪, পৃ. ২১০।

সুন্নাহ থেকে দলিল :

১. বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নাম থেকে এমন ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলেছে এবং তার অন্তরে একটি যবের দানা পরিমাণ কল্যাণ (ইমান) রয়েছে। এরপর এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলেছে এবং তার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ (ইমান) আছে। তারপর এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলেছে এবং তার অন্তরে একটি ছোটো পিপীলিকা পরিমাণ কল্যাণ (ইমান) আছে।"[199]

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত *'সহিহ মুসলিম'* গ্রন্থের 'ইমান অধ্যায়ে'। এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পাপের কারণে ইমান কমে যায়। এমনকি কমতে-কমতে তা যবের দানা ও গমের দানা পরিমাণ হয়ে যায়!

২. সাইয়্যিদুনা আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

---

[199] সহিহ মুসলিম, হা. ১৯১।

«يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ».

"জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর মহান আল্লাহ বলবেন, 'যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ইমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো'।"[200]

ইজমা থেকে দলিল :

সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহ একমত—ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে আমরা বেশ কিছু ইজমার বর্ণনা ইতোমধ্যে আলোকপাত করেছি। এখানে আরও কিছু ইজমার বর্ণনা পেশ করছি।

১. সালাফদের যুগের ইমাম **আব্দুর রাজ্জাক আস-সানআনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১১ হি.) বলেছেন :**

«لَقِيتُ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ شَيْخًا مِنْهُمْ: مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمَنْ لَمْ نُسَمِّهِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ».

"বাষট্টিজন শাইখের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। যাঁদের অন্যতম হলেন—মামার, আল-আওজায়ি, আস-সাওরি, ওয়ালিদ বিন মুহাম্মাদ আল-কুরাশি, ইয়াজিদ ইবনুস সায়িব, হাম্মাদ বিন সালামা, হাম্মাদ বিন জাইদ, সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, শুআইব বিন হার্ব, ওয়াকি

[200] সহিহুল বুখারি, হা. ২২; সহিহ মুসলিম, হা. ১৭৪।

ইবনুল জার্রাহ, মালিক বিন আনাস, ইবনু আবি লাইলা, ইসমায়িল ইবনু আইয়্যাশ, ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম। এবং আরও যাঁদের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না, তাঁরা সকলেই বলতেন, 'ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; এটি বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়'।"[201]

২. ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) এবং ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন :

«أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ».

"আমরা হিজাজ, ইরাক, শাম ও ইয়েমেন প্রভৃতির যাবতীয় অঞ্চলের আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের সবার মতাদর্শ ছিল—ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; যা বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়।"[202]

৩. ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন :

«الْإِيمَانُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ: الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ بِالْقُلُوبِ وَالْأَلْسِنَةِ وَالْجَوَارِحِ، وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، عَلَى ذَلِكَ وَجَدْنَا كُلَّ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ عَصْرِنَا بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ».

"আহলুস সুন্নাহর কাছে ইমান হলো—অন্তর, জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকা। ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। আমাদের সময়ে মক্কা,

---

[201] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ১০২৯।

[202] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৯৭।

মদিনা, শাম, বুশরা ও কুফা অঞ্চলের যাদের সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের সবাইকে আমরা এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি।”[203]

৪. আশারি সম্প্রদায়ের প্রধান ইমাম আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.) কিংবা তাঁর ছাত্র ইবনু মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) **সমগ্র সালাফের আকিদা বর্ণনা করার সময় বলেছেন :**

«وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية».

“তাঁরা একমত পোষণ করেছেন, আল্লাহর আনুগত্যের ফলে ইমান বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে ইমান কমে যায়।”[204]

৫. সুরা আনফালের ২ নং আয়াতের তাফসির করতে যেয়ে প্রখ্যাত তাফসিরকারক **ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :**

«وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَأَشْبَاهِهَا عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتَفَاضُلِهِ فِي الْقُلُوبِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ، بَلْ قد حكى الإجماع عليه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ».

“ইমাম বুখারি ও অন্যান্য ইমাম উক্ত আয়াত এবং এর অনুরূপ আয়াতসমূহ দিয়ে এ বিষয়ের দলিল দিয়েছেন যে, ইমান বাড়ে এবং মানুষের অন্তরে ইমানের মর্যাদাগত তারতম্য সংঘটিত হয়। এটা উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত। বরং একাধিক ইমাম—যেমন

---

[203] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ১০৩৫।

[204] আল-আশারি, ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর,*** পৃ. ১৫৫।

শাফিয়ি, আহমাদ বিন হাম্বাল, আবু উবাইদ প্রমুখ—এ বিষয়ে ইজমা তথা ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন।"[205]

এসব দলিল থেকে সূর্যালোকের মতো প্রতিভাত হয়—ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা :

মুরজিয়া সম্প্রদায় এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা মনে করে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না; সবার মূল ইমান সমান!

সালাফদের ইমাম, প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) বলেন :**

«خِلَافُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ ثَلَاثٌ: نَقُولُ: الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَهُمْ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلَ، وَنَقُولُ: الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَنَحْنُ نَقُولُ: النِّفَاقُ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا نِفَاقَ».

"আমাদের (আহলুস সুন্নাহর) সাথে মুরজিয়াদের তিনটি বিষয়ে মতবিরোধ আছে। **(১)** আমরা বলি, 'ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি।' আর তারা বলে, 'ইমান হলো স্রেফ কথা; কাজ নয়।' **(২)** আমরা বলি, 'ইমান বাড়ে এবং কমে।' আর তারা বলে, 'ইমান বাড়ে না এবং কমেও না।' **(৩)** আমরা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বলি, 'নিফাক (মুনাফিকি) আছে।' আর তারা (বিলকুল শঙ্কামুক্ত হয়ে) বলে, 'নিফাক বলে কিছু নেই'।"[206]

---

[205] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৪, পৃ. ১০।

[206] আবু বাকর জাফার বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরইয়াবি, ***সিফাতুন নিফাক ওয়া জাম্মুল মুনাফিকিন,*** তাহকিক : আবু আব্দুর রহমান আল-মিসরি (মিশর : দারুস সাহাবাতি লিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১২৭।

ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) স্বীয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ قَالَ: «هَذَا بَرِيءٌ مِنَ الْإِرْجَاءِ».

ইসমায়িল বিন সায়িদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৪১ হি.) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে বলে, 'ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।' তিনি জবাবে বললেন, "সে মুরজিয়াদের আকিদা থেকে মুক্ত।"[207] অর্থাৎ, যে এর বিপরীত কথা বলে, সে মুরজিয়াদের আকিদা থেকে মুক্ত নয়।

আমাদের দেশের হানাফি কওমি মাদরাসাগুলোতে মুরজিয়াদের এই আকিদাই শেখানো হয়। হানাফি দেওবন্দিদের 'বেফাকুল মাদারিস' শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত কিতাব ***'শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা'-য়*** **বলা হয়েছে :**

«(فأما الأعمال) أي: الطاعات (فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص)».

"আমলসমূহ তথা শরয়ি আনুগত্যমূলক কাজগুলো নিজের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইমান বাড়ে না, এবং কমেও না।"[208]

অর্থাৎ, উক্ত আকিদা অনুযায়ী, পদ্ধতির দিক থেকে বান্দার আমল শক্তিশালী ও দুর্বল হয়, সংখ্যা ও পরিধির দিক থেকে বান্দার আমল বাড়ে এবং কমে। কিন্তু বান্দার **ইমান** বাড়েও না, আবার কমেও

---

[207] আবু বাকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-হাম্বালি, ***আস-সুন্নাহ,*** তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৮১।

[208] আত-তাফতাজানি, ***শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা,*** পৃ. ২৮১; হাবিবুর রহমান, ***সহজ শরহে আকাইদ,*** খ. ২, পৃ. ৩৫১।

না! এই আকিদার অপরিহার্য ফলাফল হলো—সবার ইমান সমান। আমাদের ইমান এবং ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামের ইমান সমান! আমাদের ইমান এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমান সমান![209] ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যারা মনে করে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তারা সালাফদের সর্বসম্মতিক্রমে পথভ্রষ্ট মুরজিয়া।

সকল সালাফের আকিদা বর্ণনা করার সময় **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ؛ فَهُوَ مُرْجِئٌ».

"কেউ যদি মনে করে, *'ইমান বাড়ে না এবং কমে না,'* তাহলে সে মুরজিয়া।"[210]

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন :**

«الإيمان عندنا قول وعمل، يزيد وينقص. ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ».

"আমাদের (আহলুস সুন্নাহর) মতে, ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; ইমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলবে, সে মুরজিয়া বিদাতি।"[211]

---

[209] মুরজিয়াদের এই জঘন্য আকিদার বিস্তারিত খণ্ডন জানতে দেখুন : আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর, ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু ওয়া হুকমুল ইসতিসনায়ি ফিহি*** (রিয়াদ : দারু কুনুজি ইশবিলিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩২৫-৩২৬, ৩৭১-৪২৩।

[210] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৩৬।

[211] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ২০২।

ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনায় খারেজি ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের আকিদাও উল্লেখ করা হয়। সমকালীন বেশ কিছু সালাফি আকিদাবিশারদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, খারেজি ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।[212]

কিন্তু মুশকিলের বিষয় হলো—মুতাজিলা ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বইপুস্তক আমাদের কাছে পৌঁছলেও প্রাচীন খারেজি সম্প্রদায়ের বইপুস্তক আমাদের কাছে পৌঁছেনি।[213] আবার সালাফদের কেউ খারেজিদের থেকে *'ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না'*—এমন আকিদা বর্ণনা করেছেন বলেও জানতে পারিনি। সুতরাং এ বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পক্ষান্তরে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের একাধিক পণ্ডিত স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[214] প্রখ্যাত ফের্কাতত্ত্ববিদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ৪৫৬ হি.) উল্লেখ করেছেন, মুতাজিলিদের মতে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[215]

বিশিষ্ট সালাফি আকিদাবিশারদ **শাইখ সুলতান আল-উমাইরি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন :**

---

[212] আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা,*** পৃ. ৪০৩; আল-কারনি, ***উসুলুল মুখালিফিন,*** পৃ. ৭৭ ও ৯৭; আল-বদর, ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু,*** পৃ. ৩৭৩।

[213] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

[214] কাদি আব্দুল জাব্বার আল-হামদানি, ***আল-মুখতাসার ফি উসুলিদ্দিন,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইমারা (কায়রো : দারুশ শুরুক, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি., *'রাসায়িলুল আদলি ওয়াত তাওহিদ'* নামে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্গত একটি পুস্তিকা), পৃ. ২৭৬; কাদি আবু সাদ মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-হাকিম আল-জুশামি, ***উয়ুনুল মাসায়িল,*** তাহকিক : রমাদান এলদিরিম (কায়রো : দারুল ইহসান, ১ম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২৭০।

[215] আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি, ***আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল*** (কায়রো : মাকতাবাতুল খানজি, তাবি), খ. ৩, পৃ. ১০৬।

“আমি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এমন কোনো বক্তব্য পাইনি, যেখানে তাঁরা স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।’ বরং তাঁদের বেশ কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়, যেখানে স্পষ্টভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার কথা বলা হয়েছে।”[216]

[216] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৩৮।

আমলবিহীন ইমানের বিধান

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **“আমল ছাড়া স্রেফ কথা কোনো উপকারে আসবে না।”** অর্থাৎ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সকল আমল পরিত্যাগ করে কেবল মুখে ইমানের দাবি করলে তা বান্দার কোনোই উপকারে আসবে না। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল ব্যতিরেকে কেউ ইমানদার হতে পারবে না; মুমিন-মুসলিম হতে পারবে না। কেননা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমল আন্তরিক বিশ্বাসের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তাই বাহ্যিক আমল না থাকলে আন্তরিক বিশ্বাসও অটুট থাকবে না। এই মূলনীতি কুরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেন :**

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ **بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ** - وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ - وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ - أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ أَمۡ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ - **إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ** إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾.

“তারা বলে, ‘আমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ইমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম।’ কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; **বস্তুত তারা মুমিন নয়।** আর যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে, তখন

তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর হক যদি তাদের পক্ষে হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রসুলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের ওপর জুলুম করবেন? বরং তারাই তো জালিম। **মুমিনদের উক্তি তো কেবল এটাই**—যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম, এবং মান্য করলাম।' আর তারাই তো সফলকাম।"[217]

নিজেদের *'ইমানদার'* দাবি করা সত্ত্বেও যারা রসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের দাবিকে আল্লাহ বাতিল ঘোষণা করেছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন, এদের বিপরীতে মুমিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা নবিজির কথা শোনে এবং মান্য করে। এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, বাহ্যিক আমল—আন্তরিক বিশ্বাসের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বাহ্যিক আমল না থাকলে ইমান থাকবে না।[218]

আলোচ্য মূলনীতি সালাফদের ইজমা (সর্বসম্মত অভিমত) থেকেও প্রমাণিত। **ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেন :**

«وَكَانَ **الْإِجْمَاعُ** مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، لَا يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْآخَرِ».

---

[217] সুরা নুর : ৪৭-৫১।

[218] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ২২১।

“সাহাবিবর্গ এবং তাঁদের পরবর্তী তাবেয়িবৃন্দের যাদেরকে আমরা পেয়েছি, **তাঁদের সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ইমান হলো—কথা, কাজ এবং নিয়ত।** এই তিনটির কোনো একটিও অপরটি ব্যতিরেকে ইমানের জন্য যথেষ্ট হবে না।”[219]

সকল ফরজ আমল পরিত্যাগকারী কাফির :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে—যে ব্যক্তি অন্তরে ইমানের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে বলে দাবি করেছে এবং মুখে ইমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ফরজ আমলও করেনি, সে মুসলিম নয়। সালাফদের সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির। কেউ হয়তো এইমাত্র কালিমাতুশ শাহাদাহ পড়ে মুসলিম হলো এবং তৎক্ষণাৎ মারা গেল, আমল করার সুযোগ পেল না—এরকম মানুষের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সময়-সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সমুদয় ফরজ আমল পরিত্যাগ করে—যেসব ফরজ আমলের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে—সে মুসলিম নয়। সালাফদের আকিদা অনুযায়ী সে কাফির।

‘উসুলুস সুন্নাহ’ পুস্তিকার লেখক **ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১৯ হি.) অন্যত্র বলেছেন :**

«وَأُخْبِرْتُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُصَلِّيَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، إِذَا عَلِمَ أَنْ

[219] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ৯৫৬।

تَرْكَهُ ذَلِكَ فِي إِيمَانِهِ إِذَا كَانَ يُقِرُّ الْفُرُوضَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا الْكُفْرُ بِاللَّهِ الصُّرَاحُ».

"আমি সংবাদ পেয়েছি, একদল লোক বলে থাকে, 'যে ব্যক্তি নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এসবের কোনোটিই বাস্তবায়ন করে না, সে মুমিন; অথবা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পিঠে ভর দিয়ে কিবলামুখী না হয়ে ভিন্ন দিকে ফিরে নামাজ পড়লেও সে মুমিন; যতক্ষণ না সে এসব ইবাদতকে অস্বীকার করছে (ততক্ষণ পর্যন্ত সে *'মুমিন'* থাকবে)। যদি তার এরকম জানা থাকে যে, ফরজ ইবাদতগুলোর আবশ্যকতা এবং কিবলামুখী হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করে নেওয়ার পর এসব ইবাদত ছেড়ে দিলেও তার ইমান অটুট থাকে।' এ কথা শোনার পর আমি বললাম, 'তাদের এই কাজ তো আল্লাহর প্রতি প্রকাশ্য কুফরি'।"[220]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«وأيضًا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة، **وأجمع عليه السلف**، على ما هو مقرَّر في موضعه. فالقولُ تصديق الرسول، والعملُ تصديق القول؛ **فإذا خلا العبد عن العمل بالكلِّية لم يكن مؤمنًا**».

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে, ইমান হচ্ছে কথা ও কাজ। যেমনটি কিতাব ও সুন্নাহয় প্রমাণিত হয়েছে এবং **এ বিষয়ে সালাফগণ একমত হয়েছেন।** যেমনটি (অর্থাৎ এ বিষয়ের আলোচনা) তার নির্ধারিত স্থানে সুসাব্যস্ত করা

[220] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭।

হয়েছে। (ইমানের সংজ্ঞায়) কথা মানে রসুলকে সত্যায়ন করা, আর কাজ মানে সেই কথাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করা। **সুতরাং বান্দা যখন পুরোপুরি আমল থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আর মুমিন থাকে না।**"[221]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন :

«وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدِّينَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ وَاجِبًا ظَاهِرًا وَلَا صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ يُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ، لَا لِأَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَهَا؛ مِثْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ، أَوْ يُصَدِّقَ الْحَدِيثَ، أَوْ يَعْدِلَ فِي قَسَمِهِ وَحُكْمِهِ، مِنْ غَيْرِ إيمَانٍ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ. فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ يَرَوْنَ وُجُوبَ هَذِهِ الْأُمُورِ. فَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ، **مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ. وَمَنْ قَالَ: بِحُصُولِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ بِدُونِ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ... كَانَ مُخْطِئًا خَطَأً بَيِّنًا. وَهَذِهِ بِدْعَةُ الْإِرْجَاءِ** الَّتِي أَعْظَمَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ الْكَلَامَ فِي أَهْلِهَا، وَقَالُوا فِيهَا مِنْ الْمَقَالَاتِ الْغَلِيظَةِ، مَا هُوَ مَعْرُوفٌ. وَالصَّلَاةُ هِيَ أَعْظَمُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَوَّلُهَا وَأَجَلُّهَا».

"এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দ্বীনপালনের জন্য অবশ্যই কথা ও কাজ—দুটোই থাকা জরুরি। এমনটা হওয়া অসম্ভব যে,

[221] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***শারহু উমদাতিল ফিকহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮১-৮২।

একজন ব্যক্তি শুধু অন্তর দিয়ে, অথবা অন্তর ও জবান দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান রাখবে, অথচ কোনো বাহ্যিক ফরজ আমল আদায় করবে না; না নামাজ, না জাকাত, না রোজা, আর না অন্য কোনো ফরজ ইবাদত। যদি ধরে নেওয়া হয়, কেউ ফরজ কাজগুলো আদায় করছে; কিন্তু মহান আল্লাহ এগুলো ফরজ করেছেন বলে নয়। যেমন কেউ যথোচিতভাবে আমানত ফিরিয়ে দেয়, অথবা সত্য কথা বলে, কিংবা বণ্টন ও বিচারকার্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু এগুলো সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান ছাড়াই করে। তাহলে এর মাধ্যমে সে কুফর থেকে বের হবে না। কারণ মুশরিকরা এবং কিতাবধারী ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও এসব কাজকে ফরজ মনে করে। সুতরাং এমন হতে পারে না যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান রেখেছে, **অথচ এমন কোনো ফরজ কাজই করেনি, যা একমাত্র** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ করেছেন। **আর যে বলে, কোনো ফরজ কাজ আদায় না করেও ফরজ ইমান অর্জিত হয়ে যায়, ... সে সুস্পষ্ট ভুলকারী। মূলত এটাই সেই ইরজার বিদাত (মুরজিয়াদের বিদাতি আকিদা),** যেই বিদাতের ব্যাপারে সালাফ ও ইমামগণ এমন কঠোর সমালোচনা করেছেন, এবং এমনসব নির্দয় ও রূঢ় কথা বলেছেন, যা একদম সুপরিচিত। আর নামাজ হলো এসব ফরজ আমলের মধ্যে সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে ব্যাপক, সর্বপ্রথম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।"[222]

এ থেকে বোঝা গেল, যারা সমুদয় ফরজ আমল পরিত্যাগকারীকে মুসলিম মনে করে, তারা পথভ্রষ্ট মুরজিয়া ফের্কার অন্তর্ভুক্ত। অনেকে ভুলবশত সালাফদের এই আকিদাকে *'খারেজিদের*

[222] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৫৭৭।

আকিদা' মনে করেন! অথচ খারেজিদের আকিদা ভিন্ন। সালাফগণের আকিদা মোতাবেক আমরা বলি, সকল ফরজ আমল পরিত্যাগ করলে বান্দা কাফির হয়ে যায়। আর সকল ফরজ আমল না ছেড়ে দিয়ে কিছু ফরজ আমল পরিত্যাগ করলে বান্দা পাপী মুসলিম হয় মাত্র, কাফির হয় না; তার ইমান কমে যায় মাত্র, সকল ইমান বিলীন হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে খারেজি ও মুতাজিলাদের আকিদা মোতাবেক, বান্দা ওজর ব্যতীত একটি ফরজ আমল পরিত্যাগ করলেই ইমানশূন্য হয়ে যায়! তওবা না করে মারা গেলে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয়। তার ইমানের কিয়দংশ বিলীন হলে পুরো ইমানটাই বিলীন হয়ে যায়![223]

এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা :

প্রধানত মুরজিয়া সম্প্রদায় এই আকিদার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ইমানের পরিচয় বিষয়ে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক আকিদা থেকে এই বিভ্রান্তি এসেছে। তারা যেহেতু মনে করে, আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু তাদের আকিদার অপরিহার্য বিষয় দাঁড়ায়—সকল আমল পরিত্যাগ করলেও ব্যক্তি কাফির হয় না; বরং মুমিনই থাকে। মুরজিয়াতুল ফুকাহা সম্প্রদায়ও এই আকিদা পোষণ করে। মুরজিয়াতুল ফুকাহাদের অন্যতম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মাজহাব অনুযায়ী, সকল আমল পরিত্যাগকারী কাফির নয়। পরবর্তী যুগে আগত হানাফিদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক **আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেছেন :**

---

[223] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৩৮৫; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৫১১, খ. ১৩, পৃ. ৪৮।

«و إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل في الإيمان، مع اتفاقهم على أن فاقدَ التَّصديق كافرٌ، وفاقدَ العمل فاسقٌ».

"আমাদের ইমাম আজম রাহিমাহুল্লাহ এবং অধিকাংশ ফাকিহ ও মুতাকাল্লিমের (তথাকথিত ইসলামি দার্শনিক) মতে, আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তাঁরা সবাই (আহলুল হাদিস ও আবু হানিফার অনুসারীবৃন্দ) একমত ছিলেন, *তাসদিক* তথা *সত্যায়ন* পরিত্যাগকারী কাফির, আর সমুদয় আমল পরিত্যাগকারী ফাসিক (পাপী মুসলিম)!"[224]

আমাদের দেশে হানাফি মাতুরিদিদের সিলেবাসভুক্ত কিতাব *'শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যার'* আকিদার অপরিহার্য বিষয়ও এটাই দাঁড়ায় যে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি ঠিক রেখে সকল আমল পরিত্যাগ করলেও কেউ কাফির হয় না; বরং মুসলিমই থাকে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, বিশিষ্ট সালাফি আকিদাবিশারদ শাইখ সুলতান আল-উমাইরি হাফিজাহুল্লাহ,[225] শাইখ মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কুসাইরি হাফিজাহুল্লাহ[226] প্রমুখ মুরজিয়াতুল ফুকাহাদের আকিদা নিরূপণ করার সময় এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, তারা সকল আমল পরিত্যাগ করাকে কুফর মনে করে না।

---

[224] মুহাম্মাদ আনওয়ার বিন মুআজ্জাম শাহ আল-কাশ্মিরি, ***ফাইদুল বারি আলা সহিহিল বুখারি,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বদর আলম মিরাঠী (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৯।

[225] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৫৩।

[226] মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কুসাইরি, ***বারাআতু আহলিল হাদিসি ওয়াস সুন্নাহ মিন বিদআতিল মুরজিআহ*** (রিয়াদ : দারুল মুহাদ্দিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.), পৃ. ২৬১-২৬২।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক *'সালাফি'* দাবিদার শাইখ ও দায়ি আলোচ্য ভ্রষ্ট আকিদায় নিপাতিত হয়েছেন। যদিও তাঁরা নিজেদের মৌলিক আকিদা হিসেবে বলেন, "ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি, আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত।" এ সত্ত্বেও সকল আমল পরিত্যাগকারীকে তাঁরা মুমিন মনে করেন! আরব বিশ্বে বেশ কিছু 'সালাফি' দাবিদার শাইখ এই ভ্রান্ত আকিদা সাব্যস্ত করেছেন। আমাদের কিবার উলামাগণ তাদের সেই ভ্রান্ত আকিদাকে 'মুরজিয়াদের আকিদা' আখ্যা দিয়েছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন।[227] যারা নিজেদেরকে 'সালাফি' দাবি করেও এ ধরনের ভ্রান্ত ইরজায়ি আকিদা পোষণ করে, তাদেরকে সমকালীন সুন্নাহপন্থি উলামাগণ *'মুরজিয়াতুল আসর'* তথা *'এই যুগের মুরজিয়া/সমকালীন মুরজিয়া'* আখ্যা দিয়েছেন।[228]

আমাদের দেশেও কতিপয় সালাফি দায়ি কর্তৃক এই বাতিল আকিদা ছড়িয়েছে। *'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'* সংগঠনটির আমীরে জামাআত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার তাঁর পিএইচডি থিসিসে আলোচ্য ইরজায়ি আকিদা উল্লেখ করেছেন 'আহলুল হাদিসদের আকিদা' হিসেবে! উক্ত থিসিসের অন্তর্গত 'আহলুল হাদিসদের আকিদা' বিষয়ক চ্যাপ্টারটি পরবর্তীতে *'আক্বীদা*

---

[227] **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিম আদ-দুসারি, ***রফউল লায়িমা আন ফাতওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা*** (মক্কা : দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, তাবি), পৃ. ৮-১২, ৮০-৯৩; মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আলু খুদাইর, ***আল-ইমান ইনদাস সালাফ ওয়া আলাকাতুহু বিল আমাল ওয়া কাশফু শুবুহাতিল মুআসিরিন*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদি নাশিরুন, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩-৫৪, ৮৬-৮৭, ৯২-৯৩।

[228] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***ইআনাতুল মুস্তাফিদ বি শারহি কিতাবিত তাওহিদ*** (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০, খ. ২, পৃ. ২০৪; সালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সুওয়াইয়্যিহ, ***আল-ফুরুক বাইনা আকিদাতিস সালাফ ওয়া আকিদাতিল মুরজিআহ ফিল ইমান*** (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩-৪, ৮৯-৯৫, ১৭৩-১৮৮।

ইসলামিয়াহ' নামে প্রকাশ করা হয়। সেখানেও ওই বাতিল আকিদা রয়েছে বহাল তবিয়তে। স্যারের লেখা উক্ত *'আক্বীদা ইসলামিয়াহ'* পুস্তিকা তাঁর অধীন *'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের'* মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয়। কারণ তাঁরা বইটিকে অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসভুক্ত করেছেন।[229] **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার লিখেছেন :**

> "আহলেহাদীছের নিকটে 'ঈমান' হ'ল মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। প্রথম দু'টি মূল ও **শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।** খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন।"[230]

গালিব স্যারের অনুসরণ করে তাঁর থিসিসের বরাতে একই আকিদা সাব্যস্ত করেছেন হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী হাফিজাহুল্লাহ তাঁর লেখা *'কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমান'* প্রবন্ধে।[231] আমরা দেখতে পেলাম, তাঁদের প্রচারিত আকিদা মোতাবেক আমল না থাকলে পরিপূর্ণ মুমিন হয় না। তাঁরা কেউ বলছেন না, ইমানের তিনটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ আমল ছেড়ে দিলে তথা সকল ফরজ আমল ছেড়ে দিলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়!

---

[229] হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, ***পাঠ্যতালিকা ২০২৫*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, তাবি), পৃ. ১২।

[230] মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯৭; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ***আক্বীদা ইসলামিয়াহ*** (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪।

[231] মাসিক আত-তাহরীক (১৭তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৪), পৃ. ১৬।

অনুরূপভাবে ড. মুযাফফর বিন মুহসিন (আসলাহাহুল্লাহ)[232] সম্পাদিত *'প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম'* গ্রন্থেও আলোচ্য বাতিল আকিদাটি সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন একাধিক বিজ্ঞ গবেষক। **উক্ত গ্রন্থে লেখা হয়েছে :**

> "ঈমানের ব্যাপারে খারেজীদের আক্বীদা হল চরমপন্থী। **তাদের মতে- হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন তিনটিই ঈমানের মূল ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। ...** ঈমানের ব্যাপারে আহলেহাদীছদের আক্বীদা হল বিশুদ্ধ ও মধ্যমপন্থী। তাদের নিকটে, হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি মূল আর আমল তার শাখা। তাই কেউ কাবীরা গুনাহ করলে তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কাফের হয়ে যায় না। তাদের মতে, সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপকার্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। **এছাড়া কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তার গুনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হলেও সে ইসলাম থেকে খারিজ নয়।** তাই সে কাফেরও নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধীও নয়। তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্য ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে যেমন পূর্ণ মুমিন বলা যাবে না, তেমনি কাফেরও বলা যাবে না। তবে ফাসিক্ব, গুনাহগার বলা যাবে।"[233]

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমলকে ইমানের অবিচ্ছিন্ন অংশ মনে করাকে তাঁরা খারেজিদের আকিদা হিসেবে চিহ্নিত

---

[232] তিনি বর্তমানে *'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের'* যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। ইতঃপূর্বে তিনি *'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের'* যুব-সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন।

[233] মুযাফফর বিন মুহসিন (সম্পা.), ***প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম*** (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার, প্র. ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৮০-৮১।

করেছেন! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ! এরপর আবার বলছেন, গুনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ইমানশূন্য হয়ে গেলেও কেউ কাফির হয় না, বরং গুনাহগার মুসলিম থাকে! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক! ইমানশূন্য হলে আবার মুসলিম থাকে কীভাবে?!

অনেকে হয়তো ভাববেন, "অমুক-অমুক হাদিসে যে আমল না করেও জান্নাতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে! তাহলে সেগুলোর কী হবে?" সুবহানাল্লাহ! হাদিসগুলো কি সালাফদের বুঝ অনুযায়ী বুঝতে হবে, না নিজেদের বুঝ অনুযায়ী?! যাঁরা ইসলামের প্রথম তিন যুগ পেয়েছেন, সেই ইমামদের কেউ কি বলেছেন, কোনো ওজর ব্যতীত সকল আমল পরিত্যাগ করলেও ব্যক্তি জান্নাতে যাবে?! এ বিষয়ক সংশয়গুলোর জবাব দেওয়ার উপযুক্ত জায়গা এই কিতাব নয়। আমি এ বিষয়ে প্রচলিত আকিদাভ্রষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করলাম মাত্র; যেন জনসাধারণ বাতিল আকিদা থেকে সতর্ক-সাবধান থাকতে পারেন। অন্যথায় এই টপিকে অন্য কোনো কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে আমার।[234]

---

[234] তদুপরি কোনো আগ্রহী পাঠক যদি উক্ত বাতিল আকিদার বিভিন্ন সংশয় ও সেসবের নিরসন সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে নিম্নোক্ত ছয়টি আরবি কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন—

এক. আকওয়ালু জাবিল ইরফান ফি আন্না আমালাল জাওয়ারিহি দাখিলাতুন ফিল ইমান (أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان), লেখক : শাইখ ড. ইসাম আস-সিনানি, সম্পাদক : শাইখ সালিহ আল-ফাওজান।

দুই. আল-ফুরুক বাইনা আকিদাতিস সালাফ ওয়া আকিদাতিল মুরজিআহ ফিল ইমান (الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان), লেখক : সালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সুওয়াইয়্যিহ, সম্পাদক : শাইখ সালিহ আল-ফাওজান ও শাইখ মুহাম্মাদ বিন হাসান আলুশ শাইখ।

তিন. বারাআতু আহলিল হাদিসি ওয়াস সুন্নাহ মিন বিদআতিল মুরজিআহ (براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة), লেখক : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কুসাইরি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁদের অনেকে *'সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির'* বলার মত অনুসরণ করেন। যেটা অবশ্যই একটা গ্রহণযোগ্য (valid) মত; এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁরা ইমান বিষয়ক আকিদা বর্ণনা করার সময়—সকল আমল পরিত্যাগকারীকে 'মুসলিম' মনে করেন! আমলকে 'ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলাকে খারেজিদের আকিদা মনে করেন! এমনকি অনেকেই তাওহিদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "কোনো আমল না করলেও তাওহিদের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে; কোনো আমল না করলেও শির্ক না করার কারণে জান্নাতে যাবে!" আবার তাঁরাই নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির বলছেন, যে কিনা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে! তাহলে তাঁদের আকিদায় সাযুজ্য (consistency) থাকল কি?! তাঁরা কি স্ববিরোধী মত দিলেন না?! আল্লাহুল মুস্তাআন।

শুধু বর্তমান সময়ে না, বরং আগের যুগেও অনেকে *'সালাফদের আকিদা অনুসরণের'* দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও মুরজিয়াদের আকিদা বুঝতে ভুল করেছেন এবং ইরজায়ি আকিদায় নিপাতিত হয়েছেন। এ মর্মে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

চার. রফউল লায়িমা আন ফাতওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা (رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة), লেখক : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিম আদ-দুসারি, সম্পাদক : শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জিবরিন, শাইখ সালিহ আল-ফাওজান, শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি প্রমুখ।

পাঁচ. আল-ইমান ইনদাস সালাফ ওয়া আলাকাতুহু বিল আমাল ওয়া কাশফু শুবুহাতিল মুআসিরিন (الإيمان عند السلف وعلاقته وكشف شبهات المعاصرين), লেখক : শাইখ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আলু খুদাইর।

ছয়. কাওয়ায়িদু ফি বায়ানি হাকিকাতিল ইমান ইনদা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ (قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة), লেখক : শাইখ আদিল বিন মুহাম্মাদ আশ-শাইখানি।

«وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَذَاهِبِ السَّلَفِ وَأَقْوَالِ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة؛ لِاخْتِلَاطِ هَذَا بِهَذَا فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ مِمَّنْ هُوَ فِي بَاطِنِهِ يَرَى رَأْيَ الْجَهْمِيَّة وَالْمُرْجِئَةِ فِي الْإِيمَانِ وَهُوَ مُعَظِّمٌ لِلسَّلَفِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ أَمْثَالِهِ وَكَلَامِ السَّلَفِ».

“পরবর্তী যুগে আগত অনেক বিদ্বান সালাফদের মতাদর্শ এবং মুরজিয়া-জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। কারণ তাদের অনেকের বক্তব্যে এই বিষয়ের সাথে ওই বিষয় সংমিশ্রিত হয়ে গেছে।[235] তাঁরা ইমান বিষয়ে অন্তরে জাহমিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ পোষণ করেন, অথচ তাঁরাই আবার সালাফ ও আহলুল হাদিসকে সম্মান-শ্রদ্ধা করেন। ফলে তাঁরা ভাবেন, উভয় দলের মধ্যে তাঁরা সমন্বয় করছেন, কিংবা তাঁদের মতো লোকদের কথা এবং সালাফদের কথার মধ্যে সমন্বয় সাধন করছেন!”[236]

আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের সালাফি দায়িবর্গকে ক্ষমা করুন এবং এসব বিদাতি আকিদা থেকে বীরত্বের সাথে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এখন আমরা দেখে নিই, সকল আমল পরিত্যাগকারীকে যারা কাফির বলে না, তাদেরকে সালাফগণ কী বলেছেন। সালাফদের যুগের ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৯৮ হি.) মুরজিয়াদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে **তিনি বলেন :**

---

[235] পূর্ববর্তী আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করছেন ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ।

[236] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৩৬৪।

«يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ **وَالْمُرْجِئَةُ أَوْجَبُوا الْجَنَّةَ** لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُصِرًّا بِقَلْبِهِ عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ، وَسَمُّوا تَرْكَ الْفَرَائِضِ ذَنْبًا بِمَنْزِلَةِ رُكُوبِ الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ بِسَوَاءٍ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمَحَارِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ مَعْصِيَةٌ، **وَتَرْكُ الْفَرَائِضِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ جَهْلٍ وَلَا عُذْرٍ هُوَ كُفْرٌ**».

"তারা (মুরজিয়ারা) বলে, 'ইমান হচ্ছে কথা।' আর আমরা বলি, 'ইমান হচ্ছে কথা ও কাজ।' **মুরজিয়ারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছে তার জন্য,** যে অন্তরে সমগ্র ফরজ পরিত্যাগের ওপর অটল থেকে এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তারা সমগ্র ফরজ পরিত্যাগ করাকে এমন একটি গুনাহ সাব্যস্ত করেছে, যা হারাম কাজ করার সমতুল্য। অথচ দুটো বিষয় এক নয়। কারণ হালাল বিশ্বাস না করে যদি হারাম কাজ করা হয়, তাহলে তা (বড়ো কুফরের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের) একটি পাপকাজ। **পক্ষান্তরে অজ্ঞতা কিংবা কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে <u>সমগ্র</u> ফরজ ত্যাগ করা কুফর।**"[237]

আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সকল ফরজ আমল পরিত্যাগকারীকে যারা কাফির বলে না, তাদেরকে ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ *'মুরজিয়া'* আখ্যা দিয়েছেন।

সালাফদের যুগের আরেক বিখ্যাত ইমাম **ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

[237] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

«غلت **المرجئة** حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، **فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة**».

"**মুরজিয়ারা** এতটাই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এটা পর্যন্ত তাদের মতাদর্শ হয়ে গেছে। মুরজিয়াদের একদল লোক বলে, 'কেউ যদি ফরজ নামাজ, রমজানের রোজা, জাকাত, হজ এবং অন্যান্য সকল ফরজ ইবাদতকে অস্বীকার না করে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমরা তাকে কাফির বলব না। তার ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হবে। কারণ সে মুখে স্বীকার করে।' **এরা হলো সেই দল, যাদের 'মুরজিয়া' হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।**"[238]

আমরা এখানেও স্পষ্টভাবে অবলোকন করলাম—সকল ফরজ আমল পরিত্যাগকারীকে যারা কাফির বলে না, তাদের ব্যাপারে ইমাম ইসহাক বলেছেন, 'এদের মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।' এমনকি এদের মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে সালাফগণ একমত ছিলেন।

সালাফদের ইজমায়ি আকিদায় **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭০ হি.) মুরজিয়াদের মতবাদ সম্পর্কে বলেছেন :**

---

[238] আবু মুহাম্মাদ হার্ব বিন ইসমায়িল বিন খালাফ আল-কিরমানি, ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি,*** তাহকিক : ফায়িজ বিন আহমাদ বিন হামিদ হাবিস (অন্তর্জালিক সংস্করণ, প্র. ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১০১৫; আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি,*** তাহকিক : মাহমুদ বিন শাবান ও অন্যান্য (মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

«وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا. ... هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْمُرْجِئَةِ، وَهُوَ أَخْبَثُ الْأَقَاوِيلِ وَأَضْلَلُهَا وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْهُدَى».

“মুরজিয়ারা মনে করে, যে ব্যক্তি কেবল জবান দিয়ে ইমান এনেছে, কিন্তু কোনো (ফরজ) আমল করেনি, সে সত্যসত্যই ইমানদার। ... এগুলো সবই মুরজিয়াদের মতবাদ—যা সবচেয়ে দূষিত, সবচেয়ে ভ্রষ্ট এবং হেদায়েত থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মতবাদ।”[239]

[239] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৭৮।

নিয়তবিহীন ইমানের বিধান

ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **“আবার নিয়ত ছাড়া স্রেফ কথা ও কাজ কোনো উপকারে আসবে না।”** অর্থাৎ, ইমানের আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। অন্যথায় সেই আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল কোনো উপকারে আসবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

“তাদেরকে কেবল এ বিষয়েরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর ইবাদত করে সমগ্র দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে; এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে; আর এটাই সঠিক দ্বীন।”[240] অর্থাৎ, তারা যেন দ্বীনের যাবতীয় বিষয় ইখলাস সহকারে পালন করে।

আয়াতটি উল্লেখ করার পর **ইমাম ইবনু বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.) বলেছেন :**

«فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَمَعَتِ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ وَالنِّيَّةَ، فَإِنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَالْإِخْلَاصَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِعَزْمِ الْقَلْبِ وَالنِّيَّةِ».

“এই আয়াতে কথা, কাজ ও নিয়ত—সবই একত্রিত হয়েছে। কারণ আন্তরিক ও মৌখিক স্বীকৃতির পরই কেবল আল্লাহর ইবাদত

[240] সুরা বাইয়্যিনা ৯৮:৫।

কার্যকর হয়। আর আমল (কর্মে বাস্তবায়ন) ব্যতিরেকে নামাজ কায়েম করা ও জাকাত দেওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে অন্তরের দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ত ব্যতিরেকে ইখলাস বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয়।"[241]

সালাফদের যুগের ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَنِيَّةٌ صَادِقَةٌ».

"ইমান হলো কথা, কাজ এবং খাঁটি নিয়ত।"[242]

এ বিষয়ে সালাফদের ইজমা বর্ণনা করে **ইমাম আব্দুল্লাহ বিন দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১৩ হি.) বলেছেন :**

«الإيمان قول وعمل ونية». وقال: «على هذا أدركنا أهل العلم».

"ইমান হলো কথা, কাজ এবং নিয়ত।" এরপর বলেছেন, "আমরা আলিমগণকে এই মতাদর্শের ওপরই পেয়েছি।"[243]

ইমাম আবু বাকার আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَنِيَّةٌ؟ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ يَكُونُ بِلَا نِيَّةٍ، نَعَمْ، قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَنِيَّةٌ، لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، قَالَ لِي: النِّيَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ».

আমাকে আব্দুল মালিক বিন আব্দুল হামিদ আল-মাইমুনি রাহিমাহুল্লাহ জানিয়েছেন, তিনি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমাদকে) জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইমান কি কথা, কাজ এবং

---

[241] আবু আব্দুল্লাহ উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু বাত্তাহ আল-উকবারি, ***আল-ইবানা আন শারিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াতি ওয়া মুজানাবাতুল ফিরাকিল মাজমুমা,*** তাহকিক : রিদা বিন নাসান মুতি (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.), খ. ২, পৃ. ৮১৩।

[242] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮০।

[243] আল-কিরমানি, ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি,*** খ. ৩, পৃ. ৯৮৮।

নিয়ত?” তিনি আমাকে বলেছিলেন, “নিয়ত ছাড়া কীভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, ইমান হলো কথা, কাজ এবং নিয়ত। অবশ্যই নিয়ত থাকতে হবে।” তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন, “নিয়ত তো অগ্রগণ্য।”[244] অর্থাৎ, ইবাদতমূলক কথা ও ইবাদতমূলক কাজের আগে নিয়ত লাগবে।

মূলত *‘কথা ও কাজের নাম ইমান’* বললেই তার মধ্যে নিয়তের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি না-ও বুঝে উঠতে পারে। সেজন্য সালাফগণ আলাদা করে ইমানের পরিচয়ে নিয়তের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وَمَنْ قَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ قَالَ: الْقَوْلُ يَتَنَاوَلُ الِاعْتِقَادَ وَقَوْلَ اللِّسَانِ وَأَمَّا الْعَمَلُ فَقَدْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ النِّيَّةُ فَزَادَ ذَلِكَ».

“যেসব সালাফ বলেছেন, *‘ইমান হলো কথা, কাজ ও নিয়ত,’* তাঁরা চিন্তা করেছেন, *‘কথার’* মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় অন্তরের বিশ্বাস এবং জবানের উচ্চারণ তথা মৌখিক স্বীকৃতি। কিন্তু *‘কাজ’* শব্দ থেকে নিয়ত না-ও বোঝা যেতে পারে। তাই তাঁরা নিয়তকে আলাদাভাবে বর্ধিত করে উল্লেখ করেছেন।”[245]

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, **ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেছেন :**

«وَكَانَ **الْإِجْمَاعُ** مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، لَا يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْآخَرِ».

---

[244] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮০।

[245] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমান,*** পৃ. ১৩৭-১৩৮; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ১৭১।

“সাহাবিবর্গ এবং তাঁদের পরবর্তী তাবেয়িবৃন্দের যাদেরকে আমরা পেয়েছি, তাঁদের সবাই এ বিষয়ে **একমত** ছিলেন যে, ইমান হলো—কথা, কাজ এবং **নিয়ত। এই তিনটির কোনো একটিও অপরটি ব্যতিরেকে ইমানের জন্য যথেষ্ট হবে না।**”[246]

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করে, তাহলে সে কাফির। যে ব্যক্তির সকল ইবাদত দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, সে মুমিন হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿مَن كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ ومَن كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنها وما لَهُ في الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ﴾.

“যে ব্যক্তি (ইবাদতের ক্ষেত্রে) পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরকালের ফসল (সওয়াব) বর্ধিত করে দিই। এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াবি জীবনের ফসল কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ারই কিছু দিই। আর পরকালে তার জন্য (সওয়াবের) কোনো অংশই থাকবে না।”[247]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

“যারা কেবল দুনিয়াবি জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (কর্মের প্রতিদান) দুনিয়াতেই

---

[246] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ৯৫৬।

[247] সুরা শুরা ৪২:২০।

পূর্ণরূপে দিয়ে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমনসব লোক, যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা যা কিছু করেছে, তার সবই পরকালে নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তারা যেই আমল করত, সেটাও হয়ে যাবে বাতিল।"[248]

দ্বিতীয়োক্ত আয়াতটির তাফসিরে **শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৭৬ হি.) বলেছেন :**

«أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة، من الذهب، والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث. قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، **فهذا لا يكون إلا كافرا**، لأنه لو كان مؤمنا، لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا».

"অর্থাৎ, উক্ত ব্যক্তির সকল ইচ্ছা কেবল দুনিয়াবি জীবন ও তার সাজসজ্জায় সীমাবদ্ধ; নারী, সন্তানসন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, পছন্দমাফিক চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামার প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে তার আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা ও কাজকে এসব জিনিসেই ব্যয় করেছে। ইচ্ছার কোনো অংশকে স্থায়ী আবাস তথা পরকালের জন্য বরাদ্দ করেনি। **এমন ব্যক্তি কাফির ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।** কারণ সে যদি মুমিন হতো,

[248] সুরা হুদ ১১:১৫-১৬।

তাহলে কেবল দুনিয়াবি জীবনের জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা বরাদ্দ করা থেকে—তার ইমানই তাকে বাধা দিত।"[249]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

«لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان باللَّه ورسوله ولقائه أبدًا، فإن الإيمان باللَّه والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه اللَّه والدار الآخرة بأعماله، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدًا، وإن جامع الإقرارَ والعلمَ، فالإيمان وراء ذلك، فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد اللَّه سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين شاهدوا رسول اللَّه ﷺ وعرفوه كما عرفوا أبناءهم، وهم من أكفر الخلق. فإرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم، ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله اللَّه والدار الآخرة».

"মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি এবং রবের সাক্ষাতের প্রতি ইমান রাখা অবস্থায়—পরকালের সওয়াবের আশায় ভালো আমল না করে—কেবল দুনিয়া ও তার তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির আশায় ভালো আমল করা সম্ভব হতে পারে না। কেননা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আনীত ইমান অপরিহার্যভাবে এই দাবি করে যে, বান্দা তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সওয়াব কামনা করবে। সুতরাং যখন বান্দার উদ্দেশ্য হয় কেবল দুনিয়া, তখন সেটা কখনোই ইমানের সাথে মিলিত হতে পারে না;

---

[249] আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি, ***তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আল-লুওয়াইহিক (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৭৮।

যদিও তা মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে মিলিত হতে পারে। কিন্তু ইমান এর পেছনে অধরাই রয়ে যায়। কারণ মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাস তাদেরও ছিল, যাদেরকে মহান আল্লাহ কাফির বলেছেন। যেমন ফেরাউন ও সামুদ জাতি। আর ইহুদি সম্প্রদায়ের সেসব লোক, যারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিল এবং তাঁকে এমনভাবে চিনেছিল, যেমনভাবে তারা নিজেদের সন্তানসন্ততিকে চিনত। অথচ তারা ছিল সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কাফিরদের অন্যতম। কাজেই ভালো আমল করে দুনিয়া কামনা করা—মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে মিলিত হতে পারে। কিন্তু যেই ইমান এর পেছনে অধরা রয়ে যায়, সেই ইমানের অধিকারীকে অবশ্যই স্বীয় আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সওয়াব কামনা করতে হয় (নচেৎ সে ইমানদার থাকতে পারে না)।”[250]

[250] মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া জাখিরাতুশ শাকিরিন,*** তাহকিক : ইসমায়িল বিন গাজি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩২২-৩২৩।

সুন্নাহর অনুসরণবিহীন ইমান

ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **“আর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া স্রেফ নিয়তসংবলিত কথা ও কাজও কোনো উপকারে আসবে না।”** অর্থাৎ, ইমানের কথা এবং কাজ কেবল সুন্নাহ অনুসারে করলেই তা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় বিবেচিত হয়। আমল সুন্নাহমাফিক না হলে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন না। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি বিলকুল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ না করে, বিলকুল নবিজির আনুগত্য না করে, তাহলে সে মুসলিম থাকবে না। কুরআনুল কারিমে এই মূলনীতির কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

“আপনি বলে দিন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ আপনি বলে দিন, ‘তোমরা আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।’ কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।”[251]

এ আয়াতের তাফসিরে **ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :**

«فَإِنْ تَوَلَّوْا أَيْ خَالَفُوا عَنْ أَمْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكافِرِينَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فِي الطَّرِيقَةِ كُفْرٌ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنِ اتَّصَفَ بِذَلِكَ، وَإِنِ

[251] সুরা আলে ইমরান ৩:৩১-৩২।

ادعى وزعم في نفسه أنه محب لِلَّهِ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ حَتَّى يُتَابِعَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ خَاتَمَ الرُّسُلِ وَرَسُولَ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإِنْسِ».

"*'কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।'* এ থেকে প্রমাণিত হয়, আদর্শের ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীত করা কুফরি। আর যে ব্যক্তি এমন গুণে গুণান্বিত, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। যদিও সে দাবি করে এবং নিজের ব্যাপারে এটা মনে করে যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে, এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করছে। যতক্ষণ না সে অনুসরণ করে সেই উম্মি (নিরক্ষর) নবিকে, যিনি হলেন সর্বশেষ রসুল—সমগ্র মানুষ ও জিন জাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল।"[252]

এজন্য সালাফগণ ইমানের পরিচয় দিতে যেয়ে *'সুন্নাহ অনুসরণের'* কথা উল্লেখ করেছেন। সালাফদের ইজমায়ি আকিদা বর্ণনা করার সময় **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ وَتَمَسُّكٌ بِالسُّنَّةِ».

"ইমান হলো কথা, কাজ, নিয়ত এবং সুন্নাহর অনুসরণ।"[253]

প্রখ্যাত তাবেয়ি **ইমাম হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.) বলেছেন :**

---

[252] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ২, পৃ. ২৭।

[253] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৩৫।

«لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بسنة».

“আমল ছাড়া কথা শুদ্ধ হয় না। নিয়ত ছাড়া কথা ও আমল শুদ্ধ হয় না। আর সুন্নাহ ছাড়া কথা, আমল ও নিয়ত—কোনোটাই শুদ্ধ হয় না।”[254]

স্বনামধন্য তাবে-তাবেয়ি **ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেছেন :**

«لَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْقَوْلِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ وَالْقَوْلُ إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ».

“কথা (মৌখিক স্বীকৃতি) ছাড়া ইমান সঠিক হয় না। আমল ছাড়া ইমান ও মৌখিক স্বীকৃতি সঠিক হয় না। আর নিয়ত এবং সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্য ছাড়া সঠিক হয় না—ইমান, মৌখিক স্বীকৃতি ও আমল।”[255]

সালাফদের ইজমা বর্ণনা করে খ্যাতনামা তাবে-তাবেয়ি **ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) বলেছেন :**

«كَانَ الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ».

“ফাকিহগণ বলতেন, আমল ছাড়া কথা সঠিক হয় না। নিয়ত ছাড়া কথা ও আমল সঠিক হয় না। আর সুন্নাহর সামঞ্জস্য ছাড়া কথা, আমল ও নিয়ত—কোনোটাই সঠিক হয় না।”[256]

---

[254] আল-কিরমানি, ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি,*** খ. ৩, পৃ. ৯৯১।

[255] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ২, পৃ. ৮০৭; লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ৯৫৬; আবু নুআইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আসবাহানি, ***হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*** (মিশর : মাতবাআতুস সাআদাহ, প্র. ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৪৩।

[256] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ১, পৃ. ৩৩৩, খ. ২, পৃ. ৮০৭।

সালাফদের যুগের বিদ্বানদের থেকেই তাঁদের ব্যক্তীকৃত ইমানের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়েছে। **বর্ণিত হয়েছে :**

«سُئِلَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التستري عَنْ الْإِيمَانِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ وَسُنَّةٌ لِأَنَّ الْإِيمَانَ إِذَا كَانَ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ فَهُوَ كُفْرٌ وَإِذَا كَانَ قَوْلًا وَعَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ فَهُوَ نِفَاقٌ وَإِذَا كَانَ قَوْلًا وَعَمَلًا وَنِيَّةً بِلَا سُنَّةٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ».

সাহল আত-তুসতারি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৮৩ হি.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ইমান কী?" তিনি বলেছিলেন, "ইমান হলো কথা, কাজ, নিয়ত ও সুন্নাহ। কারণ ইমান যদি হয় আমলবিহীন কথা, তবে সেটা কুফরি। ইমান যদি হয় নিয়তবিহীন কথা ও কাজ, তবে সেটা নিফাক। আর ইমান যদি হয় সুন্নাহবিহীন কথা, কাজ ও নিয়ত, তাহলে সেটা বিদাত।"[257]

মূলত *'কথা ও কাজের নাম ইমান'* বললেই তার মধ্যে *'সুন্নাহ অনুসরণের'* বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি না-ও বুঝে উঠতে পারে। সেজন্য সালাফগণ আলাদা করে ইমানের পরিচয়ে *'সুন্নাহ অনুসরণের'* কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وَمَنْ زَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ فَلِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَكُونُ مَحْبُوبًا لِلَّهِ إلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَأُولَئِكَ لَمْ يُرِيدُوا كُلَّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ إنَّمَا أَرَادُوا مَا كَانَ مَشْرُوعًا مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ».

"কোনো কোনো সালাফ *'সুন্নাহ অনুসরণের'* প্রসঙ্গ বাড়িয়ে উল্লেখ করেছেন। কারণ সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া এসবের

---

[257] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ২, পৃ. ৮১৩।

কোনোটিই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। *'ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি'*—বলে তাঁরা প্রত্যেক কথা ও কাজকে বোঝাননি। বরং তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন কেবল সেসব কথা ও কাজ, যা শরিয়তে নির্ধারিত হয়েছে।"[258]

[258] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমান,*** পৃ. ১৩৮; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ১৭১।

অধ্যায় ৩

সাহাবি বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ



وَالتَّرَحُّمُ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كُلِّهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر : ١٠] فَلَنْ يُؤْمِنَ إِلَّا بِالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করা। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে।"[259] বস্তুত তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করে কোনো ব্যক্তি কখনোই ইমানদার হতে পারবে না।

فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الفَيْءِ حَقٌّ.

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদেরকে গালি দেয়, কিংবা তাঁদের মর্যাদাহানি করে, অথবা তাঁদের কোনো একজনকে গালি দেয় বা তাঁর মর্যাদাহানি করে, সে সুন্নাহর ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। *'ফাই'* সম্পদের মধ্যে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

---

[259] সুরা হাশর ৫৯:১০।

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : «قسم اللَّهُ تَعَالَى الفَيءَ، فَقَالَ : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا﴾ [الحشر: ١٠]؛ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَهُمْ، فَلَيْسَ مِمَّنْ جُعِلَ لَهُ الفَيءَ».

আমাদেরকে একাধিক ব্যক্তি মালিক ইবনু আনাস থেকে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি (ইমাম মালিক) বলেছেন, "মহান আল্লাহ *'ফাই'* বণ্টন করেছেন এবং বলেছেন, '(এই *ফাই*) সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়েছে।'[260] এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে"।'[261] সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁদের জন্য উক্ত কথা বলে না, সে তাদের আওতাভুক্ত নয়, যাদের জন্য *'ফাই'* নির্ধারণ করা হয়েছে।"

[260] সুরা হাশর ৫৯:৮।

[261] সুরা হাশর ৫৯:১০।

ব্যাখ্যা



ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্নাহর তৃতীয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার একটি অন্যতম মূলনীতি হলো—সর্বদা সাহাবিগণকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করা, তাঁদের নিন্দা-সমালোচনা না করা এবং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁদেরকে প্রদান করা।

এজন্য আহলুস সুন্নাহর আবশ্যকীয় আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৬ হি.) বলেছেন :**

«وَأَلَّا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبْ».

“উত্তমরূপে উল্লেখ ব্যতিরেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের কারও কথা আলোচনা করা যাবে না। আর তাঁদের মধ্যে যেসব কলহ-বিবাদ ঘটেছে, সে ব্যাপারে নীরব থাকতে হবে। তাঁরাই মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ের সবচেয়ে হকদার—যাঁদের (কাজের) জন্য উত্তম ব্যাখ্যা খোঁজা উচিত এবং যাঁদের ব্যাপারে সর্বোত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত।”[262]

---

[262] আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি আল-মালিকি, ***আকিদাতুস সালাফ : মুকাদ্দিমাতু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি লি কিতাবিহি আর-রিসালা,*** তাহকিক : বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ (রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি), পৃ. ৬১।

সাহাবি কাকে বলে?

আভিধানিক অর্থ :

'সাহাবি' শব্দটি *'সাহাবা'* শব্দের একবচন (جمعُ الصَّحَابَة: صَاحِب)।[263] এটি আরবি *'সুহবাহ'* শব্দ থেকে এসেছে।[264] এর অর্থ—কোনো কিছুর সাথে মিলে থাকা, কোনো কিছুর নিকটে অবস্থান করা ইত্যাদি (مُقَارَنَةُ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتُهُ)।[265] সুতরাং *'সাহাবি'* শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—সঙ্গী, সাথী, সহচর (الملازم والمصاحب)।[266]

পারিভাষিক অর্থ :

শরিয়তের পরিভাষায় *'সাহাবি'* কাকে বলে, তা নিয়ে উলামাগণ অনেকগুলো মতে মতভেদ করেছেন।[267] আমরা এখানে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত উল্লেখ করছি। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, যিনি মুসলিম অবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন, তিনিই সাহাবি। অর্থাৎ, অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুযায়ী, মুমিন অবস্থায় নবিজি

---

[263] আবুস সাআদাত মুবারাক বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আসির আশ-শাইবানি, ***আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল আসার,*** তাহকিক : তাহির আহমাদ ও মাহমুদ মুহাম্মাদ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), ভুক্তি : صحب, খ. ৩, পৃ. ১২।

[264] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** ভুক্তি : حصف, খ. ৪, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

[265] ইবনু ফারিস, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** ভুক্তি : صحب, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫।

[266] আবুল কাসিম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-আসফাহানি, ***আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন,*** তাহকিক : সাফওয়ান আদনান আদ-দাউদি (দামেস্ক : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.), ভুক্তি : صحب, পৃ. ৪৭৫।

[267] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবি,*** খ. ২, পৃ. ৩৯৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হলেই তা সাহাবি হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) তাঁর *'উসুলুস সুন্নাহ'* পুস্তিকায় বলেছেন :

«ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِمْ، كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ».

"তাঁদের পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ। যাঁরা হলেন সেই যুগের মানুষ, যাঁদের মধ্যে নবিজিকে পাঠানো হয়েছিল। যে ব্যক্তিই নবিজির সাহচর্য লাভ করেছেন এক বছর, অথবা এক মাস, অথবা এক দিন, অথবা এক ক্ষণিক সময়কাল; কিংবা শুধু নবিজিকে দেখেছেন—তিনিই তাঁর সাহাবিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।"[268]

'সহিহুল বুখারি' গ্রন্থে **ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন :**

«وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ».

"মুসলিমদের মধ্যে যিনিই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, কিংবা তাঁকে দেখেছেন, তিনিই তাঁর সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত।"[269]

সাহাবির পরিচয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ آمَنَ بِهِ وَرَآهُ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ».

---

[268] আহমাদ বিন হাম্বাল, ***উসুলুস সুন্নাহ,*** পৃ. ৪০।

[269] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি, ***আস-সহিহ আল-জামি,*** পরিশীলন : মুহাম্মাদ আজ-জুহাইর আন-নাসির (বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), খ. ৫, পৃ. ২।

“যিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমান এনেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন, তিনিই তাঁর সাহাবিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।”[270]

হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন :

«أَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ».

“এ ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বিশুদ্ধ যেই বক্তব্য জেনেছি, সেটা হলো—যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমানরত অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থাতেই মারা গেছেন, তিনি হলেন সাহাবি।”[271]

সকল সাহাবির জন্য দোয়া করা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করা।”** অর্থাৎ, সকল সাহাবির জন্য দোয়া করা, রহমত কামনা করা সুন্নাহর অন্যতম মূলনীতি এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শ। সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম আবু উসমান আস-সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন :**

---

[270] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ৮, পৃ. ৩৮৯।

[271] আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা,*** তাহকিক : আদিল আহমাদ ও আলি মুহাম্মাদ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

«ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم».

“তাঁরা মনে করেন, সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করতে হবে এবং তাঁদের সবার প্রতি মিত্রতা পোষণ করতে হবে (তাঁদেরকে ভালোবেসে তাঁদের পক্ষ নিতে হবে)।”[272]

সাহাবিগণের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা এবং তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার আদর্শ কুরআনে বিবৃত হয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا **اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا** الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

“আর যারা তাদের (অগ্রগামী সাহাবিবর্গের) পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব, **আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও**—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি পরম সহানুভূতিশীল, **অশেষ দয়ালু।**’”[273]

সকল সাহাবির জন্য *‘রাদিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)’* বলতে সচেষ্ট থাকা—তাঁদের জন্য রহমতকামনা ও ক্ষমাপ্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ। মুসলিমদের উচিত সকল সাহাবির জন্য

---

[272] আবু উসমান ইসমায়িল বিন আব্দুর রহমান আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস,*** তাহকিক : নাসির বিন আব্দুর রহমান আল-জুদাই (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৯৪।

[273] সুরা হাশর ৫৯:১০।

'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বলে দোয়া করা এবং তাঁদের সবাইকে ভালোবাসা।[274]

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ আলোচনা করেছেন—কেন সাহাবিগণের জন্য রহমতের দোয়া করা জরুরি। তিনি বলেছেন, ***"কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে"।'"***

এই আয়াতে সাহাবিগণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতটির তাফসির করতে যেয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ি তাফসিরকারক **ইমাম কাতাদা বিন দিআমা আস-সাদুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.) বলেছেন :**

«إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِسَبِّهِمْ».

"লোকদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্য কেবল ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; তাঁদেরকে গালিগালাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"[275]

এজন্য **আম্মিজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে মিশরবাসীদের কথাবার্তা, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে শামবাসী ও বনু উমাইয়ার কথাবার্তা এবং আমভাবে সাহাবিবর্গের ব্যাপারে খারেজিদের কথাবার্তা

---

[274] সালিহ বিন আব্দুল আজিজ সিন্ধি, ***শারহু আকিদাতিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস*** (ই-বুক, দারসের ট্রান্সক্রিপ্ট, তাবি), খ. ২, পৃ. ২৫১।

[275] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ২২, পৃ. ৫৩৩।

শুনেছিলেন,[276] তখন **তিনি উরওয়া রাহিমাহুল্লাহর উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন :**

«يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا، لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَبُّوهُمْ».

“হে ভাগ্নে, লোকদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তাঁদেরকে গালিগালাজ করেছে।”[277]

আরও বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ قَدْ أَمَرَنَا بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ».

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে গালি দিয়ো না। কেননা মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ মহান আল্লাহ জানতেন যে, তাঁরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবেন।”[278]

সুতরাং সাহাবিগণের জন্য আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার। সাহাবিগণের প্রাপ্য অধিকারগুলো তাঁদেরকে প্রদান করা—এই উম্মতের অপরিহার্য দায়িত্ব। **এ মর্মে শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন :**

---

[276] কাদি ইয়াদ বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি, ***ইকমালুল মুলিম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম,*** তাহকিক : ইয়াহইয়া ইসমায়িল (মিশর : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫৮৩।

[277] সহিহ মুসলিম, হা. ৩০২২।

[278] লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩২৪; ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ২২।

«فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة:

١ - محبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان.

٢ - الترحم عليهم، والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .

٣ - الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي» . الحديث».

“এই উম্মতের ওপর সাহাবিগণের যেসব অধিকার রয়েছে, সেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সাহাবিগণের ব্যাপারে উম্মতের ওপর কর্তব্য হলো—

১. সাহাবিগণ যেসব কল্যাণ ও উপকার পৌঁছে দিয়েছেন, সেসবের জন্য অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং মুখে তাঁদের প্রশংসা করা।

২. সাহাবিগণের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা এবং তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা; মহান আল্লাহর এই বাণী বাস্তবায়ন করে—‘আর যারা তাদের (অগ্রগামী সাহাবিবর্গের) পরে এসেছে, তারা বলে, “হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি পরম সহানুভূতিশীল, অশেষ দয়ালু।”’ (*সুরা হাশর : ১০*)

৩. সাহাবিগণের কারও তরফ থেকে ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশিত হলে, সে বিষয়ে নিন্দা-সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা। যদিও সাহাবিগণের সেসব ত্রুটি তাঁদের অসংখ্য মর্যাদা ও মহৎ কৃতিত্বের তুলনায় খুবই নগণ্য। আর অনেক সময় সেসব ত্রুটি তাঁদের ইজতিহাদ তথা শরয়ি গবেষণার কারণেও হতে পারে; যে ইজতিহাদের ভুল ক্ষমা করা হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে)। অথবা তাঁদের সেসব ত্রুটি এমন কোনো কাজের ফলেও হতে পারে, যেই কাজের জন্য তাঁরা ওজর পাবেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *'তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না'।"*[279]

এরপর ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"বস্তুত তাঁদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করে কোনো ব্যক্তি কখনোই ইমানদার হতে পারবে না।"** অর্থাৎ, সাহাবিগণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করে কেউ ইমানদার হতে পারবে না। কেননা মুমিনদের স্তর তিনটি— (১) মুজাহির সাহাবিগণ, (২) আনসার সাহাবিগণ, (৩) তাঁদের পরে আগত মুসলিমগণ। যারা তিন স্তরের কোনো একটারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি, তারা ইমানদার নয়।

উক্ত তিন স্তরের ব্যাখ্যা দিয়ে **সাইয়্যিদুনা সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :**

«النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ، فَمَضَتْ مَنْزِلَتَانِ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا عَلَى الَّتِي بَقِيَتْ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ

---

[279] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***তালিকুন মুখতাসার আলা কিতাবি লুমআতিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ (রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৫১; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল,*** বিন্যাস ও সংকলন : ফাহাদ বিন নাসির আস-সুলাইমান (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, প্র. ১৪১৩ হি.), খ. ৫, পৃ. ৮৩।

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الحشر: ٨] هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ، وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾، قَالَ: وَهَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ قَدْ مَضَتْ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، قَدْ مَضَتْ هَاتَانِ، وَبَقِيَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ بَقِيَتْ، يَقُولُ: أَنْ تَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ».

“মানুষ তিনটি স্তরে বিভক্ত। এর মধ্যে দুটো স্তর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর একটি বাকি রয়ে গেছে। এখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থা হলো—সেই অবশিষ্ট স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—‘যেই দরিদ্র মুহাজিরদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে (তাদের জন্য বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদের অংশ রয়েছে) ...।’ (*সুরা হাশর : ৮*) এঁরা হলেন মুহাজিরগণ, আর এটি একটি স্তর।

এরপর তিনি পাঠ করলেন—‘আর যারা তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) আগে থেকেই এই মদিনাকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইমান গ্রহণ করেছে, তারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে। এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, সেজন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো হিংসা অনুভব করে

না। আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।' (*সুরা হাশর :* ৯) এঁরা হলেন আনসার, আর এটি একটি স্তর, যা ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এরপর তিনি পাঠ করলেন, 'আর যারা তাদের (অগ্রগামী সাহাবিবর্গের) পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, **আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও—**যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি পরম সহানুভূতিশীল, **অশেষ দয়ালু।**"' (*সুরা হাশর :* ১০)

ওই দুটো স্তর ইতোমধ্যে অতীত হয়েছে, আর এই স্তরটি বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং, এখন তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থা হলো সেই অবশিষ্ট স্তরে থাকা। অর্থাৎ, তাঁদের (সাহাবিগণের) জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা।"[280]

সুতরাং যারা সাহাবিগণকে গালিগালাজ করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে, কিংবা গুটিকয়েক সাহাবি ব্যতিরেকে সবাইকে কাফির ঘোষণা দিয়েছে, তারা মুমিনদের তৃতীয় স্তরের আওতাভুক্ত নয়। তারা ইমানদার হতে পারেনি। তারা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত—কাফির। নাউজুবিল্লাহি মিনাল খিজলান।

---

[280] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবুরি, ***আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন,*** তাহকিক : মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতা (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), হা. ৩৮০০, খ. ২, পৃ. ৫২৬; লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩২৪; বর্ণনার মান : হাকিম ও জাহাবি হাদিসটিকে *'সহিহ'* বলেছেন।

কোনো সাহাবিকে গালিগালাজ না করা

কোনো সাহাবিকেই গালিগালাজ না করা—আহলুস সুন্নাহর আকিদার মূলনীতি। ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদেরকে গালি দেয়, কিংবা তাঁদের মর্যাদাহানি করে, অথবা তাঁদের কোনো একজনকে গালি দেয় বা তাঁর মর্যাদাহানি করে, সে সুন্নাহর ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।"** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবিকেও গালি দেয়, বা তাঁর ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করে, সে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। সে একজন পথভ্রষ্ট বিদাতি। সাহাবিগণকে গালিগালাজ করার ব্যাপারে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গালি কাকে বলে?

আমরা অনেক সময় ভুলবশত মনে করি, গালি মানে স্রেফ প্রচলিত কিছু অশ্লীল শব্দ। এই ভুল ধারণার কারণে যখন বলা হয়, *'অমুক আমাদের নবিজিকে গালি দিয়েছে,'* তখন কেউ কেউ বলে বসে, *'সে তো গালি দেয়নি!'* অথচ বাস্তবে সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করেছে, যেটা *'গালি'* হিসেবে বিবেচিত। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ইঙ্গিতে সমালোচনা করলেও সেটা *'গালি'* হিসেবে পরিগণিত হবে।

হাদিসে স্পষ্টভাবে সাহাবিগণকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। *'গালি'* শব্দের জন্য হাদিসে যেই আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হলো—'সাব্ব (السب)'। **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ».

“তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না।”[281]

আমরা এখন বিখ্যাত আরবি ভাষাবিজ্ঞানীদের থেকে জানার চেষ্টা করব, আরবিতে *‘সাব্ব’* বলতে কী বোঝায়। খ্যাতনামা আরবি ভাষাবিদ **ইমাম আবু মানসুর আল-আজহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন :**

«وَقَالَ الْفراء: السَّبّ القَطَع وأَنشَد:

وَمَا كَانَ ذنبُ بني مالكٍ * بأَنْ سُبّ منهمْ غُلامٌ فسَبْ

عرَاقيبَ كُومٍ طِوالِ الذُّرَى * تخرُّ بَوائكُها للرُّكَبْ.

قَالَ: أَرَادَ بقوله: (سُبَّ)، أَي: عُيِّر بالبُخْل فسَبَّ عَراقبَ إبِلِه أَنَفةً ممّا عُيِّر بِهِ».

“আল-ফার্রা (মৃ. ২০৭ হি.) বলেছেন, *‘সাব্ব’* মানে—কর্তন করা, ছিন্ন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন—

‘বনু মালিকের কী অপরাধ ছিল যে, তাদের এক তরুণকে *“সাব্ব (নিন্দা)”* করা হলো? অতঃপর সেই তরুণ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে একপাল উটের গোড়ালি *“সাব্ব করল (কেটে দিল)”*। যেসব উট ছিল উচ্চ কুঁজওয়ালা। ফলে বিশালদেহী মাংসল উটগুলো লুটিয়ে পড়ল নতজানু হয়ে।’

ফার্রা এই কবিতার ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘কবিতায় যে *“সুব্বা”* শব্দটি এসেছে, এর মানে হলো—ওই তরুণকে কৃপণতার কথা তুলে *“নিন্দা”* করা হয়েছিল। তাই সে আত্মগরিমায় নিজের উটগুলোর গোড়ালি কেটে দেয়। যেন বুঝাতে পারে, যে ব্যাপারে তাকে নিন্দা করা হয়েছিল, তা সে প্রত্যাখ্যান করছে।’”[282]

---

[281] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪০।

[282] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** খ. ১২, পৃ. ২১৯।

ধ্রুপদী ভাষাবিজ্ঞানী আল-ফার্রার বক্তব্যে আমরা দেখতে পেলাম, কৃপণতার অভিযোগে কাউকে অভিযুক্ত করাও গালি। আরও দেখতে পেলাম, *'সাব্ব'* নামে—নিন্দা, সমালোচনা, তিরস্কার (التعيير)।

বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ **মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৬৬ হি.) বলেছেন :**

«س ب ب: (السَّبُّ) الشَّتْمُ وَالْقَطْعُ وَالطَّعْنُ».

"*'সাব্ব'* মানে গালি দেওয়া, কর্তন করা, নিন্দা করা।"[283]

'সাব্ব' শব্দের পরিচয় দিতে যেয়ে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه».

"*'সাব্ব'* বলতে বোঝায়—এমন কথা, যার উদ্দেশ্য হয় মর্যাদাহানি করা এবং হেয় করা। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস সত্ত্বেও, তাদের বোধগম্যতায় যেটাকে *'গালি'* বলে মনে হয়, সেটাই সাব্ব; যেমন লানত করা, কারও মন্দত্ব বর্ণনা করা ইত্যাদি।"[284]

বাংলা ভাষাতেও *'গালি'* শব্দ দ্বারা এসব অর্থ বোঝায়। বাংলা একাডেমীর ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে* বলা হয়েছে,** "গালি [গালি]

---

[283] মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর আর-রাজি, ***মুখতারুস সিহাহ,*** তাহকিক : ইউসুফ আশ-শাইখ মুহাম্মাদ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ৫ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪০।

[284] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রসুল,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ (সৌদি আরব : সৌদিয়ান ন্যাশনাল সিকিউরিটি, তাবি), পৃ. ৫৬১।

(*বিশেষ্য*) **১** কটুবাক্য। **২** ভর্ৎসনাপূর্ণ বাক্য; ভর্ৎসনা। **৩** অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ; অশিষ্ট বাক্য।"[285]

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম, *'সাব্ব'* তথা *'গালি'* মানে—নিন্দা, তিরস্কার (ভর্ৎসনা), মর্যাদাহানিকর কথা, কটুবাক্য, অশিষ্ট বাক্য ইত্যাদি। এগুলোর সবই *'গালি'* অভিধার আওতাভুক্ত।

সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার ভয়াবহতা :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার ভয়াবহতা বিষয়ে ইসলামি শরিয়তে এত আলোচনা আছে যে, তা থেকে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করা সম্ভব। আমরা এখানে ভয়াবহতার কয়েকটি দিক আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম দিক :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নিষেধের লঙ্ঘন। **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ».

"তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ যদি এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করে, তবুও তা তাদের কারও এক মুদ (মধ্যম মাপের দু হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছবে না।"[286]

---

[285] বাংলা একাডেমী, ***বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ), ভুক্তি : গালি, পৃ. ৩৫৬।

[286] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪০ ও ২৫৪১।

কেউ যেন না ভাবে, “একজন সাহাবিকে গালি দিলে অসুবিধা নেই! আমি তো আর সবাইকে গালি দিচ্ছি না!” মনে রাখতে হবে, উক্ত হাদিস কেবল একজন সাহাবির নিন্দা করার ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছিল। বিখ্যাত সাহাবি আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেওয়ার প্রেক্ষিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটি বলেছিলেন।[287]

দ্বিতীয় দিক :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়া—আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণ। **হাদিসে এসেছে :**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদের গালি দেয়, তার ওপর আল্লাহর লানত এবং ফেরেশতাবর্গ ও সমগ্র মানবজাতির লানত।”[288]

হাদিসে আরও এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي».

---

[287] সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪১।

[288] আত-তাবারানি, ***আল-মুজামুল কাবির,*** হা. ১২৭০৯, বর্ণনার মান : আল-আলবানি হাদিসটিকে *‘হাসান’* বলেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদের গালি দেয়, আল্লাহ তাকে লানত করেন।"[289]

শরিয়তে *'লানত'* মানে—আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন (الطرد والإبعاد من رحمة الله)।[290] ফলে *'আল্লাহ লানত করেছেন'* বললে সেটার অর্থ দাঁড়ায়—আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন। আর *'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো লানতকারী লানত করেছেন'* বললে সেটার অর্থ দাঁড়ায়—তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করেন।[291]

তৃতীয় দিক :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়া মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শামিল। কারণ সাহাবিগণ হলেন আল্লাহর অলি। আর আল্লাহর অলিদের ব্যাপারে **হাদিসে বলা হয়েছে :**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَالَ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ».

---

[289] আত-তাবারানি, ***আল-মুজামুল কাবির,*** হা. ১৩৫৮৮, বর্ণনার মান : আল-আলবানি *'হাসান'* বলেছেন।

[290] আবু মুহাম্মাদ সাহল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারি, ***তাফসিরুত তুসতারি,*** সংকলক : আবু বাকর মুহাম্মাদ আল-বালাদি, তাহকিক : মুহাম্মাদ বাসিল (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৩৩; আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি ইবনুল জাওজি আল-হাম্বালি, ***জাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির,*** তাহকিক : আব্দুর রাজ্জাক আল-মাহদি (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৫২৭।

[291] নাজমুদ্দিন উমার বিন মুহাম্মাদ আন-নাসাফি, ***আত-তাইসির ফিত তাফসির,*** তাহকিক : মাহির আদিব হাবুশ (ইস্তাম্বুল : দারুল লুবাব লিদ্দিরাসাত ওয়া তাহকিকিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার কোনো অলির সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।"[292] অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কোনো একজন অলিকেও ক্রোধান্বিত করে এবং কষ্ট দেয়, আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব।[293]

যাঁরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছেন, আল্লাহকে ভয় করে চলেন, তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাঁরা সবাই আল্লাহর অলি। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুত্তাকি মুমিন বান্দাই আল্লাহর অলি।[294] **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

"জেনে রেখ, আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নেই, এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (অলি হলো সেসব ব্যক্তি) যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।"[295]

আর ইমান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন সাহাবিগণ।[296] মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবিদের মতো ইমান

---

[292] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫০২।

[293] হুসাইন বিন মাহমুদ আল-মুজহিরি, ***আল-মাফাতিহ ফি শারহিল মাসাবিহ,*** তাহকিক : নুরুদ্দিন তালিবের তত্ত্বাবধানে গঠিত মুহাক্কিক-পর্ষদ (কুয়েত : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৬।

[294] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২, পৃ. ২২৪; ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৪, পৃ. ২৪২।

[295] সুরা ইউনুস ১০:৬২-৬৩।

[296] সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩; সহিহুল বুখারি, হা. ২৬৫২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

আনতে বলেছেন।[297] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে সর্বোত্তম মানুষ আখ্যা দিয়েছেন।[298] সাহাবিগণের অন্তর যে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত, সেই ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন।[299] মহান আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সাহাবিগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন; আর সাহাবিগণও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।[300]

এজন্য সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা হচ্ছে—প্রত্যেক সাহাবি হলেন ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।[301] কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাহাবিগণকে সার্টিফাই করেছেন ভালো মানুষ হিসেবে—যাঁদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের পরে আগত কোনো অলির মধ্যেই পাওয়া যায়নি। **তাইতো শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছিলেন :**

«وَبِالْجُمْلَةِ اتَّفَقَتْ طَوَائِفُ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَاحِدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ، وَلَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِ الصَّحَابَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَفْضَلُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُهُمْ مَعْرِفَةً بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعًا لَهُ؛ كَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ أَكْمَلُ الْأُمَّةِ فِي مَعْرِفَةِ دِينِهِ وَاتِّبَاعِهِ».

---

[297] সুরা বাকারা ২:১৩৭।

[298] সহিহুল বুখারি, হা. ২৬৫২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৩৩।

[299] সুরা হাশর ৫৯:৮-১০।

[300] সুরা তাওবা ৯:১০০।

[301] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ২২, পৃ. ৪৭; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ,*** পৃ. ২৯২।

“সামগ্রিকভাবে আহলুস সুন্নাহ ও শিয়া—উভয় দলই এ ব্যাপারে একমত যে, এই উম্মতের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশিদিনের কোনো একজন। সাহাবিগণের পরে আর কেউ সাহাবিগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ের জ্ঞান যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং নবিজির অনুসরণ যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি—তাঁরাই হলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অলি। যেমন সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন—পুরো উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ।”[302]

চতুর্থ দিক :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার পরিণতি—জাহান্নামের বিভৎস শাস্তি। যারা সাহাবিগণকে গালি দেয়, তারা মূলত সাহাবিগণের গিবত করে। আর গিবত সম্পর্কে **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾.

“তোমরা একে অপরের গিবত কোরো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুত

---

[302] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমানি ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান,*** তাহকিক : আব্দুল কাদির আল-আরনাউত (দামেস্ক : মাকতাবাতু দারিল বায়ান, প্র. ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৯২; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ২২৩।

তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা-কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[303]

গিবতকারীদের ব্যাপারে **হাদিসে এসেছে :**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ».

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে যখন মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যাদের নখগুলো ছিল তামার তৈরি। সেই নখ দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডল ও বুকে আচড় মারছিল। আমি বললাম, 'হে জিবরিল, এরা কারা?' তিনি জবাব দিলেন, 'এরা হলো সেসব লোক, যারা (গিবত করে) মানুষের মাংস খেতো এবং তাদের মানসম্মানে আক্রমণ করত'।"[304]

সাধারণ মানুষের গিবত করলেই এই বিভৎস শাস্তি দেওয়া হবে। তাহলে যারা সাহাবিগণের মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গিবত করে, তাদের শাস্তি কত ভয়ানক পারে?! আল্লাহুল মুস্তাআন। কেউ কেউ ভাবতে পারে, "আমি তো সাহাবিদের ব্যাপারে কিছু বানিয়ে বলছি না;

---

[303] সুরা হুজুরাত ৪৯:১২।

[304] আবু দাউদ, হা. ৪৮৭৮, বর্ণনার মান : সহিহ।

অমুক ইতিহাসের বই থেকে বর্ণনা করছি মাত্র!” তাদের জন্য আমরা বিশুদ্ধ হাদিস থেকে গিবতের সংজ্ঞা উল্লেখ করছি।

হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা কি জান, গিবত কাকে বলে?” সাহাবিগণ বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সবচেয়ে ভালো জানেন।” নবিজি বললেন, “তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, সেটা (তার অনুপস্থিতিতে) আলোচনা করা।” জিজ্ঞেস করা হলো, “আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?” (অর্থাৎ, সেটাও কি গিবত হবে?) নবিজি বললেন, “তুমি যা (সমালোচনা করে) বলছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তুমি তার গিবত করলে। পক্ষান্তরে তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।”[305]

[305] সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৮৯।

পঞ্চম দিক :

সাহাবিগণকে গালিদাতা গোষ্ঠী গালি দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট। প্রখ্যাত তাবেয়ি বিদ্বান **আমির বিন শারাহিল আশ-শাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৩ হি.) বলেছেন :**

«تَفَاضَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَلَى الرَّافِضَةِ بِخَصْلَةٍ سُئِلَتِ الْيَهُودُ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ، فَقَالَتْ أَصْحَابُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسُئِلَتِ النَّصَارَى مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ، فَقَالُوا: حَوَارِيُّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ، فَقَالُوا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أُمِرُوا بالاستغفار لهم فَسَبُّوهُمْ، فَالسَّيْفُ عَلَيْهِمْ مَسْلُولٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَقُومُ لَهُمْ رَايَةٌ وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ قَدَمٌ، وَلَا تَجْتَمِعُ لَهُمْ كَلِمَةٌ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ بِسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَتَفْرِيقِ شَمْلِهِمْ وَإِدْحَاضِ حُجَّتِهِمْ، أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ».

“ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একটি দিক থেকে রাফিদি শিয়াদের চেয়েও উত্তম। ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তোমাদের জাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে উত্তম?’ তারা বলল, ‘মুসা আলাইহিস সালামের সাহাবা (সঙ্গীবর্গ)।’ খ্রিষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তোমাদের জাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে উত্তম?’ তারা বলল, ‘ইসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিগণ (সঙ্গীবর্গ)।’ আর এই উম্মতের রাফিদি শিয়াদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তোমাদের জাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট?’ তারা বলল, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ!’ অথচ তাদেরকে সাহাবিদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা উল্টো তাঁদেরকেই গালি

দিল। তাই রাফিদি শিয়াদের বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত তরবারি উন্মুক্ত থাকবে। তাদের কোনো বিজয়নিশান প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাদের পা দৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে না, তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অটুট থাকবে না। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে, মহান আল্লাহ তা নিভিয়ে দেবেন—তাদেরই রক্তপাতের মাধ্যমে, এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে এবং তাদের যুক্তিপ্রমাণকে বাতিল সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে ভ্রষ্টকারী বিদাতসমূহ থেকে রক্ষা করুন।"[306]

[306] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ৫, পৃ. ৬১; ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ২৭ ও ৩৩; ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭।

সাহাবিগণকে গালিদাতার ব্যাপারে সালাফদের অবস্থান :

সাহাবিগণকে যারা গালি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ শক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গালিদাতার শাস্তি ও শরয়ি হুকুম প্রকাশ করেছিলেন। আমরা তাঁদের এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

১. প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ شَتَمَ أبا بَكْرٍ الصِدِّيْقَ رضي الله عنه فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ، وأَبَاحَ دَمَه».

“যে ব্যক্তি আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়েছে, সে নিজের দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত (মুরতাদ) হয়ে গেছে, এবং নিজের রক্তকেও হালাল করে ফেলেছে।”[307]

২. বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ি বিদ্বান **ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন :**

«الَّذِي يَشْتُمُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ أَوْ قَالَ: نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ».

“যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে গালি দেয়, ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশ নেই।”[308]

৩. ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭৯ হি.) আরও বলেছেন :

---

[307] আবু আব্দুল্লাহ উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু বাত্তাহ আল-উকবারি, ***আশ-শারহু ওয়াল ইবানা আলা উসুলিস সুন্নাতি ওয়াদ দিয়ানা,*** তাহকিক : আদিল বিন আব্দুল্লাহ আলু হামদান (বৈরুত : শারিকাতু দারিল লুলুআ, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪৪ হি./২০২২ খ্রি.), পৃ. ১২৬।

[308] ইবনু বাত্তাহ, ***আশ-শারহু ওয়াল ইবানা,*** পৃ. ১২৫।

«وَمَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ أَوْ عَلِيًّا أَوْ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَإِنْ قَالَ: كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، وَإِنْ شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِنْ مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا».

"যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবিকে গালি দেয়; যেমন আবু বকর, ওমর, উসমান, আলি, মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সে যদি বলে, *'তারা কুফর ও ভ্রষ্টতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল,'* তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু সে যদি এগুলো না বলে সাধারণ মানুষদের মধ্যকার গালিগালাজের মতো গালি দেয়, তাহলে তাকে কঠোরভাবে শাস্তি দিতে হবে।"[309]

৪. ইমাম ইবনু বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.) তাঁর আকিদার কিতাবে বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ি ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৯৮ হি.) উক্তি বর্ণনা করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

«قال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت، قال: من جنازة فلان ابن فلان، قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله تعالى، ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله ﷺ فاتبعت جنازته».

"সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' লোকটি বললেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের জানাজা থেকে।' সুফইয়ান বললেন, 'আমি তোমাকে আর কোনো হাদিস শেখাব না। তুমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তুমি আর এমন কাজ কোরো না। তুমি এমন ব্যক্তির দিকে

---

[309] আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি, ***আন-নাওয়াদির ওয়াজ জিয়াদাত আলা মা ফিল মুদাওয়্যানাতি মিন গইরিহা মিনাল উম্মাহাত,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হাজ্জি (বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ৫৩১।

তাকিয়েছ, যে কিনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত; এবং তুমি তার জানাজাতেও গিয়েছ!'"[310]

৫. ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :

أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيُّ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: كَافِرٌ، قَالَ: فَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَهُو يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: «لَا تَمَسُّوهُ بِأَيْدِيكُمْ، ارْفَعُوهُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تُوَارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ».

"আমার কাছে হার্ব বিন ইসমায়িল আল-কিরমানি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে মুসা বিন হারুন বিন জিয়াদ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল-ফিরইয়াবি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২১২ হি.) বলতে শুনেছি, যখন তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, 'যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেয়, তার বিধান কী হবে?' তিনি বলেছিলেন, 'সে কাফির।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তার জানাজার নামাজ কি পড়া যাবে?' তিনি বললেন, 'না।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে তো *"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"* বলে! তাহলে তার সাথে কী করা হবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না। বরং কাঠ দিয়ে তুলে তার জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে নিয়ে যেয়ে তাকে সেখানে ঢেকে রেখে আসবে।'"[311]

---

[310] ইবনু বাত্তাহ, ***আশ-শারহু ওয়াল ইবানা,*** পৃ. ১২০।

[311] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৯৯।

৬. ইমাম বিশর ইবনুল হারিস আল-হাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৭ হি.) বলেছেন :

«مَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَهُوَ كَافِرٌ و إِنْ صَامَ وصَلَّى وزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ».

"যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে গালি দেয়, সে কাফির—যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে '*মুসলিম*' বলে দাবি করে।"[312]

৭. সালাফদের যুগের বিশিষ্ট ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، أَو أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ : **كَانَ مبتدعا،** حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا».

"যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো একজন সাহাবিরও মর্যাদাহানি করে, কিংবা সাহাবি কর্তৃক সংঘটিত কোনো ঘটনার কারণে তাঁকে অপছন্দ করে, অথবা তাঁর দোষত্রুটি আলোচনা করে, **সে ব্যক্তি বিদাতি হয়ে যায়;** যতক্ষণ না সে সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করছে এবং তাঁদের সবার ব্যাপারে তার অন্তর বিদ্বেষমুক্ত হচ্ছে (ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিদাতি হিসেবে বিবেচিত হবে)।"[313]

একই কথা বলেছেন সালাফদের যুগের আরেক ইমাম আলি ইবনুল মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.)।[314]

---

[312] ইবনু বাত্তাহ, ***আশ-শারহু ওয়াল ইবানা,*** পৃ. ১২৬।

[313] আহমাদ বিন হাম্বাল, ***উসুলুস সুন্নাহ,*** পৃ. ৫৪।

[314] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৯০।

৮. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«إِذَا رَأَيْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسُوءٍ فاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ».

"তুমি যখন দেখবে, কোনো ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবি সম্পর্কে মন্দ কথা বলছে, তখন তুমি সেই লোকের ইসলাম সম্পর্কেই সন্দেহ করবে।"[315] অর্থাৎ, তার মুসলমানিত্ব নিয়ে তুমি সন্দেহ কোরো। কারণ তার কাফির হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৯. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

«مَنْ شَتَمَ أَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مِثْلَ الرَّوَافِضِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَرَقَ عَنِ الدِّينِ».

"যে ব্যক্তি (সাহাবিদের) গালি দেয়, তার ব্যাপারে আমি রাফিদি শিয়াদের মতো *'কাফির হওয়ার'* আশঙ্কা করি।" এরপর ইমাম আহমাদ আরও বলেন, "যে লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের গালি দেয়, তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি না যে, সে নিজের দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়নি!"[316]

১০. ইমাম ইসহাক বিন ইবরাহিম ইবনু হানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন :

«وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلى خلفه؟ قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة».

"যে ব্যক্তি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেয়, তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদকে (মৃ. ২৪১ হি.) জিজ্ঞেসা করা হলো, 'তার

---

[315] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩২৬।

[316] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৯৩।

পেছনে কি নামাজ পড়া যাবে?' তিনি জবাব দিলেন, 'তার পেছনে নামাজ পড়া যাবে না; এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই'।"[317]

১১. ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ سِنْدِيٍّ قَرَابَةَ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ قَالَ: كُنْتُ، أَوْ حَضَرْتُ، أَوْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لِي خَالٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يَنْتَقِصُ مُعَاوِيَةَ، وَرُبَّمَا أَكَلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُبَادِرًا: «لَا تَأْكُلْ مَعَهُ».

"আমার কাছে মুহাম্মাদ বিন মুসা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইবরাহিম আল-হারবির আত্মীয় আবু বাকর বিন সিন্দিকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে** বলতে শুনেছি, যখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আমার মামা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদাহানি করে। আমি কখনো কখনো তাঁর সাথে একত্রে আহার করি।' আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) তাকে তড়িৎ জবাব দিয়ে বললেন, 'তুমি তার সাথে আহার কোরো না'।"[318]

১২. ইমাম আবু বাকর আল-খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: وَجَّهْنَا رُقْعَةً إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ فِيمَنْ قَالَ: «لَا أَقُولُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ

---

[317] ইসহাক বিন ইবরাহিম ইবনু হানি আন-নাইসাবুরি, ***মাসায়িলু আহমাদ ইবনি হাম্বাল রিওয়াইয়াতু ইবনি হানি,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আলি আল-আজহারি (কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৯৩।

[318] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৪৪৮।

كَاتَبُ الْوَحْيِ، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، **فَإِنَّهُ أَخَذَهَا بِالسَّيْفِ غَصْبًا؟**» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا قَوْلُ سَوْءٍ رَدِيءٌ، يُجَانَبُونَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا يُجَالَسُونَ، وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ».

মুহাম্মাদ ইবনু আবি হারুন ও মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবুল হারিস রাহিমাহুল্লাহ তাঁদেরকে বলেছেন, আমরা **আবু আব্দুল্লাহর (ইমাম আহমাদের)** কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, যার মধ্যে বলা হয়েছিল, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? যারা বলে, "আমি মুয়াবিয়াকে *'ওহি-লেখক'* বলি না এবং তাঁকে *'মুমিনদের মাতুল'*-ও বলি না। **কেননা তিনি তরবারি দিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখল করেছেন!"'** আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) জবাবে বলেছেন, 'এটা একটা নিকৃষ্ট ও মন্দ কথা। ওই সম্প্রদায়কে বর্জন করতে হবে। ওদের সাথে ওঠাবসা করা যাবে না। আর আমরা জনসাধারণের কাছে তাদের বিষয়টি (তাদের ভ্রান্তি) প্রকাশ করে দিব।"[319]

জ্ঞাতব্য যে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোন আম্মিজান উম্মু হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। নবিজির স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মু হাবিবা হলেন মুমিনদের মাতা, আর উম্মু হাবিবার ভাই মুয়াবিয়া হলেন মুমিনদের মাতুল (মামা)। **ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :**

«وَهَلْ يُقَالُ لِمُعَاوِيَةَ وَأَمْثَالِهِ خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء ﷺ، ونص الشافعي ﷺ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ».

[319] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৪৩৪।

“মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিদেরকে *‘মুমিনদের মামা’* বলা যাবে কিনা—সে ব্যাপারে উলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যে দুটি মত আছে। ইমাম শাফিয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু[320] স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘এটা বলা যাবে’।”[321]

১৩. ইমাম হারুন আল-হাম্মাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৩ হি.) বলেছেন :

«سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبلٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّ هَهُنَا رَجُلٌ يُفَضِّلُ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيْزِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَال أَحْمَدُ: لَا تُجَالِسُهُ، وَلَا تُؤَاكِلُهُ وَلَا تُشَارِبُهُ، وَ إِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ».

“আমি আহমাদ বিন হাম্বালকে বলতে শুনেছি, যখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলছিলেন, ‘হে আবু আব্দুল্লাহ, এখানে এক লোক বলে, (তাবেয়ি) উমার বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ—সাহাবি মুয়াবিয়া বিন আবু সুফইয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার চেয়ে উত্তম।’

---

[320] সাহাবিগণের জন্য ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ বলা যাবে; এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। পক্ষান্তরে সাহাবিগণ ব্যতীত অন্য মুসলিমদের জন্য *‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’* বলা যাবে কিনা—সে ব্যাপারে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। **হাফিজ নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন :**

> “সাহাবি, তাবেয়ি, ও তাঁদের পরবর্তী আলিম, ইবাদতগুজার ও অন্যান্য সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য *‘রাদিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন),’ ‘রাহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ তাকে রহম করুন)’* অথবা অনুরূপ দোয়ামূলক বাক্য বলা মুস্তাহাব তথা ভালো আমল। ... তবে কিছু আলিম বলেছেন, *‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’* কেবল সাহাবিদের জন্য বলতে হবে; আর অন্যদের জন্য কেবল *‘রাহিমাহুল্লাহ’* বলতে হবে। ... এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বানের মতই অগ্রগণ্য—উল্লিখিত সবার জন্যই এ ধরনের দোয়া করা মুস্তাহাব। এই মতের পক্ষে দলিলপ্রমাণ এতই বেশি যে, সবগুলো গণনা করা সম্ভব নয়।”

দ্রষ্টব্য : আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন বিন শারাফ আন-নাবাবি, ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব*** (কায়রো : ইদারাতুত তাবাআতিল মুনিরিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৪৪-১৩৪৭ হি.), খ. ৬, পৃ. ১৭৬।

[321] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৬, পৃ. ৩৪০।

তখন তিনি (ইমাম আহমাদ) বললেন, 'তুমি তার সাথে ওঠাবসা কোরো না, তার সাথে পানাহার কোরো না এবং সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেয়ো না'।"[322]

১৪. সালাফদের যুগের ইমামগণের বিশিষ্ট ছাত্র **ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন :**

«إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ».

"তুমি যখন দেখবে, কোনো ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবির সম্মানহানি করছে, তখন জেনে রাখবে, সে একজন জিন্দিক (ধর্মচ্যুত)।"[323]

১৫. সকল সালাফের ইজমায়ি আকিদা বর্ণনা করে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ، أَوْ نَقَّصَهُ، أَوْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ، أَوْ عَرَّضَ بِعَيْبِهِمْ، أَوْ عَابَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ دِقٍّ أَوْ جَلٍّ مِمَّا يَتَطَرَّقُ بِهِ إِلَى الْوَقِيْعَةِ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ **فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ، مُخَالِفٌ لَا قَبِلَ اللهُ صَرْفَهُ وَلَا عَدْلَهُ**».

"সুতরাং যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের মধ্যে কোনো একজনকে গালি দেয়, অথবা তাঁর সম্মানহানি করে, অথবা সাহাবিগণের নিন্দা-সমালোচনা করে, অথবা

---

[322] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজাব আল-হাম্বালি, ***জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আল-উসাইমিন (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০১।

[323] আবু বাকর আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি, ***আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াইয়া,*** পরিশীলন : আবু আব্দুল্লাহ আস-সাওরাকি (হায়দ্রাবাদ : জামইয়্যাতু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ৪৯।

তাঁদের কোনো দোষ ইঙ্গিতে উল্লেখ করে, কিংবা তাঁদের কারও প্রতি অল্প বা বেশি, ছোটো বা বড়ো—যে কোনো ত্রুটি আরোপ করে, যার মাধ্যমে তাঁদের কোনো একজনের নিন্দা-সমালোচনা করার সুযোগ তৈরি হয়; (যে লোক এসবের কোনো একটা কাজও করে) **সে একজন বিদাতি এবং নিকৃষ্ট রাফিদি শিয়া।** সে শরিয়তবিরোধী; যার ফরজ-নফল কোনো আমল আল্লাহ কবুল করবেন না।"[324]

অর্থাৎ, সকল সালাফ একমত—যে ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবিকেও গালি দেয়, সে নিকৃষ্ট বিদাতি।

[324] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৭০।

সাহাবিগণকে গালিদাতার বিস্তারিত বিধান

সাহাবিগণকে গালিগালাজ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।[325] কিন্তু সাহাবিগণকে গালিদাতার হুকুম একই স্তরভুক্ত নয়। বরং সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার অনেকগুলো স্তর ও প্রকার আছে। সাহাবিবর্গকে গালি দেওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকার আমরা নিম্নে আলোচনা করছি।

প্রথম প্রকার :

সাহাবিগণকে গালি দেওয়া হালাল মনে করা। যেই গালিদাতা হালাল মনে করে সাহাবিগণকে গালি দেয়, সে কাফির। কাদি আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[326]

দ্বিতীয় প্রকার :

সকল সাহাবিকে কিংবা অধিকাংশ সাহাবিকে এমনভাবে গালি দেওয়া, যার দরুন তাঁদের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যেমন তাঁদেরকে *'কাফির'* বলা, কিংবা *'ফাসিক'* বা *'পথভ্রষ্ট'* আখ্যা দেওয়া। এরূপ গালিদাতাও কাফির। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি দলিলপ্রমাণ সহকারে উল্লেখ করেছেন।[327]

---

[325] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৭০।

[326] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৬৯।

[327] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৮৭।

তৃতীয় প্রকার :

এমন কোনো সাহাবিকে গালি দেওয়া, যাঁর মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত এমন) পর্যায়ের দলিলপ্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরকম একজন সাহাবিকেও যদি কেউ গালি দেয়, যা থেকে তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে উক্ত গালিদাতা কাফির হয়ে যাবে। তবে এ বিষয়ে উলামাগণ ইখতিলাফ করেছেন। তথাপি যেই বিদ্বানগণ এই শ্রেণির গালিদাতাদেরকে *'কাফির'* বলেন না, তাঁরা সবাই একমত পোষণ করেছেন, এসব গালিদাতা ফাসিক (পাপাচার)।[328]

চতুর্থ প্রকার :

আম্মিজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহ যেই (ব্যভিচারের) অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, সেই অপবাদ আম্মিজান আয়িশার ওপর আরোপ করা সর্বসম্মতিক্রমে বড়ো কুফর। যে ব্যক্তি এই অপবাদ দেবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফিরে পরিণত হবে। কাদি আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[329]

পঞ্চম প্রকার :

আম্মিজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বাদে অন্য কোনো আম্মিজানকে তথা নবিজির স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া—আম্মিজান আয়িশাকে অপবাদ দেওয়ার মতো কিনা তা নিয়ে উলামাগণের মধ্যে দুটো মতে মতভেদ হয়েছে। যথা :

---

[328] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৭১; তাকিউদ্দিন আলি বিন আব্দুল কাফি আস-সুবকি, ***ফাতাওয়াস সুবকি*** (দারুল মাআরিফ, তাবি), খ. ২, পৃ. ৫৮০।

[329] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৭১।

প্রথম মত : অন্য সাহাবিগণকে গালি দেওয়ার যেই হুকুম, এটার ক্ষেত্রেও সেই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় মত : যে কোনো একজন আম্মিজানকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া আম্মিজান আয়িশাকে অপবাদ দেওয়ার মতোই বড়ো কুফর। কারণ এর ফলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করা হয়, তাঁর মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করা হয় এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এই মতটিকে *'অধিক বিশুদ্ধ'* বলে রায় দিয়েছেন।[330]

ষষ্ঠ প্রকার :

সাহাবিগণকে এমনভাবে গালি দেওয়া, যার ফলে তাঁদের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। যেমন সাহাবিদের কাউকে *'কৃপণ'* বলা, কিংবা *'কাপুরুষ'* বলা, অথবা *'কম জ্ঞানসম্পন্ন'* বলা, কিংবা *'দুনিয়াবিমুখ না'* আখ্যা দেওয়া। যে ব্যক্তি এ ধরনের গালি দেয়, সে কাফির নয়; তবে প্রহারের শাস্তি পাওয়ার হকদার।[331] আর সকল সালাফ একমত ছিলেন—যে কোনো একজন সাহাবিরও সম্মানহানি করা কিংবা যে কোনো একজন সাহাবিকেও গালি দেওয়া ব্যক্তি নিকৃষ্ট বিদাতি।[332]

---

[330] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৬৭।

[331] ইবনু তাইমিয়া, ***আস-সারিমুল মাসলুল,*** পৃ. ৫৮৬।

[332] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৭০।

সাহাবিগণকে গালিদাতা ‘ফাই’ সম্পদ পাবে না

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **“‘ফাই’ সম্পদের মধ্যে তার জন্য কোনো অংশ নেই।”** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবিকেও গালি দেয়, কিংবা তাঁর সম্মানহানি করে, সে ব্যক্তি ‘ফাই’ সম্পদ পাবে না।

আমরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় ‘ফাই’ পরিভাষাটি পড়েছি। এখন আমরা জানব, ‘ফাই’ সম্পদ বলতে আসলে কী বোঝায়। **যে সম্পদ কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধ ছাড়াই বৈধভাবে নেওয়া হয় (مَا أُخِذَ بحقٍّ بغيرِ قتالٍ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ)।** যেমন অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ধার্যকৃত ট্যাক্স, খারাজ তথা জমির কর, অমুসলিম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেওয়া নির্দিষ্ট লভ্যাংশ, ভয় পেয়ে অমুসলিমদের ফেলে যাওয়া সম্পদ, অথবা যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই এমন মৃত অমুসলিমের সম্পদ, আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশেরও এক-পঞ্চমাংশ। এসব সম্পদকে **‘ফাই (الفيء)’** বলা হয়।

‘ফাই’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। যেহেতু এই সম্পদ কাফিরদের থেকে মুসলিমদের হাতে আসে, তাই একে ‘ফাই’ বলা হয়। ‘ফাই’ সম্পদ মুসলিমদের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যয় করতে হয়। সবচেয়ে জরুরি কাজে আগে ব্যয় করতে হয়। যেমন ভাঙা বাঁধ মেরামত, খাল খনন, সেতু নির্মাণ, বিচারক ও অনুরূপ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বেতন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে,

তাহলে তা ধনী-গরীব নির্বিশেষে মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়।[333]

কিন্তু যে ব্যক্তি সাহাবিগণের সম্মানহানি করে, সে *'ফাই'* সম্পদ পাবে না। কেননা মহান আল্লাহ *'ফাই'* সম্পদের হকদারদের কথা বলার সময় তাদের বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন—তারা সাহাবিগণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও রহমতকামনা করে, এবং সাহাবিগণের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে না। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ * لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ * وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ * وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

"আল্লাহ এই জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে *'ফাই'* সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসুলের, রসুলের

---

[333] মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি, ***আর-রওদুল মুরবি বি শারহি জাদিল মুস্তাকনি,*** তাহকিক : খালিদ আল-মুশাইকিহ, আব্দুল আজিজ আল-ইদান ও আনাস আল-ইয়াতামা (কুয়েত : দারু রাকায়িজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৮ হি.), খ. ২, পৃ. ১৮২-১৮৩।

স্বজনদের এবং এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের প্রাপ্য; যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান শুধু তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তন না করে। আর রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। যেই দরিদ্র মুহাজিরদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করে (তাদের জন্য *'ফাই'* সম্পদের অংশ রয়েছে)। বস্তুত তারাই তো (নিজেদের ইমানের ক্ষেত্রে) সত্যপরায়ণ। আর যারা তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) আগে থেকেই এই মদিনাকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইমান গ্রহণ করেছে; যারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য নিজেদের অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় (তাদের জন্যও *'ফাই'* সম্পদের অংশ রয়েছে)। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে (তাদের জন্যও *'ফাই'* সম্পদের অংশ রয়েছে); যারা বলে, 'হে আমাদের রব, **আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও**—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি পরম সহানুভূতিশীল, অশেষ দয়ালু।"[334]

[334] সুরা হাশর ৫৯:৭-১০।

সুরা হাশরের এই আয়াতগুলোর তাফসিরে **ইমাম আবু ইসহাক আজ-জাজ্জাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :**

«مَن يَتَرَحَّمُ عَلى أصحابِ رَسولِ اللهِ ولَم يَكُن في قَلبِه غِلٌّ لهم أجمَعينَ، فلَهُ حَظٌّ في فيءِ المُسْلِمينَ، ومَن شَتَمَهم ولَم يَتَرَحَّمْ عليهِم أو كانَ في قَلبِه غِلٌّ لهم، فما جَعلَ اللهُ لهُ حَقًّا في شَيءٍ مِن فَيءِ المُسْلِمينَ. فهَذا نَصُّ الكِتابِ بَيِّنٌ».

"যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের জন্য রহমতের দোয়া করে এবং স্বীয় অন্তরে তাঁদের কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখে না, তার জন্য মুসলিমদের *'ফাই'* সম্পদে অংশ আছে। আর যে তাঁদেরকে গালি দেয়, তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করে না, অথবা অন্তরে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, মহান আল্লাহ তার জন্য মুসলিমদের *'ফাই'* সম্পদের কোনো অংশ নির্ধারণ করেননি। এটা কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য।"[335]

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কথার সমর্থনে সালাফদের যুগের ইমাম মালিক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৭৯ হি.) বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম হুমাইদি লিখেছেন :

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : «قسم اللهُ تَعَالَى الفَيءَ، فَقَالَ : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ﴾ [الحشر: ٨]، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾ [الحشر: ١٠]؛ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَهُمْ، فَلَيْسَ مِمَّنْ جُعِلَ لَهُ الفَيءَ».

---

[335] আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন সার্রি আজ-জাজ্জাজ, ***মাআনিল কুরআন ওয়া ইরাবুহু,*** তাহকিক : আব্দুল জালিল আব্দুহ (বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪৭।

আমাদেরকে একাধিক ব্যক্তি মালিক ইবনু আনাস থেকে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি (ইমাম মালিক) বলেছেন, "মহান আল্লাহ *'ফাই'* বণ্টন করেছেন এবং বলেছেন, '(এই *ফাই*) সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়েছে।' (*সুরা হাশর : ৮*) এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে"।' (*সুরা হাশর :* ১০) সুতরাং, যে ব্যক্তি তাঁদের জন্য উক্ত কথা বলে না, সে তাদের আওতাভুক্ত নয়, যাদের জন্য *'ফাই'* নির্ধারণ করা হয়েছে।"

আমরা ইতোমধ্যে *'ফাই'* সম্পদের অধিকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর বিস্তারিত নির্দেশনা জেনেছি। সেই নির্দেশনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ *'ফাই'* সম্পদের অধিকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তিন শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন। যথা :

এক. মুহাজির সাহাবিগণ; যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন।

দুই. আনসার সাহাবিগণ; যাঁরা আগে থেকেই মদিনার অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁদের মুহাজির ভাইদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

তিন. যাঁরা মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণের পরে অবশিষ্ট রয়ে গেছেন, এবং যাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবেন। সাহাবিগণের প্রতি যাঁদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই এবং যাঁরা সাহাবিগণের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করেন।[336]

---

[336] সুরা হাশর ৫৯:৭-১০।

যারা সাহাবিগণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে না, তারা *'ফাই'* সম্পদ পাবে না। কেননা তারা তিন শ্রেণির কোনো একটারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। এদের ব্যাপারেই ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ *'মান বিন ইসা'-র* সূত্রে বর্ণনা করেছেন, **ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন :**[337]

«مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ؛ يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ الْآيَةَ. هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ فَالْفَيْءُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ؛ فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ».

"যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে গালি দেয়, *'ফাই'* সম্পদে তার কোনো অধিকার নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যেই দরিদ্র মুহাজিরদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেন (তাদের জন্য *'ফাই'* সম্পদের অংশ রয়েছে)।' (*সুরা হাশর : ৮*) এঁরা হলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সাহাবিবর্গ, যাঁরা তাঁর সাথে হিজরত করেছেন।

[337] সুরা হাশরের আয়াত উল্লেখপূর্বক সাহাবিদের মর্যাদা বিষয়ক বক্তব্য আমরা সাহাবি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও দেখেছি। কিন্তু সেই বক্তব্যের মর্মার্থ আর ইমাম মালিকের বক্তব্যের মর্মার্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) আগে থেকেই এই মদিনাকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইমান গ্রহণ করেছে (তাদের জন্য *'ফাই'* সম্পদের অংশ রয়েছে)।' (*সুরা হাশর :* ৯) এঁরা হলেন আনসার সাহাবিগণ।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'আর যারা তাদের (অগ্রগামী সাহাবিবর্গের) পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, **আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও**—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে"।' (*সুরা হাশর :* ১০)

প্রকৃতপক্ষে *'ফাই'* সম্পদ এই তিন শ্রেণির প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং, যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে গালি দেয়, সে এই তিন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়; *'ফাই'* সম্পদে তার কোনো অধিকার নেই।"[338]

সুরা হাশরের আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসির করতে যেয়ে **ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :**

«وَمَا أَحْسَنَ مَا اسْتَنْبَطَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رحمه الله مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الرَّافِضِيَّ الَّذِي يَسُبُّ الصَّحَابَةَ لَيْسَ لَهُ فِي مَالِ الْفَيْءِ نَصِيبٌ، لِعَدَمِ اتِّصَافِهِ بِمَا مَدَحَ اللَّهُ بِهِ هَؤُلَاءِ فِي قَوْلِهِمْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ».

"কত চমৎকারভাবেই না ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ উক্ত মহিমান্বিত আয়াত থেকে এই বিধান উদ্‌ঘাটন করেছেন—যেই 'রাফিদি শিয়া' সাহাবিগণকে গালি দেয়,

---

[338] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩৪৪।

‘*ফাই*’ সম্পদে তার কোনো অংশ নেই! কেননা সে সেই গুণে গুণান্বিত নয়, যেই গুণের কথা বলে মহান আল্লাহ (*ফাই* সম্পদের হকদার এমন) মানুষদের বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন। যাঁরা তাঁদের বক্তব্যে বলে থাকেন, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও—যারা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছে। আর মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি পরম সহানুভূতিশীল, অশেষ দয়ালু।’”[339]

[339] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৮, পৃ. ১০২।

সাহাবিগণকে গালি দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

প্রধানত দুটো সম্প্রদায় সাহাবিগণকে গালি দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে—

প্রথম সম্প্রদায় : রাফিদি শিয়া

সকল শিয়া সাহাবিগণকে গালিগালাজ করে না। শিয়াদের মধ্যকার রাফিদি গোষ্ঠী—শিয়াদের মধ্যে যাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—সাহাবিগণকে গালিগালাজ করে। রাফিদি শিয়াদের মৌলিক আকিদা বর্ণনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন :**

«وَأَصْلُ قَوْلِ الرَّافِضَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ نَصًّا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ؛ وَأَنَّهُ إِمَامٌ مَعْصُومٌ وَمَنْ خَالَفَهُ كَفَرَ؛ وَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ كَتَمُوا النَّصَّ وَكَفَرُوا بِالْإِمَامِ الْمَعْصُومِ؛ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَبَدَّلُوا الدِّينَ وَغَيَّرُوا الشَّرِيعَةَ وَظَلَمُوا وَاعْتَدَوْا؛ بَلْ كَفَرُوا إِلَّا نَفَرًا قَلِيلًا: بِضْعَةَ عَشَر أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَنَحْوَهُمَا مَا زَالَا مُنَافِقَيْنِ. وَقَدْ يَقُولُونَ: بَلْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. وَأَكْثَرُهُمْ يُكَفِّرُ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ وَيُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ خَالَفَهُمْ كُفَّارًا وَيَجْعَلُونَ مَدَائِنَ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَظْهَرُ فِيهَا أَقْوَالُهُمْ دَارَ رِدَّةٍ أَسْوَأَ حَالًا مِنْ مَدَائِنِ الْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى وَلِهَذَا يُوَالُونَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ عَلَى بَعْضِ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ».

“রাফিদি শিয়াদের মূল মতবাদ হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন স্পষ্টভাবে আলি রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে ইমামুল মুসলিমিন (সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রধান শাসক) করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন; যেই নির্দেশনার ব্যাপারে কারও কোনো ওজর অবশিষ্ট নেই। আর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন নিষ্পাপ ইমাম; যে তাঁর বিরোধিতা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। রাফিদিদের মতে, মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ নবিজির সেই নির্দেশ গোপন করেছেন এবং নিষ্পাপ ইমামের প্রতি কুফরি করেছেন। এছাড়াও তাঁরা (মুহাজির ও আনসারগণ) নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করেছেন, দ্বীনকে বিকৃত করেছেন, শরিয়ত পরিবর্তন করেছেন, জুলুম করেছেন এবং সীমালঙ্ঘন করেছেন। বরং তাঁরা সবাই কাফির হয়ে গিয়েছিলেন, অল্প কয়েকজন সাহাবি ছাড়া; যাদের সংখ্যা দশ-বারোজন বা তার কিছু বেশি! এছাড়াও তারা বলে, আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ শুরু থেকেই মুনাফিক ছিলেন! আবার কখনো কখনো তারা বলে, 'না, বরং তাঁরা প্রথমে ইমান এনেছিলেন, পরে কাফির হয়ে গেছেন!' রাফিদি শিয়াদের অধিকাংশই নিজেদের মতের বিরোধীদের কাফির বলে; নিজেদেরকে *'মুমিন'* আখ্যা দেয়, আর যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে *'কাফির'* আখ্যা দেয়। যেসব ইসলামি নগরীতে তাদের মতবাদ প্রকাশ পায় না, সেগুলোকে তারা *'দারুর রিদ্দাহ (মুরতাদদের রাষ্ট্র)'* মনে করে—যা তাদের মতে মুশরিক ও খ্রিষ্টানদের নগরীর চেয়েও খারাপ! আর এই কারণেই তারা বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের মিত্রতা প্রদান করে!"[340]

আমরা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর কথার সত্যতা দেখতে পাই বারো ইমামিয়া রাফিদি শিয়াদের কাছে সমাদৃত মুহাদ্দিস আবু জাফার

[340] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৩৫৬।

আল-কুলাইনির (মৃ. ৩২৯ হি.) কিতাবে। কুলাইনি তাঁর বিখ্যাত *'আল-কাফি'* কিতাবে **আবু জাফর মুহাম্মাদ আল-বাকির থেকে বর্ণনা করেছেন :**

«كان الناس أهل الردة بعد النبي –صلى الله عليه وآله– إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي».

"নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে তিনজন ছাড়া সবাই (সকল সাহাবি) মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।" আমি মুহাম্মাদ আল-বাকিরকে জিজ্ঞেস করলাম, "সেই তিনজন কারা?" তিনি জবাবে বললেন, "মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু জার আল-গিফারি, সালমান আল-ফারিসি।"[341]

আধুনিক 'বারো ইমামিয়া রাফিদি শিয়াদের' অন্যতম রিলিজিয়াস অথোরিটি হলেন রুহুল্লাহ আল-খুমাইনি (মৃ. ১৯৮৯ খ্রি.); যাকে শিয়া মহলে *'আয়াতুল্লাহ আল-উজমা'* তথা *'আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন'* বলা হয়। তার লেখা কিতাবপত্রেও আমরা রাফিদি শিয়াদের এই নিকৃষ্ট আকিদার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। **বর্তমান *'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের'* প্রতিষ্ঠাতা রুহুল্লাহ আল-খুমাইনি লিখেছেন :**

«وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج، فلا دليل على نجاستهم و**إن كانوا أشد عذاباً من الكفار**، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين، بل للمعارضة في

[341] আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল-কুলাইনি, ***আল-কাফি*** (বৈরুত : দারু সাব ও দারুত তাআরুফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০১ হি.), খ. ৮, পৃ. ২৪৫।

الملك، أو غرض آخر، **كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم،** أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين. بل لعداوة قريش، أو بني هاشم، أو العرب، أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه، أو غير ذلك، لا يوجب - ظاهراً - شيء منها نجاسة ظاهرية و**إن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير** : لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه».

“নাসিবা ফের্কা-সহ অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে, বরং খারিজিদের ব্যাপারেও যদি বলি—তাদের নাপাক হওয়ার কোনো প্রমাণ (আমাদের কাছে) নেই। **যদিও তারা কাফিরদের চেয়ে অধিক শাস্তি ভোগ করবে!** যেমন কোনো শাসনকর্তা যদি আমিরুল মুমিনিন আলি আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, কেবল ক্ষমতাগত বিরোধিতার জন্য, কিংবা অন্য কোনো কারণে; **যেমন আয়িশা, জুবাইর, তালহা, মুয়াবিয়া ও তাদের সমগোত্রীয়রা** করেছিল। অথবা কেউ যদি আমিরুল মুমিনিন আলির বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো ইমামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে বসে; ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, বরং কুরাইশ, অথবা বানু হাশিম, অথবা আরবদের প্রতি বিদ্বেষবশত; কিংবা এজন্য যে তিনি সেই লোকের পুত্র বা পিতাকে হত্যা করেছেন, অথবা অন্য কোনো কারণে (তাঁর সাথে শত্রুতা করে)। এসবের কোনো একটিও বাহ্যিকভাবে তাদের নাপাক হওয়ার কারণ নয়; **যদিও তারা কুকুর ও শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট।** কারণ এ বিষয়ে কোনো ইজমা বা নির্ভরযোগ্য হাদিসের দলিল নেই।”[342]

---

[342] আয়াতুল্লাহ আল-উজমা আল-খুমাইনি, ***কিতাবুত তাহারাত*** (মাতবাআতু মুআসসাসাতিল উরুজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৫৭।

অনুরূপভাবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াত ইরানের সাবেক সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলি খামিনি-ও (মৃ. ১৪৪৭ হি./২০২৬ খ্রি.) সাহাবিগণকে 'হিংসুক মুনাফিক' বলে গালিগালাজ করেছেন। সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে **আলি খামিনি লিখেছেন :**

«وهكذا بقي عليه السلام ملازماً لبيته يعاني من العزلة والغربة لا ناصر له سوى فاطمة وبعض الصحابة وقد **تكالب عليه الجميع** فأصبح بين فريقين الأول **متجاهل لحقه** والثاني **منافق حاسد. ...** نعم لقد ادى واجبه تجاه النبي ﷺ من التجهيز والتغسيل والتدفين لكن **الآخرين** وللأسف الشديد **استغلوا انشغاله فقاموا بالاستيلاء على الخلافة وسرقتها ومنعوا حقه منها** وقد كان لذلك **العمل الجبان** اثاراً سلبية ستبقى في سجل التاريخ ما بقي الليل والنهار».

"এভাবেই আলি আলাইহিস সালাম আপন গৃহে অবস্থান করতে থাকলেন। তিনি একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার কষ্ট সহ্য করছিলেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অল্প কয়েকজন সাহাবি ছাড়া তাঁর কোনো সাহায্যকারী ছিল না। **সবাই তাঁর প্রতি কুকুরের মতো আচরণ করেছিল।** ফলে তিনি দুই দলের মাঝে পড়ে যান। **প্রথম দলের লোকেরা তাঁর অধিকারের ব্যাপারে না জানার ভণিতা করেছিল। আর দ্বিতীয় দল ছিল হিংসুক মুনাফিক।** ... হ্যাঁ, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। নবিজির জানাজার জন্য প্রস্তুতি, গোসল ও দাফনের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, **অন্যরা তাঁর ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে খেলাফত দখল করে নেয়, তাঁর খেলাফত**

চুরি করে নেয়, এবং তাঁকে খেলাফতের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কেয়ামত পর্যন্ত এই **কাপুরুষোচিত কাজের** নেতিবাচক প্রভাব ইতিহাসের পাতায় অবশিষ্ট থাকবে।"[343]

অথচ কিছু অসার বর্ণনা ছাড়া রাফিদি শিয়াদের এসব কথার কোনো দলিল নেই। বরং এসব কথার মাধ্যমে তারা খোদ আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং নবিপরিবারের সদস্যদের বিরোধিতা করেছে। **সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :**

«خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَخَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، عُمَرُ».

"নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর আবু বকরের পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।"[344]

প্রথম যুগের শিয়ারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা মানত। কারণ সাইয়্যিদুনা আলি থেকে এই কথা মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত এমন) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[345] এছাড়াও খোদ শিয়াদের লেখা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে সাহাবিগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। যেমন বারো ইমামিয়া রাফিদি শিয়াদের কাছে সমাদৃত ইমাম এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর **জাফার আস-সাদিক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৮ হি.) বলেছেন :**

---

[343] আয়াতুল্লাহ আলি আল-খামিনি, ***আল-খাওয়াস ওয়াল লাহাজাতুল মাসিরিয়্যা*** (বৈরুত : দারুল হাদি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৫৮।

[344] মুসনাদু আহমাদ, হা. ৮৭৯, বর্ণনার মান : সহিহ।

[345] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ৬, পৃ. ১৩৭।

«كان أصحاب رسول الله - ﷺ - اثني عشر ألفًا، ثمانية آلاف من المدينة، وألفان من مكة، وألفان من الطلقاء، ولم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار، ويقولون: اقْبِض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير».

“রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারো হাজার সাহাবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আট হাজার ছিলেন মদিনার, দুই হাজার ছিলেন মক্কার, আর দুই হাজার ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত (মক্কা বিজয়ের পর যারা মুক্তি পেয়েছিলেন)। তাঁদের মধ্যে কোনো তাকদির-অস্বীকারকারী কাদারি ছিল না, কোনো মুরজিয়া ছিল না, কোনো হারুরি (খারেজি) ছিল না, কোনো মুতাজিলি ছিল না, এবং কোনো রায়পন্থিও ছিল না। তাঁরা (দুনিয়াবিমুখতার কারণে) রাত-দিন কান্না করতেন, আর দোয়া করতেন, ‘খামির দিয়ে বানানো রুটি খাওয়ার আগেই আমাদের রুহ কবজ করে নিন’।”[346]

দ্বিতীয় সম্প্রদায় : নাসিবি ফের্কা

রাফিদি সম্প্রদায়ের বিপরীত পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় হলো—নাসিবি ফের্কা। রাফিদি শিয়ারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করেছে। আর রাফিদিদের বিরোধিতা করতে যেয়ে নাসিবিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারকে ঘৃণা করেছে এবং তাঁদের সাথে শত্রুতা করেছে। বিখ্যাত ভাষাবিদ **ইবনু মানজুর রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭১১ হি.) বলেছেন :**

---

[346] আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন আলি আল-কুম্মি, ***কিতাবুল খিসাল,*** পরিশীলন : আলি আকবার আল-গিফারি (কুম্ম, ইরান : মুআসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি, তাবি), খ. ২, পৃ. ৬৩৯-৬৪০।

«والنَّواصِبُ: قومٌ يَتَدَيَّنُونَ ببِغْضَةِ عَلِيٍّ».

"নাসিবিরা এমন একটা সম্প্রদায়—যারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘৃণা করার মাধ্যমে দ্বীন পালন করে!"[347]

নাসিবি সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্পর্কে **হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) লিখেছেন :**

«وَهُوَ الِانْحِرَافُ عَنْ عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ».

"আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারবর্গ থেকে দূরে সরে যাওয়াই (ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করাই) নাসিবি মতবাদ।"[348]

এ অনুযায়ী প্রাক্কালীন খারেজি গোষ্ঠী ও তাদের সমগোত্রীয়রা নাসিবিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ তারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির বলত এবং তাঁকে ঘৃণা করত। এজন্যই আহলুস সুন্নাহর মধ্যপন্থা বর্ণনা করতে যেয়ে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছিলেন :**

«وَفِي: أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بَيْنَ «الرَّوَافِضِ»، وَبَيْنَ «الْخَوَارِجِ»».

"আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত—রাফিদি সম্প্রদায় ও খারেজি সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যপন্থি।"[349]

এখানে খারেজি সম্প্রদায় বলে নাসিবিদেরকে বোঝানো হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

---

[347] মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররাম ইবনু মানজুর আল-আনসারি, ***লিসানুল আরব*** (বৈরুত : দারু সাদির, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৬১।

[348] আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১০, পৃ. ৪২০।

[349] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ৮২।

«قَالَتْ لَهُ الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ عَلِيًّا أَوِ النَّوَاصِبُ الَّذِينَ يُفَسِّقُونَهُ: إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا طَالِبًا لِلدُّنْيَا، وَإِنَّهُ طَلَبَ الْخِلَافَةَ لِنَفْسِهِ وَقَاتَلَ عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ، وَقَتَلَ عَلَى ذَلِكَ أُلُوفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَجَزَ عَنِ انْفِرَادِهِ بِالْأَمْرِ، وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِ فَقَاتَلُوهُ».

"যেই খারিজিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে *'কাফির'* বলত, কিংবা যেই নাসিবিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে *'ফাসিক'* বলত, তারা বলেছিল, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন জালিম দুনিয়াকামী মানুষ! তিনি নিজের জন্য খেলাফত চেয়েছিলেন এবং খেলাফত পাওয়ার জন্য তরবারি নিয়ে লড়াই করেছিলেন। আর এ কারণে হাজার হাজার মুসলিমকে পর্যন্ত তিনি হত্যা করেছিলেন। এমনকি একপর্যায়ে এককভাবে শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁর সাথীরা তাঁকে ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"[350]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ نَصَبُوا الْعَدَاوَةَ لِعَلِيٍّ وَمَنْ وَالَاهُ وَهُمُ الَّذِينَ اسْتَحَلُّوا قَتْلَهُ وَجَعَلُوهُ كَافِرًا وَقَتَلَهُ أَحَدُ رُءُوسِهِمْ «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ» فَهَؤُلَاءِ النَّوَاصِبُ الْخَوَارِجُ الْمَارِقُونَ».

"এরা হলো সেসব লোক, যারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পক্ষাবলম্বীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছে। তারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্তকে হালাল গণ্য করেছে এবং তাঁকে কাফির আখ্যা দিয়েছে। তাদেরই এক নেতা 'আব্দুর রহমান ইবনু মুলজিম আল-মুরাদি' আলি

[350] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৫৯।

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছিল। এরাই হলো নাসিবি খারেজি গোষ্ঠী—যারা বিচ্যুত হয়েছিল নিজেদের দ্বীন থেকে।"[351]

আধুনিক যুগে সাহাবিদের গালি দিয়েছেন যারা :

এতক্ষণ আমরা রাফিদি ও নাসিবিদের সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। এখন আমরা দেখব, আধুনিক সময়কালে কারা সাহাবিগণকে গালিগালাজ করেছেন; যাদেরকে অনেক মুসলিম ভাই নিজেদের *'অনুসরণীয় আদর্শ'* মনে করেন। আল্লাহুল মুস্তাআন। এমনই একজন মানুষ হলেন *'মুসলিম ব্রাদারহুড'* নামক সংগঠনের শীর্ষনেতা সাইয়্যিদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৬৬ খ্রি.)। **তিনি সম্মাননীয় সাহাবি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলেছেন :**

«وحين يركنُ معاوية وزميله عمرو إلى **الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم**، لا يملك عليٌّ أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحا ويفشل، وإنه لَفَشل أعظم من كل نجاح».

"মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গী আমর যখন **মিথ্যাচার, প্রতারণা, ধোঁকা, মুনাফিকি, ঘুষ গ্রহণ এবং দায়িত্ব ক্রয়ের (মতো অপরাধকর্মের)** দিকে ঝুঁকল, তখন আলির পক্ষে এত নীচু স্তরে নেমে আসা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ওই দুজনের সফল হওয়া এবং আলির ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে কোনো

[351] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৪, পৃ. ৪৬৮।

আশ্চর্যের বিষয় নেই। নিশ্চয় এই ব্যর্থতা যাবতীয় সফলতার চেয়েও মহান।”[352]

সাইয়্যিদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহর এই কথার ব্যাপারে সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৪৪৭ হি.) জিজ্ঞেস করা হলে, **তিনি বলেন :**

«هذا كلامُ باطنيٍّ خبيث، أو يهوديٍّ لَعين، ما يتكلم بهذا مسلم. عمرو بن العاص شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجنة، ومعاوية من فضلاء الصحابة، وهم رضي الله لهم الدين، وأهل تقوى وصلاح، لا يشك مسلم فيهم، وما فعلوا شيئا يُعاب عليهم، وكلُّ ما قاله أولئك فمُجرَّد فرية وكذب وتضليل، -وعياذا بالله- عنوانُ نفاق مِمّن قاله».

“এটা নিকৃষ্ট বাতিনি শিয়ার কথা, কিংবা অভিশপ্ত ইহুদির কথা। কোনো মুসলিম একথা বলতে পারে না। আমর ইবনুল আসের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর মুয়াবিয়া শ্রেষ্ঠ সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত; যেই সাহাবিগণের ধার্মিকতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন; যাঁরা ছিলেন পরহেজগার ও ভালো মানুষ। তাঁরা এমন কোনো কাজ করেননি, যে কারণে তাঁদেরকে দোষারোপ করা যায়। পক্ষান্তরে এরা যা বলেছে, তা স্রেফ অপবাদ, মিথ্যা রটনা,

[352] সাইয়্যিদ কুতুব, ***কুতুব ওয়া শাখসিয়্যাত*** (কায়রো : দারুশ শুরুক, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৪২।

ভ্রষ্টতা এবং মুনাফিকির সূচনা। মহান আল্লাহর কাছে এ থেকে পানা চাই।”[353]

এছাড়াও সাইয়্যিদ কুতুব—রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু—ইসলামের তৃতীয় খলিফা সাইয়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে *‘আকস্মিক ঘটনা’* আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্রী সমালোচনা করেছেন। এমনকি তিনি এই মজলুম শহিদ সাহাবিকে বাইতুল মালের অর্থ থেকে অন্যায়ভাবে আত্মীয়-স্বজনকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেওয়ার মতো জঘন্য অপবাদ দিয়েও অভিযুক্ত করেছেন![354]

এসব কথা শুনলে অনেকে কোনো দলিলপ্রমাণ ছাড়া দাবি করে বসেন, সাইয়্যিদ কুতুব এসব কথা থেকে তওবা করেছেন। তাঁদেরকে বলব, “আপনারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে, আপনাদের কথার পক্ষে দলিলপ্রমাণ হাজির করুন।” সাইয়্যিদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ মারা গেছেন ১৯৬৬ সালে। এরপর বছরের পর বছর—বরং যুগের পর যুগ—ধরে তাঁর এসব গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে; অবশ্যই তাঁর পরিবারবর্গের অনুমতিক্রমে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেসব বইয়ে বলা হয়নি, তিনি এই কথাগুলো থেকে তওবা করেছিলেন। এমনকি এসব ভয়াবহ গালিগালাজের নীচে সৌজন্যতা করেও ফুটনোট দেওয়া হয়নি—এ কথা বলে যে, তিনি এগুলো থেকে তওবা করেছেন। আলাইহিম মিনাল্লাহি মা ইয়াসতাহিক্কুন।

---

[353] মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ***“রদ্দুল আল্লামা আব্দিল আজিজ ইবনি আব্দিল্লাহ আলিশ শাইখ আলা সাইয়্যিদ কুতুব,”*** ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৮ই এপ্রিল, ২০১২ খ্রি., https://m.youtube.com/watch?v=8ijn9o0tRZg (২:২৪ মিনিট থেকে ৩:২২ মিনিট পর্যন্ত)।

[354] সাইয়্যিদ কুতুব, ***আল-আদালাতুল ইজতিমায়িয়্যা ফিল ইসলাম*** (কায়রো : দারুশ শুরুক, ত্রয়োদশ প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৬০-১৬১, ১৭২।

অনুরূপ আরেকজন ব্যক্তি হলেন *'জামায়াতে ইসলামী'* নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৭৯ খ্রি.)। **তিনি সাহাবি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দা-সমালোচনা করে বলেছেন :**

«وثمة بدعة كريهة أخري ظهرت في عهد معاوية وهي **أن معاوية نفسه وسائر ولاته –بأمره– كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا عليٍّ في خطبهم على المنابر** لدرجة أن كانوا يلعنونه –وهو أحب أقرباء رسول الله إلى قلبه الشريف– من فوق منبر المسجد النبوي نفسه وأمام الروضة النبوية ذاتها وكان أولاد سيدنا علي وأقرب أقربائه يسمعون هذا اللعن بآذانهم. أن سب أي شخص بعد وفاته أمر مجاف للأخلاق الإنسانية فضلا عن مجافاته للشريعة».

"মুয়াবিয়ার যুগে একটি নিকৃষ্ট বিদাত চালু হয়। বিদাতটি হলো—**মুয়াবিয়া নিজে এবং মুয়াবিয়ার নির্দেশে তাঁর সকল গভর্নর মিম্বারের ওপর খুতবায় আমাদের নেতা আলিকে গালিগালাজ শুরু করে।** তারা মসজিদে মিম্বারে দাঁড়িয়ে সরাসরি নবিজির রওজার সামনে তাঁকে অভিসম্পাত করত; অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর রসুলের সবচেয়ে প্রিয়ভাজন আত্মীয়। আর আমাদের নেতা আলির সন্তানসন্ততি এবং তাঁর নিকটাত্মীগণ তাঁদের নিজ কানে এই অভিসম্পাত শুনত। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে গালিগালাজ করা শরিয়ত তো দূরের কথা, মানবসুলভ চরিত্রেরও পরিপন্থি।"[355]

---

[355] আবুল আলা মওদুদি, ***আল-খিলাফাহ ওয়াল মুলক*** (কুয়েত : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১১২-১১৩।

জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আধুনিক প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত *'খেলাফত আওর মুলুকিয়্যাত'* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—*'খেলাফত ও রাজতন্ত্র'* বইটিতেও মাওলানা মওদুদির উক্তিটি পাওয়া যাবে।[356] আরও অনেকে দাবি করে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারের দাঁড়িয়ে কিংবা জুম্মার খুতবায় 'আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিসম্পাত করার' নির্দেশ দিয়েছিলেন। মওদুদি রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও অনেকে এমন দাবি করেছেন। নিঃসন্দেহে এই দাবি সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আরোপকৃত মিথ্যা অপবাদ।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদিসবেত্তা **আল্লামা আবুল আব্বাস আল-কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৫৬ হি.) বলেছেন :**

«يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه، لما كان معاوية موصوفًا به من الفضل والدين، والحلم، وكرم الأخلاق، وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح. وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسب، و إنَّما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولما سمع ذلك معاوية سكت، وأذعن، وعرف الحق لمستحقه».

"মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিসম্পাত করেছেন, কিংবা গালি দিয়েছেন—এমনটা ঘটা খুবই সুদূরপরাহত বিষয়। কারণ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মহৎ গুণ, ধার্মিকতা, ধৈর্য,

---

[356] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ***খেলাফত ও রাজতন্ত্র,*** অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪৯।

উত্তম চরিত্র—এসবের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলোচ্য বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব কথা প্রচলিত আছে, তার বেশিরভাগই মিথ্যা এবং অগ্রহণযোগ্য। এসব বর্ণনার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ঘটনাটি হলো—তিনি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'আবু তুরাবকে গালি দেওয়া থেকে আপনাকে কোন জিনিসটি বাধা দেয়?' কিন্তু এই কথাটি গালি নয়। বরং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে চেয়েছিলেন, কেন তিনি তা করেন না। যাতে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেই কোনো মন্দ কথা বলেন কিনা, তা তিনি জানতে পারেন। কিংবা সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেন। আর সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরে এটাই পরিষ্কার হয়ে যায় (তিনি গালির বিরুদ্ধে কথা বলেন)। তখন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর শুনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নীরব হয়ে যান, তাঁর কথা মেনে নেন, এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাপ্য মর্যাদা স্বীকার করেন।"[357]

আল্লামা মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৪২ হি.) বলেছেন :

«وما يذكره المؤرخون من أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يقع في الأمير كرم الله تعالى وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهر في حقه، ويتكلم بما يتكلم في شأنه مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه؛ لأن المؤرخين ينقلون ما خبث وطاب، ولا يميزون بين

[357] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন উমার আল-কুরতুবি, ***আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম*** (দামেস্ক ও বৈরুত : দারু ইবনি কাসির ও দারুল কালিমিত তাইয়্যিব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৭৮।

الصحيح والموضوع والضعيف، وأكثرهم حاطب ليل، لا يدري ما يجمع. فالاعتماد على مثل ذلك في مثل هذا المقام الخطر والطريق الوعر والمهمه الذي تضل فيه القطا ويقصر دونه الخطا، مما لا يليق بشأن عاقل، فضلا عن فاضل».

"ইতিহাসবিদরা বলে থাকে, আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর তিরোধানের পর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেন, অশোভন আলাপ করতেন, এবং তাঁর ব্যাপারে এমন কিছু প্রকাশ করতেন, যা প্রকাশ করা উচিত নয়। ইতিহাসবিদদের এসব কথার ওপর নির্ভর করা অনুচিত। তাদের কথায় মনোযোগ দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা ইতিহাসবিদগণ ভালো-মন্দ সবই বর্ণনা করেন। তাঁরা সহিহ ও জাল-জইফ আলাদা করে বলেন না। তাঁদের অধিকাংশই রাতের আঁধারে কাঠ কুড়ানো লোকের মতো (যারা কাঠ কুড়াতে যেয়ে সাপ-বিচ্ছুও কুড়ায়)। তাঁদের অধিকাংশই—কী সংগ্রহ করছেন, সে ব্যাপারে সতর্ক নন। অথচ এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, দুর্গম পথ এবং এমন কান্তার মরু, যেখানে পথিকরা পথ হারায়, লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে এসব ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর নির্ভর করা—মহৎ মানুষের কথা তো দূরেই থাকল—কোনো বিবেকবান মানুষের কাজও হতে পারে না।"[358]

[358] মাহমুদ শুকরি বিন আব্দুল্লাহ আল-আলুসি, ***সব্বুল আজাব আলা মান সাব্বাল আসহাব,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুখারি (রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৪২১।

‘ইসলামের ইতিহাস’ বইয়ে সাহাবিদের প্রতি গালি :

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে ‘ইসলামের ইতিহাস’ নামে যে সাবজেক্টটি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় পড়ানো হয়, তার বহু স্থানে মানব্যর সাহাবিগণের প্রতি চরম অশালীন ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত এইচএসসি ও আলিম স্তরের ‘ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ বইটি।

সেখানে আমরা বেদনাহত চোখে দেখি, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাহবার—সম্মাননীয় সাহাবিগণকে নোংরা ভাষায় হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেন গালাগাল করাই ইতিহাসের সঠিক বর্ণনা! দেশের কলেজগুলোতে, আলিয়া মাদরাসাগুলোতে বছরের পর বছর ধরে এসব কদর্য গালিগালাজ পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী—আমাদের ভাইবোন, আমাদের সন্তানসন্ততি—সাহাবিগণের বিরুদ্ধে ভয়ংকর গালাগাল শিখছে। এমনকি এইচএসসি পরীক্ষায় এসব অধ্যায় থেকে প্রশ্ন এলে, পরীক্ষার খাতায় সেই অশালীন কথাগুলো লিখে ইন্টারমিডিয়েট পাস করছে।

আমাদের প্রজন্মকে যেই ভয়াবহ কথা শেখানো হচ্ছে, তা ইতিহাস নয়; বরং আকিদা ও চরিত্র ধ্বংসের এক অন্ধকার অধ্যায়। সেই ভয়ংকর গালিগালাজের কিছু নমুনা আমরা এখানে তুলে ধরছি, যাতে বিষয়টি সবার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

নমুনা-১ :

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা সাইয়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

> “**চারিত্রিক দুর্বলতা :** হজরত ওসমান (রা.) অতিমাত্রায় বিনয়ী, উদার ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই সরলতা ও উদারতাই ছিল **তার ব্যর্থতার** প্রধান কারণ। খিলাফতের সংকটময় মুহূর্তে নেতৃত্বদানের চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধ বয়সে হজরত ওসমান (রা.)-এর ছিল না। **চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে** তিনি কারও বিরুদ্ধে সময়োপযোগী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। **অনেক সময় খলিফা দয়াপরবশ হয়ে কঠিন অপরাধীকেও ক্ষমা প্রদর্শন করতেন।** খলিফার এই **দুর্বলতা** ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে দুষ্কৃতকারীরা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস পায় এবং এরই পরিণামে তাকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।”[359]

সাইয়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিকবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।[360] এসব সুসংবাদ ছাড়াও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের ক্রান্তিলগ্নে অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। যে কারণে হাদিস মোতাবেক বলা হয়, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দুইবার জান্নাত কিনে নিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফতে।[361] অধিকন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। এরকম মহান

---

[359] সহিদুল ইসলাম, তসলিমা আফরীন ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি*** (ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই, ২০২৫ খ্রি.), পৃ. ১৮১।

[360] তিরমিজি, হা. ৩৭৪৮, বর্ণনার মান : সহিহ; সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৪।

[361] মুসনাদ আহমাদ, হা. ৪২০, বর্ণনার মান : সহিহ, তাহকিক : আহমাদ শাকির ও শুওয়াইব আরনাউত; আবু হাফস উমার বিন আলি ইবনুল মুলাক্কিন আশ-শাফিয়ি, ***মুখতাসার ইস্তিদরাকিল হাফিজিজ জাহাবি আলা মুস্তাদরাকি আবি আব্দিল্লাহ আল-হাকিম,*** তাহকিক : সাদ বিন আব্দুল্লাহ আলু হুমাইদ (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৮৮-১২৯১।

জান্নাতী সাহাবির বিরুদ্ধে চারিত্রিক দুর্বলতার অপবাদ দিতে এসব দেশীয় প্রফেসরের এতটুকু বুক কাঁপল না?!

নমুনা-২ :

সম্মাননীয় ওহি-লেখক সাহাবি সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে লেখা হয়েছে :

> "মুয়াবিয়া ছিলেন **ক্ষমতালোভী** ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই হজরত ওসমান (রা.) হত্যাকাণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে **নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে তিনি তৎপর ছিলেন।** এ জন্য আলী (রা.) খিলাফত লাভের সাথে সাথে তিনি ওসমান হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন। **স্বার্থান্বেষী ও ধুরন্ধর মুয়াবিয়া** হজরত আলী (রা.) কর্তৃক হজরত ওসমান (রা.) হত্যার বিচার বিলম্বকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন এবং এ হত্যাকাণ্ডে আলী (রা.) জড়িত বলে প্রচার করতে থাকেন। সেই সাথে ঘোষণা করেন যে, ওসমান (রা.) হত্যার বিচার না হলে তিনি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবেন না। এভাবে সাম্রাজ্যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মুয়াবিয়া হজরত ওসমান (রা.) হত্যার বিচার দাবির আড়ালে আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।"[362]

পরবর্তী প্যারায় আরও লেখা হয়েছে :

> "**মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ও অবাধ্যতার** উপযুক্ত জবাব এবং ইসলামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য হজরত আলী (রা.) ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওনা হলেন।"[363]

---

[362] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৮৮।

[363] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৮৮।

এই ইতিহাসবিদরা সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে গালি দিয়েছে। অথচ তিনি প্রিয়নবি মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি নবিজির খাস লেখক ছিলেন।[364] তিনি দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যেই দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব।"[365] হাদিসটির একজন বিশিষ্ট বর্ণনাকারী ইমাম ফিরইয়াবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০১ হি.) বলেন, "উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় সর্বপ্রথম উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।"[366]

নমুনা-৩ :

সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে সমঝোতার জন্য সালিস নিযুক্তির আলোচনায় প্রখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগালি করা হয়েছে। **লেখা হয়েছে :**

> "প্রস্তাব অনুযায়ী হজরত আলী (রা.)-এর পক্ষে আবু মুসা আল আশারি এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনে আল আস সালিসদার মনোনীত হলেন। ... মক্কা ও মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এ সালিস বৈঠকে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ্য বৈঠকের আগে আবু মুসা ও আমরের মধ্যে গোপন আলোচনায় **ধূর্ত আমর** আবু মুসা আল আশারিকে বোঝালেন যে, ইসলামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হজরত

---

[364] সহিহ মুসলিম, হা. ২৫০১।

[365] সহিহুল বুখারি, হা. ২৯২৪; আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ৬, পৃ. ১০৩।

[366] আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ৫, পৃ. ২৪৪০।

আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অপসারণ করতে হবে এবং তৃতীয় লোক নিযুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আশারি প্রথমে আলী (রা.)-এর পদচ্যুতি এবং পরে আমর মুয়াবিয়ার পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। সরলমনা আশারি **আমরের চালাকি** বুঝতে না পেরে উপস্থিত জনসভায় পূর্ব চুক্তি মোতাবেক হজরত আলীর পদচ্যুতি ঘোষণা করলেন। এর পরপরই আমর ইবনে আল আস দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি হজরত আলী (রা.)-এর পদচ্যুতি মেনে নিলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়াকে মনোনীত করলাম।'"[367]

পরবর্তী পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে :

"**ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক ও হঠকারী আমর চালাকি করে** সৎ, সহজ, সরল আশারিকে দিয়ে মুয়াবিয়া ও হজরত আলী (রা.) উভয়কে পদচ্যুত করার প্রস্তাব দেন এবং তাকেই প্রথমে রায় ঘোষণা করতে বলেন।"[368]

সমঝোতা বৈঠকে ধোঁকা, চালাকি ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল—এই দাবি একদম বানোয়াট এবং মিথ্যা। আবু মিখনাফ নামের এক রাফিদি শিয়া এসব বানোয়াট জাল কথা ছড়িয়েছিল।[369]

নমুনা-৪ :

মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে লেখা হয়েছে :

---

[367] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৮৮-১৮৯।

[368] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৮৯।

[369] ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-ইয়াহইয়া, ***মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফি তারিখিত তাবারি*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৭৮, ৪০৮-৪০৯।

"আলী (রা.)-এর চরিত্রই তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী : সবশেষে বলা যায় যে, হজরত আলী (রা.)-এর চরিত্রই তার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তিনি বিদ্বান ও সাহসী যোদ্ধা হলেও যোগ্য সংগঠক ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন না। তা ছাড়া সমঝোতা ও আপসের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে **তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন।** এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "In compromise, indeed, and in procrastination lay **the failure of the (Ali's) khilafat."** সমঝোতা ও দীর্ঘসূত্রতা তার পতনের অনিবার্য কারণ হয়েছে।"[370]

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে :

"দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও সময়োপযোগী তৎপরতার অভাব : বিভিন্ন মানবিক গুণ ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও **শাসক হিসেবে দৃঢ়তা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও তৎপরতার অভাব তার খিলাফতকালকে ম্লান করে দিয়েছে।** সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা তার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ ছিল। এ কারণে তিনি চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতেন। **তার চরিত্রের এরূপ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে** শত্রুরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং আপসের চেষ্টা করেছেন। আমীর আলীর মতে, "তার চরিত্রে যদি ওমরের মতো কঠোরতা থাকত তবে তিনি আরবদের মতো দুর্দান্ত জাতিকে আরও কৃতকার্যতার সাথে শাসন করতে সমর্থ হতেন। কিন্তু তার ক্ষমাশীলতা ও উদারতাকে ভুল বোঝা হয়েছিল এবং তার সদাশয়তা ও সত্যপ্রিয়তাকে শত্রুরা নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করল।" যার পরিণতিতে তাকে জীবন দিতে হলো। সবশেষে বলা যায় যে, **হজরত**

---

[370] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৯৩।

আলী (রা.) খলিফা হিসেবে ব্যর্থ হলেও মানুষ হিসেবে তিনি পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন।"[371]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! এই লেখকদের বুকের পাটা কত বড়ো হলে সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে *'খলিফা হিসেবে ব্যর্থ'* বলতে পারে?! সাহাবিদের মানমর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ, বিভ্রান্ত কাফির, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম মুইরের কুফরি কথাবার্তা পড়ে মুসলিম দাবিদার প্রফেসররা সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের নিন্দাবাণে জর্জরিত করেছে। অথচ আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।[372] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মুসা আলাইহিস সালামের নিকটে যেমন হারুন আলাইহিস সালামের মর্যাদা, তেমনি আমার নিকটেও তোমার মর্যাদা?"[373]

সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে; আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলও তাকে ভালোবাসেন।"[374] আর খলিফা হিসেবে তিনি অবশ্যই সফল ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য অনুযায়ী সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ছিল—নবুয়তের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[375]

---

[371] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৯৪।

[372] তিরমিজি, হা. ৩৭৪৮, বর্ণনার মান : সহিহ।

[373] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৭০৬।

[374] সহিহুল বুখারি, হা. ৪২১০।

[375] আবু দাউদ, হা. ৪৬৪৬, বর্ণনার মান : সহিহ।

নমুনা-৫ :

সাইয়্যিদুনা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক কেমন ছিল, সেই আলোচনা করতে যেয়ে পুনরায় মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

> "মক্কা ও মদিনার অধিবাসীরা ইমাম হাসানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও **উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী সিরিয়া ও মিশরের অধিপতি মুয়াবিয়া** তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। **ধূর্ত, কপট ও ষড়যন্ত্রকারী মুয়াবিয়া যে চক্রান্তের মাধ্যমে** খলিফা আলী (রা.)-কে সমগ্র মুসলিম জাহানের আধিপত্য থেকে বঞ্চিত করেন, ঠিক সেভাবেই সহজ, সরল ও কোমলমতি ইমাম হাসান (রা.)-কেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার **অসৎ পরিকল্পনায় মত্ত হলেন** এবং অবিলম্বে হাসান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কুফায় সৈন্য প্রেরণ করেন। ... শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। সন্ধির শর্তানুসারে-
>
> ১। ইমাম হাসান (রা.) তার জীবদ্দশায় মুয়াবিয়াকে খলিফা বলে মেনে নিতে সম্মত হন। তবে শর্ত থাকে যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসান (রা.)-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসাইন (রা.) খিলাফত পাবেন।
>
> ২। ইমাম হাসান (রা.)-এর পারিবারিক ব্যয়ের জন্য তার জীবদ্দশায় কুফার রাজকোষ থেকে বার্ষিক ৫০ লাখ দিরহাম হারে নিয়মিত ভাতা পাবেন। এ ছাড়া ইমাম হাসান (রা.) পারস্যের আহওয়াজ জেলার রাজস্ব ভোগ করবেন।
>
> ৩। **নামাজের খুতবায় হজরত আলী (রা.)-এর প্রতি অভিসম্পাত বন্ধ করতে মুয়াবিয়া সম্মত হন। ...**

মূলত সহজ-সরল ও দুর্বলচিত্তের ইমাম হাসান (রা.) **ধূর্ত মুয়াবিয়ার চালবাজি ও কূটনীতির কাছে** হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।"[376]

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিসম্পাত করতেন—এটা একটা ডাহা মিথ্যা এবং নির্জলা অপবাদ।

নমুনা-৬ :

উমাইয়া খেলাফতের আলোচনা করতে যেয়ে আবারও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালিগালাজ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে :

"মুয়াবিয়ার চরিত্রে বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। **তিনি শঠতা ও প্রবঞ্চনার বশবর্তী হয়ে খিলাফত লাভ করলেও** তাকে ইসলামের ইতিহাসে একজন অনন্য প্রতিভাধর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসকরূপে অভিহিত করা হয়েছে। ... সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "**মুয়াবিয়া ছিলেন ধূর্ত, ধর্মমত বিবর্জিত,** তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, **কৃপণ** অথচ প্রয়োজনবোধে স্বাভাবিক উদার এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যে বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান।" **নিজ স্বার্থ রক্ষায় তিনি যেকোনো হীনপন্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।** ঐতিহাসিক অসবর্ন বলেন, "**প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণের জন্য হত্যা ছিল চিরাচরিত পন্থা।** শৌর্য-বীর্যে সফল না হলে সেক্ষেত্রে তিনি **কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন।**" মানুষ হিসেবে **মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত সুবিধাবাদী।** শাসক হিসেবে **তিনি কপট ও ধূর্ত হলেও** ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিয়মিতভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন। ধর্মভীরু হলেও **নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি অনেক সময় ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করতেও দ্বিধাবোধ**

[376] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ১৯৪।

করতেন না। তিনি পারস্য ও রোমান সম্রাটদের মতো আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি জুমার নামাজের ইমামতি করলেও যেকোনো বিষয়ের সমাধান ব্যক্তিগতভাবেই করতেন এবং মজলিস-উশ-শুরার ধার ধারতেন না।"[377]

আলিয়া মাদরাসার নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য *'ইসলামের ইতিহাস'* বইটিতেও আমরা দেখতে পাই, সম্মাননীয় সাহাবিগণকে নিন্দাবাণে জর্জরিত করা হয়েছে। এই বই থেকেও আমরা কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

নমুনা-৭ :

আলোচ্য বইটিতে সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে, যেই পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছে—"হযরত আলী (রা.) এর ব্যর্থতার কারণ।"[378] **পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লেখা হয়েছে :**

"হযরত আলী (রা.) মহানুভব, দয়ালু, সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বহু গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও **রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, সতর্কতা ও সময়োপযোগী তৎপরতার অভাব দেখা যায়।** সমঝোতা এবং আপোসের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে **তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন।** এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম মুইর বলেন, 'সমঝোতা এবং দীর্ঘসূত্রতা তাঁর পতনের অনিবার্য কারণ হয়েছে।'

---

[377] ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র,*** পৃ. ২৩৯।

[378] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ***ইসলামের ইতিহাস : দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি*** (ঢাকা : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত, প্র. অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

বস্তুত তাঁর সদাশয়তা ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে স্বার্থন্বেষী মহল তাঁর চরম সর্বনাশ করে।”[379]

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম মুইরের অনুকরণ করে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি, নবিপরিবারের বিশিষ্ট সদস্য, সুপথপ্রাপ্ত খলিফা, সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দা-সমালোচনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাহর আদর্শ বর্ণনা করে **আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেছেন :**

«لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خَطَأٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، إِذْ كَانُوا كُلُّهُمُ اجْتَهَدُوا فِيمَا فَعَلُوهُ وَأَرَادُوا اللَّهَ ﷻ، وَهُمْ كُلُّهُمْ لَنَا أَئِمَّةٌ، وَقَدْ تَعَبَّدْنَا بِالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَلَّا نَذْكُرَهُمْ إِلَّا بِأَحْسَنَ الذِّكْرِ، لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ وَلِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَبِّهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ، وَأَخْبَرَ بِالرِّضَا عَنْهُمْ».

“সাহাবিগণের কারও বিরুদ্ধে কোনো সুনিশ্চিত ভুলের অভিযোগ করা জায়েজ নয়। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই যা করেছেন, তা ইজতিহাদ তথা শরয়ি গবেষণার ভিত্তিতে করেছেন এবং নিজেদের কাজে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। তাঁরা সকলেই আমাদের ইমাম ও আদর্শ। তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছে, সেসব বিষয়ে নীরব থেকে এবং এবং তাঁদের ব্যাপারে কেবল উত্তম কথা বলে—আমরা মহান আল্লাহর ইবাদত করি। কারণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বিশেষ মর্যাদা আছে (সেই মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য)। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধও করেছেন

[379] ***দাখিল ইসলামের ইতিহাস,*** পৃ. ১৫৫।

তাঁদেরকে গালি দিতে। এছাড়াও মহান আল্লাহ সাহাবিগণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট।"[380]

নমুনা-৮ :

এই বইয়ের আরেক জায়গায় সাইয়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

"**খলিফার বশ্যতা স্বীকার এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে মুয়াবিয়া (রা.) এর অসম্মতি:** মাসুদী, পি, কে হিস্ট্রি, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই **হযরত উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে** অপসারিত করে তাদের স্পলে নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মনে করলেন যে, এ নীতি অবলম্বন করলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষিত হবে। হযরত মুঘিরা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে এরূপ দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা হযরত আলী (রা) তাঁদের কথার কর্ণপাত করেননি। ফলে সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে সমস্যা আরও জটিল হলো। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা) ব্যতীত সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ খলিফার আদেশ পালন করেন।"[381]

ইতিহাসবিদ মাসুদি ছিলেন পথভ্রষ্ট মুতাজিলি শিয়া, পি. কে. হিট্টি ছিলেন কুটিল ওরিয়েন্টালিস্ট, আর সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন

---

[380] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবি, ***আল-জামি লি আহকামিল কুরআন,*** তাহকিক : আহমাদ আল-বারাদুনি ও ইবরাহিম আত্তাফাইয়্যিশ (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ৩২১।

[381] ***দাখিল ইসলামের ইতিহাস,*** পৃ. ১৪৭।

বিভ্রান্ত শিয়া চিন্তাধারার অনুসারী। এটা জানা থাকলে, এদের কলমে সাইয়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য পাওয়াটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়। আশ্চর্যের বিষয় বরং অন্যত্র। ইমাম জাহাবি, ইমাম ইবনু কাসির প্রমুখের মতো সর্বজননন্দিত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদদের কিতাব সামনে থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ ইতিহাস জানতে ছুটে যায় শিয়া ও ওরিয়েন্টালিস্টদের কাছে! আল্লাহর পানাহ—মাআজাল্লাহ!

নমুনা-৯ :

সিফফিন যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে :

"যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও মুসলমানদের অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়া (রা) কে বশ্যতা স্বীকার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় আহবান জানান। **কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) এর যুদ্ধংদেহি মনোভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।"**[382]

কত বড়ো বেয়াদবি! মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে সিফফিনের যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে ওঠেছিল, এটা কে বলেছে? সেসময়ের কোন সাহাবি কিংবা তাবেয়ি এরকম মন্তব্য করেছেন? কোন সালাফ এরকম অশোভন কথা প্রচার করেছেন? বরং সালাফদের যুগের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে আমরা এ বিষয়ে আদব-শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। **ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল :**

«ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟»

"আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে আপনি কী বলেন?"

---

[382] ***দাখিল ইসলামের ইতিহাস,*** পৃ. ১৪৮।

ইমাম আহমাদ জবাবে বলেছিলেন :

«ما أقول فيهم إلا الحُسنى».

“আমি তাঁদের ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কোনো কথা বলি না।”[383]

হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন :

«وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنِ اجْتِهَادٍ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَادِ بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَاحِدًا وَأَنَّ الْمُصِيبَ يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ».

“আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত একমত পোষণ করেছে, সাহাবিগণের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেসবকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাউকে নিন্দা-সমালোচনা করা নিষিদ্ধ। যদিও কেউ জানতে পারে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় অমুক সাহাবি সঠিক ছিলেন; তবুও তিনি বিপরীতে অবস্থানকারী সাহাবির নিন্দা-সমালোচনা করতে পারবেন না। কারণ সাহাবিগণ (নিজেদের মধ্যে) সেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে (শরয়ি গবেষণার ভিত্তিতে)। আর ইজতিহাদে ভুল হলে মহান আল্লাহ সেই ভুল ক্ষমা করে দেন। বরং সুসাব্যস্ত হাদিস অনুযায়ী, যিনি ইজতিহাদ করে ভুল করেন, তিনি একটি

---

[383] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি ইবনুল জাওজি, ***মানাকিবুল ইমাম আহমাদ,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (কায়রো : দারু হাজার, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ২২১।

সওয়াব পান, আর যিনি ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তিনি দুইটি সওয়াব পান।"[384]

সাহাবিগণকে গালিদাতা ইতিহাসবিদরা ছোট্ট পিপীলিকার সমান আদব-শিষ্টাচারও রক্ষা করতে পারেনি। বিখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা শিহাবুদ্দিন আল-আলুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২৭০ হি.) এই চমৎকার উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন।[385] সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন **এক পিপীলিকা বলেছিল :**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ﴾.

"ওহে পিঁপড়ার দল, তোমরা তোমাদের বাসগৃহে প্রবেশ করো। যেন সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী তাঁদের অজান্তে তোমাদেরকে পিষে না ফেলে।"[386]

লক্ষ করুন, পিপীলিকা তাঁর সতর্কবার্তায় কত সূক্ষ্ম শিষ্টাচার রক্ষা করেছে! 'অজান্তে' শব্দটি যোগ করেছে এই আশঙ্কায়, যেন কেউ মনে না করে সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও তাঁর বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রাণীকে পিষ্ট করেন। কত কোমল, কত পরিণত, কত সৌন্দর্যময় এই আদব! তাহলে আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের সাথে বেয়াদবি করে আমরা কি পিপড়ার চেয়েও অধম হয়ে যাব?!

---

[384] আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১৩, পৃ. ৩৪।

[385] শিহাবুদ্দিন মাহমুদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আলুসি, ***আল-আজবিবাতুল ইরাকিয়্যা আলাল আস্‌ইলাতিল লাহুরিয়্যা*** (বাগদাদ : মাতবাআতুল হুমাইদিয়্যা, প্র. ১৩০১ হি.), পৃ. ২৯-৩০।

[386] সুরা নামল ২৭:১৮।

নমুনা-১০ :

'দাখিল ইসলামের ইতিহাস' বইয়ে আরও লেখা হয়েছে :

"অবশেষে ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়ার (রা) এর নিকট বশ্যতামূলক এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তানুসারে ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়া (রা) এর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করতে এবং **মুয়াবিয়া (রা.) খুৎবায় হযরত আলী (রা) এর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ বন্ধ করতে সম্মত হন।"**[387]

আমরা ইতোমধ্যে একাধিকবার বলেছি, এটা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একটা নির্জলা মিথ্যা অপবাদ। *'ইসলামের ইতিহাস'* বইয়ে সাহাবিদের বিরুদ্ধে আরও নিন্দা-সমালোচনা লেখা আছে। আমরা কেবল দশটি নমুনা দেখালাম মাত্র। নিঃসন্দেহে এগুলো সাহাবিগণের বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট সমালোচনা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কৃত গালিগালাজ। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, সকল সালাফ একমত—যে কোনো একজন সাহাবিরও সম্মানহানি করা কিংবা যে কোনো একজন সাহাবিকেও গালি দেওয়া ব্যক্তি নিকৃষ্ট বিদাতি।[388]

ইমাম বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৯ হি.) তাঁর বিখ্যাত আকিদার কিতাবে লিখেছেন :

«و إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى».

"আপনি যদি কোনো লোককে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবির সমালোচনা

---

[387] ***দাখিল ইসলামের ইতিহাস,*** পৃ. ১৫৬।

[388] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৭০।

করতে দেখেন, তাহলে জেনে রাখবেন, সে হলো মন্দ কথার অধিকারী এবং বিদাতি।"[389]

আশারি, মাতুরিদি ও সালাফি—সকল ধারার কাছে পছন্দনীয় ও সমাদৃত পুস্তিকা *'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা'-য়* **আবু জাফার আত-তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন :**

«ونحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. **ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم.** ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين و إيمان و إحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان».

"আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে ভালোবাসি। আমরা তাঁদের কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না, আবার তাঁদের কারও থেকে বিচ্ছিন্নও হই না। **যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ঘৃণা করে এবং তাঁদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলে, আমরা তাকে ঘৃণা করি।** আমরা সাহাবিগণের ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই বলি না। সাহাবিগণকে ভালোবাসা হলো—ধার্মিকতা, ইমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে ঘৃণা করা হলো—কুফরি, নিফাক (মুনাফিকি) ও তুগইয়ান (সীমালঙ্ঘন)।"[390]

সাহাবি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা এবং তাঁর গালিদাতাদের হালহকিকত বর্ণনা করতে যেয়ে সৌদি আরবের সাবেক

---

[389] আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলি আল-বারবাহারি, ***শারহুস সুন্নাহ,*** তাহকিক : খালিদ বিন কাসিম আর-রাদ্দাদি (মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

[390] আবু জাফার আত-তাহাবি, ***আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা*** (বৈরুত : দারু ইবনি হাজম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৯।

গ্র্যান্ড মুফতি **শাইখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৪৭ হি.) বলেন :**

> "মুয়াবিয়া হলেন সম্মানিত সাহাবি, ইসলামের প্রথম রাজা। তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। তিনি ইসলামের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম। মুসলিমরা তাঁর ইমামত ও খেলাফতের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবি, ওহি-লেখক, মুমিনদের মাতুল, শ্রেষ্ঠ মুসলিম এবং ইমাম। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন, 'তুমি যদি মুয়াবিয়ার যুগ পেতে, তাহলে অবশ্যই এ কথা বলতে যে, এটা মাহদির যুগ!' তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত মানুষ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, মান্যবর সাহাবি, সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী। **মুনাফিক ও নিকৃষ্ট রাফিদি শিয়া ছাড়া আর কেউ তাঁকে গালি দেয় না। যাদের অন্তরে ইমান আছে, তাদের কেউই তাঁকে গালি দেয় না।** তিনি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তিনি আল্লাহর রসুলের পেছনে সালাত আদায় করেছেন, আল্লাহর রসুলের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন এবং ওহি লিপিবদ্ধ করেছেন। **নিকৃষ্ট মুনাফিক ছাড়া আর কেউ তাঁকে গালি দিতে পারে না।"**[391]

সাহাবিগণকে যারা গালি দিয়েছে, আর তাদের পক্ষ নিয়ে যারা ওকালতি করে, কিংবা তাদের অপরাধকে নগণ্য হিসেবে দেখায়, তাদের সবার উদ্দেশে বলব, আপনারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অলিদের পক্ষ নিন। যারা সাহাবিগণের মতো মহান অলিদের নিন্দা-সমালোচনা

---

[391] মাজমুআতু নায়িফ বিন খালিদ আল-ইলামিয়্যা, ***"রদ্দুল আল্লামা আল-ফাওজান ওয়া সামাহাতিল মুফতি আলা আয়িদ আল-কারনি,"*** ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৬ই মে, ২০১২ খ্রি., https://m.youtube.com/watch?v=nrUz4ahe5Rg (৩:১০ মিনিট থেকে ৩:৫৮ মিনিট পর্যন্ত)।

করে, তাদের বিরুদ্ধে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কোন শিবিরে থাকবেন—আল্লাহর অলিদের শিবিরে, না তাঁদেরকে গালাগালকারী লোকদের শিবিরে? **প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন :**

«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

"(পরকালে) একজন ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।"[392]

এখন আবার মুনাফিকি করে বলিয়েন না, "আমি সাহাবিকে গালি দেওয়া নেতা কিংবা প্রফেসরের সাথেও আছি, আবার গালিপ্রাপ্ত সাহাবির সাথেও আছি! কারও প্রতি কোনো ঘৃণা নয়; বরং উভয়কে সমন্বয় করে ভালোবেসে যাচ্ছি!"

[392] সহিহুল বুখারি, হা. ৬১৬৯; সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৪০।

অধ্যায় ৪

কুরআন বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ



وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ.

কুরআন আল্লাহর কথা।

سمعتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «القُرآنُ كَلَامُ اللهِ، وَمَنْ قَالَ : مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, "কুরআন আল্লাহর কথা। যে বলে, 'কুরআন সৃষ্ট,' সে বিদাতি। আমরা কাউকে এই কথা বলতে শুনিনি।"

وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «الإِيمَانُ قَولٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بن عُيَيْنَةَ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ لَا تَقُلْ يَنْقُصُ»، فَغَضِبَ؛ وَقَالَ : «اسْكُتْ يَا صَبِيٌّ؛ بَلْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شيء».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে আরও বলতে শুনেছি, "ইমান হলো কথা ও কাজ; তা বাড়ে এবং কমে যায়।" এ শুনে তাঁর ভাই ইবরাহিম বিন উয়াইনা বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ, *'ইমান কমে যায়'*—এটা বলবেন না।" তখন তিনি রেগে যেয়ে বললেন, "চুপ করো, হে বালক! বরং (ইমান এমনও কমে যেতে পারে যে, কমতে-কমতে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"

ব্যাখ্যা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্নাহর চতুর্থ মূলনীতি আলোচনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার সর্বসম্মত মূলনীতি হলো—কুরআন আল্লাহর কথা, তা সৃষ্ট নয়।

ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করে বলেছেন :

«ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم».

"আহলুল হাদিসগণ এই সাক্ষ্য দেন এবং আকিদা পোষণ করেন যে, কুরআন আল্লাহর কথা, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর ওহি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাজিলকৃত। কুরআন সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে *'সৃষ্ট'* বলে এবং কুরআনকে *'সৃষ্ট'* হিসেবেই বিশ্বাস করে, সে আহলুল হাদিসদের নিকট কাফির।"[393]

আমরা মূলপাঠে দেখেছি, ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ চতুর্থ মূলনীতি উল্লেখ করার পর পুনরায় ইমান বিষয়ক আকিদা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের শেষে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

[393] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ১৬৫।

কুরআন আল্লাহর কথা

ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"কুরআন আল্লাহর কথা।"** কুরআন যে সত্যিকারার্থেই মহান আল্লাহর কথা—তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সুপ্রিয় পাঠক, আপনি ভাবতে পারেন, কুরআন যে আল্লাহর কথা, সেটা তো সুবিদিত—জানা বিষয়। এর জন্য আবার দলিলপ্রমাণ দিতে হয়? কিন্তু আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, যখন জানবেন, একদল মুসলিম দাবিদার বিদ্বান মনে করেন, যেই কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, সেটা আল্লাহর কথা না! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এদের সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা কতিপয় উল্লেখযোগ্য দলিল পেশ করব, যা থেকে প্রতীয়মান হয়—কুরআন আল্লাহর কথা।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾.

"মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান করো, যাতে সে আল্লাহর কথা (কুরআন) শুনতে পায়।"[394]

এই আয়াত উল্লেখ করার পর সালাফদের যুগের ইমাম **আব্দুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানি আল-মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪০ হি.) বলেছেন :**

[394] সুরা তাওবা ৯:৬।

«يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من الله، وإنما عنى القرآن لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك».

“অর্থাৎ, যাতে সে কুরআন শুনতে পায়। কারণ সে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি আল্লাহর কথা শুনতে সক্ষম নয়। তাই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কুরআন। এ বিষয়ে আলিমগণ ও আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।”[395]

আলোচ্য আয়াতটি ভালোভাবে বোঝা জরুরি। এখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে বলা হচ্ছে, মুশরিকদের কেউ আপনার কাছে আশ্রয় চাইলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যেন সে আপনার কাছ থেকে কুরআন শুনতে পায়। অর্থাৎ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন, সেই তেলাওয়াতকৃত কুরআন যেন সে শুনতে পায়। ওই তেলাওয়াতকৃত কুরআনকেই *‘আল্লাহর কথা’* বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে।

২. যারা কুরআনকে *‘মানুষের কথা’* বলে, তাদেরকে মহান আল্লাহ শাস্তি দেবেন বলে জানিয়েছেন। শীর্ষস্থানীয় কাফির নেতা ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা আল-মাখজুমি যখন বলেছিল, *‘কুরআন আল্লাহর কথা নয়, বরং মুহাম্মাদের বানানো কথা,’* তখন মহান আল্লাহ

---

[395] আবুল হাসান আব্দুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানি আল-মাক্কি, ***আল-হাইদাতু ওয়াল ইতিজার ফির রদ্দি আলা মান কালা বি খলকিল কুরআন,*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ফাকিহি (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪০।

সুরা মুদ্দাসসিরের আয়াত নাজিল করেছিলেন।[396] **মহান আল্লাহ বলেছিলেন :**

﴿فَقَالَ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ يُؤۡثَرُ * إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ * سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ﴾.

"এরপর সে বলল, 'এটা তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।' অচিরেই আমি তাকে প্রবেশ করাব *'সাকার'* জাহান্নামে।"[397]

আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর **ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلِ الْبَشَرِ كَمَا ادَّعَى الْوَلِيدُ، وَلَكِنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل».

"অর্থাৎ, এটা মানুষের কথা নয়; যেমনটা ওয়ালিদ দাবি করেছে। বরং এটা হলো মহান আল্লাহর কথা।"[398]

'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা' গ্রন্থে **আবু জাফার আত-তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন :**

«وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المدثر: ٢٦] - فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: ﴿إِنْ

---

[396] আবু সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা,*** তাহকিক : বদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বদর (কুয়েত : দারু ইবনিল আসির, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৪।

[397] সুরা মুদ্দাসসির ৭৪:২৪-২৬।

[398] আদ-দারিমি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা,*** পৃ. ১৮৪।

هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ».

"নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর কথা। উক্ত কথা তাঁর থেকেই কথা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু তার ধরন আমাদের অজানা। তিনি সেই কথাকে তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি হিসেবে নাজিল করেছেন। মুমিনগণ সেটাকে সত্য হিসেবে সত্যায়ন করেছেন এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করেছেন যে, এটা সত্যিকারার্থেই মহান আল্লাহর কথা। এটা সৃষ্টিকুলের কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন শুনে দাবি করে, 'এটা মানুষের কথা,' সে কাফির হয়ে যায়। এমন কথা যে বলে, আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন, দোষারোপ করেছেন এবং তাকে *'সাকার'* জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, **'অচিরেই আমি তাকে প্রবেশ করাব *"সাকার"* জাহান্নামে।'**[399] আর যে ব্যক্তি বলেছে, **'এটা তো মানুষেরই কথা,'**[400] তাকে যখন মহান আল্লাহ *'সাকার'* জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন, তখনই তো আমরা জেনে গেছি এবং সুনিশ্চিত হয়েছি—এটা মানুষের স্রষ্টার কথা; মানুষের কথার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।"[401]

---

[399] সুরা মুদ্দাসসির ৭৪:২৬।

[400] সুরা মুদ্দাসসির ৭৪:২৫।

[401] আত-তাহাবি, ***আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা,*** পৃ. ১২-১৩।

৩. কুরআনে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সেসব কথা বলতে পারবে না।[402] **যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়েত দিতাম। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত যে, নিশ্চয় আমি কতক মানুষ ও জিনকে মিলিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।"[403]

সুন্নাহ থেকে দলিল :

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي».

"আরাফার মাঠে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলতেন, 'এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিয়ে যাবে? কারণ কুরাইশরা আমাকে আমার রবের কথা প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে।'"[404]

---

[402] আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৫৮৮।

[403] সুরা সাজদা ৩২:১৩।

[404] আবু দাউদ, হা. ৪৭৩৪; তিরমিজি, ২৯২৫; ইবনু মাজাহ, হা. ২০১; বর্ণনার মান : সহিহ।

আমরা সবাই জানি, কুরাইশরা কুরআন প্রচার করতে বাধা দিয়েছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কুরইশরা আমার রবের কথা প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে।" তিনি বলেননি, "কুরাইশরা আমার রবের কথার ভাব/মর্মার্থ প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে।"[405]

ইজমা থেকে দলিল :

১. সকল সালাফের ইজমায়ি আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَكَلَّمَ بِهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ: فَهُوَ جَهْمِيٌّ كَافِرٌ».

"কুরআন আল্লাহর কথা, যা আল্লাহ বলেছেন। কুরআন মাখুলক (সৃষ্ট) নয়। যে ব্যক্তিই দাবি করে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে জাহমি কাফির।"[406]

২. প্রখ্যাত ইমাম **আবু বাকর আল-আজুর্রি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬০ হি.) বলেছেন :**

«اعْلَمُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُزِغْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْحَقِّ، وُوُفِّقُوا لِلرَّشَادِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ، وَعِلْمُ اللَّهِ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا».

"আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে রহম করুন। জেনে রাখুন, অতীতে ও বর্তমানে যেই মুসলিমগণের অন্তর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং যেই মুসলিমগণ সঠিক পথে চলার তৌফিক

---

[405] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৫, পৃ. ৩১৯।

[406] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৬৪।

পেয়েছেন, তাঁদের সবার মতাদর্শ হলো—কুরআন মহান আল্লাহর কথা; এটি সৃষ্ট নয়। কেননা কুরআন আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত; আর আল্লাহর ইলম কখনো সৃষ্ট হতে পারে না।”[407]

৩. আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম ইবনু আবি জামানিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৯ হি.) বলেছেন :**

«وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ: أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ وَتَنْزِيلُهُ».

“আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ হচ্ছে—কুরআন আল্লাহর কথা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধান।”[408]

৪. ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৩০ হি.) বলেছেন :

«طريقتنا طَرِيقَة السّلف المتبعين للْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة؛ وَمِمَّا اعتقدوه: ... أَن الْقُرْآن كَلَام الله وَكَذَلِكَ سَائِر كتبه الْمنزلَة كَلَامه غير مَخْلُوق، وَأَن الْقُرْآن فِي جَمِيع الْجِهَات مقروءا ومتلوًا ومحفوظًا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كَلَام الله حَقِيقَة لَا حِكَايَة وَلَا تَرْجَمَة، وَأَنه بألفاظنا كَلَام الله غير مَخْلُوق؛ وَأَن الواقفة واللفظية من الْجَهْمِية وَأَن من قصد الْقُرْآن بِوَجْه من الْوُجُوه يُرِيد بِهِ خلق كَلَام الله فَهُوَ عِنْدهم من الْجَهْمِية، وَأَن الجهمي عِنْدهم كَافِر».

“আমাদের পথ হলো সেই সালাফদের পথ, যাঁরা কিতাব, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত) অনুসরণ করেছেন। তাঁদের অন্যতম আকিদা ছিল—কুরআন আল্লাহর কথা; অনুরূপভাবে তাঁর নাজিলকৃত

---

[407] আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-আজুর্রি আল-বাগদাদি, ***আশ-শারিয়া,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন সুলাইমান আদ-দুমাইজি (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৯।

[408] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জামানিন আল-মালিকি, ***উসুলুস সুন্নাহ,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুখারি (মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ৮২।

সকল কিতাব তাঁর কথা; এবং সেগুলো কোনোভাবেই সৃষ্ট নয়। কুরআন পাঠ করা হোক, চাই তেলাওয়াত করা হোক, বা মুখস্থ করা হোক, কিংবা শোনা হোক, বা লেখা হোক, অথবা উচ্চারণ করা হোক—সকল দিক থেকেই তা মহান আল্লাহর সত্যিকারের কথা; এটি আল্লাহর কথার ভাব/মর্ম নয় এবং কোনো দোভাষীর বলা ভাবার্থ নয়। আমরা যখন আমাদের উচ্চারণ দিয়ে কুরআন পাঠ করি, তখনও আমাদের উচ্চারিত কুরআন আল্লাহর কথাই থাকে—যা সৃষ্ট নয়। আর ওয়াকিফা ও লাফজিয়্যা সম্প্রদায় জাহমিদের অন্তর্ভুক্ত।[409] যে ব্যক্তি কোনো এক দিক থেকে কুরআনকে উদ্দেশ্য করে এবং (সেই দিক থেকে) কুরআনকে তথা আল্লাহর কথাকে 'সৃষ্ট' বোঝায়, সে সালাফগণের নিকট জাহমিদের অন্তর্ভুক্ত। আর সালাফগণের নিকট জাহমিরা কাফির।"[410]

---

[409] একদল লোক কুরআনকে *'আল্লাহর কথা'* বলার পর *'ওয়াক্ফ'* করে; অর্থাৎ থেমে যায়। বলে না যে, 'কুরআন আল্লাহর মাখলুক।' আবার এও বলে না যে, 'কুরআন আল্লাহর মাখলুক নয়।' এদেরকে ***'ওয়াকিফা'*** বলা হয়। আরেকদল লোক মনে করে, মহান আল্লাহ যেই কুরআন অবতীর্ণ করেননি, সেটা আল্লাহর কথা এবং সেটা মাখলুক নয়। কিন্তু তিনি যেই কুরআন স্বীয় রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেই কুরআন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনগণ তেলাওয়াত করেছেন, সেটা মাখলুক! যারা এ ধরনের আকিদা পোষণ করে, তাদেরকে ***'লাফজিয়্যা'*** বলা হয়।

[410] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৪৩।

কুরআন মাখলুক নয়

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ কুরআন বিষয়ক আকিদায় ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর বরাতে উল্লেখ করেছেন, কুরআন মাখলুক নয়।[411] কুরআন যে মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়—তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দলিল পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾.

"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও (চলবে) তাঁর।"[412]

মহান আল্লাহ এখানে *'আমর'* তথা *'নির্দেশকে'* সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছেন। আর কুরআন নির্দেশের অন্তর্গত। **কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾.

"অনুরূপভাবে আমি তোমার প্রতি আমার নির্দেশ থেকে রুহকে (কুরআনকে) ওহি করেছি।"[413]

আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর **শাইখ হাফিজ বিন আহমাদ আল-হাকামি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৭৭ হি.) বলেছেন :**

«فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْخَلْقَ غَيْرُ الْأَمْرِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ أَمْرِهِ لَا مِنْ خَلْقِهِ».

---

[411] ইমাম সুফইয়ানের বক্তব্যের ব্যাখ্যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[412] সুরা আরাফ ৭:৫৪।

[413] সুরা শুরা ৪২:৫২।

“মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, সৃষ্ট জিনিস নির্দেশ থেকে আলাদা। আর কুরআন আল্লাহর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়।”[414]

কুরআন যে সৃষ্ট নয়—সে বিষয়ের প্রমাণ দিতে যেয়ে **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«وَقَالَ ﷻ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] فَأَخْبَرَ ﷻ بِالْخَلْقِ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالْأَمْرُ﴾ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْأَمْرَ غَيْرَ الْخَلْقِ».

“মহান আল্লাহ বলেন, ‘জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও (চলবে) তাঁর।’ (*সুরা আরাফ : ৫৪*) এখানে প্রথমে তিনি সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর বলেছেন, ‘নির্দেশও তাঁর।’ এভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।”[415]

ইমাম আহমাদের পূর্বে তাবে-তাবেয়ি ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৭ হি.) এরকম তাফসির করেছেন। **ইমাম আজুর্রি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬০ হি.) লিখেছেন :**

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ فِي مَجْلِسِ خَلَفِ الْبَزَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «مَا يَقُولُ هَذِهِ الدُّوَيْبَةُ؟» يَعْنِي بِشْرًا الْمِرِّيسِيُّ قَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَالَ: «كَذَبَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] فَالْخَلْقُ: خَلْقُ اللَّهِ، وَالْأَمْرُ: الْقُرْآنُ».

---

[414] হাফিজ বিন আহমাদ বিন আলি আল-হাকামি, ***মাআরিজুল কবুল বি শারহি সুল্লামিল উসুল ইলা ইলমিল উসুল,*** তাহকিক : উমার বিন মাহমুদ আবু উমার (দাম্মাম : দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬৯।

[415] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৩৯।

আমাদেরকে আবুল কাসিম সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, খালাফ আল-বাজ্জারের মজলিসে আমার কাছে সায়িদ বিন নুসাইর আবু উসমান আল-ওয়াসিতি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি। একদা তিনি (ইমাম সুফইয়ান) জিজ্ঞেস করলেন, "এই কীটটা কী বলে?" তিনি *'কীট'* বলে বিশর আল-মারিসিকে উদ্দেশ্য করেছেন। লোকেরা বলল, "হে মুহাম্মাদের পিতা, সে দাবি করছে, কুরআন হলো মাখলুক।" তখন ইবনু উয়াইনা বললেন, "সে মিথ্যা বলেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, নির্দেশও (চলবে) তাঁর।' (*সুরা আরাফ : ৫৪*) সুতরাং এখানে সৃষ্টি হলো আল্লাহর সৃষ্টি, আর নির্দেশ হলো কুরআন।"[416]

২. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ * عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ * خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ﴾.

"আর-রহমান (পরম করুণাময়)। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"[417]

কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে খলিফা মামুন আর-রশিদের দরবারে মুতাজিলি পণ্ডিত বিশর আল-মারিসির সাথে ইমাম আব্দুল আজিজ আল-মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪০ হি.) ইলমি বিতর্ক করেন। সেই বিতর্কে **ইমাম আব্দুল আজিজ বলেছিলেন :**

«إن الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان في ثمانية عشر موضعا، ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه. وذكر القرآن في أربعة

[416] আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ১, পৃ. ৫০৪-৫০৫।

[417] সুরা রহমান ৫৫:১-৩।

وخمسين موضعا من كتابه فلم يخبر عن خلقه في موضع منها ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق، ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأخبر عن خلق الإنسان، ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل: ﴿**الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ**﴾ ففرق بين القرآن وبين الإنسان، فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن الله عزوجل فرط في الكتاب، وكان يجب عليه أن يخبر عن خلق القرآن، وقال الله عز وجل ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

"মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে আঠারো জায়গায় মানুষ-সৃষ্টির কথা জানিয়েছেন। তিনি যেখানেই '*মানুষ*' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তিনি অবহিত করেছেন—মানুষ সৃষ্ট। পক্ষান্তরে তিনি কিতাবের চুয়ান্ন (৫৪) জায়গায় কুরআনের প্রসঙ্গ এনেছেন—কিন্তু কোনো একটা জায়গাতেও '*কুরআন সৃষ্ট*' মর্মে কিছু বলেননি; এমনকি সৃষ্টির কোনো গুণও কুরআনের সাথে সংযুক্ত করেননি। এরপর এক জায়গায় মানুষ আর কুরআনের প্রসঙ্গ একত্রে উল্লেখ করেছেন—সেখানে মানুষকে সৃষ্ট ঘোষণা করেছেন এবং 'কুরআন সৃষ্ট হওয়ার দাবি' অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, **'আর-রহমান (পরম করুণাময়)। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।'** এখানে মহান আল্লাহ কুরআন ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হে আমিরুল মুমিনিন, বিশর মনে করেছে, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ঘাটতি রেখেছেন—তাঁর উচিত ছিল কুরআন-সৃষ্টি সম্পর্কে জানানো! অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিইনি'।"[418]

---

[418] আল-মাক্কি, ***আল-হাইদাতু ওয়াল ইতিজার,*** পৃ. ৮৫।

সালাফদের যুগের ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«القرآن كلام الله، ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر، والقرآن من علم الله، وفيه أسماؤه، وعلم الله ليس بمخلوق، وقال الله: ﴿**الرحمن * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ**﴾. فالقرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق فيه أسماؤه».

"কুরআন আল্লাহর কথা। যে ব্যক্তি বলে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে কাফির। কুরআন আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত; এতে তাঁর (আল্লাহর) অনেক নাম রয়েছে। আর আল্লাহর ইলম মাখলুক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, **'আর-রহমান (পরম করুণাময়)। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাকে (মানুষকে) কথা বলা শিখিয়েছেন।'** সুতরাং কুরআন আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর ইলম সৃষ্ট নয়; এতে তাঁর অনেক নাম রয়েছে।"[419]

এছাড়াও মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ﴾.

"ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অনুসরণ করছেন। বলে দিন, 'আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। আর আপনার নিকটে যেই ইলম এসেছে, তা আসার পরেও যদি আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ

[419] আল-কিরমানি, ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি,*** খ. ৩, পৃ. ১১২৬।

করেন, তাহলে আল্লাহর নিকটে আপনার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।”[420]

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾.

“আর আপনার নিকটে যেই ইলম এসেছে, তা আসার পরেও যদি আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহর নিকটে আপনার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং রক্ষকও থাকবে না।”[421]

এই আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«فَالَّذِي جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي جَاءَهُ، وَالْعِلْمُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَالْقُرْآنُ مِنَ الْعِلْمِ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ».

“নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ইলম নিয়ে এসেছেন, তা হলো কুরআন। এটাই সেই ইলম, যা তাঁর কাছে এসেছে। আর ইলম মাখলুক নয়। কুরআন সেই ইলমের অন্তর্ভুক্ত; কুরআন আল্লাহর কথা।”[422]

৩. কুরআনে এমন কিছু কথা আছে, যা কোনো মাখলুকের জন্য বলা বৈধ নয়। এমনকি কোনো মাখলুক সেসব কথা বললে—কাফির হয়ে যাবে। **যেমন আল্লাহ বলেছেন :**

﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

---

[420] সুরা বাকারা ২:১২০।

[421] সুরা রাদ ১৩:৩৭।

[422] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৬, পৃ. ২৬।

“হে মুসা, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[423]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾.

“নিশ্চয় আমি আল্লাহ; আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।”[424]

তাবে-তাবেয়ি ইমাম **সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) বলেন :**

«مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷻ ﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ زِنْدِيقٌ حَلَالُ الدَّمِ».

“যে ব্যক্তি মনে করে, মহান আল্লাহর এই বাণী—*‘হে মুসা, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’* – মাখলুক, সে কাফির, জিন্দিক (ধর্মচ্যুত); তার রক্ত হালাল।”[425]

তাবে-তাবেয়ি ইমাম **আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮১ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ قَالَ: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ».

---

[423] সুরা নামল ২৭:৯।

[424] সুরা তহা ২০:১৪।

[425] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১০৭।

"যে ব্যক্তি বলে, মহান আল্লাহর এই বাণী—*'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই'* – মাখলুক, সে কাফির। কোনো সৃষ্টির জন্য (সুরা তহার) এমন কথা বলা সঙ্গত নয়।"[426]

৪. কুরআনে আল্লাহর অনেক নাম আছে। আর আল্লাহর নাম মাখলুক নয়। মহান আল্লাহর নাম দিয়েই আল্লাহকে ডাকতে বলা হয়েছে শরিয়তে। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾.

"(হে নবি) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহকে ডাক, অথবা রহমানকে ডাক। যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ।"[427]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾.

"আর আল্লাহর রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর নামসমগ্র। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।"[428]

এজন্য ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) বলেছেন :

«مَنْ قَالَ إِنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ».

"যে ব্যক্তি বলে, মহান আল্লাহর এই বাণী—*'বলুন, তিনি আল্লাহ এক; আল্লাহ হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ (অমুখাপেক্ষী)'* – মাখলুক, সে কাফির।"[429]

ইমাম হাম্বাল বিন ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৩ হি.) বলেছেন :

---

[426] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৩০।

[427] সুরা ইসরা ১৭:১১০।

[428] সুরা আরাফ ৭:১৮০।

[429] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১০৭।

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَمَّنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَأَسْمَاءَهُ مَخْلُوقَةٌ فَقَدْ كَفَرَ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٦١] أَفَلَيْسَ هُوَ الْقُرْآنُ؟ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ مَخْلُوقَةٌ فَهُوَ كَافِرٌ لَا يُشَكُّ فِي ذَلِكَ، إِذَا أَعْتَقَدَ ذَلِكَ، وَكَانَ رَأْيُهُ وَمَذْهَبُهُ وَكَانَ دِينًا يَتَدَيَّنُ بِهِ، كَانَ عِنْدَنَا كَافِرٌ».

আমি আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যখন ইয়াকুব আদ-দাওরাকি তাঁকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যে বলে, 'কুরআন হলো মাখলুক।' তাঁর জবাবে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, "যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর ইলম ও তাঁর নামসমূহ মাখলুক, সে কাফির। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর আপনার কাছে ইলম আসার পর যদি কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্ক করে।' (*সুরা আলে ইমরান :* ৬১) এখানে কি এই 'ইলম' বলতে কুরআনকে বোঝানো হয়নি? সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর ইলম এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি সৃষ্ট—সে নিঃসন্দেহে কাফির। যদি সে তা বিশ্বাস করে, এবং সেটাই তার অভিমত হয়, এবং সেটাকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে; তাহলে আমাদের নিকটে সে কাফির গণ্য হবে।"[430]

[430] আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ১, পৃ. ৫০৩।

সুন্নাহ থেকে দলিল :

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ قالت، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ».

খাওলা বিনতু হাকিম আস-সুলামিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি (সফররত অবস্থায়) কোনো মঞ্জিলে নেমে বলে, 'আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের কাছে তথা কথাসমূহের অসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি)।' সেই মঞ্জিল থেকে অন্যত্র যাত্রা করা অবধি কোনো জিনিস তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[431]

আরও বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য এই দোয়া পড়ে আশ্রয় চাইতেন আর বলতেন, "তোমাদের পিতা (ঊর্ধ্বতন দাদা) ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইল ও ইসহাক আলাইহিমাস সালামের জন্য এই দোয়া পড়ে

[431] সহিহ মুসলিম, হা. ২৭০৮।

পানাহ চাইতেন। ‘আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিও ওয়া হাম্মাহ ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মাহ (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের কাছে তথা কথাসমূহের অসিলায় প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাইছি)।”[432]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআন আল্লাহর কথা।[433] আর এই হাদিসগুলোতে বলা হচ্ছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কথার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করতেন। অথচ মাখলুকের কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করা না-জায়েজ। কুরআন যদি মাখলুক হতো, তাহলে তার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করা বৈধ হতো না। উল্লেখ্য, মহান আল্লাহর কথার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করার অর্থ—মহান আল্লাহর কথার অসিলায় আশ্রয়প্রার্থনা করা। মূলত এটা সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করারই নামান্তর।[434]

হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) লিখেছেন :

«قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَعْنِي الْوَارِدَةَ فِي الِاسْتِعَاذَةِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ... عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ إِذْ لَوْ كَانَ مَخْلُوقًا لَمْ يَسْتَعِذْ بِهَا إِذْ لَا يُسْتَعَاذُ بمخلوق».

“নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৮ হি.) তাঁর *‘আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা’* গ্রন্থে বলেছেন, এই

---

[432] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৩৭১।

[433] সুরা তাওবা ৯:৬।

[434] আল-উসাইমিন, ***মাজমুউ ফাতাওয়া,*** খ. ২, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

হাদিসগুলো—অর্থাৎ যেসব হাদিস 'আল্লাহর নাম ও তাঁর কথাসমূহের কাছে আশ্রয়প্রার্থনার' ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে—থেকে প্রতীয়মান হয়, কুরআন মাখলুক নয়। কারণ কুরআন যদি মাখলুক হতো, তাহলে আল্লাহর কথাসমূহের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হতো না। কেননা মাখলুকের কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করা সিদ্ধ নয়।"[435]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন :

«بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَسْتَعِيذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا بِكَلَامِ غَيْرِهِ وَقَالَ نُعَيْمٌ: «لَا يُسْتَعَاذُ بِالْمَخْلُوقِ، وَلَا بِكَلَامِ الْعِبَادِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَنَّ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ»».

"পরিচ্ছেদ : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কথার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, অন্য কারও কথার কাছে নয়। নুআইম বিন হাম্মাদ (মৃ. ২২৮ হি.) বলেছেন, 'মাখলুকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না; আর বান্দার কথা, কিংবা জিন, মানুষ বা ফেরেশতার কথার কাছেও আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না।' এ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর কথা মাখলুক নয়; এছাড়া যা আছে সবই মাখলুক।"[436]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর *'নুনিয়্যাহ'* কাব্যগ্রন্থে বলেছেন :

وَرَسُولُهُ قَدْ عَاذَ بالكَلِمَاتِ مِنْ ... لَذْغٍ وَمِن عَيْنٍ ومِنْ شَيْطَانِ

أيعوذُ بالمَخْلُوقِ حَاشَاهُ مِنَ الْـ ... إِشرَاكِ وَهْوَ مُعَلِّمُ الإِيمَانِ

---

[435] আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১৩, পৃ. ৩৮১।

[436] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৯৬।

بَلْ عَاذَ بالكَلِمَاتِ وَهْيَ صِفَاتُهُ ... سُبْحَانَهُ لَيْسَتْ مِنَ الأَكْوانِ

وَكَذَلِكَ القُرْآنُ عَيْنُ كَلَامِهِ الْـ ... ـمَسْمُوعِ مِنْهُ حقِيقَةً بِبَيَانِ.

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন আল্লাহর কথাসমূহের কাছে (বিষাক্ত প্রাণীর) দংশন থেকে, বদনজর থেকে এবং শয়তান থেকে।
নবিজি কি মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাইতেন? কক্ষনো না! কীভাবেই বা শির্কের দিকে ঝুঁকবেন তিনি, যিনি নিজেই ইমানের শিক্ষক?!
বরং নবিজি আশ্রয় চেয়েছেন আল্লাহর কথাসমূহের কাছে; যা মূলত তাঁরই গুণাবলি। এগুলো সৃষ্টিজগতের অংশ নয়।
তদ্রূপ কুরআনও তাঁর সত্যিকারের কথা; যা আসলেই তাঁর নিকট থেকে শোনা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।"[437]

ইজমা থেকে দলিল :

১. বিখ্যাত তাবেয়ি বিদ্বান ইমাম আমর ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২৬ হি.) থেকে এ বিষয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ইজমা বর্ণিত হয়েছে। **ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেন :**

«سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَنْ دُونَهُمْ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: «اللَّهُ الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ خَرَجَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ»».

"আমি ইসহাক বিন ইবরাহিম আল-হানজালি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২৩৮ হি.) বলতে শুনেছি, সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ

---

[437] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া ফিল ইনতিসার লিল ফিরকাতিন নাজিয়া,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-আরিফি, নাসির আল-হানিনি, আব্দুল্লাহ আল-হুজাইল প্রমুখ (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

(মৃ. ১৯৮ হি.) বলেন, আমর ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণকে এবং তাঁদের পরবর্তী ব্যক্তিবর্গকে সত্তর বছর ধরে এ কথাই বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ হলেন খালিক (স্রষ্টা), আর তিনি ছাড়া যা কিছু আছে, সবই মাখলুক। কুরআন হলো আল্লাহর কথা; যা তাঁর থেকেই বের হয়েছে, এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।'"[438]

উক্তিটি উল্লেখ করার পর **ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) লিখেছেন :**

«وَقد تَوَاتر هَذَا عَن ابْن عُيَيْنَة».

"সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই উক্তি মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন এমন) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।"[439]

২. সালাফদের যুগের ইমাম **ইসহাক ইবনু রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

«لَيْسَ بَين أهل الْعلم اخْتِلَاف أَن الْقُرْآن كَلَام الله لَيْسَ بمخلوق فَكيف يكون شَيْء خرج من الرب عزوجل مخلوقًا».

"উলামাগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, কুরআন আল্লাহর কথা; এটি মাখলুক নয়। আর মহান রব থেকে যা বের হয়েছে, তা কীভাবেই বা মাখলুক হতে পারে?!"[440]

---

[438] আদ-দারিমি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা,*** পৃ. ১৮৯।

[439] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ১৫৬।

[440] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ১৭৯-১৮০।

৩. ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) এবং ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন :

«أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؛ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بِجَمِيعِ جِهَاتِهِ».

"আমরা হিজাজ, ইরাক, শাম ও ইয়েমেন প্রভৃতির যাবতীয় অঞ্চলের আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের সবার মতাদর্শ ছিল—ইমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি; যা বৃদ্ধি পায় এবং কমে যায়। আর সকল দিক থেকেই কুরআন মহান আল্লাহর কথা; মাখলুক নয়।"[441]

তাঁরা বললেন, **সকল দিক থেকেই কুরআন—আল্লাহর কথা; মাখলুক নয়।** এর মানে, কুরআন জবান দিয়ে তিলাওয়াত করা হোক, চাই অন্তরে মুখস্থ রাখা হোক, কিংবা পাতায় লিখে রাখা হোক, কিংবা কান দিয়ে শোনা হোক—সকল অবস্থাতেই এটা মহান আল্লাহর কথা; কোনো সৃষ্ট বিষয় নয়। বান্দার তেলাওয়াতকৃত কুরআনের ব্যাপারে সালাফগণ বলতেন, "এই কথা মূলত আল্লাহরই কথা, আর আওয়াজ হলো পাঠকের আওয়াজ।"[442]

৪. ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন :

---

[441] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

[442] আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর, ***তাজকিরাতুল মুতাসি শারহু আকিদাতিল হাফিজ আব্দিল গনি আল-মাকদিসি*** (দারু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২০১।

«سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَهَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ، وَعَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحَكِيمَ بْنَ سَيْفٍ الرَّقِّيَّ، وَأَيُّوبَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيَّ، وَسَوَّارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَالرَّبِيعَ صَاحِبَ الشَّافِعِيِّ، وَعَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَأَحْمَدَ بْنَ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيَّ، وَوَهْبَ بْنَ بَقِيَّةَ، وَمَنْ لَا أُحْصِيهِمْ مِنْ عُلَمَائِنَا كُلُّ هَؤُلَاءِ، سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ». وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»».

“আমি ইসহাক ইবনু ইবরাহিম ইবনু রাহুইয়াহ, হান্নাদ ইবনুস সারি, আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ, উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু মায়সারা, হাকিম ইবনু সাইফ আর-রাক্কি, আইয়ুব ইবনু মুহাম্মাদ আর-রাক্কি, সাওয়্যার ইবনু আব্দুল্লাহ, আশ-শাফিয়ির ছাত্র আর-রাবি, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনুল হাকাম, মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ইবনু সুফইয়ান, উসমান ইবনু আবি শাইবা, মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার ইবনুর রাইয়্যান, আহমাদ ইবনু জাওয়্যাস আল-হানাফি, ওয়াহব ইবনু বাকিয়্যা এবং আমাদের আরও বহু আলিম—যাঁদের সবাইকে আমি গুণেগুণে উল্লেখ করছি না—তাঁদের প্রত্যেককে আমি বলতে শুনেছি, ‘কুরআন আল্লাহর কথা; এটি মাখলুক নয়।’ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে বলেছেন, ‘কুরআন হলো গাইরে মাখলুক (অসৃষ্ট)’।”[443]

---

[443] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আস-সিজিস্তানি, ***মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ রিওয়াইয়াতু আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি,*** তাহকিক : আবু মুয়াজ তারিক আওয়্যাদাল্লাহ (মিশর : মাকাতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮।

কুরআনকে মাখলুক মনে করার বিধান

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ কুরআন বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেছেন :

سمعتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «القُرآنُ كَلَامُ اللهِ، وَمَنْ قَالَ : مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, "কুরআন আল্লাহর কথা। যে বলে, 'কুরআন সৃষ্ট,' সে বিদাতি। আমরা কাউকে এই কথা বলতে শুনিনি।"

প্রশ্ন আসতে পারে, ইমাম হুমাইদি এখানে কোন সুফইয়ানের কথা বলেছেন—সুফইয়ান আস-সাওরি, না সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা? আমরা বলব, ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ অবশ্যই সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর কথা বলেছেন। কারণ তিনি ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহর যুগ পাননি। সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ ১৬১ হিজরিতে মারা গেছেন।[444] আর ইমাম হুমাইদি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৫০ হিজরির পরে।[445] সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে—এমন তথ্য পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তিনি ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৯৮ হি.) শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম হিসেবে সুবিদিত ছিলেন। **ইমাম হুমাইদি নিজেই বলেছেন :**

---

444 আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনি বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি, ***আল-কামাল ফি আসমায়ির রিজাল,*** তাহকিক : শাদি বিন মুহাম্মাদ আলু নুমান (কুয়েত : আল-হাইআতুল আম্মাহ লিল ইনায়াতি বি তিবাআতি ওয়া নাশরিল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ এবং শারিকাতু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২১১।

445 আল-হুমাইদি, ***মুসনাদুল হুমাইদি,*** খ. ১, পৃ. ৩৫।

«جَالَسْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَهَا».

“আমি উনিশ বছর অথবা তার কাছাকাছি সময়কাল যাবৎ সুফইয়ান ইবনু উয়াইনার সাহচর্য লাভ করেছি।”[446]

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেন :

«مَا رَأَيْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ، أَحْفَظَ مِنَ الحُمَيْدِيِّ، كَانَ يَحْفَظُ لِسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ عَشْرَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ».

“আমি কফ-শ্লেষ্মাজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে আল-হুমাইদির চেয়ে অধিক মুখস্থশক্তিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনার দশ হাজার হাদিস মুখস্থ জানতেন।”[447]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-হারাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০১ হি.) বলেছেন :

«قدمت مكة سنة ثمان وتسعين، ومات ابن عيينة في أول السنة قبل قدومي لسبعة أشهر؛ فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة، فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه».

“আমি ১৯৮ হিজরি সনে মক্কায় এসেছিলাম। সেই বছরের শুরুর দিকে আমার আগমনের সাত মাস আগেই ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ মারা যান। তখন আমি ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করি। আমার কাছে হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়। তখন আমি হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর হাদিস লিখে নিই।”[448]

---

[446] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১০, পৃ. ৬১৭।

[447] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১০, পৃ. ৬১৮।

[448] ইবনু আবি হাতিম, ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল,*** খ. ৫, পৃ. ৫৭।

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ আমাদের দেওয়া পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন। মহান আল্লাহ তাঁকে বিরাট ইলম, পরহেজগারি ও খ্যাতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তিনি একজন তাবে-তাবেয়ি বিদ্বান। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদিস, বিশিষ্ট ফাকিহ, মহান ইমাম, শাইখুল ইসলাম। ১০৭ হিজরিতে তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮ হিজরিতে মারা যান।[449]

আমরা দেখলাম, ইমাম হুমাইদির বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **"কুরআন আল্লাহর কথা। যে বলে, *'কুরআন সৃষ্ট,'* সে বিদাতি।"** কুরআন যে মহান আল্লাহর কথা; মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়, সে বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে দলিলপ্রমাণ সহকারে বিশদ আলোচনা করেছি। এখন আমাদের জানা দরকার, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, তার বিধান কী হবে।

ইমাম সুফইয়ান উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, সে বিদাতি। মনে রাখা জরুরি—**ধর্মচ্যুত করা, বা না-করার দৃষ্টিকোণ থেকে বিদাত দুই প্রকার। যথা :**

এক. আল-বিদআতুল মুকাফফিরা তথা কাফিরকারী বিদাত; যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

দুই. আল-বিদআতুল মুফাসসিকা তথা ফাসিককারী বিদাত; যা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

---

[449] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ৮, পৃ. ৪৫৪-৪৭৪; আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***তাকরিবুত তাহজিব,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়ামা (সিরিয়া : দারুর রশিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৪৫।

বিদাতের এই দুই প্রকারের প্রতি ইঙ্গিত করে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন আল্লামা শাতিবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯০ হি.)।[450]

কুরআনকে মাখলুক বলা—প্রথম শ্রেণির বিদাত তথা কাফিরকারী বিদাত। এজন্য **ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :**

«الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ ﷻ، مَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ».

"কুরআন মহান আল্লাহর কথা। যে বলে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে কাফির। যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে-ও কাফির।"[451]

এরপর ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, **"আমরা কাউকে এই কথা বলতে শুনিনি।"** অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাহর কাউকে আমরা 'কুরআনকে মাখলুক' বলতে শুনিনি। কারণ এটা জাহমি ও মুতাজিলিদের কুফরি আকিদা। যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তারা আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

---

[450] ইবরাহিম বিন মুসা আশ-শাতিবি আল-গারনাতি, ***আল-ইতিসাম,*** তাহকিক : সালিম বিন ইদ আল-হিলালি (সৌদি আরব : দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৩, খ. ২, পৃ. ৫১৬।

[451] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১১২।

যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তাদের ব্যাপারে সালাফদের সিদ্ধান্ত :

যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তাদের ব্যাপারে সালাফগণ কী রায় দিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে কেমন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, সেটা সুস্পষ্টভাবে জানা জরুরি। এ ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে কিছু বক্তব্য জেনেছি। এখানে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বক্তব্য পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

১. মুসা বিন ইবরাহিম আল-ওয়াররাক থেকে বর্ণিত, তাবে-তাবেয়ি বিদ্বান **ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮১ হি.) বলেছেন :**

«سَمِعْتُ النَّاسَ مُنْذُ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْبَتَّةَ. قُلْتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّ امْرَأَتَهُ مُسْلِمَةٌ، وَمُسْلِمَةٌ لَا تَكُونُ تَحْتَ كَافِرٍ».

"আমি উনপঞ্চাশ বছর যাবৎ লোকদেরকে (সুন্নাহপন্থি বিদ্বানবর্গকে) বলতে শুনেছি, 'যে বলবে, "*কুরআন মাখলুক,*" তার স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে তিন তালাকপ্রাপ্ত'।" আমি বললাম, "কেন এমন হবে?" তিনি বললেন, "কারণ তার স্ত্রী মুসলিম নারী। আর মুসলিম নারী কখনোই কাফিরের অধীনে থাকতে পারে না।"[452]

ইমাম ইবনুল মুবারাকের উক্তিটি বর্ণনা করার পর **ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১৮ হি.) লিখেছেন :**

«فَقَدْ لَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَغَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ فِي وَقْتِهِ أَكْثَرُ رِحْلَةً مِنْهُ، وَأَكْثَرُ طَلَبًا

[452] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ২৭০।

لِلْعِلْمِ، وَأَجْمَعُهُمْ لَهُ، وَأَجْوَدُهُمْ مَعْرِفَةً بِهِ، وَأَحْسَنُهُمْ سِيرَةً، وَأَرْضَاهُمْ طَرِيقَةً مِثْلُهُ، وَلَعَلَّهُ يَرْوِي عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ مِنَ التَّابِعِينَ. فَأَيُّ إِجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا؟».

"নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একদল তাবেয়ির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যেমন সুলাইমান আত-তাইমি, হুমাইদ আত-তাবিল এবং আরও অনেকে। তাঁর সময়ে মুসলিমদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁর চেয়ে বেশি সফর করেছেন, তাঁর সমান ইলম অন্বেষণ করেছেন, তাঁর সমান ইলম সংগ্রহ করেছেন, তাঁর সমান ইলমে পারদর্শী ছিলেন, তাঁর সমান উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁর সমান সন্তোষজনক পথে ছিলেন। এবং সম্ভবত তিনি এক হাজার তাবেয়ি শাইখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে এর চেয়ে শক্তিশালী ইজমা (সর্ববাদিসম্মত অভিমত) আর কী হতে পারে?"[453]

২. বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ি বিদ্বান **ইমাম ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৭ হি.) বলেছেন :**

«من شكّ أَن الْقُرْآن كَلَام الله يَعْنِي غير منزل فَهُوَ كَافِر، وَمن لم يشْهد أَنه منزل غير مَخْلُوق فَهُوَ كَافِر **بِالْإِجْمَاع**».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কথা কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ করে, অর্থাৎ মনে করে আল্লাহর কথা কুরআন অবতীর্ণ হয়নি, সে কাফির। আর কুরআন যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা মাখলুক নয়, এই সাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয় না, সে **সর্বসম্মতিক্রমে** কাফির।"[454]

৩. বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ি বিদ্বান **ইমাম ইয়াজিদ বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৬ হি.) বলেছেন :**

---

[453] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ২৭০।

[454] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ১৫৮।

«مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ».

"যে ব্যক্তি বলে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে কাফির। যে ব্যক্তি তাকে কাফির বলে না, সে-ও কাফির। যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে-ও কাফির।"[455]

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :

«من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. ومن شك فى كفره فهو كافر».

"যে ব্যক্তি বলে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে কাফির। যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে-ও কাফির।"[456]

৫. সালাফদের ইজমায়ি আকিদার বিবরণ দিতে যেয়ে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَكَلَّمَ بِهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ: فَهُوَ جَهْمِيٌّ كَافِرٌ».

"কুরআন আল্লাহর কথা, যা আল্লাহ বলেছেন। কুরআন মাখুলক (সৃষ্ট) নয়। যে ব্যক্তিই দাবি করে, *'কুরআন মাখলুক,'* সে জাহমি কাফির।"[457]

৬. সালাফদের যুগের সাড়ে পাঁচশো বিদ্বান বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে, সে কাফির। ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১৮ হি.) উক্ত সাড়ে পাঁচশো বিদ্বানের নাম উল্লেখ করেছেন। **এরপর বলেছেন :**

---

[455] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৬, পৃ. ৫৭।

[456] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. খ. ১, পৃ. ১৭৯।

[457] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফি ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৬৪।

«قَالُوا كُلُّهُمْ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ. فَهَؤُلَاءِ خَمْسُ مِائَةٍ وَخَمْسُونَ نَفْسًا أَوْ أَكْثَرُ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّينَ سِوَى الصَّحَابَةِ الْخَيِّرِينَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَمُضِيِّ السِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ. وَفِيهِمْ نَحْوٌ مِنْ مِائَةٍ إِمَامٍ مِمَّنْ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِمْ وَتَدَيَّنُوا بِمَذَاهِبِهِمْ، وَلَوِ اشْتَغَلْتُ بِنَقْلِ قَوْلِ الْمُحَدِّثِينَ لَبَلَغَتْ أَسْمَاؤُهُمْ أُلُوفًا كَثِيرَةً، لَكِنِّي اخْتَصَرْتُ وَحَذَفْتُ الْأَسَانِيدَ لِلِاخْتِصَارِ، وَنَقَلْتُ عَنْ هَؤُلَاءِ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ قَوْلَهُمْ اسْتَتَابُوهُ أَوْ أَمَرُوا بِقَتْلِهِ أَوْ نَفْيِهِ أَوْ صَلْبِهِ».

“তাঁরা সবাই বলেছেন, ‘কুরআন মহান আল্লাহর কথা। এটা মাখলুক নয়। যে বলে, *“কুরআন মাখলুক,”* সে কাফির।’ এ কথা বলেছেন পাঁচশো পঞ্চাশজন কিংবা তারও বেশি সংখ্যক ব্যক্তি; যাঁরা কেউ সাহাবি ছিলেন না। তবে তাঁরা ছিলেন যুগে যুগে এবং বছরের পর বছর ধরে আগত তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি এবং গ্রহণযোগ্য ইমাম। তাঁদের মধ্যে প্রায় একশোজন এমন ইমাম আছেন, যাঁদের বক্তব্য মানুষজন গ্রহণ করেছে এবং যাঁদের মাজহাব অনুযায়ী দ্বীন পালন করেছে। যদি আমি মুহাদ্দিসদের বক্তব্যগুলোও বর্ণনা করতাম, তাহলে তাঁদের নামের সংখ্যা হাজার-হাজার হয়ে যেত! কিন্তু আমি সংক্ষেপ করার জন্য বক্তব্যগুলো কমিয়ে এনেছি এবং বর্ণনাসূত্রও বাদ দিয়েছি। আমি যুগের পর যুগ ধরে আগত এসব ব্যক্তির এই সাক্ষ্য উল্লেখ করেছি। কোনো যুগেই তাঁদের এই কথার বিপরীতে কেউ আপত্তি করেনি। কেউ যদি তাঁদের এই আকিদার বিরোধিতা করত, তাহলে তাঁরা তাকে তওবা করতে

বলতেন। অন্যথায় তাকে হত্যা করার, কিংবা নির্বাসনে পাঠানোর, কিংবা শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিতেন।”[458]

এ কারণে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) **তাঁর *‘নুনিয়্যাহ’* কাব্যগ্রন্থে বলেছেন :**

ولقد تقلَّد كفرَهُم خَمْسُونَ فِي ... عَشْرٍ مِنَ العُلَماءِ في البُلْدَانِ

واللالَكَائِيُّ الإمامُ حَكَاهُ عَنْـ .... ـهُم بَلْ حَكَاهُ قبلَهُ الطَّبَرانِي.

“নিশ্চয় (কুরআনকে যারা মাখলুক বলে) তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি পোষণ করেছেন বিভিন্ন অঞ্চলের পাঁচশজন আলিম। ইমাম লালাকায়ি তাঁদের থেকে এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন; বরং তাঁর আগেই তা বর্ণনা করেছেন আত-তাবারানি।”[459]

৭. ইমাম আব্দুল গনি আল-মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬০০ হি.) বলেছেন :

«وأجمع أئمة السلف، والمُقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر».

“সালাফদের ইমামগণ এবং পরবর্তী যুগে যাদেরকে অনুসরণ করা হয়, তারা সবাই একমত পোষণ করেছেন, কুরআন মাখলুক নয়। যে ব্যক্তি বলে, *‘কুরআন মাখলুক,’* সে কাফির।”[460]

৮. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

---

[458] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৩৪৪।

[459] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া,*** খ. ১, পৃ. ২০৬।

[460] আব্দুল গনি বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি, ***আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : আহমাদ বিন আতিয়্যা আল-গামিদি (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৬।

«الْقَوْلُ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا مَقَالَةَ الْجَهْمِيَّة الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ مَخْلُوقًا مُنْفَصِلًا عَنْ اللَّهِ بَلْ كَفَّرُوا مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَالْكُتُبُ الْمَوْجُودَةُ فِيهَا أَلْفَاظُهُمْ بِأَسَانِيدِهَا وَغَيْرِ أَسَانِيدِهَا كَثِيرَةٌ: مِثْلُ: (كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة) لِلْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَ(الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الجعفي شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَ(الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة) لِلْحَكَمِ بْنِ مَعْبَدٍ الخزاعي وَ(كِتَابِ السُّنَّةِ) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَ(السُّنَّةِ) لِحَنْبَلِ ابْنِ عَمِّ الْإِمَامِ أَحْمَد وَ(السُّنَّةِ) لِأَبِي دَاوُد السجستاني وَ(السُّنَّةِ) لِلْأَثْرَمِ وَ(السُّنَّةِ) لِأَبِي بَكْرٍ الْخَلَّالِ وَ(السُّنَّةِ وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ) لِخُشَيْشِ بْنِ أَصْرَمَ وَ(الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة) لِعُثْمَانِ بْنِ سَعِيدٍ الدارمي. وَ(نَقْضِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى الجهمي الْكَاذِبِ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ فِي التَّوْحِيدِ) وَ(كِتَابِ التَّوْحِيدِ) لِابْنِ خُزَيْمَة وَ(السُّنَّةِ للطبراني) وَلِأَبِي الشَّيْخِ الأصبهاني وَ(شَرْحِ أُصُولِ السُّنَّةِ) لِأَبِي الْقَاسِمِ اللالكائي وَ(الْإِبَانَةِ) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ وَكُتُبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ منده وَ(السُّنَّةِ) لِأَبِي ذَرٍّ الهروي وَ(الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) للبيهقي وَ(الْأُصُولِ) لِأَبِي عُمَرَ الطلمنكي وَ(الْفَارُوقِ) لِأَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ وَ(الْحُجَّةِ) لِأَبِي الْقَاسِمِ التيمي.

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُصَنَّفَاتِ الَّتِي يَطُولُ تَعْدَادُهَا: الَّتِي يَذْكُرُ مُصَنِّفُوهَا الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتُ مَذَاهِبَ السَّلَفِ بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَةِ عَنْهُمْ بِأَلْفَاظِهِمْ الْكَثِيرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي تُعْرَفُ مِنْهَا أَقْوَالُهُمْ مَعَ أَنَّهُ مِنْ حِينِ مِحْنَةِ الْجَهْمِيَّة لِأَهْلِ السُّنَّةِ - الَّتِي جَرَتْ فِي زَمَنِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ لَمَّا صَبَرَ فِيهَا الْإِمَامُ أَحْمَد وَقَامَ بِإِظْهَارِ السُّنَّةِ وَالصَّبْرِ عَلَى مِحْنَةِ الْجَهْمِيَّة حَتَّى نَصَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالسُّنَّةَ وَأَطْفَأَ نَارَ تِلْكَ الْفِتْنَةِ

- ظَهَرَ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ وَانْتَشَرَ بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ الْمُتَّبِعِينَ لِلسَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ هُمْ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ وَالْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَمِنْ اتَّبَعَهُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْجَهْمِيَّة لَمْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ. فَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ».

“এই মতটি সালাফদের ইমামদের থেকে মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত এমন) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ‘কুরআন হলো আল্লাহর কথা; মাখলুক নয়।’ তাঁরা জাহমিদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা কুরআনকে মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সৃষ্ট বস্তু বলে দাবি করেছিল। বরং যারা এমনটা বলে, তাদেরকে সালাফগণ কাফির ঘোষণা করেছেন। এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যগুলো বর্ণনাসূত্র-সহ এবং বর্ণনাসূত্র ব্যতীত—উভয় অবস্থায় অসংখ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিমের *‘আর-রদ্দ আলাল জাহমিয়্যা’*; ইমাম বুখারির শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আল-জুফি রচিত *‘আর-রদ্দ আলাল জাহমিয়্যা’*; আল-হাকাম ইবনু মাবাদ আল-খুজায়ি রচিত *‘আর-রদ্দ আলাল জাহমিয়্যা’*; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল রচিত *‘কিতাবুস সুন্নাহ’*; ইমাম আহমাদের চাচাতো ভাই হাম্বাল বিরচিত *‘আস-সুন্নাহ’*; আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি রচিত *‘আস-সুন্নাহ’*; আল-আসরাম রচিত *‘আস-সুন্নাহ’*; আবু বাকর আল-খাল্লাল রচিত *‘আস-সুন্নাহ’*; খুশাইশ ইবনু আসরাম

রচিত *'আস-সুন্নাহ ওয়ার রদ্দু আলা আহলিল আহওয়া'*; উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি রচিত *'আর-রদ্দ আলাল জাহমিয়্যা'*; দারিমি বিরচিত *'নাকদু উসমান বিন সায়িদ আলাল জাহমিয়্যিল কাজিবিল আনিদ ফিমা ইফতারা আলাল্লাহি ফিত তাওহিদ'*; ইবনু খুজাইমা রচিত *'কিতাবুত তাওহিদ'*; তাবারানি রচিত *'আস-সুন্নাহ'*; আবুশ শাইখ আল-আসবাহানি রচিত *'আস-সুন্নাহ'*; আবুল কাসিম আল-লালাকায়ি রচিত *'শারহু উসুলিস সুন্নাহ'*; আবু আব্দুল্লাহ ইবনু বাত্তাহ বিরচিত *'আল-ইবানা'*; আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মান্দাহ বিরচিত কিতাবপত্র, আবু জার আল-হারাবি রচিত *'আস-সুন্নাহ'*; আল-বাইহাকি রচিত *'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত'*; আবু উমার আত-তালামানকি বিরচিত *'আল-উসুল'*; আবু ইসমায়িল আল-আনসারি রচিত *'আল-ফারুক'*; আবুল কাসিম আত-তাইমি বিরচিত *'আল-হুজ্জাহ'* প্রভৃতি গ্রন্থ।

এরকম গ্রন্থের সংখ্যা আরও অনেক। এসব গ্রন্থের রচয়িতাগণ ছিলেন নির্ভরযোগ্য আলিম। তাঁরা সুসাব্যস্ত বর্ণনাসূত্র সহকারে সালাফদের অভিমতগুলো উল্লেখ করেছেন। এসবের ভাষ্য ও পরিমাণ এত বেশি এবং এত ব্যাপকভাবে বর্ণিত যে, তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এছাড়াও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের যুগে আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে জাহমিদের ফিতনা ঘটেছিল। ইমাম আহমাদ জাহমিদের সেই ফিতনায় ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং সুন্নাহ তথা বিশুদ্ধ আকিদা প্রকাশ করেছিলেন। একপর্যায়ে মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও সুন্নাহকে বিজয় দান করেন এবং ফিতনার আগুন নির্বাপিত করেন। সেসময় সমগ্র ইসলামি ভূখণ্ডে, সাধারণ ও বিশেষ সকলের মাঝে স্পষ্টভাবে প্রসার লাভ করে—সাহাবিবর্গ ও তাবেয়িবৃন্দের মতো

সালাফদের অনুসারী *'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদিসের'* মাজহাব হচ্ছে—কুরআন আল্লাহর কথা; এটি মাখলুক নয়।

ইসলামের ইতিহাসে যারা সর্বপ্রথম কুরআনকে 'মাখলুক' বলার বিদাতি মত চালু করে, তারা হলো—জাদ বিন দিরহাম, জাহম বিন সাফওয়ান, এবং তাদের অনুসারী মুতাজিলা ও অন্যান্য জাহমিয়া সম্প্রদায়। সাহাবিদের কেউ এই মত বলেননি। যাঁরা উত্তমরূপে সাহাবিদের অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরও কেউ এই মত বলেননি। সুতরাং এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সুপরিচিত মত—কুরআন আল্লাহর কথা, এটি মাখলুক নয়।"[461]

[461] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৭, পৃ. ৭৪-৭৬।

কুরআন বিষয়ক আকিদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

কুরআন বিষয়ক আকিদায় কয়েকটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

প্রথম সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে, কুরআন আল্লাহর কথা। কিন্তু আল্লাহর কথা হলো মাখলুক। সুতরাং কুরআন আল্লাহর মাখলুক।[462] সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেছিল জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু জাহম বিন সাফওয়ানের শিক্ষক জাদ বিন দিরহাম। **ইমাম লালাকায়ি (মৃ. ৪১৭ হি.) লিখেছেন :**

«وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ جَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ فِي سِنِيِّ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ».

“এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, সর্বপ্রথম কুরআনকে ‘মাখলুক’ বলেছিল জাদ বিন দিরহাম ১২০ হিজরির কয়েক বছর পরের সময়কালে। এরপর এই মতবাদ প্রচার করেছিল জাহম বিন সাফওয়ান।”[463]

দ্বিতীয় সম্প্রদায় : মুতাজিলা ফের্কা

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতেও, কুরআন আল্লাহর কথা। কিন্তু আল্লাহর কথা হলো মাখলুক। সুতরাং কুরআনও আল্লাহর মাখলুক।

---

[462] আবু সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আলাল মারিসিয়্যিল জাহমিয়্যিল আনিদ ফিমা ইফতারা আলাল্লাহি মিনাত তাওহিদ,*** তাহকিক : রশিদ বিন হাসান আল-আলমায়ি (মাকাতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩৬।

[463] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৮৬।

মুতাজিলিদের মুহাক্কিক বিদ্বান কাদি আব্দুল জাব্বার আল-হামাজানি (মৃ. ৪১৫ হি.) লিখেছেন :

«وأما مذهبنا في ذلك، فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه ، وهو مخلوق محدث، أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام».

"এ বিষয়ে আমাদের মাজহাব হলো—কুরআন মহান আল্লাহর কথা ও ওহি। কিন্তু এটা নতুনভাবে সংঘটিত মাখলুক। নবিজির নবুয়তের প্রমাণ ও নিদর্শন হিসেবে মহান আল্লাহ এটা নবিজির ওপর নাজিল করেছেন। তিনি আমাদের জন্য এটাকে বিধিবিধান নির্ধারণের নির্দেশিকা করেছেন। যেন আমরা হালাল-হারাম জানার উদ্দেশ্যে উক্ত নির্দেশিকার দিকে ফিরে যাই।"[464]

পরবর্তীতে খারেজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো উপদল মুতাজিলিদের এই আকিদা গ্রহণ করেছে। বর্তমান যুগে খারেজিদের *'ইবাদিয়্যা'* উপদল, এবং শিয়াদের *'রাফিদি'* ও *'জাইদি'* উপদলের মধ্যে এই আকিদা বিদ্যমান রয়েছে।[465] জাহমিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এই আকিদা যে বড়ো কুফর, সে বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। আমরা এটাও জেনেছি যে, সালাফগণ এই আকিদা পোষণকারীকে কাফির বলেছেন।

---

[464] আব্দুল জাব্বার আল-মুতাজিলি, ***শারহুল উসুলিল খমসা,*** তাহকিক : আব্দুল কারিম উসমান (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫২৮।

[465] সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*** (মানসুরা : দারুল মাওয়াদ্দা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮৫-২৮৬।

তৃতীয় সম্প্রদায় : আশারি-মাতুরিদি

কালামি স্কুলস অফ থটের অন্যতম দুটো ফের্কা আশারি সম্প্রদায় এবং মাতুরিদি সম্প্রদায়। কুরআন বিষয়ে এদের আকিদা অভিন্ন। আশারি-মাতুরিদি গোষ্ঠীর লোকেরা মনে করে, **কুরআন দুটো—**

(১) যেই কুরআন আল্লাহর কালামুন নাফসিতে আছে, তথা আল্লাহর নাফসে আছে; অর্থাৎ আল্লাহর ইলমে আছে। এই কুরআন আল্লাহর কথা। এটা আল্লাহর সিফাত; মাখলুক নয়।

(২) যেই কুরআন আরবি ভাষায় পড়া যায়, যেই কুরআন মহান আল্লাহর নিকট থেকে নাজিল হয়েছে, যেই কুরআনে শব্দ ও বর্ণ আছে। এই কুরআন সরাসরি আল্লাহর কথা নয়! বরং এটা আল্লাহর কথার ভাব, কিংবা হুবহু বিবরণ। এই কুরআন মাখলুক![466]

মুসলিমদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ ধরনের আকিদা প্রকাশ করেছিলেন *'কুল্লাবিয়্যা'* ফের্কার প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িদ ইবনু কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.)। পরবর্তীতে আশারি-মাতুরিদি গোষ্ঠীও এই আকিদা গ্রহণ করে এবং এই আকিদার পৃষ্ঠপোষকতা করে।[467] আশারি ও মাতুরিদি বিদ্বানগণ বিশ্বাস করেন, মনের অব্যক্ত ভাবনাকেই 'কথা' বলা হয়। তাঁরা নিজেদের এই আকিদার পক্ষে খ্রিষ্টান কবি আখতালের একটি পঙ্‌ক্তি দিয়ে দলিল দেন—

«إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَ إِنَّمَا ... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلَا»

---

[466] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৬০; আবুল ইউসর আল-বাজদাবি, ***উসুলুদ দিন,*** তাহকিক : হ্যান্স পিটার লেনজ (কায়রো : আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৬৮।

[467] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪৯৭।

“নিশ্চয় ‘কথা’ তো তাকেই বলে, যা অন্তরে থাকে। মানুষের জবানকে তো কেবল (অন্তরস্থ কথার) দলিল বানানো হয়েছে।”[468]

আমাদের দেশের দেওবন্দি কওমি মাদরাসাগুলোতে আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদা শেখানো হয়। হানাফি দেওবন্দিদের ‘বেফাকুল মাদারিস’ শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত *‘শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা’* কিতাবে এই মাসআলায় মুতাজিলিদের সাথে আশারি-মাতুরিদিদের মতপার্থক্যের সুনির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে আশারি দার্শনিক **আত-তাফতাজানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) লিখেছেন :**

«وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي».

“কালামুন নাফসি সাব্যস্ত করা ও না-করাই—আমাদের আর মুতাজিলাদের মধ্যে মতপার্থক্যের আসল জায়গা। অন্যথায় আমরা কুরআনের শব্দ ও বর্ণগুলোকে ‘কদিম (অসৃষ্ট অনাদি)’ বলি না। আর তারাও আল্লাহর ‘কালামুন নাফসিকে’ সৃষ্ট বলে না।”[469]

এটা ছাড়া আশারি-মাতুরিদিরা মুতাজিলিদের সাথে এ বিষয়ে বিলকুল একমত যে, আরবি ভাষার কুরআন হলো মাখলুক। এজন্যই

---

[468] আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুয়াইনি, ***লুমাউল আদিল্লাহ ফি কাওয়ায়িদি আকায়িদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ,*** তাহকিক : ফাওকিয়্যা হুসাইন মাহমুদ (বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১০৩-১০৪; জামালুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজনাবি আল-হানাফি, ***কিতাবু উসুলিদ্দিন,*** তাহকিক : উমার ওয়াফিক আদ-দাউক (বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১০২।

[469] আত-তাফতাজানি, ***শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা,*** পৃ. ১৬৫-১৬৬; হাবিবুর রহমান, ***সহজ শরহে আকাইদ,*** খ. ১, পৃ. ২০৫।

আশারিদের সমকালীন বিদ্বান **মুহাম্মাদ সায়িদ রমাদান আল-বুতি (মৃ. ১৪৩৪ হি.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন :**

«أما العبارات نفسها فألفاظ حادثة مخلوقة من الله، كما اتفقنا (يعني الأشاعرة والمعتزلة) جميعاً، فهي ليست صفة الله تعالى ولكنها مخلوق من مخلوقاته، وليس الكلام إلا عبارة عن هذا. ... وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه مخلوق».

"পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যগুলো নতুনভাবে সংঘটিত শব্দগুচ্ছ; যেগুলোকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমরা সবাই (অর্থাৎ আশারি ও মুতাজিলা সম্প্রদায়) একমত হয়েছি। কুরআনের ইবারত তথা বাক্যগুলো মহান আল্লাহর সিফাত নয়, বরং এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিরাজির অন্যতম সৃষ্টি। কুরআনের কথাগুলো মহান আল্লাহর প্রকৃত কথার ভাব তথা মর্মার্থ ছাড়া কিছুই নয়। ... কুরআনের যেই কথা উচ্চারণযোগ্য, সে ব্যাপারে আশারি ও মুতাজিলা সবাই একমত—কুরআনের উক্ত কথা মাখলুক।"[470]

দেওবন্দিদের 'বেফাকুল মাদারিস' শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত ***'শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা'*** **কিতাবের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :**

"শারিহ রহ. নিছক الْقُرْآن مَخْلُوق বলেননি, বরং القُرآنُ এর পর কালামুল্লাহ শব্দটিও যুক্ত করেছেন। কেননা মাশায়েখে কিরাম লিখেছেন, الْقُرْآن مَخْلُوق না বলে যেন الْقُرْآن كَلامُ الله غَيْرُ مَخْلُوق বলা হয়। **কেননা সমাজ কুরআন দ্বারা পঠিতব্য শব্দ এবং কালামে লফযী বুঝে। যেটি হরফ এবং স্বর দ্বারা**

[470] মুহাম্মাদ সায়িদ রমাদান আল-বুতি (মৃ. ১৪৩৪ হি.), ***কুবরাল ইয়াকিনিয়্যাতিল কাওনিয়্যা উজুদুল খালিকি ওয়া ওয়াজিফাতুল মাখলুক*** (দামেস্ক : দারুল ফিকর, ৪৩শ প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ১২৬।

সংযুক্ত হওয়ার কারণে নশ্বর। সুতরাং القرآن غَيْرٌ مَخْلُوق বলা হলে প্রসিদ্ধির কারণে মন **পঠিতব্য শব্দ অসৃষ্ট হওয়ার দিকে ধাবিত হবে।** অথচ পঠিতব্য শব্দ **সৃষ্ট ও নশ্বর।**"[471]

আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদা আরও খুল্লাম-খুল্লা আলোচনা করেছেন মাতুরিদিদের সমকালীন পণ্ডিত মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি (মৃ. ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.)। **তিনি লিখেছেন :**

«والواقع أن القرآن في اللوح وفى لسان جبريل عليه السلام وفى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنة سائر التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة. ومن ينكر ذلك يكون مسفسطا ساقطًا من مرتبة الخطاب، وإنما القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام النفسي في علم الله».

"প্রকৃতপক্ষে, যেই কুরআন লাওহে মাহফুজে আছে, যেই কুরআন জিবরিল আলাইহিস সালামের জবানে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে, এবং সকল তেলাওয়াতকারীর জবানে পঠিত হয়েছে, যেই কুরআন তেলাওয়াতকারীদের অন্তরে ও ফলকে রয়েছে, সেই কুরআন হলো নতুনভাবে সংঘটিত মাখলুক। এটা একেবারে সুসাব্যস্ত অকাট্য বিষয়। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করে, সে মূলত কুযুক্তিবাদী (sophist); 'তার সাথে আলোচনায় যাওয়ার মতো যোগ্যতাও' সে হারিয়ে ফেলেছে। পক্ষান্তরে যেই কুরআন *'কদিম তথা অসৃষ্ট অনাদি'*, সেটা মহান আল্লাহর সত্তায় বিদ্যমান

[471] হাবিবুর রহমান, ***সহজ শরহে আকাইদ,*** খ. ১, পৃ. ২০৫।

অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়;[472] অর্থাৎ কালামুন নাফসি, যা আল্লাহর ইলমের মধ্যে বিরাজ করে।"[473]

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, আশারি-মাতুরিদিদের মতে, কুরআন দুটো। যেই কুরআন মহান আল্লাহর সত্তায় আছে, সেটা তাঁর কথা। এটা মাখলুক নয়। পক্ষান্তরে যেই কুরআন আল্লাহর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে, যেই কুরআনকে আরবি ভাষায় পড়া যায়, যেই কুরআনে অক্ষর ও আওয়াজ আছে, সেটা আল্লাহর কথা নয়। এই কুরআন হলো মাখলুক। সোজা কথায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কুরআন প্রচার করেছেন, আমরা যেই কুরআন পড়ি ও প্রচার করি, সেটা আশারি-মাতুরিদিদের মতে মহান আল্লাহর কথা নয়। বরং আল্লাহর কথার ভাব বা মর্মার্থ!

তাহলে আশারিদের মতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কার কথা?

যেহেতু আশারি-মাতুরিদিদের মতে, মানবজাতির নিকটে বিদ্যমান মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর কথা নয়, সেহেতু এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, তাহলে তাদের মতে কুরআন কার কথা? এর জবাব—আরবি ভাষার আল-কুরআন কার কথা সে বিষয়ে আশারিগণ তিনটি মতে মতভেদ করেছেন। যথা :

প্রথম মত : আমাদের কাছে যেই কুরআন আছে, সেটা জিবরিল আলাইহিস সালামের কথা। অর্থাৎ, আমরা নামাজের মধ্যে জিবরিল আলাইহিস সালামের কথা তেলাওয়াত করি!

---

[472] পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটি দিয়েও সরাসরি অনুভব করা যায় না—এমন বিষয়কে **'অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য'** বলা হয়। মানবদেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; যথা : শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ।

[473] মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি, ***মাকালাতুল কাওসারি*** (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, তাবি), পৃ. ৪৪।

দ্বিতীয় মত : আমাদের কাছে যেই কুরআন আছে, সেটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। অর্থাৎ, আমরা নামাজের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তেলাওয়াত করি!

তৃতীয় মত : আমাদের কাছে যেই কুরআন আছে, সেটাকে মহান আল্লাহ লাওহে মাহফুজে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীতে তেইশ বছর যাবৎ ধীরে ধীরে তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিল করা হয়েছে। কিন্তু এই কুরআন সত্যিকারার্থে মহান আল্লাহর কথা নয়। আবার সুনির্দিষ্ট কোনো সৃষ্টিরও কথা নয়।

এ মর্মে আশারি বিদ্বান **আল্লামা ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আল-বাইজুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২৭৬ হি./১৮৬০ খ্রি.) বলেছেন :**

«والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل المنزل : المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي، بألفاظ من عنده ، لكن التحقيق الأول، لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له : «بيت العزة» في ليلة القدر، كما قال تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر : ١]. ثم أنزله على النبي مفرقا بحسب الوقائع».

“এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হলো—কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল কুরআনের অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। আর জিবরিল আলাইহিস সালাম নিজের তরফ থেকে সেটা প্রকাশ করেছেন নিজস্ব শব্দে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কেবল কুরআনের অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরফ থেকে সেটা প্রকাশ করেছেন নিজস্ব শব্দে। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিক বিশ্লেষণধর্মী

অভিমত। কারণ মহান আল্লাহ প্রথমে কুরআনকে সৃষ্টি করেছেন লাওহে মাহফুজে। তারপর তা 'সহিফা তথা লিখিত ফলকসমূহে' রেখে নাজিল করেছেন পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের একটি স্থানে। সেই স্থানের নাম 'বাইতুল ইজ্জাহ'। এটা নাজিল করা হয়েছিল শবে কদরে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাজিল করেছি কদরের রাতে।' (*সুরা কদর ৯৭:১*) এরপর তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ধাপে ধাপে নাজিল করা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে।"[474]

আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদার প্রতি ইঙ্গিত করে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :**

«اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ الْـ ... ـعَرَبِيُّ مَخْلُوقًا مَنَ الأَكْوَانِ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْـ ... ـمَلَكِيُّ أَنْشَاهُ عَنِ الرَّحْمنِ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ الْـ ... ـبَشَرِيُّ أَنْشاهُ لَنَا بِلِسَانِ

هَذِي مَقَالَاتٌ لَكُمْ يَا أُمَّةَ التَّـ ... ـشْبِيهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى إِيمَانِ

شَبَّهْتُمُ الرَّحْمنَ بالأَوْثَانِ فِي ... عَدَمِ الكَلَامِ وَذَاكَ لِلأَوْثَانِ

مِمَّا يَدُلُّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِآ ... لِهَةٍ وَذَا البُرْهَانُ فِي القرآنِ».

ভাবানুবাদ : "কুরআনের 'আরবি ভাষার কথাকে' সৃষ্টিজগতের কোনো সৃষ্টি বলার মত থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। বস্তুত আল্লাহ হলেন সবচেয়ে মহান।

দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা-রসুল জিবরিল আলাইহিস সালাম কুরআনের কথা নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছেন, এমন কথা বলা

[474] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৬২।

থেকেও আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। বস্তুত আল্লাহ হলেন সবচেয়ে মহান।

আবার মানব-রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জবান দিয়ে কুরআনের কথা উদ্ভাবন করেছেন, এমন কথা বলা থেকেও আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। বস্তুত আল্লাহ হলেন সবচেয়ে মহান।

হে সাদৃশ্যবাদী মুশাব্বিহা সম্প্রদায়, এগুলো তোমাদের মতবাদ। তোমরা তো ইমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও।

'আল্লাহ সত্যিকারার্থে কথা বলেন না,' দাবি করে তোমরা দয়াময় আল্লাহকে মূর্তির সাথে সাদৃশ্য দিয়েছ। কারণ কথা বলতে না পারা তো মূর্তিরই বৈশিষ্ট্য!

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূর্তিরা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। এই যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে।"[475]

[475] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৮৮৯।

আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদার বিধান :

খাঁটি জাহমিদের আকিদার মতো আশারি-মাতুরিদিদের এই আকিদাও বড়ো কুফর। জেনেশুনে এই আকিদা পোষণ করলে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، يستتاب. فإن تاب و إلا قتل».

"যে ব্যক্তি বলে, *'আমার উচ্চারিত কুরআন মাখলুক,'* সে কাফির। তাকে (এই আকিদা থেকে) তওবা করতে বলা হবে। সে তওবা করলে তো ভালো; নচেৎ তাকে (মুরতাদ হিসেবে) হত্যা করতে হবে।"[476]

অনেকে সালাফগণের কথা ভুলভাবে বুঝতে পারেন। তাই তাঁদের এ জাতীয় কথার ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি। *আমরা যখন কুরআন পড়ি, তখন আমাদের আওয়াজ মাখলুক; কিন্তু আমরা যেটা পড়ছি সেটা আল্লাহর কথা, যা মাখলুক নয়। কুরআন যখন মুসহাফে লেখা হয়, তখন লেখার সামগ্রী তথা কালি ও কাগজ মাখলুক; কিন্তু যেটা লেখা হচ্ছে সেটা আল্লাহর কথা, যা মাখলুক নয়।*

এজন্য **আমাদের ইমামগণ বলতেন :**

«الْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِي وَالصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِئِ».

"কুরআনের কথা মূলত মহান স্রষ্টা আল্লাহরই কথা। আর কুরআন-পাঠের আওয়াজ হলো পাঠকের আওয়াজ।"[477]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

---

[476] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ৩২৮।

[477] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১২, পৃ. ৯৮; আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (দারু হাজার, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ৩৮৫।

«هُوَ قَولُ رَبّي آيُه وحُروفُهُ ... وَمِدَادُنَا والرَّقُّ مَخْلُوقانِ»

“কুরআনের আয়াত ও অক্ষরগুলো আমার রবেরই কথা। পক্ষান্তরে আমরা যেই কালি ও কাগজ দিয়ে তা লিখেছি, সেই কালি ও কাগজ হলো মাখলুক।”[478]

আমাদের উচ্চারিত আরবি ভাষার কুরআনকে যারা মাখলুক বলে, তাদেরকে সালাফদের যুগের পঞ্চাশের অধিক ইমাম কাফির ফতোয়া দিয়েছেন। পঞ্চাশের অধিক ইমামের নাম সহকারে এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১৮ হি.)। তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করার পর **ইমাম লালাকায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ. وَقَالُوا: هَذِهِ مَقَالَتُنَا وَدِينُنَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ».

“তাঁরা বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলে, *“আমার উচ্চারিত কুরআন মাখলুক,”* সে ওই ব্যক্তির মতোই, যে বলে, *“কুরআন হলো মাখলুক”।*’ তাঁরা বলেছেন, ‘এটাই আমাদের মতাদর্শ এবং আমাদের দ্বীন, যা দিয়ে আমরা আল্লাহর দ্বীন পালন করে থাকি’।”[479]

---

[478] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৮৯০।

[479] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৩৮৫-৩৮৭।

ইমান কমতে-কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ কুরআন বিষয়ক আকিদা উল্লেখ করার পর বলেছেন—

وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : «الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبْرَاهِيمُ بن عُيَيْنَةَ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ لَا تَقُلْ يَنْقُصُ»، فَغَضِبَ؛ وَقَالَ : «اسْكُتْ يَا صَبِيُّ؛ بَلْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شيء».

আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, "ইমান হলো কথা ও কাজ; তা বাড়ে এবং কমে।" এ শুনে তাঁর ভাই ইবরাহিম বিন উয়াইনা বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ, *'ইমান কমে যায়'*—এটা বলবেন না।" তখন তিনি রেগে যেয়ে বললেন, "চুপ করো, হে বালক! বরং (ইমান এমনও কমে যেতে পারে যে, কমতে-কমতে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"

অর্থাৎ, ইমাম হুমাইদি পুনরায় ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদা আলোচনা করেছেন। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, **ইমাম হুমাইদি কেন ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদা পুনরায় আলোচনা করলেন?** এর কারণ হতে পারে, তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের শিক্ষক ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতিগুলো এক জায়গায় উল্লেখ করতে চেয়েছেন। তাই কুরআন বিষয়ক আকিদায় ইমাম সুফইয়ানের বক্তব্য উল্লেখ করার পর ইমানের পরিচয় বিষয়েও তাঁর উক্তি উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইমাম সুফইয়ানের আলোচ্য উক্তি থেকে জানা যায়, *'ইমান কমে যায়'* বলা থেকে বিরত থাকা যাবে না। বরং স্পষ্টভাবে বলতে হবে,

ইমান যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি কমেও যায়। যারা বলে, *"ইমান শুধু বাড়ে, কিন্তু কমে না,"* তারা মুরজিয়াদের আকিদায় নিপাতিত হয়েছে।

ইমাম খাল্লাল রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *'আস-সুন্নাহ'* কিতাবে পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, **"মুরজিয়াদের খণ্ডন—যারা বলে, ইমান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না।"** তিনি উক্ত পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন :

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَاصِلٍ الْمُقْرِئُ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: مَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، وَهُوَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، قَالَ: «هَذَا قَوْلُ الْمُرْجِئَةِ».

আমাকে মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওয়াসিল আল-মুকরি জানিয়েছেন, আবু আব্দুল্লাহ তথা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "যে ব্যক্তি বলে, 'ইমান হলো স্রেফ কথা, কোনো কাজ নয়। আর ইমান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না' (তার বিধান কী হবে?)।" ইমাম আহমাদ জবাবে বলেছেন, "এটা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ।"[480]

সালাফদের ইজমায়ি আকিদার বিবরণ দিতে যেয়ে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ. وإن قال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول المرجئة».

"কেউ যদি মনে করে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তাহলে সে একজন মুরজিয়া। আর কেউ যদি বলে, *'ইমান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না,'* তাহলে সে মূলত মুরজিয়াদের কথাই বলেছে।"[481]

বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেছেন :**

---

[480] আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৬৯-৫৭০।

[481] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফি ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৩৬।

«الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَاحْذَرُوهُ، فَإِنَّهُ مُبْتَدِعٌ».

"ইমান হলো কথা ও কাজ, তা বেড়ে যায়, এবং কমেও যায়। যে ব্যক্তি মনে করে, ইমান শুধু বাড়ে, কিন্তু কমে না; আপনারা তার থেকে সাবধান থাকবেন। কারণ সে বিদাতি।"[482]

'ইমান কমতে কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'—এ ধরনের কথা আরও সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন **উকবা বিন আলকামা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْإِيمَانِ، أَيَزِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى يَكُونَ كَالْجِبَالِ، قُلْتُ: فَيَنْقُصُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ».

"আমি আল-আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহকে ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইমান কি বৃদ্ধি পায়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। এমনকি তা পাহাড়ের মতো হয়ে যায়!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইমান কি কমে যায়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। এমনকি (কমতে-কমতে) তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"[483]

'ইমান কমতে-কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'—কথাটির ব্যাখ্যা কী?

ইমান কমতে কমতে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে? এর মানে কি *'কুফর নয় এমন পাপে'* লিপ্ত থাকলেও ব্যক্তির ইমান শেষ হয়ে কাফির হয়ে যায়?! বিষয়টি আসলে এমন নয়। আলোচ্য বক্তব্যটির ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা যায়। যেমন :

---

[482] আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ২, পৃ. ৬০৭।

[483] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৫, পৃ. ১০৩০।

(১) সাধারণ পাপকাজ অনেক সময় কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। পাপকাজের ওপর অটল থাকার দরুন কখনো কখনো পাপী লোক কুফরিতে লিপ্ত হয়ে নিজের ইমান নষ্ট করে ফেলে। ফলে তার সকল আমল পণ্ড হয়ে যায়। এজন্য **সালাফগণ বলতেন :**

«الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ».

"পাপকাজ কুফরের দূত।"[484] অর্থাৎ সাধারণ পাপাকাজও পাপীকে কুফরের দিকে ঠেলে দেয়।

(২) বান্দা কোনো ওজর ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায়যোগ্য সমুদয় ফরজ আমল পরিত্যাগ করলে তার ইমান আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ সমুদয় ফরজ আমল ত্যাগ করা বড়ো কুফর, যা আমরা ইতোমধ্যে দলিলপ্রমাণ সহকারে আলোচনা করেছি।

---

[484] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৩৪৬; ইবনু রজব, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১, পৃ. ১৯৭।

অধ্যায় ৫

পরকালে আল্লাহকে দেখার প্রতি ইমান

মূলপাঠ



وَالْإِقْرَارُ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ المَوْتِ.

মৃত্যুর পর যে আল্লাহকে দেখা যাবে, সেটা স্বীকার করা।

ব্যাখ্যা



ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্নাহর পঞ্চম মূলনীতি আলোচনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার একটি অন্যতম মূলনীতি হলো—মুমিনগণ যে পরকালে আল্লাহকে দেখবেন, সেটার প্রতি ইমান রাখা। এই মূলনীতির গুরুত্ব বিবেচনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) মন্তব্য করেছিলেন :**

«ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ... ويعدون من أنكر الرؤية معطلًا».

“মহান আল্লাহকে দেখার বিষয়টি ছিল সিফাত-সাব্যস্তকারী আহলুস সুন্নাহ এবং জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে

বড়ো পার্থক্যকারী বিষয়। এমনকি 'আহলুল হাদিস ওয়াস সুন্নাহর' আলিমগণ মহান আল্লাহকে দেখার প্রমাণস্বরূপ স্বতন্ত্র কিতাবপত্র রচনা করতেন। ... আর যারা আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করত, তাদেরকে তাঁরা *'মুআত্তিল'* তথা *'আল্লাহর সিফাত-অস্বীকারকারী'* গণ্য করতেন।"[485]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«وَهَذِهِ «الْمَسْأَلَةُ» مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي كَانَ يَشْتَدُّ نَكِيرُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِيهَا».

"আর এই বিষয়টি এমন মৌলিক বিষয়গুলোর একটি, যেসবের ক্ষেত্রে কেউ (সুন্নাহর বিপরীতে গিয়ে) ভিন্নমত পোষণ করলে—সালাফ ও ইমামগণ তার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা প্রকাশ করতেন।"[486]

---

[485] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা ফি তাসিসি বিদায়িহিমিল কালামিয়্যা*** (মদিনা : কিং ফাহাদ গ্লোরিয়াস কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৯৪।

[486] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৪৬৯।

পরকালে আল্লাহকে দেখার দলিলপ্রমাণ

পরকালে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দেখতে পাবেন—এ বিষয়টি কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দলিল পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

"সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[487]

ইমাম লালাকায়ি তাঁর বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন :

«وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ عز وجل ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] أَتَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عز وجل؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ تَنْظُرُ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: بَلْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظَرًا».

"ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৭৯ হি.) মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' (*সুরা কিয়ামা :* ২২-২৩) প্রশ্নকারী বললেন, 'তাহলে কি তারা মহান আল্লাহকেই দেখবে?' ইমাম মালিক উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেছেন, তখন আমি বললাম, 'কিছু লোক বলে, এর অর্থ—তারা মহান আল্লাহর নেয়ামতরাজি দেখবে অথবা মহান আল্লাহর নেয়ামতরাজির প্রতীক্ষায়

[487] সুরা কিয়ামা ৭৫:২২-২৩।

থাকবে।' এ শুনে ইমাম মালিক বললেন, 'না, বরং তারা স্বয়ং আল্লাহকেই দেখবে'।"[488]

২. মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾.

"যারা ভালো আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অতিরিক্ত।"[489] আয়াতে 'উত্তম প্রতিদান' মানে জান্নাত এবং 'অতিরিক্ত' মানে মহান আল্লাহর দর্শনলাভ।[490] সালাফদের থেকে এই তাফসির সুসাব্যস্ত হয়েছে।[491]

সুন্নাহ থেকে দলিল :

১. জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ».

"তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, তেমনি তোমাদের প্রতিপালককে অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড় বা জুলুমের সম্মুখীন হবে না।"[492]

সহিহুল বুখারির বর্ণনায় এসেছে, **নবিজি বলেছেন :**

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

---

[488] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৫৫।

[489] সুরা ইউনুস ১০:২৬।

[490] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮১।

[491] আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনু খুজাইমা আন-নাইসাবুরি, ***কিতাবুত তাওহিদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রব,*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ বিন ইবরাহিম আশ-শাহওয়ান (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৩-৪৫৮।

[492] সহিহুল বুখারি, হা. ৫৫৪; সহিহ মুসলিম, হা. ৬৩৩।

“অবশ্যই তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।”[493]

২. হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, ‘তোমরা কি চাও, আমি আরও অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই?’ তাঁরা বলবেন, ‘আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেননি?’” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এরপর আল্লাহ পর্দা (আড়াল) তুলে নেবেন। বস্তুত আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো জিনিস তাদেরকে দেওয়া হয়নি।” এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, “যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং তারচেয়েও অতিরিক্ত। (*সুরা ইউনুস :* ২৬)”[494]

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন :

---

[493] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৩৫।

[494] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮১।

«وَقَدْ ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ ﷻ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ **مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا وَلَا مَنْعُهَا**».

"পরকালে মুমিনরা আল্লাহকে দেখবে—এটা সহিহ হাদিসগুলোতে সাব্যস্ত হয়েছে। হাদিসের ইমামগণের নিকটে **এটা মুতাওয়াতির সূত্রে (বিপুলসংখ্যক সনদে) বর্ণিত হয়েছে,** যা বাতিল করা কিংবা অস্বীকার করা অসম্ভব।"[495]

ইজমা থেকে দলিল :

১. ইমাম আবু জুরআহ আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) এবং ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন :

«أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ: ... وَأَنَّهُ ﷻ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، يَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ».

"আমরা হিজাজ, ইরাক, শাম ও ইয়েমেন প্রভৃতির যাবতীয় অঞ্চলের আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের সবার মতাদর্শ ছিল— ... পরকালে মহান আল্লাহকে দেখা যাবে। জান্নাতবাসীরা নিজেদের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখবেন। এবং আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে তাঁর কথা শুনবেন।"[496]

---

[495] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৮, পৃ. ২৮৭।

[496] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৯।

২. সালাফদের ইজমায়ি আকিদার বিবরণ দিতে যেয়ে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَيَنْظُرُ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِلَى وَجْهِهِ يَزُورُونَهُ؛ فَيُكْرِمُهُمْ، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ».

"জান্নাতবাসীরা আল্লাহর চেহারার দিকে তাকাবেন। তাঁরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তখন তিনি তাঁদেরকে সম্মান করবেন এবং তাঁদের সামনে প্রকাশিত হবেন।"[497]

৩. আকিদা বিষয়ে সালাফদের ইজমা (সর্ববাদিসম্মত অভিমত) বর্ণনা করতে যেয়ে আশারিদের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশআরি রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু (মৃ. ৩২৪ হি.)** কিংবা তাঁর ছাত্র **ইবনু মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেছেন :**

«وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله ﷻ يوم القيامة بأعين وجوههم».

"সালাফগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত হয়েছেন যে, মুমিনগণ কেয়ামতের দিন নিজেদের মুখমণ্ডলের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখবেন।"[498]

৪. ইমাম ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৬ হি.) বলেছেন :

«فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: ... وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال ﷻ في كتابه وعلى لسان نبيه. قال الرسول ﷺ في قول الله

---

[497] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফি ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৬৪।

[498] আল-আশআরি, ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর,*** পৃ. ১৩৪।

سبحانه: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] قال: الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى».

"দ্বীন সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে এই উম্মাহর ঐক্যমত হয়েছে, এবং যেসব সুন্নাহর বিপরীতে চলা হলো বিদাত ও ভ্রষ্টতা, সেসবের মধ্যে রয়েছে— ... পরকালে মহান আল্লাহর অলিগণ তাঁদের মুখমণ্ডলের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখবেন। আল্লাহকে দেখার সময় তাঁরা কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন স্বীয় কিতাবে এবং তাঁর নবির জবানে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যারা ভালো আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অতিরিক্ত।' (*সুরা ইউনুস :* ২৬) এই আয়াতের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উত্তম প্রতিদান মানে জান্নাত, আর অতিরিক্ত মানে মহান আল্লাহর চেহারা দেখার সৌভাগ্য'।"[499]

৫. সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করে **ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন :**

«ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم ﷻ بأبصارهم، وينظرون إليه».

"আহলুস সুন্নাহর ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য দেন, মুমিনগণ নিজেদের চোখ দিয়ে তাঁদের মহান রবকে দেখবেন এবং অবলোকন করবেন।"[500]

---

[499] আল-কাইরাওয়ানি, ***আল-জামি ফিস সুনানি ওয়াল আদাব,*** পৃ. ১০৭-১০৯।

[500] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ২৬৩।

পরকালে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার সারকথা

এক. পরকালে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে নিজেদের চোখ দিয়ে দেখবেন।

দুই. মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দেখবেন কেয়ামতের দিন।

তিন. কেবল জান্নাতে নয়, বরং একাধিক স্থলে মহান আল্লাহকে দেখা যাবে পরকালে।

চার. মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দেখবেন ওপরের দিকে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ওপরে থাকবেন, মুমিনগণ নীচ থেকে তাঁকে দেখবেন। উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমা থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে।[501]

কাফিররা কি মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে?

কাফিররা জান্নাতে মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে না। এটা একেবারে সুস্পষ্ট ও সর্ববাদিসম্মত বিষয়। পক্ষান্তরে কাফিররা কেয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামাদের মধ্যে তিনটি মতে মতভিন্নতা হয়েছে। যথা :

প্রথম মত : কাফিররা তাদের রবকে কখনোই দেখবে না। এটা পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের অভিমত। পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্য থেকেও এই মত বোঝা যায়। ইমাম আহমাদের অধিকাংশ অনুসারী এবং অন্য কিছু বিদ্বানও এই মত পোষণ করেছেন।

---

[501] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ১৪৪।

দ্বিতীয় মত : মুমিনদের সাথে সাথে সেসব মুনাফিকও কেয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহকে দেখবে, যারা বাহ্যিকভাবে তাওহিদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ মুনাফিকদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন, ফলে তারা পরে আর তাঁকে দেখতে পাবে না। এটা আহলুস সুন্নাহর কতিপয় ইমামের মত; যেমন আবু বাকর ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহ।

তৃতীয় মত : কাফিররা আল্লাহকে দেখতে পাবে। তবে তাদের দেখাটা হবে তাদের জন্য পরিচিতিমূলক ও শাস্তিস্বরূপ; যেমন একজন চোর তার শাসককে দেখে। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ কাফিরদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। যাতে তাদের শাস্তি আরও গুরুতর ও কঠোর হয়। এটা আবুল হাসান ইবনু সালিম ও তার সঙ্গীবর্গের অভিমত, যাঁরা নিজেদেরকে ইমাম আহমাদ ও সাহল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারির অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতেন।[502]

উপরিউক্ত মতভেদ বর্ণনা করার পর **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وَلَيْسَتْ هَذِهِ «الْمَسْأَلَةُ» فِيمَا عَلِمْت مِمَّا يُوجِبُ الْمُهَاجَرَةَ وَالْمُقَاطَعَةَ؛ فَإِنَّ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِيهَا قَبْلَنَا عَامَّتُهُمْ أَهْلُ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا مَنْ لَمْ يتهاجروا وَيَتَقَاطَعُوا».

"আমার জানা মতে, এটা এমন কোনো বিষয় নয়, যা পরস্পরের মধ্যে বয়কট-বর্জনকে অপরিহার্য করে তোলে। কারণ আমাদের আগে যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা-র মানুষ ছিলেন (অর্থাৎ বিদাতপন্থি ছিলেন না)। তাঁরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা একে অপরকে বয়কট-বর্জন করেননি।"[503]

---

[502] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮।

[503] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৫০২।

পরকালে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করার বিধান

মুমিনগণ যে পরকালে মহান আল্লাহকে দেখবেন, সেটাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة: فقد كفر بالله، وكذب بالقرآن. ورد على الله أمره. يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله تعالى لا يرى في الدنيا، ويرى في الآخرة».

"যে ব্যক্তি মনে করে, পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে না, সে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে এবং আল্লাহর আদেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে তো ভালো; অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। মহান আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখা যাবে না, তবে পরকালে দেখা যাবে।"[504]

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন :

«سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ فِي الرُّؤْيَةِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُرَى، فَهُوَ كَافِرٌ».

"আমি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি। তাঁর কাছে আল্লাহকে দেখার বিষয়ে এক ব্যক্তির মতাদর্শ বলা হয়েছিল। তখন তিনি রেগে যেয়ে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি বলে, *"আল্লাহকে দেখা যাবে না,"* সে কাফির'।"[505]

---

[504] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ১৪৫।

[505] আবু দাউদ, ***মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ,*** পৃ. ৩৫৩।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) লিখেছেন :

«وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ «السَّلَفِ» أَنَّ مَنْ جَحَدَ رُؤْيَةَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِلْمُ فِي ذَلِكَ عُرِّفَ ذَلِكَ كَمَا يُعَرَّفُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ».

“অধিকাংশ সালাফের মতাদর্শ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, সে কাফির। তবে সে যদি এমন লোক হয়, যার কাছে এ বিষয়ের ইলম পৌঁছেনি, তাহলে তাকে বিষয়টি জানানো হবে। যেমনভাবে ইসলামি শরিয়তের অন্যান্য বিধান যার কাছে পৌঁছেনি, তাকে সেগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে যদি ইলম পৌঁছে যাওয়ার পরও অস্বীকারের ওপর অটল থাকে, তাহলে সে ‘কাফির’ বিবেচিত হবে।”[506]

[506] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৪৮৬।

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

পরকালে আল্লাহর দর্শনলাভ সংক্রান্ত আকিদায় কয়েকটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

প্রথম সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে, মহান আল্লাহকে দেখা যাবে না—ইহকালে-পরকালে কোথাও না। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু জাহম বিন সাফওয়ান (মৃ. ১২৮ হি.) যখন *'সুমানিয়্যা'* গোষ্ঠীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, **তখন বলেছিল :**

«أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ فِي أَجْسَادِكُمْ أَرْوَاحًا؟. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ رَأَيْتُمْ أَرْوَاحَكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَسَمِعْتُمْ كَلَامَهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَشَمَمْتُمْ لَهَا رَائِحَةً؟ قَالُوا: لَا. قَالَ جَهْمٌ: فَكَذَلِكَ اللَّهُ ﷻ لَا يُرَى فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ».

"তোমরা কি দাবি করো না যে, তোমাদের দেহে আত্মা আছে?" সুমানিয়্যা গোষ্ঠীর লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, করি।" জাহম বলল, "তোমরা কি তোমাদের আত্মাকে দেখেছ?" তারা বলল, "না, দেখিনি।" সে বলল, "তোমরা কি তার কথা শুনেছ?" তারা বলল, "না, কথাও শুনিনি।" সে বলল, "তোমরা কি তার গন্ধ পেয়েছ?" তারা বলল, "না, সেটাও পাইনি।" এবার জাহম বলল, "অনুরূপভাবে মহান আল্লাহকেও দুনিয়া ও আখেরাতে কখনোই দেখা যাবে না।

তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন।"[507]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন :

«قالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ... فأيهما أولى أن نتبع: النبي ﷺ حين قال: «إنكم سترون ربكم» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟!».

"তারা বলে, 'মহান আল্লাহকে দুনিয়াতেও দেখা যাবে না, আখেরাতেও দেখা যাবে না।' ... তাহলে কার কথা অনুসরণ করা উচিত আমাদের? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *'নিশ্চয় তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।'* এই কথা অনুসরণ করা উচিত, না জাহমি লোকের কথা, যে বলে, 'তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না'!?"[508]

জাহমিয়া সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা পোষণ করে মুসলিম দাবিদার দার্শনিকরাও মহান আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।[509]

---

[507] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৬, পৃ. ৮৬।

[508] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা,*** তাহকিক : সাবরি বিন সালামা শাহিন (রিয়াদ : দারুস সাবাত, তাবি), পৃ. ১৩২।

[509] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***বুগইয়াতুল মুরতাদ ফির রদ্দি আলাল মুতাফালসিফাতি ওয়াল কারামিতাতি ওয়াল বাতিনিয়্যা,*** তাহকিক : মুসা আদ-দুওয়াইশ (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৭২।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় : মুতাজিলা ফের্কা

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতেও, মহান আল্লাহকে দেখা যাবে না। মুতাজিলি পণ্ডিত **কাদি আব্দুল জাব্বার আল-হামাজানি (মৃ. ৪১৫ হি.) লিখেছেন :**

«ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية. وهذه مسألة خلاف بين الناس. وفي الحقيقة، الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية، فأما المجسمة فهم يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسمها لما صح أن يرى، ونحن نسلم لهم أن الله تعالى لو كان جسمها لصح أن يرى، والكلام معهم في هذه المسألة لغو».

"মহান আল্লাহর ব্যাপারে যে বিষয়গুলো অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে, সেসবের একটি হলো 'আল্লাহকে দেখতে পাওয়া'। এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই বিষয়ে কেবল আমাদের আর আশারিদের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বিরোধ। যেই আশারিরা আল্লাহর দর্শনলাভ সাব্যস্ত করলেও তার কোনো ধরন-পদ্ধতি নির্ধারণ করে না। পক্ষান্তরে দেহবাদী মুজাসসিমা সম্প্রদায় এটা মেনে নেয় যে, মহান আল্লাহ যদি দেহবিশিষ্ট না হতেন, তাহলে তাঁকে দেখা সম্ভব হতো না। আমরাও তাদের সাথে এ বিষয়ে একমত—যদি মহান আল্লাহ দেহবিশিষ্ট হতেন, তাহলে তাঁকে দেখা সম্ভব হতো (যেহেতু তাঁর দেহ নেই, সেহেতু তাঁকে দেখা অসম্ভব)। সুতরাং এ বিষয়ে দেহবাদীদের সাথে বিতর্ক করা অর্থহীন।"[510]

[510] আব্দুল জাব্বার, ***শারহুল উসুলিল খমসা,*** পৃ. ২৩২-২৩৩।

জাহমি ও মুতাজিলিদের অনুসরণ করে খারেজিদের বিভিন্ন উপদল এবং বারো ইমামিয়া শিয়া গোষ্ঠীও মহান আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে। **ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :**

«الْمُخَالِفُ فِي الرُّؤْيَةِ: الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْإِمَامِيَّةِ. وَقَوْلُهُمْ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».

"মহান আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর বিপরীত মত পোষণ করেছে জাহমিয়া সম্প্রদায়, মুতাজিলা সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারী খারেজি ও ইমামিয়্যা সম্প্রদায়। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের মতাদর্শ প্রত্যাখ্যাত বাতিল।"[511]

তৃতীয় সম্প্রদায় : আশারি-মাতুরিদি

আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায় পরকালে মহান আল্লাহকে দেখার বিষয়টি আংশিক স্বীকার করে। আশারি-মাতুরিদি বিদ্বানগণ বলেন, "পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে; কিন্তু তা হবে কোনো 'দিক' ছাড়া!"[512]

এটা একদম অযৌক্তিক কথা। কারণ চোখ দিয়ে যা-ই দেখা যায়, সেটা কোনো না কোনো 'দিকে' থাকে। সুতরাং 'আল্লাহকে দেখা যাবে' বললে, এটাও স্বীকার করা জরুরি হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ ওপরে থাকবেন, আর মুমিন বান্দাগণ নীচ থেকে তাঁকে দেখবেন। কিন্তু আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায় আল্লাহর সত্তাগত ঊর্ধ্বতা তথা সত্তাগতভাবে আল্লাহর ওপরে থাকা—অস্বীকার করে। এটা যে

---

[511] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২০৭।

[512] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৯২; আল-বাজদাবি, ***উসুলুদ দিন,*** পৃ. ৮৩।

অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী আকিদা, সেটা অনেক বুদ্ধিমান আশারি পণ্ডিত বুঝতে পেরেছিলেন। বিধায় মহান আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার এই অপরিহার্য দিক থেকে বাঁচতে আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের অনেক বিদ্বান আল্লাহকে দেখার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। সেসব ব্যাখ্যার সারমর্ম হলো—আল্লাহকে দেখার অর্থ আল্লাহকে জানা! এজন্য অনেক আশারি বিদ্বান স্বীকার করে নিয়েছেন, আল্লাহকে দেখার বিষয়ে মুতাজিলিদের সাথে তাদের মতপার্থক্য স্রেফ শব্দগত মতপার্থক্য; প্রকৃত মতপার্থক্য নয়! আল্লাহর পানা চাই—আল-ইয়াজু বিল্লাহ।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«وَلِهَذَا صَارَ حُذَّاقُهُمْ إِلَى إِنْكَارِ الرُّؤْيَةِ وَقَالُوا: قَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ فِي الْبَاطِنِ؛ فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا الرُّؤْيَةَ بِزِيَادَةِ انْكِشَافٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نُنَازِعُ فِيهِ الْمُعْتَزِلَةَ».

“এ কারণে আশারিদের বুদ্ধিমান বিদ্বানগণ আল্লাহর দর্শনলাভকে অস্বীকার করার মতটিই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ‘বাহ্যত না হলেও আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে মুতাজিলিদের মতটিই আমাদের অভিমত।’ কারণ উক্ত আশারি পণ্ডিতগণ আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—অতিরিক্ত উন্মোচন বা প্রকাশ (অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান আরও প্রকাশিত হওয়া)। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের আর মুতাজিলিদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।”[513]

[513] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৬, পৃ. ৮৫।

আশারি পণ্ডিতদের বইপত্রে আমরা এ কথার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। যেমন বিখ্যাত আশারি বিদ্বান **আবু হামিদ আল-গাজালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৫ হি.) লিখেছেন :**

«إِن الرُّؤْيَة نوع كشف وَعلم إِلَّا أَنه أتم وأوضح من الْعلم».

"আল্লাহকে দেখতে পাওয়া মানে এক ধরনের উন্মোচন ও জ্ঞান। তবে এটা সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক স্পষ্ট।"[514]

আশারি দার্শনিক **ফাখরুদ্দিন আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬০৬ হি.) বলেছেন :**

«المراد من الرؤية: أن يحصل لنا انكشاف بالنسبة إلى ذاته المخصوصة. وهو يجري مجرى الانكشاف الحاصل عند إبصار الألوان والأضواء. ... فالرؤية عبارة عن هذا الانكشاف التام».

"'*আল্লাহকে দেখতে পাওয়া*' বলতে উদ্দেশ্য—আল্লাহর বিশেষ সত্তা সম্পর্কে আমাদের কাছে এক ধরনের উন্মোচন বা প্রকাশ ঘটা। বিভিন্ন রঙ ও আলো দেখার সময় (অন্তরে) যে উন্মোচন ঘটে, এটা তার মতো একটা বিষয়। ... সুতরাং '*আল্লাহকে দেখতে পাওয়া*' মানে পরিপূর্ণ উন্মোচন তথা প্রকাশ।"[515]

---

[514] আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজালি, ***কাওয়ায়িদুল আকায়িদ,*** তাহকিক : মুসা মুহাম্মাদ আলি (বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭১।

[515] ফাখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাজি, ***আল-আরবায়িন ফি উসুলিদ্দিন,*** তাহকিক : আহমাদ হিজাজি আস-সাক্কা (কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আজহারিয়্যা, তাবি), খ. ১, পৃ. ৩০৪।

বাংলাদেশে দেওবন্দিদের 'বেফাকুল মাদারিস' শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত *'শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা'* কিতাবেও আল্লাহকে দেখার এই উদ্ভট জটিল ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।[516]

আশারি পণ্ডিত **আল-আমিদি (মৃ. ৬৩১ হি.) লিখেছেন :**

«وَقد بَينا أَن البنية الْمَخْصُوصَة لَيست بِشَرْط لَهُ كَمَا مضى بل لَو خلق الله ذَلِك الْمَعْنى فِي الْقلب أَو غَيره من الْأَعْضَاء لقد كُنَّا نسمى ذَلِك مدْركا. ... وَبينا أَنه لَيْسَ الْإِدْرَاك إِلَى نوع من الْعُلُوم يخلقه الله تَعَالَى فِي الْبَصَر وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي تعلقه بالمدرك مُقَابلَة وَلَا جِهَة أصلا».

"আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি, আল্লাহকে দেখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ শর্ত নয়। বরং মহান আল্লাহ যদি সেই উপলব্ধির অর্থ (অর্থাৎ আল্লাহকে দেখার জ্ঞান) অন্তরে কিংবা অন্য কোনো অঙ্গে সৃষ্টি করেন, তবুও আমরা উক্ত উপলব্ধি হাসিলকারীকে 'মুদরিক (আল্লাহকে উপলব্ধি করেছে এমন)' বলে অভিহিত করব। ... আমরা আরও ব্যাখ্যা করেছি, এই উপলব্ধি আসলে এক ধরনের জ্ঞান, যা মহান আল্লাহ বান্দার চোখে (অথবা অন্তরে) সৃষ্টি করেন। আল্লাহকে উপলব্ধিকারীর সাথে এই জ্ঞানের যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক অনুযায়ী উক্ত জ্ঞান—মহান স্রষ্টার মুখোমুখি হওয়াকে এবং 'দিক থাকাকে' অপরিহার্য করে না।"[517]

---

[516] আত-তাফতাজানি, ***শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা,*** পৃ. ১৮৯।

[517] আবুল হাসান আলি বিন আবু আলি আল-আমিদি, ***গায়াতুল মারাম ফি ইলমিল কালাম,*** তাহকিক : হাসান মাহমুদ আব্দুল লাতিফ (কায়রো : আল-মাজলিসুল আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যা, তাবি), পৃ. ১৬৬-১৬৮।

আশারি-মাতুরিদিরা মহান আল্লাহর সত্তাগত ঊর্ধ্বতা অস্বীকার করা সত্ত্বেও আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করে—দেখে মুতাজিলিরা আশারি-মাতুরিদিদের বিরুদ্ধে স্ববিরোধিতার অভিযোগ এনেছে। আর বাস্তবেও আশারি-মাতুরিদিদের এই মত অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী। **ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছিলেন :**

«وَمَنْ قَالَ: يُرَى لَا فِي جِهَةٍ، فَلْيُرَاجِعْ عَقْلَهُ! فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُكَابِرًا لِعَقْلِهِ وَفِي عَقْلِهِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَإِذَا قَالَ يُرَى لَا أَمَامَ الرَّائِي وَلَا خَلْفَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَلَا فَوْقَهُ وَلَا تَحْتَهُ، رَدَّ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ بِفِطْرَتِهِ السَّلِيمَةِ. وَلِهَذَا أَلْزَمَ الْمُعْتَزِلَةُ مَنْ نَفَى الْعُلُوَّ بِالذَّاتِ بِنَفْيِ الرُّؤْيَةِ، وَقَالُوا: كَيْفَ تُعْقَلُ رُؤْيَةٌ بِغَيْرِ جِهَةٍ».

“যারা বলে, ‘আল্লাহকে দেখা যাবে, তবে কোনো *দিকে* নয়,’ তারা যেন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে কিনা। কারণ হয় সে জেনেবুঝে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অস্বীকার করছে, আর নয়তো তার আকলে কোনো সমস্যা আছে। অন্যথায় কেউ যদি বলে, ‘অমুককে দেখা যাবে, কিন্তু দর্শকের সামনে নয়, পেছনেও নয়, ডান দিকে নয়, বাম দিকেও নয়, ওপরে নয়, নীচেও নয়,’ তাহলে সুস্থ ফিতরাতসম্পন্ন প্রত্যেকেই শোনামাত্র এই কথা প্রত্যাখ্যান করবে। এজন্যই যারা আল্লাহর সত্তাগত ঊর্ধ্বতা অস্বীকার করে, মুতাজিলিরা তাদেরকে ‘আল্লাহর দর্শনলাভ’ অস্বীকার করতেও বাধ্য করেছে। মুতাজিলিরা বলেছে, ‘কোনো দিক ছারাই দেখা যায়—এটা কীভাবে বিবেকসম্পন্ন হতে পারে?’”[518]

[518] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২১৯-২২০।

চতুর্থ সম্প্রদায় : চরমপন্থি সুফি গোষ্ঠী

চরমপন্থি সুফি সম্প্রদায়ের কেউ কেউ দাবি করেছে, মহান আল্লাহকে পরকালেও স্বচক্ষে দেখা যাবে এবং দুনিয়াতেও স্বচক্ষে দেখা যাবে। **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«قول بعض المتكلمين وبعض جهال الصوفية أنه يرى في الدنيا وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي عن بعض الصوفية ورد عليه».

"কতিপয় *কালামি* এবং কিছু মূর্খ সুফি বলে থাকেন, আল্লাহকে দুনিয়াতেও দেখা যায়। আবু তালিব আল-মাক্কি কতিপয় সুফির বরাতে এই কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার খণ্ডন করেছেন।"[519]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«وَمَنْ قَالَ مِنْ النَّاسِ: إنَّ الْأَوْلِيَاءَ أَوْ غَيْرَهُمْ يَرَى اللَّهَ بِعَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ».

"মানুষদের মধ্যে যে ব্যক্তিই বলেছে, *'অলি-আউলিয়া কিংবা অন্য ব্যক্তিবর্গ দুনিয়াতেই স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবে,'* সে একজন পথভ্রষ্ট বিদাতি; কিতাব, সুন্নাহ ও উম্মতের সালাফদের ইজমা-বিরোধী (সর্বসম্মত আকিদার বিরোধী)।"[520]

---

[519] ইবনু তাইমিয়া, ***বুগইয়াতুল মুরতাদ,*** পৃ. ৪৭২।

[520] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৫১২।

তবে উলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে দুনিয়াতে মহান আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব।[521] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছেন। **নবিজি বলেছেন :**

«رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ الصُّورَةِ».

"আমি আমার রবকে সর্বোত্তম সুরতে দেখেছি।"[522]

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«أَتَانِي رَبِّي عز وجل اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ -أَحْسِبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ-».

"গতকাল রাতে আমার মহান রব সর্বোত্তম সুরতে আমার কাছে এসেছেন। অর্থাৎ স্বপ্নে এসেছেন।"[523]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহ চাইলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য মানুষও আল্লাহকে স্বপ্নে দেখতে পারেন নিজেদের ইমান অনুযায়ী। কিন্তু মানুষ স্বপ্নে আল্লাহকে যেমন দেখে, মহান আল্লাহ বাস্তবেই সেরকম—এটা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ যার ইমান যত শক্তিশালী, তিনি তত উত্তমরূপে আল্লাহকে দেখতে পান।[524]

---

[521] আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নববি, ***আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*** (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.), খ. ১৫, পৃ. ২৫।

[522] ইবনু আবি আসিম, ***আস-সুন্নাহ,*** হা. ৪৬৭, বর্ণনার মান : সহিহ।

[523] মুসনাদ আহমাদ, হা. ৩৪৮৪, তাহকিক : শুআইব আরনাউত, বর্ণনার মান : দুর্বল।

[524] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৩২৬; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ২৫১।

এ প্রসঙ্গে **শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন :**

«أما رؤيته في المنام فقد رأى النبي ﷺ ربه في المنام كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، أما غير الرسول فذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه والله أعلم هل يصح هذا أم لا يصح؟ لكن نحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله ﷻ، حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه، وكأنما يخاطبنا، ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضًا حتى نعمل به، ولا تشغل نفسك بهذه الأمور، فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية، عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما».

“নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে স্বপ্নে দেখেছেন। যেমনটি ‘ঊর্ধ্বতন ফেরেশতাবর্গের বিতর্ক’ সংক্রান্ত হাদিসে এসেছে। কিন্তু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহকে দেখতে পারে কিনা, এ বিষয়ে বলা হয়ে থাকে, ‘ইমাম আহমাদ তাঁর রবকে স্বপ্নে দেখেছেন।’ এ কথা সত্য কিনা সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমাদের হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহকে স্বপ্নে দেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য জরুরি হলো—এমনভাবে কুরআন পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা; যেন মনে হয়, মহান আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলছেন। এ কারণে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন নাজিল করেছেন এবং আমাদের ওপরও কুরআন নাজিল করেছেন; যাতে আমরা কুরআন মোতাবেক আমল করতে পারি। **সুতরাং আপনি এসব বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত**

রাখবেন না। কারণ এর মাধ্যমে আপনি কোনো সন্তোষজনক ফলাফলে পৌঁছতে পারবেন না। বরং আপনার দায়িত্ব হলো কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।”[525]

[525] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***লিকাউল বাবিল মাফতুহ*** (ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি), ট্রান্সক্রিপ্টেড ফাইলের স্ক্রিপ্ট নং : ২১৩, পৃ. ১২।

আল্লাহর দিদার—আহলুস সুন্নাহর জন্য সুসংবাদ, কিন্তু বিদাতিদের জন্য দুঃসংবাদ

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের যবনিকাপাতের আগে বলতে চাই, মহান আল্লাহর দিদার লাভ করা প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহান আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার! এরচেয়ে বড়ো সফলতা মুমিনের জন্য আর কী হতে পারে?! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় 'আল্লাহকে দেখার এই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত' প্রার্থনা করতেন। মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন অন্তরে তৈরি হয়, সেটা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন। **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন :**

«وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، **وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ**، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ».

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আমি আপনাকে ভয় করে চলি। সন্তোষ ও ক্রোধ— উভয় অবস্থায় ইখলাসের কথা (হক কথা) বলতে পারি। আমি আপনার কাছে এমন নেয়ামত চাইছি, যা কখনও শেষ হবে না। এমন চক্ষুশীতলতা চাইছি, যা কখনও নিঃশেষ হবে না। আমি আপনার কাছে ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি কামনা করছি, মৃত্যুর পর প্রশান্ত

জীবন চাইছি। **আপনার চেহারা দেখার সুখ কামনা করছি, আপনার সাক্ষাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাইছি।** আমি আপনার কাছে ক্ষতিকর দুঃখ-কষ্ট থেকে এবং পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইমানের সৌন্দর্যে সুশোভিত করুন, এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রদর্শক বানিয়ে দিন।"[526]

যারা আল্লাহর দিদারের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের জন্য এটা বিরাট সুসংবাদ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর দিদার বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য এটা নিতান্তই পরিতাপ ও আফসোসের কারণ। প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ি **ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেছেন :**

«إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْجُبَ اللَّهُ ﷻ جَهْمًا وَأَصْحَابَهُ أَفْضَلَ ثَوَابِهِ الَّذِي وَعْدَهُ أَوْلِيَاءَهُ حِينَ يَقُولُ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] فَجَحَدَ جَهْمٌ وَأَصْحَابُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِهِ الَّذِي وَعَدَ أَوْلِيَاءَهُ».

"আমি আশা করি, মহান আল্লাহ জাহম বিন সাফওয়ান ও তার অনুসারীদেরকে তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন, যা তিনি তাঁর অলিদের (তাকওয়াবান মুমিনদের) দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' (*সুরা কিয়ামা :* ২২-২৩) কিন্তু জাহম বিন সাফওয়ান ও তার অনুসারীরা মহান আল্লাহর এই শ্রেষ্ঠ প্রতিদানকে অস্বীকার করেছে; যেই প্রতিদান তিনি তাঁর অলিদেরকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।"[527]

---

[526] সুনানুন নাসায়ি, হা. ১৩০৬, বর্ণনার মান : সহিহ।

[527] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৫৭।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর *'হাদিল আরওয়াহ'* কিতাবে এত চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন, যা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন :**

«هذا البابُ أشرفُ أبواب الكتاب، وأجلُّها قدرًا، وأعلاها خطرًا، وأقرُّها لعيون أهل السنَّة والجماعة، وأشدُّها على أهل البدعة والفُرقة، وهي الغاية التي شمَّر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابقَ إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنَّة نَسُوا ما هم فيه من النعيم، وحِرْمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشدَّ عليهم من عذاب الجحيم، اتفق عليها الأنبياء والمرسلونَ، وجميعُ الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوِّكون، والفرعونية المبطلون، والباطنية الَّذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرَّافضة الَّذين هم بحبائل الشيطان مُتمسِّكون، ومن حبل اللَّه منقطعون، وعلى مسبَّة أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- عاكفون، وللسُّنَّة وأهلها محاربون، ولكلِّ عدوٍّ للَّه ورسوله ودينه مسالمونَ، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون، وعن بابه مطرودون، أولئك أحزاب الضلال، وشيعة الَّلعين، وأعداء الرسول وحزبه».

"মহান আল্লাহর দিদার বিষয়ক এই অধ্যায়টি পুরো গ্রন্থের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ অধ্যায়, সবচেয়ে মহিমান্বিত অধ্যায়, এবং সবচেয়ে ভীতিকর অধ্যায়। এই বিষয়টি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মানুষদের জন্য সবচেয়ে চক্ষুশীতলকারী,

কিন্তু বিদাতি ও ফের্কাবাজ লোকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর। এটাই সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যা অর্জন করতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আগ্রহী হয়, প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে, আর অগ্রগামীরা দ্রুত অগ্রসর হয়। এটা এমন এক মহান বিষয়, যার জন্যই কর্মপরায়ণদের কাজ করা উচিত। জান্নাতবাসীরা যখন এই নেয়ামত লাভ করবেন, তখন তাঁদের যাবতীয় নেয়ামত ও সুখের কথা ভুলে যাবেন। জাহান্নামবাসীদের জন্য এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মহান আল্লাহর থেকে অন্তরালে থাকাটাই—জাহান্নামের শাস্তির চেয়ে কঠিনতর হবে।

এই নেয়ামতের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন সকল নবি-রসুল, সমগ্র সাহাবি-তাবেয়ি এবং যুগে যুগে আগত ইসলামের ইমামগণ। পক্ষান্তরে এই নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে দ্বীন থেকে বিচ্যুত বিদাতি সম্প্রদায়, পথবিভ্রান্ত জাহমিয়া সম্প্রদায়, বাতিলপন্থি ফেরাউনি মতাদর্শ লালনকারী সম্প্রদায়,[528] এবং সেই বাতিনিয়্যা সম্প্রদায়, যারা সকল ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন। অনুরূপভাবে এই নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে রাফিদি শিয়া সম্প্রদায়; যারা শয়তানের পেতে রাখা ফাঁদগুলোকে আঁকড়ে ধরেছে, আল্লাহর রজ্জু (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের নিন্দা-সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে, সুন্নাহ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে, এবং মহান আল্লাহ, তাঁর রসুল ও তাঁর দ্বীনের প্রতিটি শত্রুর সাথে সমঝোতা করেছে। এরা সবাই তাদের মহান রব থেকে সেদিন আড়ালে থাকবে (আল্লাহকে দেখতে পাবে না) এবং

---

[528] মহান আল্লাহ যে সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন—এটা যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ *'ফিরাউনি মতাদর্শ লালনকারী'* অভিহিত করেছেন।

আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হবে। এরাই হলো ভ্রষ্টতার দল-উপদল, অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারী এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের দুশমন।”[529]

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দিদার লাভের মহা নেয়ামত দান করুন, এবং এই গ্রন্থের রচয়িতা ও মুসলিম পাঠকদেরও সেই অনন্য সুখে ধন্য করুন। আমিন।

---

[529] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ,*** তাহকিক : জাইদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬০৫।

অধ্যায় ৬

আল্লাহর গুণাবলির প্রতি ইমান

মূলপাঠ

وَمَا نَطَقَ بِهِ القُرآنُ وَالحَدِيثُ مِثْلُ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٦٤]، وَمِثْلُ: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر : ٦٧]، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالحَدِيثِ، لَا نَزِيدُ فِيهِ، وَلَا نُفَسِّرُهُ ، نَقِفُ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

কুরআন ও হাদিসে যেসব কথা বলা হয়েছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "ইহুদিরা বলেছে, 'আল্লাহর হাত আবদ্ধ।' বরং তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে।"[530] মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "কেয়ামতের দিন আসমানরাজি তাঁর ডান হাতে গুটানো অবস্থায় থাকবে।"[531] কুরআন ও হাদিসে এ জাতীয় যত আয়াত ও হাদিস আছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি। আমরা এতে কিছু সংযোজন করি না এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও করি না। কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে থেমে গেছে, আমরাও সেখানে থেমে যাই।

وَنَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]. وَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا، فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهْمِي.

---

[530] সুরা মায়িদা ৫:১৬৪।

[531] সুরা জুমার ৩৯:৬৭।

আমরা বলি, "দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।"[532] যে ব্যক্তি এর বিপরীত আকিদা পোষণ করে, সে জাহমি মুআত্তিল (সিফাত-অস্বীকারকারী)।

ব্যাখ্যা



ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সুন্নাহর ষষ্ঠ মূলনীতি আলোচনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার একটি সর্বসম্মত মূলনীতি—মহান আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলির প্রতি ইমান আনয়ন করা। আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র **মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮৯ হি.) বলেছেন :**

«اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صِفَةِ الرَّبِّ ﷻ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا وَصْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ».

"প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সকল ফাকিহ একমত পোষণ করেছেন, মহান আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে কুরআনের বাণী এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমগ্রের প্রতি ইমান আনতে হবে; কোনো পরিবর্তন, ধরন-নির্দিষ্টকরণ, এবং সাদৃশ্যপ্রদান না করে।"[533]

---

[532] সুরা তহা ২০:৫।

[533] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৮০; আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক, ***আত-তাওদিহাতুল জালিয়্যা ফি শারহিল ফাতওয়া***

তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের ইজমা তথা সম্মিলিত মতাদর্শ বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫৭ হি.) বলেছেন :**

«كُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ وَعَلَا».

"তাবেয়িগণের সংখ্যা যখন অনেক ছিল, তখন আমরা বলতাম, মহান আল্লাহ তাঁর আরশের ওপরে আছেন। **আর সুন্নাহয় আল্লাহর যত সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি।**"[534]

আল-হামাবিয়্যা (রিয়াদ : মুআসসাসাতু ওয়াকফিশ শাইখ আব্দির রহমান আল-বাররাক, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫।

[534] আবু বাকর আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-হাশিদি (জেদ্দা : মাকতাবাতুস সাওয়াদি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩০৪; আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা,*** তাহকিক : হামাদ আত-তুওয়াইজিরি (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৬-২৯৭।

সিফাত বিষয়ে লেখকের কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ শুরুতেই বলেছেন :

«وَمَا نَطَقَ بِهِ القُرآنُ وَالحَدِيثُ».

“কুরআন ও হাদিসে যেসব কথা বলা হয়েছে, আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি।”

আলোচনার প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়, *‘আমরা সেসবের প্রতি ইমান রাখি’* বাক্যাংশটি এখানে লুপ্ত আছে। ইমাম হুমাইদি বলতে চাইছেন, কুরআন-সুন্নাহয় মহান আল্লাহর যতগুলো সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, সেসবের প্রত্যেকটির প্রতি ইমান আনতে হবে।

এরপর ইমাম হুমাইদি লিখেছেন :

«مِثْلُ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾».

“যেমন আল্লাহ বলেছেন, ‘ইহুদিরা বলেছে, “আল্লাহর হাত আবদ্ধ।” বরং তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে।’”[535]

কুরআন-সুন্নাহ থেকে জানা যায়—এমন ইলাহি সিফাতের উদাহরণ দিতে যেয়ে ইমাম হুমাইদি **মহান আল্লাহর ‘হাত’ সিফাতের ব্যাপারে** একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হচ্ছে, “ইহুদিরা বলেছে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ।” আমরা আয়াত থেকে জানলাম, ইহুদিরা বলেছিল, আল্লাহর হাত ‘মাগলুলা’। এর শাব্দিক অর্থ—আবদ্ধ, রুদ্ধ, শৃঙ্খলিত (ممسكة ومنقبضة ومحبوسة)।[536]

---

[535] সুরা মায়িদা ৫:১৬৪।

[536] মুহাম্মাদ আল-আমিন বিন আব্দুল্লাহ আল-হারারি, ***তাফসিরু হাদায়িকির রাওহি ওয়ার রাইহান ফি রাওয়াবি উলুমিল কুরআন*** (বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪১৩।

কিন্তু মহান আল্লাহর হাতকে আবদ্ধ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে সালাফদের দুটি মত রয়েছে। যথা :

প্রথম মত : আল্লাহর হাত দানশীলতা থেকে আবদ্ধ (ممسكة عن العطاء)। অর্থাৎ, ইহুদিরা এ কথার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে কৃপণ বলেছিল। জালিমরা যা বলে, তা থেকে মহিমান্বিত আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। ইবনু আব্বাস, ইকরিমা, দাহহাক, কাতাদা প্রমুখ সালাফ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত : আল্লাহর হাত আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া থেকে আবদ্ধ (ممسكة من عذابنا)। ইহুদিরা বলত, আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষরা গোবৎস পূজা করে যে অপরাধ করেছিল, মহান আল্লাহ সেই অপরাধের শাস্তি দেবেন মর্মে কসম করেছিলেন। সেই শপথ রক্ষার্থে তিনি আমাদেরকে কেবল সেই অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দেবেন। হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী প্রথম মতটিকে অধিক অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ এ আয়াতেরই শেষের অংশে **আল্লাহ বলেছেন :**

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

"বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত; **যেভাবে ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন।"**[537]

এখানে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—**ইহুদিরা কেন এ কথা বলেছিল?** সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদিরা ছিল অত্যন্ত উর্বর ও কল্যাণে পরিপূর্ণ এক জাতি। কিন্তু তারা যখন মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলো এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ বিস্তৃত করে

[537] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ২, পৃ. ৬৬-৬৭।

রেখেছিলেন, তার কিছুটা ফিরিয়ে নিলেন। তখনই ইহুদিরা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের থেকে তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর হাত আবদ্ধ।"[538]

ইহুদিদের কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, **"তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে।"** সালাফদের থেকে এ কথার তাফসির হিসেবে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। যথা :

প্রথম মত : *'তাদের হাত আবদ্ধ'* মানে—তাদের হাত জাহান্নামে শৃঙ্খলিত (غلت أيديهم في جهنم)। হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত : *'তাদের হাত আবদ্ধ'* মানে—তাদের হাত কল্যাণ থেকে রুদ্ধ (أمسكت أيديهم عن الخير)। মুকাতিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় মত : *'তাদের হাত আবদ্ধ হয়েছে'* মানে—তারা কৃপণ হয়েছে (جُعِلوا بخلاء)। আজ-জাজ্জাজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।[539]

আয়াতে বলা হয়েছে, **"গুল্লাত্ আইদিহিম তথা তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)।"** আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী, এই বাক্যের দুরকম অর্থ হতে পারে। যথা :

এক. বিবৃতিমূলক অর্থ (المعنى الخبري); তখন উপরিউক্ত তিনটি তাফসির অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে যথাক্রমে— **(১)** তাদের হাত

---

[538] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জামানিন আল-মালিকি, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিজ,*** তাহকিক : হুসাইন বিন উক্কাশা ও মুহাম্মাদ বিন মুস্তাফা আল-কানজ (কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৬।

[539] ইবনুল জাওজি, ***জাদুল মাসির,*** খ. ১, পৃ. ৫৬৫।

জাহান্নামে শৃঙ্খলিত হয়েছে, **(২)** তাদের হাত কল্যাণ থেকে রুদ্ধ হয়েছে, **(৩)** তারা কৃপণ হয়েছে।

দুই. প্রার্থনাসূচক অর্থ (المعنى الدَّعوي); তখন উপরিউক্ত তিনটি তাফসির অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে যথাক্রমে— **(১)** তাদের হাত জাহান্নামে শৃঙ্খলিত হোক, **(২)** তাদের হাত কল্যাণ থেকে রুদ্ধ হোক, **(৩)** তারা কৃপণ হোক।

বিবৃতিমূলক অর্থ মোতাবেক, মহান আল্লাহ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহকে গালিদাতা জালিম ইহুদিদের এরকম পরিণতি ঘটেছে। পক্ষান্তরে প্রার্থনাসূচক অর্থ মোতাবেক, মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহকে গালিদাতা জালিম ইহুদিদের বিরুদ্ধে আমাদের এই বদদোয়া করা উচিত।[540]

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ মহান আল্লাহর 'ডান হাত' সম্পর্কে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

«وَمِثْلُ: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾».

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "কেয়ামতের দিন আসমানরাজি তাঁর ডান হাতে গুটানো অবস্থায় থাকবে।"[541]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, মুশরিকরা মহান আল্লাহকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি, সত্যিকারার্থে তাঁর মহিমা চিনতে পারেনি। বরং তারা আল্লাহর সাথে এমন দুর্বল সৃষ্টিদেরকে শরিক করেছে, যাদের না আছে কোনো উপকার করার ক্ষমতা, আর না আছে ক্ষতি করার ক্ষমতা। তারা এরকম অক্ষম সৃষ্টিকে সেই

---

[540] আবুল হাসান আলি বিন আহমাদ আল-ওয়াহিদি আন-নাইসাবুরি, ***আত-তাফসিরুল বাসিত*** (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.), খ. ৭, পৃ. ৪৫৩।

[541] সুরা জুমার ৩৯:৬৭।

মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার সমতুল্য গণ্য করেছে, যাঁর মহিমা এতটাই সমুচ্চ যে, কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের কব্জায়, আর বিশাল আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। যারা শির্ক করে মাখলুককে মহান আল্লাহর সমতুল্য গণ্য করেছে, তারা আল্লাহকে যথোচিত মর্যাদা দেয়নি। তারা সবচেয়ে বড়ো জুলুমকারী জালিম। বস্তুত তাদের শির্ক ও জুলুম থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত; তিনি মহাপবিত্র, সুমহান।[542] উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহর ডান হাত আছে।

এরপর ইমাম হুমাইদি লিখেছেন :

«وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالحَدِيثِ، لَا نَزِيدُ فِيهِ، وَلَا نُفَسِّرُهُ، نَقِفُ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ».

কুরআন ও হাদিসে এ জাতীয় যত আয়াত ও হাদিস আছে, আমরা সেসবের প্রতিও ইমান রাখি। আমরা এতে কিছু সংযোজন করি না এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও করি না। কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে থেমে গেছে, আমরাও সেখানে থেমে যাই।

অর্থাৎ, কুরআন-সুন্নাহয় যতগুলো সিফাত সাব্যস্ত হয়েছে, আমরা সেগুলোর প্রত্যেকটিই সাব্যস্ত করি। কুরআন-সুন্নাহ উল্লঙ্ঘন করে আমরা নিজেদের তরফ থেকে অতিরিক্ত সিফাত সাব্যস্ত করি না। কেননা সেটা হবে আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলার শামিল। **আমরা সিফাতের ব্যাখ্যা করি না;** অর্থাৎ সিফাতের ধরণ-প্রকৃতি নির্ধারণ করি না এবং জাহমিদের মতো অপব্যাখ্যা করি না। আর মহান আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে আমাদের আলোচনার ভিত্তি হলো—কুরআন ও সুন্নাহ। কারণ মহান আল্লাহর গুণাবলি প্রধানত গায়েবি বিষয়। গায়েবি বিষয়ে আমরা নিজে থেকে কথা বলতে পারি

[542] আস-সাদি, ***তাইসিরুল কারিমির রহমান,*** পৃ. ৭২৯।

না। কুরআন-সুন্নাহয় যতটুকু বলা হয়েছে কিংবা বলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, আমরা কেবল ততটুকু বলতে পারি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এসব কথা বলার পর ইমাম হুমাইদি লিখেছেন :

وَنَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. وَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا، فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهْمِيٌ.

আমরা বলি, "দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।"[543] যে ব্যক্তি এর বিপরীত আকিদা পোষণ করে, সে জাহমি মুআত্তিল (সিফাত-অস্বীকারকারী)।

অর্থাৎ, আমরা সাক্ষ্য দিই, মহান আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। এটি আল্লাহর একটি সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে যেমনভাবে মানানসই আমরা সেভাবেই সিফাতটি সাব্যস্ত করি। কোনো মাখলুকের আরোহণের সাথে আল্লাহর এই সিফাতকে আমরা সাদৃশ্য দিই না। যারা আমাদের এই আকিদার বিপরীত আকিদা পোষণ করে, তারা মুয়াত্তিল তথা তাতিলকারী। যারা বিলকুল সিফাত অস্বীকার করে, কিংবা সিফাতের অপব্যাখ্যা করে, কিংবা সিফাতের অর্থ-অস্বীকার করে, তাদেরকে মুয়াত্তিল বলা হয়। তাতিল করা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা। এ কারণে *'আরশের ওপর আরোহণ'* সিফাতটি যারা স্বীকার করে না, তাদেরকে ইমাম হুমাইদি *'জাহমি'* বলেছেন। 'তাতিল' ও 'জাহমি' পরিভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[543] সুরা তহা ২০:৫।

আল্লাহর গুণাবলির প্রতি ইমান আনয়নের কয়েকটি বুনিয়াদি মূলনীতি

মহান আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করার জন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণ বেশ কিছু মূলনীতির ওপর নির্ভর করেছেন। আমরা সেসব মূলনীতি থেকে কেবল উল্লেখযোগ্য চারটি মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ এই মূলনীতি চতুষ্টয় সম্পর্কে জানলে বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচনা বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম মূলনীতি : আল্লাহর গুণাবলি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর

মহান আল্লাহর গুণাবলি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহর দলিলনির্ভর। কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর যেসব গুণ তথা বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলো সালাফগণের বুঝ অনুযায়ী সাব্যস্ত করতে হবে। লেখক ইমাম হুমাইদি এই মূলনীতির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর এই কথায়—**"আমরা এতে কিছু সংযোজন করি না এবং এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে থেমে গেছে, আমরাও সেখানে থেমে যাই।"**

কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن **تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ**﴾.

“তুমি বল, অবশ্যই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি, **আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।**”[544]

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :

«لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله ﷺ لا يتجاوز القرآن والحديث».

“আল্লাহকে কেবল সেসব গুণে গুণান্বিত করতে হবে, যেসব গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা যেসব গুণে তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের সীমা অতিক্রম করা যাবে না।”[545]

ইমাম সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) এই মূলনীতির ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

«وقد اتفقت الأئمة على أنّ الصفات لا تؤخذ إلا توقيفًا».

“ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন, কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত না হলে কোনো বিষয়কে সিফাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।”[546]

---

[544] সুরা আরাফ ৭:৩৩।

[545] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ২৬৫।

[546] আবু নাসর উবাইদুল্লাহ বিন সায়িদ আস-সিজ্জি, ***রিসালাতুস সিজ্জি ইলা আহলি জাবিদ ফির রদ্দি আলা মান আনকারাল হারফা ওয়াস সওত,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বাকারিম (মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৭৮।

আল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ার বিষয়টি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর নয় :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে—আল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্র তাঁর সিফাত বর্ণনার ক্ষেত্রটির চেয়ে প্রশস্ত। এজন্য মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর হলেও তাঁর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার বিষয়টি স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর নয়। বরং কেউ চাইলে আল্লাহর ব্যাপারে এমন সঠিক শব্দ বা বাক্য বলতে পারবেন, যা হুবহু কুরআন-সুন্নাহয় আসেনি। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা যেন আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা না হয়। মহান আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মহাপবিত্র। যেমন বলা হয়, "আল্লাহ হলেন অস্তিত্বশীল।" অথচ 'অস্তিত্বশীল' শব্দটি কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি। কিন্তু শব্দটির মর্মার্থ সঠিক, আল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ারও উপযুক্ত। তাই এটা আল্লাহর নাম বা গুণ হিসেবে নয়—বরং তাঁর ব্যাপারে প্রদত্ত সংবাদ হিসেবে বলা যাবে।

এ মর্মে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

«ما يُطْلَق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌّ، وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه».

"মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি হিসেবে যা বলা হয়, সেগুলো স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ হিসেবে যা বলা হয়, তা 'স্রেফ কুরআন-সুন্নাহনির্ভর' হওয়া জরুরি নয়। যেমন বলা হয়, আল্লাহ হলেন *'কদিম (সূচনাহীন চিরন্তন সত্তা)'*; আল্লাহ

হলেন *'শাইউন (বিষয়)'*; আল্লাহ হলেন অস্তিত্বশীল, স্বনির্ভর ইত্যাদি।"[547]

আল্লামা ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) এ ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। **তিনি মহান আল্লাহ সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ দেওয়ার পর বলেছেন :**

«لِأَن كل هَذَا إِخْبَار عَن فعله تَعَالَى وَهَذَا مُبَاح لنا بِالْإِجْمَاع».

"কারণ এগুলোর সবই মহান আল্লাহর কর্মাবলি সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ। আমাদের জন্য আল্লাহর ব্যাপারে এরকম সংবাদ দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।"[548]

---

[547] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ,*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮৫।

[548] ইবনু হাজম, ***আল-ফাসল ফিল মিলাল,*** খ. ২, পৃ. ১২৬।

দ্বিতীয় মূলনীতি : তাহরিফ ও তাতিল এবং তাকয়িফ ও তামসিল-বিহীন ইমান

কোনোরূপ তাহরিফ (বিকৃতি), তাতিল (অস্বীকার) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ), তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে—মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো সাব্যস্ত করতে হবে, এবং যেসব গুণ নাকচ করেছেন, সেগুলো নাকচ করতে হবে। এ বিষয়ে সমগ্র সালাফ এবং আহলুস সুন্নাহর সকল ইমাম একমত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل».

"উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ সর্বসম্মত হয়েছেন, আল্লাহর জন্য তিনি নিজে যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করতে হবে—কোনোরূপ তাহরিফ (বিকৃতি) ও তাতিল (অস্বীকার-অপব্যাখ্যা) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ) ও তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে।"[549]

---

[549] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***শারহুল আকিদাতিল আসফাহানিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন রিয়াদ আল-আহমাদ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৪১।

পরিভাষা চারটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

তাহরিফের পরিচয় :

তাহরিফের শাব্দিক অর্থ—পরিবর্তন করা, বিকৃত করা (التغيير والتبديل)।[550] পরিভাষায়—

«التَّحْرِيْفُ: تَغْيِيْرُ خِطَابِ الشَّرْعِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى».

কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিলের শব্দ কিংবা অর্থকে পরিবর্তন করে দেওয়াই তাহরিফ।[551]

তাহরিফ দুই প্রকার।[552] যথা :

প্রথম প্রকার : শব্দগত তাহরিফ (تحريف اللفظ); অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর শব্দ পরিবর্তন করে ফেলা। যেমন কুরআনে এসেছে :

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا﴾.

"অবশ্যই আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন।"[553]

আয়াতটিতে 'আল্লাহ' শব্দে জবর দিয়ে পড়লে শব্দগত পরিবর্তন হবে এবং অর্থও পালটে যাবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে—"অবশ্যই মুসা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।" এক ব্যক্তি এই আয়াত পড়ার সময় 'আল্লাহ' শব্দে জবর দিয়ে পড়েছিল। এটা শুনে ইমাম আবু বাকর ইবনু আইয়্যাশ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৩ হি.) বলেছিলেন, "কাফির

---

[550] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** খ. ৫, পৃ. ১২।

[551] সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, ২য় নুসখা, প্র. ১৪৪০ হি.), পৃ. ৯।

[552] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা,*** তাহকিক : হুসাইন বিন উক্কাশা (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, বৈরুত : দারু ইবনু হাজম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৭।

[553] সুরা নিসা ৪:১৬৪।

ছাড়া কেউ এভাবে পড়তে পারে না।”[554] বিরল দুয়েকটা ঘটনা ছাড়া মুসলিম দাবিদাররা সাধারণত ইচ্ছাকৃতভাবে সিফাতের ইস্যুতে শব্দগত তাহরিফ করে না।

দ্বিতীয় প্রকার : অর্থগত তাহরিফ (تحريف المعنى); বিনা দলিলে কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করে ভিন্ন অর্থ সাব্যস্ত করা। মুসলিম দাবিদার দার্শনিক গোষ্ঠী, জাহমিয়া, মুতাজিলা ও আশারি-মাতুরিদিরা অর্থগত তাহরিফ করে থাকে। এটাকে ‘নিন্দনীয় তাবিল তথা অপব্যাখ্যা’ বলেও অভিহিত করা হয়। যেমন তাহরিফকারীরা রহমত সিফাতের ব্যাপারে বলে, “রহমত মানে রহমত নয়, বরং সওয়াবদানের ইচ্ছা করা;” কিংবা আল্লাহর *ইয়াদ* তথা *হাত* সিফাতের ব্যাপারে বলে, “ইয়াদ মানে সত্যিকারের হাত নয়, বরং এর মানে কুদরত বা নেয়ামত!”

তাতিলের পরিচয় :

তাতিলের শাব্দিক অর্থ—শূন্য করা, খালি করা (التخلية والتفريغ)।[555] পরিভাষায়—

«التَّعْطِيْلُ: إِنْكَارُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الإِلَهِيَّةِ».

মহান আল্লাহর জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করা ওয়াজিব, তা সাব্যস্ত না করাই তাতিল।[556]

তাতিল প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

---

[554] আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমাদ আত-তাবারানি, ***আল-মুজামুল আওসাত,*** তাহকিক : আবু মুআজ তারিক আওয়্যাদাল্লাহ (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৭১।

[555] ইবনু ফারিস, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** খ. ৪, পৃ. ৩৫১।

[556] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***ফাতহু রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, তাবি), পৃ. ১৮।

প্রথম প্রকার : পূর্ণাঙ্গ তাতিল (التعطيل الكلي); যেমন খাঁটি জাহমিয়া সম্প্রদায়ের তাতিল, যারা বিলকুল মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার : আংশিক তাতিল (التعطيل الجزئي); যেমন আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের তাতিল। আশারি-মাতুরিদিরা মহান আল্লাহর কিছু গুণ সাব্যস্ত করে, আর কিছু গুণ সাব্যস্ত করে না।[557]

তাতিল সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে। যথা :

এক. বিলকুল অস্বীকার করা। এটাকে পূর্ণাঙ্গ তাতিলও বলা যেতে পারে। যেমন কেউ হয়তো কুরআন ও সুন্নাহয় প্রমাণিত—আল্লাহর কোনো নাম বা কোনো গুণ পুরোপুরি অস্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ সে বলে, আল্লাহর *'ইয়াদ'* তথা *'হাত'* নেই, তিনি আরশে ওঠেননি, তাঁর চোখ নেই ইত্যাদি। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া খবরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা সকল মুসলিমের ঐক্যমতে বড়ো কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।[558]

দুই. তাবিল করা তথা ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে **'তাতিল'** করা। জ্ঞাতব্য যে, *'তাবিল'* শব্দের কয়েকটি ব্যবহারিক অর্থ আছে।[559] এখানে আমরা উসুলবিদদের পরিভাষা মোতাবেক 'তাবিল' শব্দের আলোচনা করছি। উসুলবিদদের পরিভাষায়—

---

[557] আল-উসাইমিন, ***ফাতহু রব্বিল বারিয়্যা,*** পৃ. ১৮-১৯।

[558] সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি, ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, ১ম নুসখা, প্র. ১৪৩৬ হি.), পৃ. ২০৯।

[559] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আওদা আস-সাআবি (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৯১-৯৪।

«التَّأْوِيلُ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يُخَالِفُ الظَّاهِرَ».

কোনো শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করে ভিন্ন অর্থে নিয়ে যাওয়াকে **তাবিল** বলে।[560]

এই তাবিল আবার প্রধানত দুই প্রকার।[561] যথা :

প্রথম প্রকার : বিশুদ্ধ তাবিল (التأويل الصحيح); যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিঃসন্দেহে এই তাবিল গ্রহণযোগ্য। যেমন হাদিসে কুদসিতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমিই হলাম যুগ।"[562]

আমরা এই বাক্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলি, এর মানে, আমি হলাম যুগের মালিক, নিয়ন্ত্রক ও পরিবর্তক। কারণ আমাদের ব্যাখ্যার পক্ষে দলিল আছে। যেহেতু একই হাদিসে ওই কথা বলার পরে আল্লাহ বলেছেন, "আমার হাতেই সকল কিছুর কর্তৃত্ব রয়েছে। আমি রাত ও দিনকে পরিবর্তন করে থাকি।"[563]

দ্বিতীয় প্রকার : বাতিল তাবিল (التأويل الباطل); যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। নিঃসন্দেহে এই তাবিল প্রত্যাখ্যাত, না-জায়েজ। যেমন মহান আল্লাহর ক্রোধকে 'শাস্তিদানের ইচ্ছা করা' বলে, কিংবা মহান আল্লাহর রহমতকে 'সওয়াবদানের ইচ্ছা করা' বলে ব্যাখ্যা করা।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয়োক্ত তাবিলই আমাদের আলোচ্য তাতিল পরিভাষার আওতাভুক্ত। তাবিলকারীরা সরাসরি সিফাত অস্বীকার

---

[560] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৯১; ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ১, পৃ. ২৫; ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৩।

[561] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ১, পৃ. ৩১-৩২।

[562] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৯১।

[563] আল-উসাইমিন, ***তালিকুন মুখতাসার আলা কিতাবি লুমআতিল ইতিকাদ,*** পৃ. ২১-২২।

করে না, বরং সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করে নিয়ে তারপর ভিন্ন অর্থ সাব্যস্ত করে। **না-জায়েজ তাবিলের আবার দুই রকম অবস্থা হতে পারে—**

(১) যদি ব্যাখ্যাটি আরবি ভাষায় গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে কুফরি হবে না। যেমন আল্লাহর *'ইয়াদ'* তথা *'হাত'* সিফাতকে 'কুদরত' বা 'নেয়ামত' বলে ব্যাখ্যা করা। কারণ আরবিতে *'হাত'* শব্দটি কখনো কখনো এসব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করে এরকম ব্যাখ্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে বিদাত এবং ন্যায়নিষ্ঠ সালাফদের মানহাজবিরোধী। তবে এটা বড়ো কুফর নয়।[564]

(২) যদি আরবি ভাষায় ব্যাখ্যাটির কোনো ভিত্তি না থাকে, তাহলে সেটা মূলত অস্বীকারেরই শামিল হবে এবং বড়ো কুফর গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।" কেউ যদি এর ব্যাখ্যা করে, "আল্লাহর দুই হাত মানে আকাশ ও পৃথিবী," তাহলে তা কুফরি হবে। কারণ আরবি ভাষায় এই অর্থের কোনো ভিত্তিই নেই।[565]

উল্লেখ্য, *'কুফর নয়'* এমন বিদাতি তাবিলের আলোচ্য বিধান শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ-সহ বেশ কয়েকজন সমকালীন বিদ্বান ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই মতটি আরও তাহকিকের প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা মুতাকাদ্দিমিন ইমামদের আলোচনায় দেখেছি, তাঁরা আল্লাহর হাত সিফাতকে *'নেয়ামত'* বলে ব্যাখ্যা করাকে বড়ো

---

[564] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আল-কওলুল মুফিদ আলা কিতাবিত তাওহিদ*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি.), খ. ২, পৃ. ১৮৩-১৮৪; আল-উসাইমি, ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ,*** পৃ. ২০৯।

[565] আল-উসাইমিন, ***আল-কওলুল মুফিদ,*** খ. ২, পৃ. ১৮৩-১৮৪; আল-উসাইমি, ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ,*** পৃ. ২০৯।

কুফর সাব্যস্ত করেছেন! যেমনটি আমরা সামনে হাত সিফাতের আলোচনায় ইমাম দারিমির বক্তব্যে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

তিন. তাফবিদ তথা অর্থ-অস্বীকার করার মাধ্যমে **'তাতিল'** করা। তাফবিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ—ন্যস্ত করা, সোপর্দ করা (فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ تَفْوِيضًا : رَدَّهُ إِلَيْهِ)।[566] আভিধানিক অর্থে, যে কোনো বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করাকে **তাফবিদ** বলা যায়। এই অর্থ অনুযায়ী মহান আল্লাহর সিফাত বিষয়ক তাফবিদ দুই প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার : ধরনগত তাফবিদ (تفويض الكيف); অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত করার পর সেটার ধরন-প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। যেমন এরকম বলা যে, "মহান আল্লাহর হাত আছে, যা আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জেনেছি। কিন্তু আল্লাহর হাতের ধরন-প্রকৃতি আমরা জানি না, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।" এই তাফবিদই ছিল সালাফদের আদর্শ।

দ্বিতীয় প্রকার : অর্থগত তাফবিদ (تفويض المعنى); অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের প্রকৃত অর্থ এবং তার ধরন-প্রকৃতি—উভয়ের জ্ঞান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। যেমন এরকম বলা যে, "মহান আল্লাহর রহমত আছে, কিন্তু রহমত মানে আমরা জানি না, কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।" এই তাফবিদ হলো আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের একদল বিদ্বানের মতাদর্শ।

সাধারণ অবস্থায়, 'তাফবিদ' শব্দ প্রয়োগ করে এই তাফবিদকেই বোঝানো হয়। এর পরিচয় হিসেবে বলা হয়—

«التَّفْوِيضُ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ مَعَ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ».

কোনো শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করার পরে শব্দটির উদ্দিষ্ট অর্থ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকাকে **তাফবিদ** বলে। অর্থাৎ,

---

[566] আর-রাজি, ***মুখতারুস সিহাহ,*** পৃ. ২৪৪।

কোনো সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করার পর ভিন্ন অর্থ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকাই তাফবিদ।[567]

প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাবিলের সাথে এর মিল আছে। সেজন্য অনেকে এটাকে **'সংক্ষিপ্ত তাবিল (التأويل الإجمالي)'** বলে থাকেন।[568]

তাফবিদকারীরা সাধারণত তাফবিদের ক্ষেত্রে দুটো ধাপ অনুসরণ করে—

(১) সিফাতের প্রকাশ্য অর্থকে অস্বীকার করা।

(২) সিফাতের ভিন্ন কোনো অর্থ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকা।

যেমন আল্লাহর হাত সিফাতের ক্ষেত্রে তাফবিদকারী বলবে, "সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এটা সত্যিকারের হাত নয়। এটার অন্য কোনো অর্থ আছে। কিন্তু সেই অন্য অর্থটি কী, তা আমি জানি না। সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।"

সুতরাং, যারা বিলকুল সিফাত অস্বীকার করে, কিংবা সিফাতের তাবিল করে, কিংবা সিফাতের ক্ষেত্রে তাফবিদ করে, তারা সবাই 'মুয়াত্তিল' তথা 'তাতিলকারী'।[569] তাতিলকারীকে আরবিতে *'মুআত্তিল'* বলা হয়, আর তাতিলকারী গোষ্ঠীকে বলা হয় *'মুআত্তিলা'।*

---

[567] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৫৬।

[568] আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনু হাজার আল-হাইতামি, ***আশরাফুল ওয়াসায়িল ইলা ফাহমিশ শামায়িল,*** তাহকিক : আহমাদ বিন ফারিদ আল-মাজিদি (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২৩২।

[569] মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন, ***শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা,*** (কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.), পৃ. ৪৪৮।

তাকয়িফের পরিচয় :

তাকয়িফ শব্দটি আরবি *'কাইফা'* শব্দ থেকে এসেছে। কোনো কিছুর অবস্থা ও প্রকৃতি জানার জন্য *'কাইফা'* শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার অর্থ দাঁড়ায়—কীভাবে, কেমন, কীরূপে, কেমন করে? এ অনুযায়ী আরবি ভাষায় *'তাকয়িফ'* বলতে কোনো কিছুর ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা বোঝায়। পরিভাষায়—

«التَّكْيِيفُ: تَعْيِينُ كُنْهِ الصِّفَةِ الإِلَهِيَّةِ».

মহান আল্লাহর সিফাতের ধরন-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করাকে **তাকয়িফ** বলে।[570]

'আল্লাহর অমুক সিফাত এমন-এমন' ইত্যাদি কথা বলে নিজে থেকে সিফাতের ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা তাকয়িফের আওতাভুক্ত। যেমন এরকম বলা যে, মহান আল্লাহর হাত এমন-এমন; অথবা এরকম বলা যে, পৃথিবীর নিকটতম আসমানে আল্লাহ তাআলার অবতরণ এভাবে-এভাবে হয়।[571]

তামসিলের পরিচয় :

তামসিলের শাব্দিক অর্থ—সাদৃশ্য দেওয়া (التشبيه)।[572] পরিভাষায়—

«التَّمْثِيلُ: تَعْيِينُ كُنْهِ الصِّفَةِ الإِلَهِيَّةِ بِذِكْرِ مُمَاثِلٍ لَهَا».

---

[570] ফালিহ বিন মাহদি আলু মাহদি, ***আত-তুহফাতুল মাহদিয়্যা শারহুল আকিদাতিত তাদমুরিয়্যা*** (মদিনা : মাতাবিউল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬।

[571] আল-উসাইমিন, ***ফাতহু রব্বিল বারিয়্যা,*** পৃ. ১৯-২০।

[572] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** খ. ১৫, পৃ. ৭২।

সাদৃশ্য উল্লেখ করে মহান আল্লাহর সিফাতের ধরন-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করাকে **তামসিল** বলে।[573]

যেমন এরকম বলা যে, 'আল্লাহর হাত অমুকের হাতের মতো।' কিংবা 'আল্লাহ **এভাবে** অমুক কাজ করবেন'—বলে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

তাহরিফ ও তাতিল হোক, চাই তাকয়িফ ও তামসিল—এগুলো বিলকুল হারাম। কারণ এগুলোর প্রত্যেকটিতেই মহান আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। প্রথম মূলনীতির আলোচনায় আমরা এ বিষয়ক দলিল পেশ করেছি। এছাড়াও মনে রাখা উচিত, শয়তান মানুষকে মহান আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলতে প্ররোচিত করে। **আল্লাহ তাআলা বলেছেন :**

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

"নিশ্চয় সে (শয়তান) কেবল তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়, মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলার—যা তোমরা জানো না।"[574]

পরন্তু আল্লাহ বলেছেন :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

"তাঁর সদৃশ (মতো) কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[575]

এই আয়াতের শিক্ষা হলো—মহান আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করতে হবে, যেমন তিনি এখানে তাঁর শোনা ও দেখার বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন; আর আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য

---

[573] আল-উসাইমি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ১০।

[574] সুরা বাকারা ২:১৬৯।

[575] সুরা শুরা ৪২:১১।

দেওয়া যাবে না। কেননা তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। আল্লাহ শোনেন, মাখলুকও শোনে; কিন্তু আল্লাহর শোনা কখনোই মাখলুকের শোনার মতো নয়। আল্লাহ দেখেন, আবার মাখলুকও দেখে; কিন্তু আল্লাহর দেখা কখনোই মাখলুকের দেখার মতো নয়।[576]

ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ আল-খুজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৮ হি.) বলেছেন :

«مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهٌ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য দেয়, সে কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহ নিজেকে যেই গুণে বিশেষিত করেছেন, সেটা যেই ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেও কাফির হয়ে যায়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তাকে যেসব গুণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই।"[577]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের শাইখ **ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ وَصَفَ اللَّهَ فَشَبَّهَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সিফাত বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁর সিফাতগুলোকে কোনো সৃষ্টির সিফাতের সাথে তাশবিহ (সাদৃশ্য) দেয়, সে মহান আল্লাহর প্রতি কুফরিকারী কাফির।"[578]

---

[576] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৮ ও ২২।

[577] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮৭।

[578] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮৮।

তৃতীয় মূলনীতি : সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করা

মহান আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলিকে প্রকৃত ও প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে; রূপক অর্থ কিংবা ভিন্ন অর্থ বলে তাবিল তথা অপব্যাখ্যা করা যাবে না।

কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

"নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"[579]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

"নিশ্চয় আমরা এটাকে করেছি আরবি ভাষার কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"[580]

আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়—

প্রথমত, কুরআনকে আরবি ভাষার প্রকৃত অর্থ অনুযায়ীই বুঝতে হবে। কারণ কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়েছে, যাতে আমরা তা বুঝতে পারি। কেবল তখনই ভিন্ন অর্থ করা যাবে, যখন শরিয়তের কোনো স্পষ্ট দলিল সেই অর্থকে সাব্যস্ত করে।

দ্বিতীয়ত, যিনি এসব আয়াত বলেছেন, তিনি হলেন আল্লাহ। আর তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই স্পষ্ট আরবি ভাষায় কথা বলেছেন। তাই তাঁর বক্তব্যকে সরাসরি প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি তা না করা হয়, তাহলে সবার মধ্যে মতভেদ তৈরি

---

[579] সুরা ইউসুফ ১২:২।

[580] সুরা জুখরুফ ৪৩:৩।

হবে, আর নানারকম ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাবে।[581]

‘প্রকাশ্য অর্থ’ বলতে কী বোঝায়?

আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ যখন বলেন, সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে, প্রকাশ্য অর্থের প্রতি ইমান আনতে হবে; তখন ‘আজ-জাহির’ তথা ‘প্রকাশ্য অর্থ’ বলতে এমন অর্থ বোঝানো হয়, যা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনে প্রথম উদিত হয়। কোনো কথা শুনলে আমাদের মনে প্রথম যে অর্থ ভেসে ওঠে, সেটাই প্রকাশ্য অর্থ। **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«إِنَّ ظَاهِرَ الْكَلَامِ هُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْعَقْلِ السَّلِيمِ مِنْهُ لِمَنْ يَفْهَمُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ظُهُورُهُ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَقَدْ يَكُونُ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ».

“কোনো ভাষা বোঝেন এমন সুস্থবুদ্ধির মানুষ সেই ভাষার কোনো কথা শুনলে তাঁর মনে প্রথমে যেই অর্থ উদিত হয়, সেটাই উক্ত কথার ‘প্রকাশ্য অর্থ’। এই ‘প্রকাশ্য অর্থ’ কখনো স্রেফ শব্দের গঠনমূলক অবস্থার কারণেই স্পষ্টভাবে উদিত হয়; আবার কখনো সম্পূর্ণ কথার প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্টভাবে উদিত হয়।”[582]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর কথা থেকে বোঝা যায়, ‘প্রকাশ্য অর্থ’ দুই প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার : মৌলিক শব্দগত প্রকাশ্য অর্থ (الظاهر الإفرادي); সরাসরি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ থেকেই যেই প্রকাশ্য অর্থ পরিস্ফুটিত

---

[581] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা*** (মদিনা : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[582] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৬, পৃ. ৩৫৬।

হয়। এই প্রকাশ্য অর্থ পরিস্ফুটিত হওয়ার জন্য প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না। **যেমন আল্লাহ বলেছেন :**

﴿يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّ﴾.

"হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?"[583]

যেকোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন আরবি-জানা মানুষ এই কথা শোনামাত্র বোঝেন, মহান আল্লাহর দুই হাত আছে। এটাই প্রকাশ্য অর্থ। এখন কেউ যদি বলে, এখানে 'হাত' মানে 'ক্ষমতা' বোঝানো হয়েছে, তখন সেটা হবে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত।

দ্বিতীয় প্রকার : যৌগিক শব্দগত প্রকাশ্য অর্থ (الظاهر التركيبي); পুরো কথার প্রসঙ্গ থেকে যেই প্রকাশ্য অর্থ পরিস্ফুটিত হয়। এই প্রকাশ্য অর্থ পরিস্ফুটিত হওয়ার জন্য প্রসঙ্গের প্রয়োজন পড়ে। **যেমন আল্লাহ বলেছেন :**

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾.

"আপনি কি আপনার রবকে দেখেন না, কীভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন?"[584]

যেকোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন আরবি-জানা মানুষ এই কথা শোনামাত্র বোঝেন, এখানে স্বয়ং আল্লাহকে দেখার কথা বলা হয়নি। বরং মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন দেখার কথা বলা হয়েছে। পুরো কথার প্রসঙ্গ থেকে এই অর্থই পরিস্ফুটিত হয়।[585] কথার প্রসঙ্গ থেকে

---

[583] সুরা সাদ ৩৮:৭৫।

[584] সুরা ফুরকান ২৫:৪৫।

[585] সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা*** (কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হিজাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.), পৃ. ৩৫৬-৩৫৯।

এই অর্থ ফুটে ওঠে বলে কোনো কোনো বিদ্বান এটাকে **'প্রসঙ্গগত প্রকাশ্য অর্থ (الظاهر السياقي)'** বলেও অভিহিত করেছেন।[586]

একটি আপত্তি ও তার খণ্ডন :

কেউ আপত্তি পেশ করে বলতে পারেন, "প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে তো এমন-এমন বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে, যা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ 'হাত' বলতে আমরা প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী 'অঙ্গ' বুঝি। তাহলে আমরা কি মহান আল্লাহর জন্য 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' সাব্যস্ত করব?!"

এই আপত্তির জবাবে আমরা বলব, কার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, এটা মাথায় রাখা জরুরি। আমরা যখন মহান আল্লাহর জন্য কোনো বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করি, যেই বৈশিষ্ট্যের মতো একই নামের বৈশিষ্ট্য মাখলুকের মাঝেও পাওয়া যায়, তখন দুটোর মূল অর্থ আলাদা না হলেও উভয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিরাট তারতম্য থাকে। যেমন মহান আল্লাহর কুদরত আছে। আমরা জানি, কুদরত মানে ক্ষমতা। মাখলুকেরও কুদরত আছে। এই কুদরতের মানেও ক্ষমতা। অথচ মহান আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন, কিন্তু মাখলুকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মহান আল্লাহর ক্ষমতা কারও ওপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু মাখলুকের ক্ষমতা নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ মাখলুককে ক্ষমতা না দিলে সে অক্ষম সৃষ্টিতে পরিণত হবে।

তদ্রূপ মহান আল্লাহর জন্য 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' সাব্যস্ত করলে আল্লাহর জন্য ত্রুটি সাব্যস্ত করা হয়। মহান আল্লাহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত—এমন অর্থ প্রকাশ পায়। নাউজুবিল্লাহ। তাই আল্লাহর জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

---

[586] মাহির আমির, ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৮৭৩; আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৮৪।

সাব্যস্ত করা যাবে না। সামনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

এই বিষয়টি লক্ষ করে **ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেছিলেন :**

«وقد قال الخطابي في «الأعلام»: مذهب السلف في أحاديث الصفات: الإيمان، و إجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.

ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل».

"খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *'আলামুল হাদিস'* গ্রন্থে বলেছেন, সিফাত-সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ক্ষেত্রে সালাফদের আদর্শ ছিল—এগুলোর প্রতি ইমান আনা, সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এগুলোকে গ্রহণ করা এবং এসব গুণের ধরন নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা।

যারা বলে, 'কুরআন-সুন্নাহয় সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ বোঝানো হয়নি', তাদেরকে বলতে হবে, **প্রকাশ্য অর্থ দুই ধরনের।** যথা :

(১) এমন প্রকাশ্য অর্থ, যা মাখলুকের সাথে মানানসই এবং কেবল মাখলুকের জন্যই প্রযোজ্য। মহান আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এই 'প্রকাশ্য অর্থ' বোঝানো হয়নি।

(২) এমন প্রকাশ্য অর্থ, যা মহিমান্বিত ও সম্মানিত আল্লাহর জন্য মানানসই। মহান আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে এই 'প্রকাশ্য অর্থই' বোঝানো হয়েছে। এই অর্থ অস্বীকার করা মূলত সিফাতকে তাতিল (অস্বীকার) করার শামিল।"[587]

---

[587] ইবনু রজব, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ৭, পৃ. ২৩৩।

প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করার আবশ্যকতা :

ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ একমত ছিলেন, অবশ্যই সিফাতের প্রকাশ্য অর্থের প্রতি ইমান আনতে হবে। তাই এ বিষয়ে ভিন্ন মত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই, কোনো বৈধতা নেই।

এ প্রসঙ্গে **ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন :**

«فَأَما مَا سَأَلتَ عَنهُ من الْكَلَام فِي الصِّفَات وَمَا جَاءَ مِنْهَا فِي الْكتاب وَالسّنَن الصَّحِيحَة فَإِن مَذْهَب السّلف إِثْبَاتهَا و**إجراؤها على ظَاهرهَا** وَنفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنْهَا».

"আপনি মহান আল্লাহর গুণাবলি এবং এ বিষয়ে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহয় বর্ণিত বিষয়গুলোর আলোচনা জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে সালাফদের আদর্শ ছিল—এসব গুণ সাব্যস্ত করা, **এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা,** এবং এসব গুণের ধরন ও সাদৃশ্য স্থাপন করা থেকে বিরত থাকা।"[588]

উক্তিটি বর্ণনা করার পর **ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) লিখেছেন :**

«وَكَذَا نقل الِاتِّفَاق عَن السّلف فِي هَذَا الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب ثمَّ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم التَّيْمِيّ الْأَصْبَهَانِيّ وَغَيرهم».

"অনুরূপভাবে এ বিষয়ে সালাফদের সর্বসম্মত মত বর্ণনা করেছেন—হাফিজ আবু বাকর আল-খতিব, তাঁর পর হাফিজ আবুল কাসিম আত-তাইমি আল-আসবাহানি প্রমুখ।"[589]

---

[588] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৩৬।

[589] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৩৬।

ইমাম খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :

«أما الْكَلَام فِي الصِّفَات فَأَما مَا رُوِيَ مِنْهَا فِي السّنَن الصِّحَاح فمذهب السّلف إِثْبَاتهَا وإجراؤها على ظواهرها وَنفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنْهَا».

"**সিফাত প্রসঙ্গে আলোচনা :** সহিহ সুন্নাহয় যেসব সিফাত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সালাফদের আদর্শ ছিল—এসব গুণ সাব্যস্ত করা, **এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা,** এবং এসব গুণের ধরন ও সাদৃশ্য স্থাপন করা থেকে বিরত থাকা।"[590]

সমগ্র আহলুস সুন্নাহ একমত—সিফাতকে রূপক অর্থে নয়, বরং প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী সিফাতের প্রতি ইমান আনতে হবে। **ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :**

«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، **وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز،** إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله».

"আহলুস সুন্নাহ এ মর্মে একমত পোষণ করেছে যে, কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত সকল সিফাত তথা আল্লাহর গুণ

---

[590] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৫৩।

সাব্যস্ত করতে হবে, সেগুলোর প্রতি ইমান রাখতে হবে **এবং সেগুলোকে প্রকৃত অর্থ অনুযায়ীই ব্যাখ্যা করতে হবে, মাজাজ তথা রূপক অর্থে নয়।** তবে আহলুস সুন্নাহ এসব গুণের কোনো ধরন নির্দিষ্ট করে না এবং কোনো সীমাবদ্ধ ধরন-প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধও করেন না। পক্ষান্তরে বিদাতি গোষ্ঠী, জাহমিয়া সম্প্রদায়, সমুদয় মুতাজিলা ও খারেজি সম্প্রদায়—এদের সবাই এসব সিফাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং এসবের কোনোকিছুকেই প্রকৃত অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করে না। বরং তারা মনে করে, যে ব্যক্তি এসব সিফাতের স্বীকৃতি দেয়, সে সাদৃশ্যবাদী মুশাব্বিহ। কিন্তু যারা সিফাতকে সাব্যস্ত করে, তাদের কাছে ওরা এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা মাবুদের প্রতিই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী। প্রকৃতপ্রস্তাবে এক্ষেত্রে হক রয়েছে তাঁদেরই বক্তব্যের মাঝে, যাঁরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাতের বক্তব্য মোতাবেক কথা বলেছেন। আর তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণ। আলহামদুলিল্লাহ।”[591]

আকিদা বিষয়ে সালাফদের আদর্শ কেমন ছিল, সেটা প্রমাণ করার জন্য পরবর্তী যুগের অনেক ইমাম ‘ইমাম ইবনু আব্দিল বার্রের’ এই অমূল্য উক্তিটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—হাম্বালি মাজহাবের ‘শাইখুল মাজহাব’ খ্যাত ইমাম ইবনু

[591] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ৭, পৃ. ১৪৫।

কুদামা,[592] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া,[593] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম,[594] ইমাম জাহাবি[595] প্রমুখ।

সুতরাং যারা বিনা দলিলে সিফাতের তাবিল করে, প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, তারা পথভ্রষ্ট। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সবাই একমত। **ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.) বলেছেন :**

«وأما الإِجْماع فَإِن الصَّحابَة أَجمعُوا على ترك التَّأْوِيل بِما ذَكرْناهُ عَنْهُم وكَذَلِكَ أهل كل عصر بعدهمْ ولم ينْقل التَّأْوِيل إِلّا عَن مُبْتَدع أو مَنسُوب إِلى بِدعَة».

"আর সর্ববাদিসম্মত অভিমতের ব্যাপারটি হলো, সাহাবিগণ (নিন্দনীয়) তাবিল বর্জনের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন; আমরা তাঁদের নিকট থেকে যা বর্ণনা করেছি তা থেকেই বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়। তদ্রূপ তাঁদের পরবর্তী সকল যুগের (হকপন্থি) অধিবাসীগণ এমনটিই মনে করেছেন। কেবল বিদাতি কিংবা বিদাতের সাথে সম্পৃক্ত লোক ছাড়া অন্য কেউ তাবিল করেছেন বলে জানা যায়নি।"[596]

---

[592] মুওয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি, ***ইসবাতু সিফাতিল উলু,*** তাহকিক : আহমাদ বিন আতিয়্যা আল-গামিদি (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৮৯।

[593] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ৪৮২।

[594] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ২, পৃ. ৮৭৫-৮৭৬।

[595] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৫০।

[596] ইবনু কুদামা, ***জাম্মুত তাবিল,*** পৃ. ৪০।

চতুর্থ মূলনীতি : সিফাতের অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু ধরন অজ্ঞাত

মহান আল্লাহর সিফাতসমূহ একদিক থেকে আমাদের কাছে বিদিত, আরেকদিক থেকে অবিদিত। অর্থের দিক থেকে সিফাতসমূহ আমাদের কাছে জ্ঞাত, কিন্তু ধরনের দিক থেকে আমাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ জানি, কিন্তু সিফাতের ধরন-প্রকৃতি জানি না।

কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾.

"তারা কি কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তাহলে তারা অবশ্যই এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।"[597]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾.

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমরা আপনার প্রতি নাজিল করেছি। যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করে। আর যাতে বোধসম্পন্ন মানুষরা গ্রহণ করে উপদেশ।"[598]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾.

"তারা কি কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[599]

---

[597] সুরা নিসা ৪:৮২।

[598] সুরা সাদ ৩৮:২৯।

[599] সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে পুরো কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহর অজস্র সিফাত। যদি এসব সিফাতের অর্থ আমাদের কাছে অজানাই থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ পুরো কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করার নির্দেশ দিতেন না। কেননা তখন বিষয়টি হয়ে যেত সাধ্যাতীত ভার চাপিয়ে দেওয়ার শামিল। আর আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, তিনি কারও ওপর সাধ্যাতীত ভার চাপিয়ে দেন না। সুতরাং তাঁর আলোচ্য নির্দেশ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন যাদের ওপর নাজিল হয়েছে, তারা সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ বোঝে, প্রকাশ্য অর্থ জানে। কিন্তু মহান আল্লাহর সিফাত কেমন, কিংবা সিফাতের ধরন-প্রকৃতি কেমন, সেটা তারা জানে না।[600]

ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তি ও তার ব্যাখ্যা :

বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ি ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৭৯ হি.) একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহর সিফাতের ন্যূনতম মূল অর্থ আমাদের জানা আছে, কিন্তু সিফাতের ধরন-প্রকৃতি জানা নেই। একবার এক ব্যক্তি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মজলিসে এসে প্রশ্ন করে, "হে আব্দুল্লাহর পিতা, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ওঠেছেন।' বলুন তো, তিনি কীভাবে ওঠেছেন?"

প্রশ্ন শুনে ইমাম মালিক অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর কপালে ঘাম জমল। উপস্থিত মানুষজন নিস্তব্ধ—একদম চুপ। সবাই

---

[600] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৮৯; ফালিহ আলু মাহদি, ***আত-তুহফাতুল মাহদিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

অপেক্ষা করছেন, ইমাম মালিক কী জবাব দেবেন। কিছুক্ষণ পর ইমাম মালিক তাঁর কালজয়ী উক্তিটি পেশ করলেন। **বললেন :**

«الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ».

"মহান আল্লাহ যে আরশের ওপরে ওঠেছেন—তা আমাদের কাছে সুবিদিত। কিন্তু সেটার ধরন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এটার প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, আর এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদাত।"

উক্তিটি বলার পর প্রশ্নকারী ব্যক্তির উদ্দেশে ইমাম মালিক বললেন, "আমি আশঙ্কা করছি, তুমি বিভ্রান্ত লোক হয়ে থাকবে।" এ কথা বলে তিনি লোকটিকে মজলিস থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাকে বের করে দেওয়া হলো।[601]

সিফাত বিষয়ে সালাফদের আকিদা ও মানহাজ কেমন ছিল, সেটা ইমাম মালিকের উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই উক্তি থেকে অনেকগুলো মূলনীতি ও ইলমি অবগতি জানা যায়। আমরা প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করছি।

এক. আরবি ভাষায় মহান আল্লাহর সিফাতের অর্থ কী, সেটা মানুষ জানে। সুতরাং সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ কোনো অজানা বা অজ্ঞাত বিষয় নয়।

দুই. মহান আল্লাহর সিফাতের ধরন-প্রকৃতি আছে। কিন্তু সেই ধরন-প্রকৃতি কেমন, সেটা আমরা জানি না। এই জ্ঞান স্রেফ আল্লাহর কাছে আছে।

---

[601] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৪১; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮।

তিন. কুরআন-সুন্নাহয় মহান আল্লাহর যেসব সিফাত প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রতি ইমান আনা আবশ্যক। এসব সুপ্রমাণিত সিফাতের অর্থ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

চার. সিফাতের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না। কেননা এসব সিফাত সম্পর্কে জানার পর সাহাবিগণ নবিজিকে জিজ্ঞেস করেননি, 'আল্লাহ কীভাবে আরশের ওপর ওঠেছেন,' কিংবা 'কীভাবে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন,' কিংবা 'আল্লাহর হাত-পা কেমন?' তাই এ ধরনের প্রশ্ন করা সালাফদের মানহাজ পরিপন্থি—বিদাত।

ইমাম মালিকের আলোচ্য উক্তির ওপরে শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। আগ্রহী পাঠকবর্গ উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা জানতে চাইলে পুস্তিকাটি পড়তে পারেন।[602]

ইমাম মালিকের বলা আলোচ্য উক্তিটির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সকল বিদ্বান একমত। এ প্রসঙ্গে **ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন :**

«هَذَا ثَابت عَن مَالك، وَتقدم نَحوه عَن ربيعَة شيخ مَالك، **وَهُوَ قَول أهل السّنة قاطبة :** أَن كَيْفيَّة الاسْتوَاء لَا نعقلها، بل نجهلها وَأَن استواءه مَعْلُوم كَمَا أخبر فِي كِتَابه وَأَنه كَمَا يَلِيق بِهِ».

"এই বক্তব্য ইমাম মালিক থেকে প্রমাণিত। এবং একই বক্তব্য ইমাম মালিকের শাইখ ইমাম রাবিআ থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। **আর এই**

---

602 আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর, ***আল-আসারুল মাশহুর আনিল ইমাম মালিক ফি সিফাতিল ইস্তিওয়া দিরাসাতুন তাহলিলিয়্যা*** (মদিনা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা, প্র. ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৩-৪১।

বক্তব্য মূলত সমগ্র আহলুস সুন্নাহরই বক্তব্য। সমগ্র আহলুস সুন্নাহর মতে, আরশের ওপরে মহান আল্লাহর আরোহণের ধরন-প্রকৃতি আমরা জানি না; এ ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ। তবে তাঁর আরোহণের বিষয়টি আমাদের জানা আছে, যেমনভাবে তিনি কুরআনে জানিয়েছেন। আর তা তাঁর মর্যাদার সাথে যেভাবে মানানসই, সেভাবেই সাব্যস্ত করা হবে।"[603]

এই মূলনীতি 'আরশের ওপর আরোহণ' সিফাতের ব্যাপারে বলা হলেও এটা অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে **ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وَهَذَا الْجَوَابُ مِنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي الِاسْتِوَاءِ شَافٍ كَافٍ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ. مِثْلَ النُّزُولِ وَالْمَجِيءِ وَالْيَدِ وَالْوَجْهِ وَغَيْرِهَا. فَيُقَالُ فِي مِثْلِ النُّزُولِ: النُّزُولُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ إِذْ هِيَ بِمَثَابَةِ الِاسْتِوَاءِ الْوَارِدِ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ».

"ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ মহান আল্লাহর আরশে আরোহণ প্রসঙ্গে যেই উত্তর দিয়েছেন, সেটা সকল সিফাতের জন্যই যথেষ্ট ও সন্তোষজনক বক্তব্য। যেমন *আন-নুজুল* তথা *অবতরণ*, *আল-মাজিউ* তথা *আগমন*, *আল-ইয়াদ* তথা *হাত*, *আল-ওয়াজহ* তথা *চেহারা* ইত্যাদি। সুতরাং *নুজুল* তথা *অবতরণ* সিফাত সম্পর্কে বলা হবে, 'মহান আল্লাহর অবতরণ আমাদের কাছে সুবিদিত। কিন্তু তার ধরন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এটার প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব, আর এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদাত।' একইভাবে অন্যান্য সকল সিফাতের ক্ষেত্রেও এ কথা বলা

[603] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ১৩৯।

হবে। কারণ সেগুলোও কুরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত—*'আরশে আরোহণ'* সিফাতের পর্যায়ভুক্ত।"[604]

মাতুরিদি মতাদর্শের বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও **আল্লামা মোল্লা আলি কারি হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০১৪ হি.)** ইমাম মালিকের আলোচ্য বক্তব্যের চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, যা সালাফদের আকিদা ও মানহাজের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। **তিনি *মিশকাতের* বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ *'মিরকাতে'* লিখেছেন :**

«فَرْقٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَعْلُومِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَبَيْنَ الْكَيْفِ الَّذِي لَا يَعْقِلُهُ الْبَشَرُ، وَهَذَا الْجَوَابُ مِنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ شَافٍ عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالنُّزُولِ وَالْغَضَبِ وَالرَّحْمَةِ وَالضَّحِكِ، **فَمَعَانِيهَا كُلُّهَا مَعْلُومَةٌ، وَأَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَغَيْرُ مَعْقُولَةٍ،** إِذْ تَعَقُّلُ الْكَيْفِ فَرْعُ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكُنْهِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْلُومٍ، فَكَيْفَ يُعْقَلُ لَهُمْ كَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ؟ وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ يَصِفَ اللَّهَ - بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ: وَوَصَفَ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيرٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ».

"সুতরাং এ জাতীয় শব্দের সুবিদিত অর্থ এবং তার ধরন—যা মানুষ বুঝতে পারে না—এর মধ্যে পার্থক্য আছে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ যেই উত্তর দিয়েছেন, তা যথেষ্ট এবং সকল সিফাতের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হিসেবে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহর শোনা, দেখা, জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, *নুজুল* তথা *অবতরণ*, রাগ, রহমত,

---

[604] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৪, পৃ. ৪।

হাসি ইত্যাদি। **এ জাতীয় সকল সিফাতের অর্থই আমাদের জানা আছে। কিন্তু সেগুলোর ধরন-প্রকৃতি আমাদের জানা নেই।** কারণ ধরন-প্রকৃতি জেনে ফেলার বিষয়টি নির্ভর করে (আল্লাহর) সত্তা ও তার ধরন-প্রকৃতি জানার ওপর। যেখানে আল্লাহর সত্তার প্রকৃতি আমাদের অজানা, সেখানে তাঁর সিফাতগুলোর ধরন-প্রকৃতি জানা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?!

এই বিষয়ে কল্যাণকর ও সুরক্ষিত মতাদর্শ হলো—মহান আল্লাহর জন্য তিনি নিজে যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা—কোনোরূপ তাহরিফ (বিকৃতি) ও তাতিল (অস্বীকার-অপব্যাখ্যা) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ) ও তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে।"[605]

---

[605] আবুল হাসান আলি বিন সুলতান আল-কারি, ***মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ*** (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৭৯।

‘আমরা সিফাতের ব্যাখ্যা করি না’ – কথাটির মর্মার্থ

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ সিফাত বিষয়ক আকিদা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেছেন, **“আমরা এতে কিছু সংযোজন করি না এবং এগুলোর ব্যাখ্যা করি না।”** সালাফদের আরও অনেক ইমাম থেকে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন সিফাত-সংক্রান্ত হাদিস সম্পর্কে সালাফদের যুগের ইমাম **আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৪ হি.) বলেছেন :**

«هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عِنْدَنَا حَقٌّ يَرْوِيهَا الثِّقَاتُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنَّا إِذَا سُئِلْنَا عَنْ تَفْسِيرِهَا قُلْنَا: **مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا يُفَسِّرُ مِنْهَا شَيْئًا وَنَحْنُ لَا نُفَسِّرُ مِنْهَا شَيْئًا نُصَدِّقُ بِهَا وَنَسْكُتُ**».

“এই হাদিসগুলো আমাদের কাছে সত্য। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ একে অন্যের মারফতে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তবে আমাদের কাছে যখন এসব হাদিসের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়, তখন আমরা বলি, **আমরা এমন কাউকে পাইনি, যিনি এসবের কোনো ব্যাখ্যা করতেন; আমরা নিজেরাও এসবের কোনো ব্যাখ্যা করি না।** আমরা এসব হাদিসকে সত্যায়ন করি এবং (সিফাতের ব্যাখ্যা করা থেকে) নীরব থাকি।”[606]

সিফাতের হাদিস সম্পর্কে তাবে-তাবেয়ি ইমাম **ওয়াকি ইবনুল জার্রাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৭ হি.) বলেছেন :**

«كَانَ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد وَالثَّوْري ومسعر يروون هَذِه الْأَحَادِيث لَا يفسرون مِنْهَا شَيْئا».

---

[606] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮১।

"ইসমায়িল ইবনু আবি খালিদ, সুফইয়ান আস-সাওরি এবং মিসআর ইবনু কিদাম—ইনারা সবাই এসব হাদিস বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁরা এসবের কোনো ব্যাখ্যা করতেন না।"[607]

তাফবিদকারীদের দাবির অপনোদন :

সালাফদের এ জাতীয় উক্তি দিয়ে তাফবিদপন্থি বিদাতিরা নিজেদের বিদাতি আকিদার পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে। অর্থাৎ তাফবিদপন্থি বিদাতিরা বলতে চায়, "আমরা যে বলি, *'অমুক-অমুক সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করা যাবে না,'* সেটাই বলেছেন সালাফগণ! তাঁরা বলেছেন, কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না। সুতরাং আমাদের আকিদা মূলত সালাফদের নিরাপদ আকিদা।" যেমন সমকালীন আশারি শাইখ সাইফ আল-আসরি এরকম উদ্ভট আর্গুমেন্ট দিয়ে তাঁর কিতাব ভরতি করেছেন।[608] প্রকৃতপক্ষে তাফবিদকারীদের এই দাবির মধ্যে আছে শুভঙ্করের ফাঁকি। সংক্ষেপে এর কয়েকটা কারণ ব্যাখ্যা করি।

প্রথমত, তাফবিদপন্থি বিদ্বানগণ যেই গ্রিক ফিলোসফি-প্রভাবিত জটিল মানতিকি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে তাফবিদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই নীতিমালার ওপর সালাফগণ নির্ভর করেননি। এমনকি তাঁদের অধিকাংশই এসব দুর্বোধ্য ফিলোসফিক্যাল নীতিমালা সম্পর্কে জানতেন না। কারণ গ্রিক ফিলোসফির বইপত্র অনুবাদই শুরু

---

[607] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ১৪৬।

[608] সাইফ বিন আলি আল-আসরি, ***আল-কওলুত তামাম বি ইসবাতিত তাফবিদি মাজহাবান লিস সালাফিল কিরাম*** (জর্ডান : দারুল ফাতহ, তাবি), পৃ. ১৬৯-১৭৪।

উল্লেখ্য, সাইফ আল-আসরির সম্পূর্ণ বইটি খণ্ডন করে বিশিষ্ট সালাফি বিদ্বান শাইখ **মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আলু খুদাইর** হাফিজাহুল্লাহ একটি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটির নাম—মাকালাতুত তাফবিদ বাইনাস সালাফি ওয়াল মুতাকাল্লিমিন।

হয়েছে তাবেয়িদের জামানায়।[609] এর আগের সালাফদের পক্ষে এসব বিষয় জানা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু সালাফগণ গ্রিক ফিলোসোফি থেকে জন্ম নেওয়া ইলমুল কালামের তীব্র সমালোচনা করতেন, এবং এই বিদ্যা মোতাবেক আকিদা চর্চাকারীদের *'জিন্দিক (ধর্মচ্যুত)'* বলতেন।[610]

দ্বিতীয়ত, তাফবিদপন্থিরা নিজেদের তাফবিদি নীতির ব্যাখ্যায় পরিষ্কার করেছে, কোনোভাবেই সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করা যাবে না এবং সেই প্রকাশ্য অর্থ শরয়ি দলিলে বোঝানোও হয়নি। বরং অন্য কোনো অর্থ বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সেটা তারা জানে না![611] অথচ সালাফগণ তাদের মতো এসব কথা বলেননি যে, 'কুরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত সিফাতগুলোর প্রকাশ্য অর্থ বোঝানো হয়নি।' আমরা তাফবিদপন্থিদের বলব, "যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের দাবির পক্ষে দলিলপ্রমাণ হাজির করেন! সালাফদের কোন ইমাম আপনাদের মতো এরকম অদ্ভুত কথা বলেছেন?"

তৃতীয়ত, তাফবিদপন্থিরা মনে করে, সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ কুফর! কুরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত হয়েছে এমন সিফাতগুলোর মধ্যে তাফবিদপন্থিরা যেসবের তাফবিদ করে, সেসব সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ কুফর! পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক আশারি বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ

---

[609] জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, ***সওনুল মানতিকি ওয়াল কালাম আন ফান্নাইল মানতিকি ওয়াল কালাম,*** তাহকিক : আলি সামি আন-নাশশার ও সুআদ আলি আব্দুর রাজ্জাক (মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যা, তাবি), পৃ. ৩৯-৪৫।

[610] আবু ইসমায়িল আল-হারাউয়ি, ***জাম্মুল কালামি ওয়া আহলিহি,*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল (মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি. - ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬৮-২২১।

[611] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৫৬।

আস-সানুসি-সহ (মৃ. ৮৯৫ হি.) অনেকেই এ ধরনের ভয়ংকর দাবি করেছেন।[612] প্রকাশ্য অর্থের এই কুফর থেকে বাঁচতে তাফবিদকারীরা 'প্রকাশ্য অর্থ' অস্বীকার করে; কিন্তু এরপর ভিন্ন আরেকটি অর্থ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। তাফবিদপন্থিদের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই, "সালাফদের কোন ইমাম আপনাদের মতো এরকম নিকৃষ্ট কথা বলেছেন যে, কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ কুফরি?! যদি এটা প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে কোন হায়ায় আর কোন লজ্জায় এই দাবি করেন যে, আপনাদের তাফবিদি আকিদাই ছিল সালাফদের আকিদা?"

চতুর্থত, সালাফগণ ব্যাখ্যা না করার কথা সকল সিফাতের ব্যাপারে আমভাবে বলেছেন। কিন্তু তাফবিদপন্থিগণ সকল সিফাতের ক্ষেত্রে তাফবিদ করেন না! যেসব সিফাতের ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে মনে হয়, এগুলো সাব্যস্ত করলে মহান আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়ে যাবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁরা তাফবিদের নীতি প্রয়োগ করেন। এছাড়া আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা, শোনা, দেখা, কথা, ক্ষমতা প্রভৃতি সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ তাঁরা সাব্যস্ত করে থাকেন। এ কারণে প্রখ্যাত আশারি পণ্ডিত **ইবরাহিম আল-লাক্কানি (মৃ. ১০৪১ হি.) বলেছিলেন :**

«وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ ... أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ، وَرُمْ تَنْزِيهًا»

"কুরআন-সুন্নাহর যে দলিলই মহান আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার ধারণা উদ্রেক করে, সেই দলিলকেই হয় তাবিল করবেন, নয়তো তাফবিদ করবেন। আর এই তাবিল বা তাফবিদ করার

---

[612] মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ-দুসুকি, ***হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শারহিস সানুসি লি উম্মিল বারাহিন*** (কায়রো : মাতবাআতু ইসা আল-বাবি আল-হালাবি, তাবি), পৃ. ২১৭।

সময় নিয়ত রাখবেন—আমি মহান আল্লাহকে ত্রুটিমুক্ত মহাপবিত্র ঘোষণা করছি।"[613]

আমরা বুঝতে পারলাম, তাফবিদের নীতি আশারি-মাতুরিদি গোষ্ঠী সকল সিফাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না। বরং যেসব সিফাতের ক্ষেত্রে তারা মনে করে, এগুলো সাব্যস্ত করলে আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যস্থাপন করা হয়ে যাবে, কেবল সেগুলোর ক্ষেত্রেই তারা তাফবিদের নীতি প্রয়োগ করে। তাহলে তাদের দাবি অনুযায়ী, তারা কি সালাফগণের কথা পুরোপুরি মানল?! নিজেদের নীতির ওপর কি কনসিস্টেন্ট থাকল?! আল্লাহুল মুস্তাআন।

পঞ্চমত, সালাফদের থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে, তাঁরা বিভিন্ন সিফাতের অর্থ করেছেন। যেমন আস-সামাদিয়্যা (অমুখাপেক্ষিতা),[614] আল-ইস্তিওয়া (ওঠা/আরোহণ),[615] আল-আসাফ (অসন্তোষ)[616] প্রভৃতি সিফাতের অর্থ সাহাবি ও তাবেয়িদের থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। সামনের আলোচনায় আমরা সালাফদের থেকে এমন কিছু তাফসির দেখব ইনশাআল্লাহ। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, সালাফগণ সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত না করে তাফবিদ করতেন?

আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাফবিদপন্থিদের কিতাব খুলে খুলে তাদের বাতিল আকিদার অসারতা প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু বক্ষ্যমাণ কিতাব তাদের আকিদার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও খণ্ডন হিসেবে লেখা

---

[613] বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম আল-লাক্কানি, ***হিদায়াতুল মুরিদ লি জাওহারাতিত তাওহিদ,*** তাহকিক : মারওয়ান হুসাইন আল-আজহারি (কায়রো : দারুল বাসায়ির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৮।

[614] ইবনুল জাওজি, ***জাদুল মাসির,*** খ. ৪, পৃ. ৫০৬।

[615] আল-বুখারি, ***আস-সহিহুল জামি,*** খ. ৯, পৃ. ১২৪।

[616] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ২০, পৃ. ৬১৭-৬১৮।

হচ্ছে না। বিধায় তাদের মতবাদের দীর্ঘ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ক বিশদ রেফারেন্সেস দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

এবার আসি, সালাফদের উক্তির ব্যাখ্যায়। সালাফগণ যে বলেছেন, *"আমরা সিফাতের ব্যাখ্যা করি না,"* কিংবা বলেছেন, *"কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ইমান আনতে হবে,"* অথবা বলেছেন, *"কোনো অর্থ ছাড়াই সিফাত সাব্যস্ত করতে হবে,"*—এ জাতীয় কথার দুটো অর্থ রয়েছে।

প্রথম অর্থ :

'আমরা ব্যাখ্যা করি না' মানে—*'আমরা ধরন-নির্দিষ্ট করি না'।* সালাফদের যুগের ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৪ হি.), ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) প্রমুখ থেকে এই ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়েছে। **ইমাম আবু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صِحَاحٌ حَمَلَهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ والفقهاء بعضهم على بَعْضٍ، وهِيَ عِنْدَنَا حَقٌّ لَا نَشُكُّ فِيهَا، **وَلَكِنْ إِذَا قِيلَ: كَيْفَ وَضَعَ قَدَمَهُ؟ وَكَيْفَ ضَحِكَ؟ قُلْنَا: لَا يُفَسَّر هَذَا وَلَا سَمِعْنَا أَحَدًا يُفَسِّرُهُ».**

"এই হাদিসগুলো সহিহ। মুহাদ্দিস ও ফাকিহগণ এসব হাদিস একে অপরের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নিকটে এগুলো সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। **তবে যদি বলা হয়, 'আল্লাহ কীভাবে তাঁর পা রাখলেন?' অথবা 'কীভাবে হাসলেন?' তাহলে আমরা বলব, 'এর**

ব্যাখ্যা করা যাবে না; আমরা কাউকে এর ব্যাখ্যা করতেও শুনিনি'।"[617]

ইমাম আবু উবাইদ নিজেই তাঁর *'গরিবুল হাদিস'* গ্রন্থে আল্লাহর *'হানান'* সিফাতের অর্থ করেছেন *'রহমত'।*[618] আমরা জানলাম, ইমাম আবু উবাইদ *'সিফাতের ব্যাখ্যা করা যাবে না'* বলা সত্ত্বেও তিনি নিজেই সিফাতের ব্যাখ্যা করেছেন। তার মানে অবশ্যই তিনি 'ব্যাখ্যা' বলতে অন্য কিছু বুঝিয়েছেন। তিনি আসলে কী বুঝিয়েছেন, সেটা আমরা কথার প্রসঙ্গের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারি। তিনি বলছিলেন, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'মহান আল্লাহ **কীভাবে** তাঁর পা রাখবেন?' 'মহান আল্লাহ **কীভাবে** হাসেন?' তখন তার উত্তরে আমরা বলব, "এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমরা কাউকে এর ব্যাখ্যা করতে শুনিনি।" পুরো কথার প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, *'ব্যাখ্যা করা যাবে না'*—বলে 'ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা' বুঝিয়েছেন সালাফদের যুগের ইমাম আবু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সুবিখ্যাত *'সুনানুত তিরমিজি'* গ্রন্থে বলেছেন :

«وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ، وَيُؤْمَنُ بِهَا، **وَلَا تُفَسَّرُ وَلَا تُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ**، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ

---

[617] আবুল হাসান আলি বিন উমার আদ-দারাকুতনি, ***কিতাবুস সিফাত,*** তাহকিক : আলি বিন নাসির আল-ফাকিহি (প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৬৮-৬৯।

[618] আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাবি, ***গরিবুল হাদিস,*** তাহকিক : হুসাইন মুহাম্মাদ শারাফ (কায়রো : আল-হাইআতুল আম্মাহ লি শুউনিল মাতাবিয়িল আমিরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫।

الَّذِي اخْتَارُوهُ، وَذَهَبُوا إِلَيْهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: **فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ يَعْنِي يَتَجَلَّى لَهُمْ**».

"এটাই হলো আহলুল হাদিসদের চয়নকৃত মতাদর্শ—এ ধরনের বিষয়গুলো যেভাবে এসেছে, তাঁরা সেগুলো সেভাবেই বর্ণনা করবেন। আর এসবের প্রতি ইমান আনতে হবে। **কিন্তু এগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না,** এগুলো নিয়ে অনুমান-কল্পনা করা যাবে না, **এবং বলা যাবে না যে, 'এসবের ধরন কী?'** উলামাগণের মতাদর্শও এটাই, যা তাঁরা গ্রহণ ও চয়ন করেছেন। আর হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কথা বলেছেন যে, ***'তিনি (আল্লাহ) তাদের কাছে নিজেকে পরিচিত করাবেন,'* এর মানে—তিনি তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন।"**[619]

আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি, ইমাম তিরমিজি *'সিফাতের ব্যাখ্যা করা যাবে না'* বলা সত্ত্বেও এক বাক্য পরে নিজেই একটি সিফাতের ব্যাখ্যা করেছেন! সুতরাং অবশ্যই তিনি ব্যাখ্যা বলতে অন্য কিছু বুঝিয়েছেন। তিনি আসলে কী বুঝিয়েছেন, সেটা আমরা তাঁর কথার প্রসঙ্গের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারি। ইমাম তিরমিজি যেই বাক্যে বলেছেন, *'সিফাতের ব্যাখ্যা করা যাবে না,'* সেই বাক্যেই তিনি লিখে দিয়েছেন, **'বলা যাবে না যে, এসবের ধরন কী?'** এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, তিনি *'সিফাতের ব্যাখ্যা করা যাবে না'*—বলে বুঝিয়েছেন, 'সিফাতের ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা যাবে না।' এটাই ছিল সালাফদের সমঝ, যা গ্রহণ না করলে স্ববিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী।

---

[619] আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা আত-তিরমিজি, ***আল-জামিউস সহিহ,*** তাহকিক ও টীকা : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি ও ইবরাহিম আতওয়া (মিশর : শারিকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৭-৮৩।

এজন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে ইমাম ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৩১১ হি.) স্তরের বিদ্বান **আবু আহমাদ ইবনু আবি উসামা আল-কুরাশি আল-হারাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন :**

«وَلَا نكيف صِفَات الله ﷻ، وَلَا نفسرها تَفْسِير أهل التكييف والتشبيه».

"আমরা মহান আল্লাহর গুণাবলির ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করি না। আমরা আল্লাহর গুণগুলোর ব্যাখ্যা করি না, যেমনভাবে ধরন-প্রকৃতি বর্ণনাকারী মুশাব্বিহা সম্প্রদায় ব্যাখ্যা করে থাকে।"[620]

দ্বিতীয় অর্থ :

'আমরা ব্যাখ্যা করি না' মানে—*'আমরা জাহমিদের বাতিল ব্যাখ্যা করি না,' 'অপব্যাখ্যা করি না'।* ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ থেকে সালাফদের উক্তির এই অর্থ সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, ইমাম তিরমিজি *'সুনানুত তিরমিজি'* কিতাবে বলেছেন, "সিফাতের ব্যাখ্যা করা যাবে না।" **এটা বলা সত্ত্বেও তিনি একই গ্রন্থ *সুনানুত তিরমিজিতে* লিখেছেন :**

«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ اليَدَ وَالسَّمْعَ وَالبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتِ الجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ **فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ العِلْمِ،** وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى اليَدِ هَاهُنَا القُوَّةُ».

---

[620] আবুল কাসিম ইসমায়িল বিন মুহাম্মাদ আত-তাইমি আল-আসবাহানি, ***আল-হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ ওয়া শারহু আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন রাবি আল-মাদখালি ও মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আবু রহিম (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫১২।

"মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় নিজের হাত, শোনা ও দেখার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জাহমিয়া সম্প্রদায় এ আয়াতগুলোর তাবিল (অপব্যাখ্যা) করেছে। **তারা এসবের এমন ব্যাখ্যা করেছে, যা আহলুল ইলমদের ব্যাখ্যার বিপরীত।** তারা বলেছে, 'আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেননি।' তারা ব্যক্ত করেছে, এখানে *'হাত'* শব্দের অর্থ হলো *'ক্ষমতা'।*"[621]

ইমাম তিরমিজির এই বক্তব্য থেকে দুটো বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা :

এক. সিফাতের ব্যাখ্যা জাহমিরাও করেছে, আবার আহলুস সুন্নাহর আলিমগণও করেছেন।

দুই. জাহমিদের ব্যাখ্যাগুলো হয়েছে আহলুস সুন্নাহর আলিমদের ব্যাখ্যার বিপরীত।

অনুরূপভাবে বিখ্যাত মুতাজিলি পণ্ডিত বিশর আল-মারিসির খণ্ডন করতে যেয়ে **ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছিলেন :**

«فَكَمَا نَحْنُ لَا نُكَيِّفُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا نُكَذِّبُ بِهَا كَتَكْذِيبِكُمْ، وَلَا نُفَسِّرُهَا كَبَاطِلِ تفسيركم».

"আমরা যেমন মহান আল্লাহর এসব সিফাতের ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করি না, তেমনি আমরা তোমাদের মতো এসব সিফাতকে অস্বীকার করি না। আর আমরা এই সিফাতগুলোর ব্যাখ্যা করি না, যেমনভাবে তোমরা এসব সিফাতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে থাক।"[622]

---

[621] সুনানুত তিরমিজি, খ. ৩, পৃ. ৪১।

[622] আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান,*** খ. ১, পৃ. ২২২।

এ থেকে বোঝা যায়, সিফাতের সঠিক ব্যাখ্যা করলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু জাহমিদের মতো বাতিল ব্যাখ্যা তথা অপব্যাখ্যা করলে বিরাট অসুবিধা আছে। এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সালাফদের বক্তব্যে যেই ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেটা হলো জাহমিদের ব্যাখ্যা; অর্থাৎ সিফাতের প্রকৃত অর্থ অস্বীকার করা এবং সেটার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া। আমরা আরও বুঝতে পারলাম, তাফবিদপন্থিরাও সালাফদের আকিদা-মানহাজের বিরোধী, আবার তাবিলপন্থিরাও সালাফদের আকিদা-মানহাজের বিরোধী। আল্লাহুল মুস্তাআন।

আল্লাহর হাত সিফাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ সিফাত বিষয়ক মৌলিক আকিদা উল্লেখ করতে যেয়ে কয়েকটি সিফাতের উদাহরণ দিয়েছেন, যেসবের প্রতি ইমান আনা জরুরি। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহর হাত সিফাত আছে। আমাদের সকল সালাফ মহান আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করেছেন। ন্যায়নিষ্ঠ সালাফ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে—আল্লাহ তাআলার সত্যিকারের দুটো হাত রয়েছে। দুটো হাত মহান আল্লাহর সিফাত। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, দুই হাত আল্লাহর *'সিফাত জাতিয়্যা'* তথা *'সত্তাগত গুণ';* অর্থাৎ, যেই সিফাত আল্লাহর সত্তা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না।

উক্ত সিফাত আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত সেভাবেই সাব্যস্ত করি, যেভাবে অপরাপর সিফাত সাব্যস্ত করে থাকি—কোনোরূপ তাহরিফ (বিকৃতি) ও তাতিল (অস্বীকার-অপব্যাখ্যা) না করে এবং তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ) ও তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে।

সালাফদের যুগের ইমামগণের নাম উল্লেখ করে ইমাম আবুল কাসিম আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৩৫ হি.) আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আকিদা ও মানহাজ বর্ণনা করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

«مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، **أن صفات الله التي وصف بها نفسه،**

أو وصفه بها رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيه، ولا تشبيه ولا تأويل، قال سفيان بن عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» أي على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل».

"ইমাম মালিক, সুফইয়ান আস-সাওরি, আল-আওজায়ি, আশ-শাফিয়ি, হাম্মাদ বিন সালামা, হাম্মাদ বিন জাইদ, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইয়াহইয়া বিন সায়িদ, আব্দুর রহমান বিন মাহদি, এবং ইসহাক বিন রাহুইয়াহ প্রমুখের মতাদর্শ হলো—**আল্লাহ নিজেকে যেসব গুণে বিশেষিত করেছেন, অথবা তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যেসব গুণে বিশেষিত করেছেন;** যেমন যেমন শোনা, দেখা, চেহারা, **দুই হাত,** এবং তাঁর অন্যান্য সকল গুণ; এসব সিফাতকে তাদের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরন কল্পনা করা যাবে না, (মাখলুকের সিফাতের সাথে) কোনো সাদৃশ্য দেওয়া যাবে না, এবং কোনো তাবিল তথা ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে না। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ নিজেকে যে গুণেই বিশেষিত করেছেন, তা পাঠ করাটাই তার ব্যাখ্যা।' অর্থাৎ, উক্ত সিফাত তথা গুণকে তার প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। কোনো ধরনের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসব গুণকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া না-জায়েজ।"[623]

---

[623] শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***আল-আরশ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি (মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৬৩।

মহান আল্লাহর যে হাত আছে, তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু দলিল পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

"ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত আবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের এই বক্তব্যের দরুণ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। **বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত;** যেভাবে ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন।"[624]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইহুদিরা আল্লাহর জন্য দুটো বিষয় সাব্যস্ত করেছিল— **(১)** আল্লাহর হাত আছে, **(২)** আল্লাহ কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। জালিমরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইহুদিদের একটি দাবি খণ্ডন করেছেন, কিন্তু তাঁর হাত থাকার বিষয়টি খণ্ডন করেননি। অথচ সত্যিকারের হাত সাব্যস্ত করলে যদি মহান আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার কুফর হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সেই দাবিরও খণ্ডন করতেন। অধিকন্তু তিনি বলে দিয়েছেন, "বরং আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত।"

---

[624] সুরা মায়িদা ৫:৬৪।

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২০৪ হি.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, *'আল্লাহর সিফাত বিষয়ে কেমন ইমান রাখা উচিত?'* **তিনি উত্তরে বলেছিলেন :**

«لله تبارك وتعالى أسماء **وصفات** جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه ﷺ أمته. ... أتانا أنه سميع، **وأن له يدين**، بقوله: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ﴾، وأن له يمينا، بقوله: ﴿وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾».

"মহান আল্লাহর কিছু নাম ও **গুণাবলি** আছে, যা তাঁর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যে সম্পর্কে তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন। ... আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, তিনি সর্বশ্রোতা, **তাঁর দুটো হাত রয়েছে।** তিনি বলেছেন, 'বরং আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।' (*সুরা মায়িদা ৫:৬৪*) তাঁর ডান হাত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন আসমানরাজি থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাজ করা অবস্থায়।' (*সুরা জুমার ৩৯:৬৭*)"[625]

২. ইবলিসের নাফরমানির ঘটনা উল্লেখ করার সময় **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّ﴾.

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?"[626]

প্রথম যুগের আশারি ইমাম **কাদি আবু বাকর আল-বাকিল্লানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৩ হি.) লিখেছেন :**

---

[625] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

[626] সুরা সাদ ৩৮:৭৫।

«فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الْحجَّة فِي أَن لله عز وجل وَجها ويدين؟ قيل لَهُ: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيبقى وَجه رَبك ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام﴾، وَقَوله: ﴿مَا مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بيَدي﴾، فَأَثْبت لنَفسِهِ وَجها ويدين».

“যদি কেউ বলে, ‘মহান আল্লাহর যে চেহারা ও দুই হাত আছে, তার প্রমাণ কী?’ তাকে বলতে হবে, মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আর থেকে যাবে শুধু আপনার রবের মহিমাময় ও সম্মানিত চেহারা।’ (*সুরা রহমান : ৫৫:২৭*) মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?’ (*সুরা সাদ ৩৮:৭৫*) আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর জন্য ‘চেহারা’ এবং ‘দুই হাত’ সাব্যস্ত করেছেন।”[627]

অনেকে বলে, এই আয়াতে হাত বলতে ‘কুদরত’ বা ‘নেয়ামত’ বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারে **আল-বাকিল্লানি বলেছেন :**

«يُقَال لَهُم هَذَا بَاطِل، لِأَن قَوْله ﴿بيَدي﴾ يَقْتَضِي إِثْبَات يدين **هما صفة لَهُ.** فَلَو كَانَ المُرَاد بهما الْقُدْرَة لوَجَبَ أَن يكون لَهُ قدرتان؛ وَأَنْتُم فَلَا تَزْعُمُونَ أَن للباري سُبْحَانَهُ قدرَة وَاحِدًا، فَكيف يجوز أَن تثبتوا لَهُ قدرتين؟! وَقد أجمع الْمُسلمُونَ من مثبتي الصِّفَات والنافين لَهَا على أَنه لَا يجوز أَن يكون لَهُ تَعَالَى قدرتان، فَبَطل مَا قُلْتُمْ.

---

627 আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানি, ***তামহিদুল আওয়ায়িল ফি তালখিসিদ দালায়িল,*** তাহকিক : ইমাদুদ্দিন আহমাদ হাইদার (লেবানন : মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৯৫-২৯৬।

وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يكون الله تَعَالَى خلق آدم بنعمتين، لِأَن نعم الله تَعَالَى على آدم وعَلى غَيره لَا تحصى؛ وَلِأَن الْقَائِل لَا يجوز أَن يَقُول: «رفعت الشَّيْء بيَدي»، أَو «وَضعته بيَدي»، أَو «تَوليته بيَدي»، وَهُوَ يَعْنِي نعْمَته. وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يُقَال: «لي عِنْد فلَان يدان» يَعْنِي نعمتين، وَإِنَّمَا يُقَال: «لي عِنْده يدان بيضاوان». لِأَن القَوْل «يَد» لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْيَد الَّتِي هِيَ صفة للذات».

“তাদের বলতে হবে, আপনাদের দাবি বাতিল। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি (بِيَدَيَّ)।’ এই কথা প্রমাণ করে, মহান আল্লাহর দুই হাত আছে; যা তাঁর একটি **সিফাত।** যদি ধরে নেওয়া হয়, ‘দুই হাত’ দ্বারা এখানে ‘কুদরত’ তথা ‘ক্ষমতা’ বোঝানো হয়েছে, তাহলে আল্লাহ তাআলার ‘দুইটি ক্ষমতা’ থাকা অপরিহার্য হয়ে যাবে! কিন্তু আপনারা তো এরকম দাবিই করেন না যে, মহান আল্লাহর একটি ক্ষমতা আছে! তাহলে আপনারা কীভাবে তাঁর জন্য দুইটি ক্ষমতা সাব্যস্ত করলেন? অথচ সিফাত-সাব্যস্তকারী ব্যক্তিবর্গ হোক, চাই সিফাত-নাকচকারী—সকল মুসলিম একমত পোষণ করেছে, *‘মহান আল্লাহর দুইটি ক্ষমতা আছে,’* এরকম কথা বলা না-জায়েজ।[628] সুতরাং আপনাদের দাবি বাতিল।

একইভাবে, এটাও বলা যায় না যে, মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে দুইটি নেয়ামতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আদম আলাইহিস সালাম এবং অন্য মাখলুকদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য, অগণিত। এছাড়াও (আরবি ভাষারীতি অনুযায়ী) কোনো ব্যক্তি ‘দুই

[628] আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী, ‘অমুকের দুই হাত’ বলে ‘তার দুইটি ক্ষমতা’ বোঝানো হয় না।

হাত' দ্বারা 'নেয়ামত' উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম কথা বলতে পারবে না—'আমি উক্ত বস্তু আমার দুই হাত দিয়ে তুললাম,' কিংবা 'আমার দুই হাত দিয়ে রাখলাম,' অথবা 'আমার দুই হাত দিয়ে সেটা গ্রহণ করলাম বা সেটার দায়িত্ব নিলাম।'[629]

অনুরূপভাবে, 'দুইটি নেয়ামত' উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম কথা বলাও সিদ্ধ নয়—'অমুকের কাছে আমার দুইটি হাত আছে।' কেবল এই উদ্দেশ্য নিয়ে বলা যাবে যে, 'তার কাছে আমার দুইটি সাদা হাত আছে (অর্থাৎ প্রকৃত হাত)।'[630] কারণ 'হাত' শব্দটিকে কেবল সেই হাতের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়, যেই হাত কোনো সত্তার সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য।"[631]

---

[629] অর্থাৎ, এসব কথা বলে সত্যিকারের 'হাত' বাদ দিয়ে 'নেয়ামত' উদ্দেশ্য নেওয়া আরবি ভাষায় সিদ্ধ নয়।

[630] 'অমুকের কাছে আমার দুইটি হাত আছে'—কথাটির ব্যাপারে বাকিল্লানি রাহিমাহুল্লাহর বিশ্লেষণের সাথে আমি একমত না। আলোচনা জটিল ও দুর্বোধ্য হওয়ার আশঙ্কা না করলে দ্বিমত করার কারণ ব্যাখ্যা করতাম। এই কথাগুলো বললাম; কারণ বাকিল্লানির আলোচ্য বিশ্লেষণটির ব্যাপারে তাবিলপন্থিরা আপত্তি পেশ করতে পারে। সেসব খণ্ডন করার মতো ক্ষমতা মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

[631] আল-বাকিল্লানি, ***তামহিদুল আওয়ায়িল,*** পৃ. ২৯৭।

সুন্নাহ থেকে দলিল :

১. বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ... وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ, রাতদিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না। ... আর তাঁর অন্য হাতে আছে মিজান (দাঁড়িপাল্লা), যা কখনও তিনি নীচে নামান, আবার কখনও ওপরে ওঠান।"[632]

২. আরও বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ **وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ** الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণরা আল্লাহর নিকটে মহান দয়াময়ের ডান হাতের দিকে নুরের তৈরি মিম্বারের ওপর অবস্থান করবে। **আর আল্লাহর উভয় হাতই ডান।** ওরা হবে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের বিচার-ফয়সালায়, পরিবারপরিজনে এবং নিজেদের কর্তৃত্বাধীন ক্ষেত্রগুলোতে ন্যায়পরায়ণ থাকে।"[633]

আশারি সম্প্রদায়ের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেছেন :**

---

[632] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৬৮৪ ও ৭৪১১।

[633] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮২৭।

«فإن سئلنا: أتقولون أن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله عز وجل: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، وقوله عز وجل: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾. ... وجاء عن النبي - ﷺ - أنه قال: «كلتا يديه يمين»».

"যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা কি 'আল্লাহর দুই হাত আছে' বলে দাবি করেন? তাহলে উত্তর বলা হবে, আমরা এমনটাই বলে থাকি। আমাদের কথার দলিল—মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের হাতের ওপরে রয়েছে মহান আল্লাহর হাত।' (*সুরা ফাতহ ৪৮:১০*) তিনি আরও বলেছেন, 'হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?' (*সুরা সাদ ৩৮:৭৫*) ... আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'তাঁর উভয় হাতই ডান'।"[634]

ইজমা থেকে দলিল :

১. আশারিদের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.),** কিংবা তাঁর ছাত্র **ইবনু মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেছেন :**

«وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى (يدين مبسوطتين) وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحًا، وأن يديه تعالى غير نعمته».

"তাঁরা (সালাফগণ) একমত পোষণ করেছেন, মহান আল্লাহ শোনেন এবং দেখেন। আর তাঁর রয়েছে প্রসারিত দুই হাত।

---

[634] আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশারি, ***আল-ইবানা আন উসুলিদ দিয়ানা,*** তাহকিক : সালিহ বিন মুকবিল আল-উসাইমি (রিয়াদ : দারুল ফাদিলা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪৪৩-৪৪৭।

কেয়ামতের দিনে সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর কব্জায়, আর আসমানসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়। তবে তা এ অর্থে নয় যে, দুই হাত তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর মহান আল্লাহর দুই হাত মানে তাঁর নেয়ামত—বিষয়টি এমন নয়।"[635]

২. মালিকি মাজহাবের শীর্ষ ইমাম **ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৬ হি.) বলেছেন :**

«فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: ... وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه».

"দ্বীন সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে এই উম্মাহর ঐক্যমত হয়েছে, এবং যেসব সুন্নাহর বিপরীতে চলা হলো বিদাত ও ভ্রষ্টতা, সেসবের মধ্যে রয়েছে— ... আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর (হাতের) কব্জায় এবং আসমানরাজি ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে।"[636]

৩. ইমাম আবু নাসর আস-সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেছেন :

«وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر، قال الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾. وقال النبيّ ﷺ: وكلتا يدي الرحمن يمين».

"আহলুস সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, মহান আল্লাহর দুটো হাত আছে। এ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহয় সুস্পষ্ট দলিল বর্ণিত হয়েছে।

---

[635] আল-আশারি, ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর,*** পৃ. ১২৭।

[636] আল-কাইরাওয়ানি, ***আল-জামি ফিস সুনানি ওয়াল আদাব,*** পৃ. ১০৭।

মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?’ (*সুরা সাদ ৩৮:৭৫*) আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দয়াময় আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত’।”[637]

৪. সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন :**

«ويثبتون له ﷻ ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾».

“মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সালাফ ও আহলুল হাদিসগণ সেসব গুণ সাব্যস্ত করেন। আল্লাহর সিফাতকে তাঁরা মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন, মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে নিজের দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন এই বাণীতে, ‘আর আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস, আমি যাকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?’ (*সুরা সাদ ৩৮:৭৫*)”[638]

এগুলো ছাড়াও মহান আল্লাহর হাত সিফাতের ব্যাপারে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। এমনকি **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) উল্লেখ করেছেন :**

---

[637] আস-সিজ্জি, ***রিসালাতুস সিজ্জি ইলা আহলি জাবিদ,*** পৃ. ২৬৩।

[638] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ১৬১-১৬২।

«وَرَدَ لَفْظُ الْيَدِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ مَوْضِعٍ وُرُودًا مُتَنَوِّعًا مُتَصَرَّفًا فِيهِ مَقْرُونًا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا يَدٌ حَقِيقَةً».

"কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবিগণ ও তাবেয়িবর্গের বাণীতে (আল্লাহর ব্যাপারে) 'হাত' শব্দটি একশোরও বেশি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রসঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'হাত' শব্দের সাথে এমনসব বিষয়ও যুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয়—এটা সত্যিকারের হাত (রূপক নয়)।"[639]

[639] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪০৫।

আল্লাহর ডান হাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা

ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা—মহান আল্লাহর ডান হাত আছে। লেখক ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

“তারা আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের কব্জায় এবং আসমানরাজি ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে।”[640]

বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম দাহহাক বিন মুজাহিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০২ হি.) থেকে এ আয়াতের তাফসির বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের সুপুত্র **ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ রাহিমাহুমাল্লাহ (মৃ. ২৯০ হি.) বলেছেন :**

حَدَّثَنَا أَبِي، نا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي أَبُو حُجَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ فِي يَمِينِهِ».

আমাদের কাছে আমার পিতা (আহমাদ বিন হাম্বাল) হাদিস বর্ণনা করে বলেছেন, আমাদের কাছে ওয়াকি হাদিস বর্ণনা করে বলেছেন, আমার কাছে আবু হুজাইর হাদিস বর্ণনা করেছেন, দাহহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, “কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের কব্জায় এবং আসমানরাজি ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে।”

[640] সুরা জুমার ৩৯:৬৭।

(*সুরা জুমার :* ৬৭) দাহহাক বলেন, "উল্লিখিত সবগুলো তাঁর **ডান হাতে** থাকবে।"[641]

হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় **আল্লাহর ডান হাত** পরিপূর্ণ, রাতদিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না।"[642]

হাদিসে আরও এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণরা আল্লাহর নিকটে মহান দয়াময়ের ডান হাতের দিকে নুরের তৈরি মিম্বারের ওপর অবস্থান করবে। **আর আল্লাহর উভয় হাতই ডান।** ওরা হবে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের বিচার-ফয়সালায়, পারিবারিক বিষয়ে এবং নিজেদের কর্তৃত্বাধীন ক্ষেত্রগুলোতে ন্যায়পরায়ণ থাকে।"[643]

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, **ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেছেন :**

---

641 আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৫৩১।

642 সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪১৯; সহিহ মুসলিম, হা. ৯৯৩।

643 সহিহ মুসলিম, হা. ১৮২৭।

«لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه ﷺ أمته. ... أتانا أنه سميع، **وأن له يدين**، بقوله: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ﴾، **وأن له يمينا**، بقوله: ﴿وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

"মহান আল্লাহর কিছু নাম ও গুণাবলি আছে, যা তাঁর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যে সম্পর্কে তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন। ... আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, তিনি সর্বশ্রোতা, তাঁর দুটো হাত রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'বরং আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।' **তাঁর ডান হাত রয়েছে।** আল্লাহ বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন আসমানরাজি থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাজ করা অবস্থায়'।"[644]

ইমামু আহলিস সুন্নাহ **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«وكَما صَحَّ الخَبرُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّه ﷺ أَنَّهَ قالَ: «ما مِنْ قَلْبٍ إِلّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصابِعِ الرَّحْمَنِ»، و«كلْتا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الإِيْمانُ بذلِكَ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِذلِكِ، ويَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ حَقٌّ، كَما قال رسول اللَّه ﷺ فهو مُكَذِّب بِرَسُوْلِ اللَّه ﷺ، يُسْتَتابُ فِإِنْ تابَ، و إِلَّا قُتِلَ».

"যেমনভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক অন্তর দয়াময় আল্লাহর আঙুলসমূহের দুই আঙুলের মধ্যে থাকে।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, 'তাঁর দুই হাতই ডান হাত।' এসবের প্রতি ইমান আনা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এসবের প্রতি ইমান আনেনি, এগুলোকে সত্য হিসেবে জানেনি, যেমনভাবে রসুলুল্লাহ

644 ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী। তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে, তো ভালো; নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে।"[645]

মহান আল্লাহর কি বাম হাত আছে?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী, মহান আল্লাহর দুই হাত আছে। কিন্তু আল্লাহর দুই হাতের একটিকে কি 'বাম হাত' বলা যাবে? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন। যথা :

প্রথম মত : মহান আল্লাহর বাম হাত আছে। তাঁর দুই হাতের একটি ডান, আরেকটি বাম। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম দারিমি, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজদি, শাইখ সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, শাইখ মুহাম্মাদ খলিল হাররাস প্রমুখ।[646]

এই মতের একটি অন্যতম দলিল—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ

---

[645] ইবনু আবি ইয়ালা, ***তাবাকাতুল হানাবিলা,*** খ. ১, পৃ. ৩১৩।

[646] আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ, ***সিফাতুল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা আল-ওয়ারিদাতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*** (দারুল হিজরাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭৯-৩৮০; সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ আদ-দুবাইখি, ***আহাদিসুল আকিদা আল্লাতি ইউহিমু জাহিরুহা আত-তাআরুদা ফিস সহিহাইন দিরাসাতুন ওয়া তারজিহ*** (তায়েফ : মাকতাবাতু দারিল বায়ানিল হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৪৩-২৪৪।

الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ».

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আসমানরাজি ভাঁজ করবেন। এরপর তিনি আসমানরাজিকে তাঁর ডান হাতে ধরে বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। উদ্ধত প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?' এরপর তিনি **তাঁর বাম হাত দিয়ে** সমগ্র জমিন ভাঁজ করে নেবেন। আর বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। উদ্ধত প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?'"[647]

দ্বিতীয় মত : মহান আল্লাহর দুই হাতই ডান। তাঁর দুই হাতের মধ্যে কোনো বাম হাত নেই। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম ইবনু খুজাইমা, শাইখ আলবানি প্রমুখ।[648]

এই মতের একটি অন্যতম দলিল—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ».

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণরা

---

[647] সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৮।

[648] আস-সাক্কাফ, ***সিফাতুল্লাহ আল-ওয়ারিদাতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ,*** পৃ. ৩৮৩; আদ-দুবাইখি, ***আহাদিসুল আকিদা,*** পৃ. ২৪৬।

আল্লাহর নিকটে মহান দয়াময়ের ডান হাতের দিকে নুরের তৈরি মিম্বারের ওপর অবস্থান করবে। **আর তাঁর উভয় হাতই ডান।**"[649]

আমি দুটো মতের মধ্যে কোনো মতকে অগ্রগণ্য বলছি না। কারণ আমি মনে করি, তারজিহ দেওয়া বা কোনো মতকে 'অগ্রগণ্য মত' হিসেবে রায় দেওয়া—*'মুজতাহিদ'* পর্যায়ের বিদ্বান তথা উচ্চস্তরের বিদ্বানের কাজ। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

উল্লেখ্য, আমরা প্রায়শই বলে থাকি—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিদ্বানগণ যে বিষয়ে মতভেদ করেছেন, সে বিষয়ে সুন্নাহপন্থি বিদ্বানদের কোনো একটি মত গ্রহণ করার কারণে কেউ পথভ্রষ্ট হয় না। সুতরাং কেউ যদি আলোচ্য দুটো মতের কোনো একটি গ্রহণ করেন, তিনি অপর মত গ্রহণকারীকে *'পথভ্রষ্ট'* বলতে পারবেন না। যারা এই মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীকে *'পথভ্রষ্ট'* বলবে, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট মতাদর্শের লোক। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন। আমিন।

[649] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮২৭।

আল্লাহর হাত সিফাত অস্বীকারের বিধান

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মহান আল্লাহর হাত সিফাতকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি জেনেশুনে আল্লাহর হাত সিফাত অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পূর্ববর্তী ইমাম **আবু বাকর আল-আজুর্রি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬০ হি.) বলেছেন :**

«يُقَالُ لِلْجَهْمِيِّ الَّذِي يُنْكِرُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ **كَفَرْتَ بِالْقُرْآنِ**، وَرَدَدْتَ السُّنَّةَ، وَخَالَفْتَ الْأُمَّةَ».

“আল্লাহ যে আদম আলাইহিস সালামকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন—এটা যেই জাহমি অস্বীকার করে, তাকে বলা হবে, **তুমি কুরআনকে অস্বীকার করেছ,** সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করেছ, এবং সমগ্র উম্মতের বিরোধিতা করেছ।”[650]

সালাফদের যুগের ইমাম **নুআইম বিন হাম্মাদ আল-খুজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৮ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهٌ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য দেয়, সে কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহ নিজেকে যেই গুণে বিশেষিত করেছেন, সেটা যেই ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেও কাফির হয়ে যায়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তাকে যেসব গুণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং

[650] আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ৩, পৃ. ১১৭৭।

তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই।"[651]

এ থেকে বোঝা গেল, মহান আল্লাহর সিফাত হুবহু কুরআন-সুন্নাহর মতো করে সাব্যস্ত করলে কোনো অসুবিধা নেই। এর দরুন আল্লাহকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয় না। সদৃশ উল্লেখ করে আল্লাহর কোনো সিফাতের ধরন-নির্দিষ্ট করলে তাশবিহ হয়, যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। পক্ষান্তরে কেউ যদি আল্লাহর সুপ্রমাণিত অকাট্য সিফাত অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়।

[651] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮৭।

আল্লাহর হাত সিফাতের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

আল্লাহ তাআলার হাত সিফাতের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটো সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে।

প্রথম সম্প্রদায় : মুশাব্বিহা ফের্কা

যারা আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়, তাদেরকে *'মুশাব্বিহা'* বলা হয়। এদের মধ্যকার একদল চরমপন্থি সরাসরি বলত, 'আল্লাহর অমুক-অমুক সিফাত আমাদের সিফাতের মতো।' আর মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের আরেকটা দল পরোক্ষ তাশবিহ (সাদৃশ্যদান) করত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, একদল শিয়া এবং চরমপন্থি দরবেশ এই মতাদর্শ অবলম্বন করেছিল। তারা বলত, "আল্লাহর **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ** আছে; যেমন হাত, পা, চোখ ইত্যাদি।"[652]

যারা স্পষ্টভাবে আল্লাহর হাত সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়, তারা এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে, কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। **আবার যারা আল্লাহর হাতকে *'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'* বলে, তারাও তাশবিহ দেওয়ার কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে।** স্মর্তব্য যে, যারা আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়, তারা সালাফদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। আমরা ইতঃপূর্বে সাদৃশ্যদানের ব্যাপারে সালাফগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছি।

অনেকে মনে করতে পারেন, **এমন আকিদার মানুষও কি আছে বর্তমানে?** আমি দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা নিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলছি, বেশ কিছু আহলেহাদিস দাবিদার মৌলানার ব্যাপারে আমি জেনেছি, তারা

---

[652] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৬১৭-৬১৮।

মহান আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিশ্বাসী; এমনকি আল্লাহর শরীরে বিশ্বাসী! তাদের কেউ কেউ এই কুফরি আকিদার পক্ষ নিয়ে তর্ক পর্যন্ত করে! নাউজুবিল্লাহি মিনাল খিজলান। আমরা একটু পরেই আল্লাহর জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শরীর সাব্যস্ত করার বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা

যারা জাহম বিন সাফওয়ানের কুফরি আকিদা অনুসরণ করেছে, তাদেরকে *'জাহমিয়া'* বলা হয়। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিরা তাতিলের আকিদা পোষণ করেছে। এজন্য যাদের মধ্যেই তাতিলের আকিদা পাওয়া গেছে, তাদেরকেই সালাফ ও তাঁদের অনুসারী পূর্ববর্তী সুন্নাহপন্থি ইমামগণ 'জাহমিয়া' বলেছেন। এরই ভিত্তিতে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ জাহমিদের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।[653] যথা :

প্রথম স্তর : যারা আল্লাহর সকল নাম ও গুণ অস্বীকার করেছে। তারা যদি কখনো আল্লাহর নাম বলেও থাকে, তাহলে সেটা রূপক অর্থে বলে। আল্লাহর সত্যিকারের নাম আছে বলে তারা মনে করে না। এরাই জাহম বিন সাফওয়ানের প্রকৃত অনুসারী, যাদের উক্ত কুফরি আকিদার বিবরণ দিয়েছেন ইমাম আহমাদ তাঁর *'আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা'* কিতাবে।

দ্বিতীয় স্তর : যারা পুরোপুরি স্বীকার না করলেও এজমালিভাবে মহান আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করে, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে। তবে তারা আল্লাহর সকল নামকে সত্যিকারার্থেই সাব্যস্ত করে

---

[653] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আত-তিসয়িনিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আল-আজলান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৬৫-২৭১।

না, বরং অনেক নামকে রূপক অর্থবোধক মনে করে। এরা হলো মুতাজিলা সম্প্রদায়। এদের মধ্যে জাহম বিন সাফওয়ানের তাতিলি আকিদার বিরাট অংশ থাকায়, এদেরকে 'জাহমিয়া' বলা হয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এদেরকে *'আল-জাহমিয়্যাতুল মাশহুরুন'* তথা *'প্রসিদ্ধ জাহমিয়া'* আখ্যা দিয়েছেন।

তৃতীয় স্তর : যারা এজমালিভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহান আল্লাহর অনেক নাম ও গুণকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। তারা বাহ্যিকভাবে জাহমি-মুতাজিলিদের বিরোধিতা করলেও তাদেরকে 'জাহমিয়া' বলা হয়। কারণ তাদের মধ্যেও জাহম বিন সাফওয়ানের তাতিলি আকিদার উপাদান রয়েছে। এরা হলো আব্দুল্লাহ ইবনু কুল্লাব ও তাঁর অনুসারীবর্গ (কুল্লাবিয়্যা), এবং আবুল হাসান আল-আশারি ও তাঁর অনুসারীবর্গ (আশারিয়া সম্প্রদায়)। কুল্লাবি পণ্ডিতগণ এবং প্রথম দিকের আশারি বিদ্বানগণ মুতাজিলিদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের আশারিরা মুতাজিলিদের সাথে মিত্রতা পোষণ করেছেন এবং তাদের অধিক নিকটবর্তী হয়েছেন। অনুরূপভাবে আবু মানসুর আল-মাতুরিদি ও তাঁর অনুসারীবর্গও (মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়) তৃতীয় স্তরের জাহমিয়া গণ্য হবেন।

এখন আল্লাহর হাত সিফাতের ব্যাপারে জাহমিদের অবস্থান বলি। সমগ্র জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে, প্রকৃত অর্থে মহান আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করা যাবে না। তাহলে আল্লাহর হাতের ব্যাপারে বর্ণিত দলিলগুলোর ব্যাপারে কী অবস্থান হবে? এক্ষেত্রে এদের দুটো অবস্থান রয়েছে—

প্রথম অবস্থান : তাবিল করা। আল্লাহর হাত মানে 'আল্লাহর ক্ষমতা (القدرة أو القوة)', কিংবা 'আল্লাহর নেয়ামত' ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা

করা। এটা খাঁটি জাহমিয়া[654] ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের[655] আকিদা। আশারি সম্প্রদায়[656] ও মাতুরিদি সম্প্রদায়ের[657] বড়ো একটা অংশ আল্লাহর হাত সিফাতের ব্যাপারে এই আকিদা পোষণ করেন।

দ্বিতীয় অবস্থান : তাফবিদ করা। অর্থাৎ, আল্লাহর হাত মানে 'সত্যিকারের হাত' বিশ্বাস করা যাবে না, বরং অন্য কোনো অর্থ হবে; কিন্তু সেই অর্থ সাব্যস্ত না করে 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলতে হবে। এটা আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের একদলের আকিদা। তাফবিদের বাতিল আকিদা সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি।

এই আকিদার ব্যাপারেই **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছিলেন :**

«فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد».

"সুতরাং স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে গেল, যেই তাফবিদকারী সম্প্রদায় মনে করে, তারা সুন্নাহ ও সালাফের অনুসারী, মূলত সেই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ—বিদাতি ও বক্রপথ অবলম্বনকারীদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট মতবাদগুলোর অন্যতম।"[658]

---

[654] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ১৬১-১৬২; ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪০১।

[655] আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান,*** খ. ১, পৃ. ২৮৪-২৮৮।

[656] ফাখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাজি, ***আল-ইশারা ফি ইলমিল কালাম,*** তাহকিক : হানি মুহাম্মাদ হাজিম (আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা, তাবি), পৃ. ২৬৯।

[657] আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাতুরিদি, ***তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ,*** তাহকিক : মাজদি বাসলুম (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫১।

[658] ইবনু তাইমিয়া, ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল,*** খ. ১, পৃ. ২০৫।

আল্লাহর হাত মানে *‘তাঁর ক্ষমতা বা অনুগ্রহ’* বলে ব্যাখ্যা করা কি আহলুস সুন্নাহর আকিদা?

অনেকে মনে করেন, আল্লাহর হাত মানে *‘আল্লাহর ক্ষমতা’* বা *‘আল্লাহর অনুগ্রহ’* বলে ব্যাখ্যা করা আহলুস সুন্নাহরই একটি আকিদা! নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ দাবি করেন—এমন অনেক আশারি ও মাতুরিদি ফের্কার বিদ্বান এই আকিদা প্রচার করেছেন। বরং এটাই অধিকাংশ আশারির আকিদা।[659]

দেওবন্দিদের অফিসিয়াল আকিদা অনুযায়ী, মহান আল্লাহর হাত সিফাতকে ‘আল্লাহর কুদরত’ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা দেওবন্দি মৌলানাদের মতে, এটাও হক আকিদা। দেওবন্দিদের অফিসিয়াল আকিদাগ্রন্থ *‘আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদে’* প্রথিতযশা দেওবন্দি বিদ্বান **আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৪৬ হি.) বলেছেন :**

«وأما ما قال المتأخرون من أئمتنا في تلك الآيات، يُؤولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع، بأنه يمكن أن يكون المراد من الاستواء : الاستيلاء، ومن اليد: القدرة إلى غير ذلك، تقريباً إلى أفهام القاصرين، فحق أيضاً عندنا».

“পরবর্তী যুগে আমাদের যেসব ইমাম এসেছেন, তাঁরা এসব আয়াত (সিফাতের আয়াতসমূহ) সম্পর্কে কথা বলেছেন। তাঁরা এসব আয়াতের এমন বিশুদ্ধ তাবিল করেছেন, যা

---

[659] আল-মাতুরিদি, ***তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৫১; আর-রাজি, ***আল-ইশারা ফি ইলমিল কালাম,*** পৃ. ২৬৯; সায়িদ বিন আব্দুল লাতিফ ফুদা, ***শারহু আকিদাতিল ইমাম ইবনিল হাজিব*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি), পৃ. ৫৪।

আরবি ভাষা ও শরিয়তের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বলেছেন, 'ইস্তিওয়া (আরশের ওপর আরোহণ)' মানে হতে পারে—'আরশ দখল করা'। তদ্রূপ 'আল্লাহর হাত' মানে হতে পারে—'আল্লাহর ক্ষমতা'। দুর্বল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদেরকে বুঝানোর সুবিধার্থে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের নিকটে এসব ব্যাখ্যাও হক।"[660]

অনুরূপভাবে বাংলাদেশে দেওবন্দি মাদরাসাগুলোতে যেই *'মিশকাতুল মাসাবিহ'* কিতাব পড়ানো হয়, তার পার্শ্বটীকাতেও মহান আল্লাহর হাত সিফাতের তাবিল করা হয়েছে। এই পার্শ্বটীকা-সংবলিত *'মিশকাত'* আহলেহাদিস মাদরাসাগুলোরও অনেক ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যয়ন করে থাকেন। পুরো উপমহাদেশেই উক্ত পার্শ্বটীকা বহুলপঠিত ও সমাদৃত। আলোচ্য পার্শ্বটীকা-সংবলিত **মিশকাতের ১২০ নং হাদিসের টীকায় লেখা হয়েছে :**

«ولذا ورد في حديث آخر: وكلتا يديه يمين، وفي هذا تصوير لجلال الله وعظمته، لتعاليه عن الجسم ولوازمه».

"এজন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহর উভয় হাতই ডান।' এ কথার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বড়োত্ব ও মর্যাদা বোঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা 'দেহ ও তার অপরিহার্য বিষয়াদি' থেকে অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছেন।"[661]

---

[660] খলিল আহমাদ সাহারানপুরি, ***মাবাহিস ফি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ আল-মুসাম্মা আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আদাম আল-কাওসারি (আম্মান : দারুল ফাতহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬৪।

[661] আল-খতিব ওয়ালিউদ্দিন আত-তিবরিজি, ***মিশকাতুল মাসাবিহ*** (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, *সাহারানপুরির টীকা-সহ,* প্র. ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪।

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্যিকারের হাত থাকাকে অস্বীকার করে বলা হচ্ছে, হাত মানে বড়োত্ব ও মর্যাদা। কারণ সত্যিকারের হাত সাব্যস্ত করলে আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে মুক্ত। সুতরাং তাঁর সত্যিকারের হাত থাকতে পারে না! এরকম ভ্রমাত্মক বিদাতি বুঝ থেকে মহান আল্লাহর পানা চাই—মাআজাল্লাহ। অবশ্যই আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও মর্যাদা আছে; তিনি মহান নেয়ামতদাতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হাত সিফাতও আছে। তাঁর হাত সিফাতকে 'ক্ষমতা, মর্যাদা বা নেয়ামত' বলে অপব্যাখ্যা করা বিদাত।

আমরা এখন দেখব, সালাফ ও মুতাকাদ্দিমিন ইমামগণ আশারি-মাতুরিদিদের এই তাবিলি-তাতিলি আকিদার ব্যাপারে কেমন মনোভাব রাখতেন। তারা কি এটাকে আহলুস সুন্নাহর আকিদা মনে করতেন, কিংবা বিশুদ্ধ আকিদা হিসেবে জানতেন?

১. সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন :**

«ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية، أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة، خذلهم الله».

"মুতাজিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায় যেমন আল্লাহর দুই হাতকে *'দুই নেয়ামত'* বা *'দুই ক্ষমতা'* হিসেবে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে, তাঁরা সেভাবে আল্লাহর কথাকে তার যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করে দেন না। আল্লাহ মুতাজিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন। আবার মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের মতো তাঁরা আল্লাহর দুই হাতের ধরন-নির্দিষ্ট

করেন না, কিংবা মাখলুকের হাতের সাথে সাদৃশ্যও দেন না। আল্লাহ মুশাব্বিহা সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করুন।"[662]

২. ইমাম শাফিয়ির খাস ছাত্র **ইমাম আব্দুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪০ হি.)** তাঁর *"আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা"* গ্রন্থে **বলেছেন :**

«وَقَالَ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] قَالَ: **فَزَعَمَ الْجَهْمِيُّ أَنَّ يَدَ اللَّهِ نِعْمَتُهُ،** فَبَدَّلَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَأَرَادَ الْجَهْمِيُّ أَنْ يُبَدِّلَ كَلَامَ اللَّهِ، إِذْ أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ يَدًا بِهَا مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَبَدَّلَ مَكَانَ الْيَدِ نِعْمَةً».

"আল্লাহ বলেছেন, 'বরং তাঁর দুই হাত প্রসারিত।' (*মায়িদা :* ৬৪) **কিন্তু জাহমি দাবি করেছে, *'আল্লাহর হাত' বলে 'তাঁর নেয়ামত' বোঝানো হয়েছে।*** এভাবে তাকে যেই কথা বলতে বলা হয়েছিল, সেই কথার পরিবর্তে সে অন্য কথা প্রয়োগ করল। সুতরাং জাহমি আল্লাহর কথাকে বদলাতে চেয়েছে। আল্লাহ যখন জানিয়েছেন, 'তাঁর হাতে সকল কিছুর রাজত্ব রয়েছে,' তখন সে (জাহমি) *'হাতের'* জায়গায় *'নেয়ামত'* বসিয়ে দিয়েছে।"[663]

৩. ইমাম বুখারির ছাত্র ইমাম আবু ইসা আত-তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) **তাঁর *'সুনানুত তিরমিজি'* গ্রন্থে লিখেছেন :**

«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ اليَدَ وَالسَّمْعَ وَالبَصَرَ، **فَتَأَوَّلَتِ الجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ العِلْمِ،** وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، **وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى اليَدِ هَاهُنَا القُوَّةُ».**

---

[662] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ১৬১-১৬২।

[663] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪০১।

“মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় নিজের হাত, শোনা ও দেখার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু **জাহমিয়া সম্প্রদায় এ আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করেছে।** তারা এসবের এমন ব্যাখ্যা করেছে, যা আহলুল ইলমদের ব্যাখ্যার বিপরীত। তারা বলেছে, ‘আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেননি।’ **তারা ব্যক্ত করেছে, এখানে ‘হাত’ শব্দের অর্থ হলো ‘ক্ষমতা’।**”[664]

৪. কী কী কারণে জাহমিয়া সম্প্রদায়কে কাফির বলা যায়, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের ছাত্র **ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭০ হি.) বলেছেন :**

«قَالَ هَؤُلَاءِ: لَيْسَ لِلَّهِ يَدٌ، وَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدَيْهِ، **إِنَّمَا يَدَاهُ نِعْمَتَاهُ وَرِزْقَاهُ.** فَادَّعَوْا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْحَشَ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْيَهُودُ ﴿قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، وَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: يَدُ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ، لِأَنَّ النِّعَمَ وَالْأَرْزَاقَ مَخْلُوقَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا، وَذَاكَ مُحَالٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَضْلًا أَنْ يَكُونَ كُفْرًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ: خَلَقَ آدَمَ بِنِعْمَتِهِ. ... وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ: ﴿يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]: نِعْمَتَاهُ، فَكَأَنَّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا نِعْمَتَانِ مَبْسُوطَتَانِ، لَا تُحْصَى نِعَمُهُ، وَلَا تُسْتَدْرَكُ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ مُحَالٌ مِنَ الْكَلَامِ فَضْلًا أَنْ يَكُونَ كُفْرًا».

“জাহমিরা বলে, ‘আল্লাহর হাত নেই। তিনি আদম আলাইহিস সালামকে নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেননি। **বরং “তাঁর দুই হাত” মানে—তাঁর দুই নেয়ামত বা তাঁর দুই রিজিক।’** এভাবে তারা আল্লাহর হাতের ব্যাপারে এমন দাবি করেছে, যা ইহুদিদের দাবির চেয়েও ভয়াবহ।

[664] সুনানুত তিরমিজি, খ. ৩, পৃ. ৪১।

ইহুদিরা বলেছিল, 'আল্লাহর হাত আবদ্ধ।' (*মায়িদা : ৬৪*) আর জাহমিরা বলে, আল্লাহর হাত মাখলুক! কারণ নেয়ামত ও রিজিক তো নিঃসন্দেহে মাখলুক। এই আকিদা যে কুফর, সেটা বাদ দিলেও আরবদের ভাষায় এরকম কথা অসম্ভব। কারণ এভাবে বলা যায় না যে, 'আল্লাহ আদমকে তাঁর নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।' ... একইভাবে এটা বলা যায় না যে, *'তাঁর দুই হাত প্রসারিত'* মানে তাঁর *'দুই নেয়ামত প্রসারিত'।* কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর কেবল দুটো নেয়ামত আছে! অথচ তাঁর নেয়ামত অসংখ্য, অগণিত। তাই আমরা বলি, এ ধরনের তাবিল (অপব্যাখ্যা) কুফর তো বটেই, অধিকন্তু ভাষাগতভাবেও অসম্ভব!"[665]

আমরা ইমাম দারিমির এই বক্তব্যের কথাই বলেছিলাম, যেখানে **সিফাতের তাবিল করাকে বড়ো কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে।** শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ১৪২০ হি.) এই মত ব্যক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আমরা এখানে শাইখের ফতোয়াটি পেশ করছি।

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি **শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ প্রদত্ত ফতোয়া—**

السؤال: مَن وقع في تأويل الصفات هل هي من الأمور الاجتهادية؟

الجواب: لا، لا، هذا باطل، هذا من الضلال، هذا مِن دِين الجهمية والمعتزلة، كفر أكبر -نسأل الله العافية- نفي الصفات كفرٌ أكبر؛ لأنَّه تكذيبٌ لله -نسأل الله العافية- وتكذيبٌ للرسول ﷺ، فالذي يقول: "إن الله ليس له رحمة، ولا يُوصَف بالعزة، ولا بالعفو، ولا بالمغفرة، ولا بالرحمة" فهذا كفرٌ أكبر.

---

[665] আদ-দারিমি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা,*** পৃ. ২০২।

س: يُؤوِّلها مثلًا؟ ج: كلها كفرٌ أكبر.

প্রশ্ন : “কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সিফাতের তাবিল করলে, সেটা কি ইজতিহাদি বিষয় হিসেবে গণ্য হবে?”

উত্তর : “না, না, এটা বাতিল। এটা পথভ্রষ্টতা। এটা জাহমিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের ধর্ম। এটা বড়ো কুফর। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাইছি। সিফাত অস্বীকার করা বড়ো কুফর। কারণ এর দরুন আল্লাহকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয়, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয়। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। যে বলে, ‘আল্লাহর রহমত সিফাত নেই,’ কিংবা ‘আল্লাহকে ইজ্জত, ক্ষমা, মাগফিরাত (মার্জনা) ও রহমতের গুণে গুণান্বিত করা যাবে না,’—তার এই কথা বড়ো কুফর।”

প্রশ্নকারী : “সে যদি এসব সিফাতের তাবিল তথা ভিন্ন ব্যাখ্যা করে?” **শাইখ :** “সবই বড়ো কুফর।”[666]

৫. জাহমিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডন করতে যেয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রখ্যাত ইমাম **ইবনু কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৬ হি.) বলেছেন :**

«وفعلوا في كتاب الله أكثر مما فعل الأولون في تحريف التأويل عن جهته فقالوا في قول الله: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾ أن اليد ههنا النعمة وما ننكر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل:

أحدها: النعمة.

---

[666] আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ, “হুকমুত তাউয়িল ফি সিফাতিল্লাহি তাআলা,” ***বিনবাজ ডট অর্গ,*** https://tinyurl.com/2up92yc4.

والآخر: القوة من الله: ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ يريد أولي القوة في دين الله والبصائر ومنه يقول الناس (ما لي بهذا الأمر يد) يعنون مالي به من طاقة.

الوجه الثالث: اليد بعينها.

ولكنه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة لأنه قال: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾ والنعم لا تغل وقال: ﴿غلت أيديهم﴾ معارضة بمثل ما قالوا ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم ثم قال: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ ولا يجوز أن يريد نعمتاه مبسوطتان. ... فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا هما اليدان اللتان تعرف الناس كذلك، قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان)، وقال النبي ﷺ: «كلتا يديه يمين». فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين؟».

“আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রে জাহমিরা পূর্ববর্তী লোকদের চেয়েও অধিক মাত্রায় আয়াতের ব্যাখাকে তার সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, আয়াতকে বিকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘ইহুদিরা বলেছে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ।’ (*সুরা মায়িদা ৫:৬৪*) জাহমিরা দাবি করেছে, ‘এখানে হাত মানে নেয়ামত।’ আমরা এটা অস্বীকার করি না যে, আরবি ভাষায় ‘ইয়াদ’ তথা ‘হাত’ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যথা :

এক. নেয়ামত অর্থে।

দুই. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা অর্থে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তাঁরা ছিলেন হাতের অধিকারী

এবং সূক্ষ্মদর্শী।' (*সুরা সাদ ৩৮:৪৫*) এর মানে তাঁরা ছিলেন শক্তির অধিকারী এবং সূক্ষ্মদর্শী। এই অর্থেই লোকেরা বলে থাকে, 'এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই।' অর্থাৎ, এ বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা/সামর্থ্য নেই।

তিন. সত্যিকারের হাত অর্থে।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'হাত' দ্বারা 'নেয়ামত' বোঝানো সিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ইহুদিরা বলেছে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ।' অথচ নেয়ামত আবদ্ধ হয় না। ওই আয়াতে ইহুদিদের কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলেছেন, 'ইহুদিদের হাতই আবদ্ধ হয়েছে।' এখানে 'ইহুদিদের নেয়ামত আবদ্ধ হয়েছে'—এমন অর্থ করা গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর ওই একই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'বরং আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।' এখানে 'আল্লাহর দুটি নেয়ামত প্রসারিত'—এমন অর্থ করা সিদ্ধ নয়। ...

এখন কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আয়াতে 'আল্লাহর দুই হাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? আমরা বলব, এগুলো সেই দুই হাত, যেভাবে মানুষ হাতকে চেনে। এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'দুই হাত মানে দুই হাত।' আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহর দুই হাতই ডান।' এই হাদিসের আলোচনায় আল্লাহর দুই হাতকে 'তাঁর নেয়ামত' কিংবা 'তাঁর দুটি নেয়ামত' বলে ব্যাখ্যা করা কি কারও জন্য বৈধ হতে পারে?!"[667]

---

[667] আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, ***আল-ইখতিলাফু ফিল লাফজ ওয়ার রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা ওয়াল মুশাব্বিহা,*** তাহকিক : উমার বিন মাহমুদ আবু উমার (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৪০।

৬. *'ইমামুল আয়িম্মা'* খ্যাত মুহাদ্দিস **ইমাম ইবনু খুজাইমা আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :**

«وَفِي هَذَا الْبَابِ **زَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ:** أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] أَيْ نِعْمَتَاهُ، وَهَذَا تَبْدِيلٌ، لَا تَأْوِيلٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى نَقْضِ دَعْوَاهُمْ هَذِهِ أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ، لَا يُحْصِيهَا إِلَّا الْخَالِقُ الْبَارِئُ، وَلِلَّهِ يَدَانِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا. ... وَزَعَمَ بَعْضُ الْجَهْمِيَّةِ: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بِيَدَيْهِ» أَيْ بِقُوَّتِهِ، فَزَعَمَ أَنَّ الْيَدَ هِيَ الْقُوَّةُ، وَهَذَا مِنَ التَّبْدِيلِ أَيْضًا، وَهُوَ جَهْلٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَالْقُوَّةُ إِنَّمَا تُسَمَّى الْأَيْدُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، لَا الْيَدُ».

"এ বিষয়ে **সিফাত-অস্বীকারকারী জাহমিয়া সম্প্রদায়** দাবি করেছে, আল্লাহ যে বলেছেন, 'বরং তাঁর দুই হাত প্রসারিত,' এর মানে—'তাঁর দুই নেয়ামত প্রসারিত'। অথচ এটা তাবিল (ব্যাখ্যা) নয়, বরং তাবদিল (অর্থ-পরিবর্তন)। তাদের এই দাবি যে বাতিল, তার প্রমাণ হলো—আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য, যা কেবল মহান স্রষ্টা আল্লাহই গণনা করতে পারেন। অথচ মহান আল্লাহর দুটো হাত আছে, এর বেশি নয়। ... আবার কিছু জাহমি দাবি করেছে, আল্লাহ যে বলেছেন, 'আল্লাহ আদমকে তাঁর দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন'—এর মানে 'তাঁর ক্ষমতা বা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন'। তারা মনে করেছে, *'হাত'* মানে *'ক্ষমতা'*। অথচ এটাও তাবদিল (অর্থ-পরিবর্তন), এবং আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা। কারণ আরবি ভাষায় শক্তিকে 'আইদ (أيد)' বলা হয়; 'ইয়াদ (يد)' নয়।"[668]

---

[668] ইবনু খুজাইমা, ***কিতাবুত তাওহিদ,*** খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৯।

৭. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আজ-জুবাইরি আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৮ হি.) বলেছেন :

«**الرد على من أنكر اليد:** قال الله تبارك وتعالى في ذكر اليد لإبليس الملعون: ﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ [سورة ص: ٧٥] يعني : آدم صلوات الله عليه وسلامه ولو كان كما تقول الجهمية : إنها يد النعمة؛ لكانت يدا واحدة، ولا تكون في كلام العرب (يَدَيَّ) إِلَّا اليدان من ذاته».

"**যারা আল্লাহর 'হাত' অস্বীকার করে, তাদের খণ্ডন :** মহান আল্লাহ 'হাত' এর কথা উল্লেখ করে অভিশপ্ত ইবলিসের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'হে ইবলিস, আমি যাকে আমার দুই হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা দিতে তোকে কীসে বাধা দিল?' (*সুরা সাদ ৩৮:৭৫*) এখানে উদ্দেশ্য হলেন—আদম আলাইহিস সালাম; মহান আল্লাহ তাঁকে আপন দুই হাতে সৃষ্টি করেছেন। **জাহমিয়া সম্প্রদায় দাবি করে, 'এখানে হাত মানে নেয়ামতের হাত।'** তাদের দাবি যদি সঠিক হতো, তাহলে কেবল একটি হাতের কথা বলা হতো আয়াতে। আরবি ভাষায় *'আমার দুই হাত'* কথাটি কেবল 'সত্তাগত দুই হাত' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় (নেয়ামত অর্থে নয়)।"[669]

৮. আশারি আকিদার জনক আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.); যিনি চল্লিশ বছর যাবৎ মুতাজিলি আকিদার ওপর অটল ছিলেন এবং মুতাজিলি আকিদার বিরাট পণ্ডিত

---

[669] আবু আব্দুল্লাহ আজ-জুবাইর বিন আহমাদ আজ-জুবাইরি আশ-শাফিয়ি, ***শারহুল ইমানি ওয়াল ইসলাম ওয়া তাসমিয়াতুল ফিরাকি ওয়ার রদ্দু আলাইহিম*** – শীর্ষক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য; গৃহীত : আবু আব্দুল্লাহ আদিল বিন আব্দুল্লাহ আলু হামদান, ***আল-জামি ফি আকায়িদি ওয়া রাসায়িলি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল আসার*** (রিয়াদ : দারুল মানহাজ, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৭৬২।

ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মুতাজিলি আকিদা থেকে ফিরে আসেন। **তিনি স্পষ্টভাবে মুতাজিলিদের আকিদা বর্ণনা করেছেন :**

«وقالت **المعتزلة** بإنكار ذلك إلا الوجه وتأولت اليد بمعنى النعمة».

"মুতাজিলারা এসবের সবকিছুই অস্বীকার করেছে, কেবল 'ওয়াজহ' তথা 'চেহারা' সিফাত ছাড়া।[670] আর তারা 'হাত' সিফাতের তাবিল করে বলেছে, এর মানে 'নেয়ামত'।"[671]

৯. 'শাইখুল হানাবিলা' খ্যাত বিদ্বান **ইমাম ইবনু বাত্তাহ আল-উকবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.) বলেছেন :**

«ثُمَّ قَالَ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، فَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: مَعْنَى الْيَدِ النِّعْمَةُ، وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا لَمْ يَقُلْ «﴿يَدَاهُ﴾ [المائدة: ٦٤]، وَلَقَالَ: بَلْ مَبْسُوطَةٌ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْيَدِ مَعْنَى النِّعْمَةِ لَمْ يَقُلْ بِيَدَيَّ، وَلَقَالَ: بِيَدِي أَوْ بِنِعْمَتِي؛ لِأَنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَعْمَتَيْنِ».

"এরপর মহান আল্লাহ বলেছেন, 'বরং আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।' (*সুরা মায়িদা ৫:৬৪*) **জাহমিরা বলে, 'এখানে "হাত" বলতে নেয়ামত বোঝানো হয়েছে।'** তাদের দাবি যদি সঠিক হতো, তাহলে আল্লাহ বলতেন না, 'আল্লাহর দুই হাত প্রসারিত।' বরং একবচনের শব্দ ব্যবহার করে বলতেন, 'আল্লাহর হাত প্রসারিত।' আর 'হাত' মানে যদি

---

[670] পরবর্তীতে চেহারা সিফাতের ব্যাপারে মুতাজিলিদের দুটো মত উল্লেখ করেছেন আবুল হাসান আল-আশারি।

[671] আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশারি, ***মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লিন,*** তাহকিক : নাইম জারজুর (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭৩।

‘নেয়ামতই’ হতো, তাহলে আল্লাহ বলতেন না যে, ‘আমার দুই হাতে যাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছি।’ বরং একবচনের শব্দ ব্যবহার করে বলতেন, ‘আমার হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছি,’ কিংবা বলতেন, ‘আমার নেয়ামত দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছি।’ কারণ আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য, অগণিত। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে যাও, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।’ (*সুরা নাহল ১৬:১৮*) তাহলে কীভাবে এ কথা বলা বৈধ হতে পারে যে, *‘মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে দুটি নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন’*?!”[672]

অথচ বর্তমান যুগের তাবিলপন্থি আশারি-মাতুরিদিরা হুবহু এই তাবিল করে! আবার জোরগলায় দাবি করে, তারাই বিশুদ্ধ আকিদার ধারক ও বাহক; তারা জাহমি না, মুতাজিলিদের আকিদাধারী না। কিন্তু আমরা সালাফদের যুগের ইমাম এবং মুতাকাদ্দিমিন সুন্নাহপন্থি ইমামদের বক্তব্য থেকে দেখলাম, আশারি-মাতুরিদিদের এসব তাবিল মূলত জাহমিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়েরই তাবিল। এজন্যই মুতাজিলিদের ইমাম বিশর আল-মারিসির তাবিল এবং আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের তাবিলের মধ্যে তুলনা করতে যেয়ে **ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছিলেন :**

«وَهَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ الْمَوْجُودَةُ الْيَوْمَ بِأَيْدِي النَّاسِ - مِثْلُ أَكْثَرِ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فورك فِي كِتَابِ التَّأْوِيلَاتِ وَذَكَرَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِي فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ «تَأْسِيسَ التَّقْدِيسِ» وَيُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي كَلَامِ خَلْقٍ كَثِيرٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ

[672] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৭, পৃ. ৩১৬।

مِثْلَ أَبِي عَلِيٍّ الجبائي وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَد الهمداني وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي الْوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ - هِيَ بِعَيْنِهَا تَأْوِيلَاتُ بِشْرٍ المريسي الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ».

"বর্তমান যুগে মানুষের হাতে যেসব তাবিল বিদ্যমান রয়েছে; যেমন আবু বাকর ইবনু ফুরাক তাঁর *'কিতাবুত তাউয়িলাতে'* যেই তাবিলগুলো উল্লেখ করেছেন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাজি তাঁর *'তাসিসুত তাকদিস'* কিতাবে যেই তাবিলগুলো উল্লেখ করেছেন। এ জাতীয় অনেক তাবিল পাওয়া যায় আরও বহু ব্যক্তির বক্তব্যে; যেমন আবু আলি আল-জুব্বায়ি, আব্দুল জাব্বার বিন আহমাদ আল-হামদানি, আবুল হুসাইন আল-বাসরি, আবুল ওয়াফা ইবনু আকিল, আবু হামিদ আল-গাজালি প্রমুখ। তাদের এসব তাবিলের অধিকাংশই—হুবহু বিশর আল-মারিসির তাবিল; যেসব তাবিল সে তার কিতাবে উল্লেখ করেছিল।"[673]

অনুরূপভাবে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন :**

«أَنَّ إِبْطَالَ حَقِيقَةِ الْيَدِ وَنَفْيَهَا وَجَعْلَهَا مَجَازًا هُوَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ وَتَبِعَهُمْ عَلَيْهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَبَعْضُ الْمُسْتَأْخِرِينَ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْأَشْعَرِيُّ وَقُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ يَرُدُّونَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَيُبَدِّعُونَهُمْ وَيُثْبِتُونَ الْيَدَ حَقِيقَةً».

"হাত সিফাতের প্রকৃত অর্থ বাতিল করা, অস্বীকার করা এবং হাত সিফাতকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা—মূলত

---

[673] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ২৪৫-২৪৯; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ২৩।

সিফাত-অস্বীকারকারী জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ। মুতাজিলিরা এ বিষয়ে জাহমিদের অনুসরণ করেছে। পরবর্তীতে যাদেরকে আবুল হাসান আল-আশারির আকিদার অনুসারী বলে দাবি করা হয়, সেই আশারিদের মধ্যকার একদল লোকও এক্ষেত্রে জাহমিদের অনুসরণ করেছে। অথচ আবুল হাসান আল-আশারি নিজে এবং তাঁর প্রাচীন অনুসারীবর্গ জাহমি-মুতাজিলিদের এসব বক্তব্য খণ্ডন করতেন, তাদেরকে বিদাতি বলতেন এবং 'হাত' সিফাতকে প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত করতেন (রূপক অর্থে নয়)।"[674]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুমাল্লাহ আশারিদের ব্যাপারে যেই দাবি করেছেন, সেই দাবির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ আশারি মতাদর্শের বিশেষজ্ঞ বিদ্বান আল্লামা হাসান মাহমুদ আশ-শাফিয়ি আল-আজহারি ওয়াফফাকাহুল্লাহ (জ. ১৩৪৯ হি./১৯৩০ খ্রি.)। আশারিদের প্রখ্যাত ইমাম সাইফুদ্দিন আল-আমিদির (মৃ. ৬৩১ হি.) মতামত বিশ্লেষণ করতে যেয়ে মিশরস্থ আল-আজহারের 'সিনিয়র উলামা কাউন্সিলের' এই প্রবীণ সদস্য উক্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন। **তিনি বলেন :**

«ثم يأخذ الآمدي في تأويل هذه النصوص السمعية؛ فاليدان : القدرة والعين : الحفظ والرعاية، والوجه : الذات ومجموع الصفات ، والنور : الهداية ، والكشف عن الساق : ظهور أهوال القيامة ، والاستواء : التسخير والتصرف ، والنزول : تنزل اللطف والرحمة. إلى غير ذلك من المعاني التي يراها أليق بكمال الله - سبحانه من الظواهر التي

[674] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪০০-৪০১।

تدل عليها هذه العبارات. وقد بينت في التعليقات التفصيلية على هذه النصوص أنه لا يكاد يخرج عما عرف عن المتأخرين من أصحابه، وأن تفسيره لأكثر هذه النصوص يختلف عما قرره الشيخ الأشعري نفسه في «اللمع والإبانة» وما نقله عن ابن كلاب في «المقالات»، ولكني أشير هنا إلى أنه أيضاً لا يكاد يختلف مع تأويل المعتزلة لهذه النصوص نفسها، كما نجده عند عبد الجبار في «شرح الأصول الخمسة»».

“এরপর আল-আমিদি কুরআন-সুন্নাহর এই দলিলগুলোর তাবিল (ভিন্নার্থ) করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর দুই হাত’ মানে আল্লাহর ক্ষমতা, ‘আল্লাহর চোখ’ মানে আল্লাহ প্রদত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, ‘আল্লাহর চেহারা’ মানে আল্লাহর সত্তা এবং সকল গুণের সমষ্টি, ‘আল্লাহর নুর’ মানে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত, ‘আল্লাহর পায়ের গোছা উন্মোচিত হওয়া’ মানে কেয়ামতের ভয়াবহতা প্রকাশ পাওয়া, ‘আল্লাহর ইস্তিওয়া (আরশের ওপর আরোহণ)’ মানে আরশের কর্তৃত্ব লাভ করা এবং রাজত্ব পরিচালনা করা, ‘আল্লাহর অবতরণ’ মানে অনুগ্রহ ও রহমতের অবতরণ। এ জাতীয় আরও অর্থ আল-আমিদি গ্রহণ করেছেন, যেগুলো তাঁর দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণতার সাথে অধিক মানানসই—আলোচ্য কথাগুলোর (সিফাতগুলোর) বাহ্যিক/প্রকাশ্য অর্থের তুলনায়।

আল-আমিদির এসব বক্তব্য প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত মন্তব্য করেছি। সেখানে আমি প্রমাণ করেছি, আল-আমিদির এই ব্যাখ্যাগুলো পরবর্তী যুগে আগত আশারি মতাদর্শের বিদ্বানদের সুপরিচিত ব্যাখ্যাগুলো থেকে খুব একটা

আলাদা নয়। আমি এটাও প্রমাণ করেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোচ্য দলিলগুলোর যেই ব্যাখ্যা করেছেন, তা স্বয়ং শাইখ আবুল হাসান আল-আশারির বক্তব্যের বিপরীত। যেমনটি আবুল হাসান আল-আশারি তাঁর *'আল-ইবানা'* এবং *'আল-লুমা'* কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু কুল্লাব (কুল্লাবিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রধান ইমাম) থেকে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর *'আল-মাকালাত'* কিতাবে। কিন্তু এখানে আমি শুধু এটা ইঙ্গিত করছি যে, মুতাজিলিরা হুবহু এই দলিলগুলোর যেসব ব্যাখ্যা করেছে, আল-আমিদির তাবিল সেসব ব্যাখ্যা থেকে আলাদা নয়। মুতাজিলিদের যেসব ব্যাখ্যা আমরা আব্দুল জাব্বার আল-মুতাজিলির লেখা *'শারহুল উসুলিল খমসা'* কিতাবে দেখতে পাই (আল-আমিদি হুবহু সেসব ব্যাখ্যা দিয়েই আল্লাহর সিফাতের তাবিল করেছেন)।"[675]

[675] হাসান মাহমুদ আশ-শাফিয়ি, ***আল-আমিদি ওয়া আরাউহুল কালামিয়্যা*** (কায়রো : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

আল্লাহর *‘শরীর’* সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর হাতকে *‘অঙ্গ’* বলার বিধান

মুশাব্বিহা ও মুজাসসিমা সম্প্রদায়ের একদল লোক আল্লাহর হাতকে *‘অঙ্গ’* বলে, *‘প্রত্যঙ্গ’* বলে, কিংবা একসাথে *‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’* বলে। আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চোখ প্রভৃতি সিফাত সাব্যস্ত করার সময় তারা এগুলোকে *‘আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’* বলে, কিংবা এসব সিফাত থেকে ধারণা করে নেয়, আল্লাহর দেহ আছে। তাই তারা আল্লাহর জন্য দেহ বা শরীরও সাব্যস্ত করে। দেশীয় অনেক আহলেহাদিস দাবিদার মৌলানাও ‘আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা শরীর-দেহ আছে’—বিশ্বাস করেন! এদের কুফরি আকিদা থেকে আল্লাহর পানা চাই—আল-ইয়াজু বিল্লাহ।

সঙ্গত কারণেই বলে রাখছি, আহলেহাদিস সমাজে পরিচিত একজন মশহুর বক্তা তাঁর লেখা বইপত্রে এবং বক্তব্যগুলোতে মহান আল্লাহর শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য পর্যন্ত দিয়েছেন। কিন্তু এখন অবধি তিনি এসব বিদাতি ও কুফরি আকিদা থেকে স্পষ্টভাবে তওবা করে বিবৃতি দেননি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁর সেসব বিদাত-কুফর নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন মনে করিনি। তবে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি, তাঁর অসংখ্য বিদাতি ও কুফরি কথার ন্যায়সঙ্গত ইলমি সমালোচনা আসা জরুরি—স্বতন্ত্র লেখায়, স্বতন্ত্র কিতাবে।

এছাড়াও আমার কাছে খবর এসেছে, আমাদের আহলেহাদিস সমাজে পরিচিত অনেক দায়ি আছেন, যাঁদের কেউ কেউ সরাসরি

আল্লাহর জন্য ‘দেহ’ সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কোনো সুন্নাহপন্থি কিবার আলিমের বরাতে দাবি করেছেন, “আল্লাহর জন্য ‘দেহ’ সাব্যস্ত করা যায়; এতে কোনো অসুবিধা নেই।” প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ভ্রান্ত ও বিদাতি কথাবার্তা। আর বলাই বাহুল্য, তাঁদের সবাইকে এসব বিদাতি আকিদা থেকে ফিরে আসতে হবে। বরং এসব বিদাতি আকিদা থেকে প্রকাশ্যে তওবা করা তাঁদের জন্য ফরজ।

আমরা ইতঃপূর্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসৃত সিফাত বিষয়ক কয়েকটি মূলনীতি আলোকপাত করেছি। সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর একটি প্রধান মূলনীতি হলো—আল্লাহর গুণাবলি বিলকুল কুরআন-সুন্নাহর দলিলনির্ভর। সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর দলিল পাওয়া গেলে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হবে, নয়তো সাব্যস্ত করা হবে না। এই মূলনীতির পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে—কোনো বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করলে যদি আল্লাহর জন্য ত্রুটিবিচ্যুতি বা মর্যাদাহানিকর কিছু সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অবশ্যই সেই বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহকে মুক্ত-পবিত্র ঘোষণা করতে হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়টি চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর *‘আত-তাদমুরিয়্যা’* গ্রন্থে।[676] এখন এই মূলনীতিগুলো মাথায় রেখে আমরা বোঝার চেষ্টা করব—ইনশাআল্লাহ—মহান আল্লাহর জন্য শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা কতটুকু সমীচীন।

---

[676] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ১১৬-১২৪।

প্রথম বিষয় : আল্লাহর দেহ সাব্যস্ত করা

শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে, মহান আল্লাহর জন্য দেহ বা শরীর সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ। সংক্ষেপে এর কারণ ব্যাখ্যা করছি।

প্রথমত, কুরআন-সুন্নাহর কোথাও মহান আল্লাহর জন্য দেহ বা শরীর সাব্যস্ত করা হয়নি।[677]

দ্বিতীয়ত, সালাফদের আকিদার কিতাবপত্র আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁদের কাউকে আমরা আল্লাহর জন্য শরীর বা দেহ সাব্যস্ত করতে দেখিনি। বরং সর্বপ্রথম আল্লাহর শরীর সাব্যস্ত করেছিল—*'হিশাম ইবনুল হাকাম'* নামক রাফিদি শিয়া।[678]

তৃতীয়ত, বাতিলপন্থিরা 'আল্লাহর দেহ' শব্দের আড়ালে বিভিন্ন বিদাতি আকিদা প্রচার করে। কেউ মুশাব্বিহাদের বিদাত প্রচার করে, আবার কেউ জাহমিদের বিদাত প্রচার করে।[679]

চতুর্থত, 'দেহ বা শরীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ ত্রুটিপূর্ণ, যা মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। আর মহান আল্লাহকে যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করা ফরজ।[680]

আরবি ভাষায় এবং শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় দেহ শব্দের মর্মার্থ ও বিধান :

বাংলা 'দেহ' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ—জিসম, জাসাদ, বাদান প্রভৃতি (جسم وجسد وبدن)। এই আলোচনায় প্রধানত 'জিসম' শব্দ নিয়ে

---

677 ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৭, পৃ. ৩১৮।

678 ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৫০১।

679 ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৯, খ. ২, পৃ. ৫৩০; ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ৫, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

680 ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

আলোকপাত করা হয়। তাই আমরা 'জিসম' শব্দের মর্মার্থ নিয়ে আলাপ করব, পাশাপাশি অন্যান্য আরবি প্রতিশব্দগুলো নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অর্থ ও তার বিধান :

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি *'জিসম'* শব্দের অর্থ—*জাসাদ* বা *বাদান* তথা শরীর বা দেহ। আরবি ভাষার ইমাম **খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭০ হি.) বলেছেন :**

«جسم: الجِسْمُ يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل والدَّوابِّ ونحوه ممّا عظم من الخلق الجسيم».

"**জিসম :** 'বাদান' তথা 'শরীর' এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একত্রে 'জিসম' বলা হয়। সেই জিসমটি হয়ে থাকে মানুষের, উটের, চতুষ্পদ জন্তুর, কিংবা এ ধরনের বড়ো আকৃতির কোনো সৃষ্টির।"[681]

আরবি ভাষাশাস্ত্রের আরেক ইমাম **আবু নাসর আল-জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৩ হি.) বলেছেন :**

«[جسم] قال أبو زيد: الجِسْمُ: الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الاصمعي: الجسم والجُسْمانُ: الجَسَدُ».

"**জিসম :** আবু জাইদ বলেন, জিসম মানে জাসাদ তথা দেহ। তদ্রূপ জুসমান ও জুছমান মানেও দেহ।

---

[681] আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি, ***আল-আইন,*** তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুরায়ি (বৈরুত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, তাবি), ভুক্তি : جسم, খ. ৬, পৃ. ৬০।

আল-আসমায়ি বলেন, জিসম ও জুসমান মানে জাসাদ তথা দেহ।”[682]

শাইখুল ইসলাম **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«فَإِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يَقُولُونَ: الْجِسْمُ هُوَ الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ».

“নিশ্চয় ভাষাবিদগণ বলে থাকেন, জিসম মানে জাসাদ (শরীর) ও বাদান (দেহ)।”[683]

এই অর্থে ‘জিসম’ শব্দটি কুরআনুল কারিমে ব্যবহৃত হয়েছে। **মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন :**

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾.

“হে নবি, আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের জিসম (দেহ বা শরীরের অবয়ব) আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে।”[684]

মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলদের মধ্যে প্রেরিত রাজা তালুতের ব্যাপারে বলেছেন :

﴿وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ﴾.

“আল্লাহ তাকে জ্ঞানে ও জিসমে (দেহে) সমৃদ্ধ করেছেন।”[685]

---

[682] আবু নাসর ইসমায়িল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ তাজুল লুগাতি ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যা,*** তাহকিক : আহমাদ আব্দুল গফুর আত্তার (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), ভুক্তি : جسم, খ. ৫, পৃ. ১৮৮৭।

[683] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৫৩; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৩২।

[684] সুরা মুনাফিকুন ৬৩:৪।

[685] সুরা বাকারা ২:২৪৭।

আয়াতদুটো উল্লেখ করার পর **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন :**

«فَهُوَ يَدُلُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَى الْكَثَافَةِ وَالْغِلَظِ كَلَفْظِ الْجَسَدِ، ثُمَّ قَدْ يُرَادُ بِهِ نَفْسُ الْغَلِيظِ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ غِلَظُهُ، فَيُقَالُ: لِهَذَا الثَّوْبِ جِسْمٌ أَيْ غِلَظٌ وَكَثَافَةٌ، وَيُقَالُ: هَذَا أَجْسَمُ مِنْ هَذَا أَيْ أَغْلَظُ وَأَكْثَفُ».

"এ থেকে প্রমাণিত হয়, আরবি ভাষায় 'জিসম' শব্দটি আরবি 'জাসাদ' শব্দের মতোই ঘনত্ব ও পুরুত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপর কখনো কখনো 'জিসম' বলতে খোদ সেই 'পুরু অবয়বকে' বোঝানো হয়, আবার কখনো কখনো দেহের পুরুত্ব ও ঘনত্ব বোঝানো হয়। এজন্য বলা হয়, 'এই কাপড়ের জিসম (দেহ) আছে।' অর্থাৎ, কাপড়টির ঘনত্ব ও পুরুত্ব আছে। অনুরূপভাবে বলা হয়, 'এই জিনিসটি ওই জিনিসের চেয়ে অধিক জিসমসম্পন্ন।' অর্থাৎ, জিনিসটি অধিক ঘন, অধিক পুরু।"[686]

আলোচ্য আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী 'জিসম' শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা না-জায়েজ। মহান আল্লাহ শাব্দিক অর্থের এই জিসম থেকে মহাপবিত্র। এ মর্মে শাইখুল ইসলাম **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«فَالْجِسْمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْبَدَنُ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ».

"আরবি ভাষায় 'জিসম' মানে বাদান তথা দেহ বা শরীর। মহান আল্লাহ এই জিসম থেকে মহাপবিত্র।"[687]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

---

[686] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৫৩০।

[687] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***শারহু হাদিসিন নুজুল*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৫ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৬৯; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৪১৯।

«فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتًا، فتكون له حرمة الإثبات، ولا نفيًا، فيكون له إلغاء النفي، فمن أطلقه نفيًا أو إثباتًا سُئل عمَّا أراد به. فإن قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب، وهو البدن الكثيف الذي لا يُسمَّى في اللغة جسمٌ سواه، فلا يُقال للهواء جسم لغةً، ولا للنار ولا للماء، فهذه اللغة، وكُتُبها بين أَظهُرنا = فهذا المعنى منفيٌّ عن الله عقلًا وسمعًا».

“জিসম শব্দটি কুরআন-সুন্নাহয় সাব্যস্ত হয়নি। বিধায় সাব্যস্তকরণের যে মর্যাদা থাকে শরয়ি শব্দের, সেই মর্যাদা এই শব্দের মধ্যে নেই। আবার শব্দটিকে কুরআন-সুন্নাহয় নাকচও করা হয়নি। তাই এটাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়ার নীতিটিও প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর জন্য ‘জিসম’ শব্দটি সাব্যস্ত করে, কিংবা নাকচ করে, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ‘সে এর দ্বারা কী বোঝাচ্ছে?’ সে যদি বলে, আমি ‘জিসম’ বলতে আরবদের ভাষায় ব্যবহৃত অর্থ বুঝিয়েছি। অর্থাৎ, জিসম মানে ঘন বা পুরু দেহ। আরবি ভাষায় কেবল এই জিনিসকেই ‘জিসম’ বলা হয়। তাই আরবি ভাষায় বাতাসকে ‘জিসম’ বলা হয় না, আগুনকে কিংবা পানিকেও ‘জিসম’ বলা হয় না। এটাই আরবি ভাষার ব্যবহার। আরবি ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো আমাদের সামনেই রয়েছে। সে যদি ‘জিসম’ বলে এই অর্থ উদ্দেশ্য করে, তাহলে জেনে রাখা উচিত, উক্ত অর্থ মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না, বরং নাকচ করতে হবে। নাকচ করার এই বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত, আবার আকল তথা বিবেকবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণিত।”[688]

---

[688] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

দ্বিতীয় অর্থ ও তার বিধান :

দার্শনিকদের পরিভাষায়, আকৃতি ধারণ করার মতো কাঠামো এবং আকৃতি—এই দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়কে 'জিসম/দেহ' বলা হয়। গঠিত বিষয়ের মূল উপাদানকে 'কাঠামো' বলা হচ্ছে, যাকে দার্শনিকরা 'হুয়ুলি' তথা 'মৌলিক উপাদান' বলে অভিহিত করেন। আর সেই কাঠামো বা মৌলিক উপাদান দিয়ে কোনো কিছু গঠন করা হলে তার যেই আকার-আকৃতি ফুটে ওঠে, সেটাকে 'সুরত' তথা 'আকৃতি' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ কাদামাটি হলো মৌলিক উপাদান, আর কাদামাটি দিয়ে তৈরিকৃত বস্তুর আকৃতি (shape) হলো সুরত। দার্শনিকদের মতে, উক্ত মৌলিক উপাদান এবং আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বস্তু হলো জিসম।[689]

জিসমের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক **ইবনু সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.) বলেছেন :**

«ويقال جسم لجوهر مؤلف من هيولى، وصورة».

"হুয়ুলি এবং সুরত—এই দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুকে জিসম বলা হয়।"[690]

দার্শনিকদের মতাদর্শ বর্ণনা করতে যেয়ে শাইখুল ইসলাম **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«والقول بأن الجسم مركب من المادة والصورة قول الفلاسفة المشائين».

---

[689] মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়্যিস, ***শারহুর রিসালাতিত তাদমুরিয়্যা*** (রিয়াদ : দারু আতলাসিল খাদরা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০৩।

[690] আব্দুল আমির আল-আসাম, ***আল-মুসতালাহুল ফালসাফি ইনদাল আরাব*** (কায়রো : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২৪৮।

"আকৃতি ধারণ করার উপযুক্ত মৌলিক উপাদান এবং আকৃতি—এই দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়কে জিসম বলা হয়। এটা ওয়াকিং ফিলোসফারদের (walking philosophers) অভিমত।"[691]

এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার জন্য 'জিসম/দেহ' সাব্যস্ত করার হুকুম বর্ণনা করে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :**

«و إن أردتم به (أي: الجسم) المركب من المادة والصورة، أو المركب من الجواهر الفردة؛ فهذا منفيٌّ عن الله قطعًا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضًا، فليس الجسم المخلوق مركبًا من هذا ولا من هذا».

"আপনারা যদি 'জিসম' বলতে বোঝান, 'মৌলিক উপাদান ও আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত সত্তা,' কিংবা 'জিসম' বলতে বোঝান, 'অবিভাজ্য কণিকাসমূহের (indivisible substances) সমন্বয়ে গঠিত সত্তা,' তাহলে আমরা বলব, এই জিসম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না; বরং সুনিশ্চিতভাবে নাকচ করতে হবে। এমনকি বিশুদ্ধ মতানুসারে, মাখলুকদের জন্যও এই অর্থের জিসম সাব্যস্ত করা যাবে না, বরং নাকচ করতে হবে। কারণ 'মাখলুক জিসম'—না মৌলিক উপাদান ও আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত, আর না অবিভাজ্য কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।"[692]

---

[691] ইবনু তাইমিয়া, ***বুগইয়াতুল মুরতাদ,*** পৃ. ৪১২।

[692] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা,*** খ. ১, পৃ. ৫৮৩-৫৮৪।

তৃতীয় অর্থ ও তার বিধান :

আশারি-মাতুরিদিদের পরিভাষায়, দুই বা ততোধিক অংশের মাধ্যমে গঠিত সত্তাকে 'জিসম/দেহ' বলা হয়। আশারিদের বিখ্যাত ইমাম **ফাখরুদ্দিন আর-রাজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬০৬ হি.) বলেছেন :**

«فعلى هذا: الجسم ما يكون مؤلفًا من جزئين فصاعدًا».

"এরই ভিত্তিতে বলতে হয়, দুই বা ততোধিক অংশের মাধ্যমে গঠিত সত্তাই হলো জিসম তথা দেহ।"[693]

আশারি মতাদর্শের বিখ্যাত পণ্ডিত **আল্লামা সাদুদ্দিন আত-তাফতাজানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৩ হি.) বলেছেন :**

«الجسم عندنا القابل للانقسام، فيتناول المؤلف من الجزءين فصاعدا».

"আমাদের নিকটে 'জিসম' হলো এমন বিষয়, যা বিভাজনযোগ্য (ভাগ করা যায় এমন)। সুতরাং 'জিসম' বলতে বোঝানো হয়—দুই বা ততোধিক অংশের মাধ্যমে গঠিত সত্তা।"[694]

এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার জন্য 'জিসম/দেহ' সাব্যস্ত করার হুকুম বর্ণনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«وَأَهْلُ الْكَلَامِ قَدْ يُرِيدُونَ بِالْجِسْمِ مَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمُفْرَدَةِ أَوْ مِنْ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُنَازِعُ فِي كَوْنِ الْأَجْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَذَا وَهَذَا؛ بَلْ أَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ عِنْدَهُمْ

---

[693] আর-রাজি, ***আল-আরবায়িন ফি উসুলিদ্দিন,*** খ. ১, পৃ. ২০।

[694] আবু সায়িদ মাসউদ বিন উমার আত-তাফতাজানি, ***শারহুল মাকাসিদ*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৯।

أَنَّ السَّمَوَاتِ لَيْسَتْ مُرَكَّبَةً لَا مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمُفْرَدَةِ وَلَا مِنْ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مُرَكَّبًا مِنْ هَذَا وَهَذَا؟ فَمَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ جِسْمٌ وَأَرَادَ بِالْجِسْمِ هَذَا الْمُرَكَّبَ؛ فَهُوَ مُخْطِئٌ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ قَصَدَ نَفْيَ هَذَا التَّرْكِيبِ عَنْ اللَّهِ؛ فَقَدْ أَصَابَ فِي نَفْيِهِ عَنْ اللَّهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ عِبَارَةً تُبَيِّنُ مَقْصُودَهُ. وَلَفْظُ التَّرْكِيبِ قَدْ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ رَكَّبَهُ مُرَكِّبٍ أَوْ أَنَّهُ كَانَتْ أَجْزَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً فَاجْتَمَعَ أَوْ أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْرِيقَ وَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ».

“কালামনির্ভর আকিদা পোষণকারীরা কখনো কখনো ‘জিসম’ বলতে এমন কিছুকে বোঝায়, যা অবিভাজ্য কণিকা (indivisible substances) দিয়ে গঠিত, কিংবা যা মৌলিক উপাদান ও আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের অনেকেই আবার এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে, মাখলুক জিসমগুলো কি আদৌ এই দুটির (অবিভাজ্য কণিকা কিংবা মৌলিক উপাদান ও আকৃতি) সমন্বয়ে গঠিত কি না। বরং বনু আদমের অধিকাংশ বুদ্ধিমান মানুষের মতে, আকাশমণ্ডলী না অবিভাজ্য কণিকা দিয়ে গঠিত, আর না মৌলিক উপাদান ও আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত। তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কীভাবে এসবের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারেন?! সুতরাং, যে ব্যক্তি বলে, ‘আল্লাহ হলেন জিসম তথা দেহবিশিষ্ট,’ এবং এর মাধ্যমে সে এই অর্থ বোঝায় যে, আল্লাহ হলেন একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত সত্তা, তাহলে সে ভুল করেছে। আর যে ব্যক্তি *‘আল্লাহ জিসম নন’* বলে বোঝায়, মহান আল্লাহ একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত নন; সে জিসমকে নাকচ করার ক্ষেত্রে সঠিক কাজই করেছে। তবে তার উচিত—এমন ভাষা ব্যবহার করা, যাতে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

‘তারকিব’ তথা ‘গঠিত হওয়া/গঠিত করা’ পরিভাষাটির মাধ্যমে কখনো কখনো বোঝানো হয়, কোনো সত্তাকে কেউ গঠন করেছে। অথবা বোঝানো হয়, সেই সত্তার অংশগুলো আগে বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে একত্র হয়েছে। কিংবা বোঝানো হয়, সেই সত্তা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ার উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ আলোচ্য ‘তারকিবের’ এই প্রতিটি উদ্দেশ্য থেকে মহাপবিত্র।”[695]

কিছুদূর এগিয়ে **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন :**

«وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّبَّ مُرَكَّبٌ مُؤَلَّفٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْرِيقَ وَالِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ فَهَذَا مِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ وَأَجْهَلِهِمْ وَقَوْلُهُ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ لِلَّهِ وَلَدًا بِمَعْنَى أَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْهُ جُزْءٌ فَصَارَ وَلَدًا لَهُ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي تَفْسِيرِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ: هُوَ جِسْمٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمُنْفَرِدَةِ أَوْ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ؛ فَهَذَا بَاطِلٌ بَلْ هُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ فِي الْمَخْلُوقَاتِ فَكَيْفَ فِي الْخَالِقِ ﷻ وَهَذَا مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْمُجَسِّمَةِ الهشامية والكَرَّامِيَة وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُحْكَى عَنْهُمْ التَّجْسِيمُ؛ إذْ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ كُلَّ جِسْمٍ فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمُنْفَرِدَةِ وَيَقُولُونَ مَعَ ذَلِكَ: إنَّ الرَّبَّ جِسْمٌ وَأَظُنُّ هَذَا قَوْلَ بَعْضِ الكَرَّامِيَة فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي إثْبَاتِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جِسْمٌ».

---

[695] ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু হাদিসিন নুজুল,*** পৃ. ৬৯; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৪১৯।

“অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দাবি করে, ‘মহান আল্লাহ হলেন গঠিত, সংযোজিত।’ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাগ, অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার উপযোগী। যে ব্যক্তি এই দাবি করে, সে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কাফির এবং সবচেয়ে বড়ো মূর্খদের অন্যতম। তার এই কথা তাদের কথার চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা বলে, ‘আল্লাহর সন্তান আছে।’ অর্থাৎ, আল্লাহর একটি অংশ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্তানে পরিণত হয়েছে। আমরা একাধিক জায়গায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারমধ্যে সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতের তাফসির অন্যতম।

একইভাবে যদি বলা হয়, ‘মহান আল্লাহ হলেন জিসম।’ অর্থাৎ, তিনি অবিভাজ্য কণিকা দিয়ে গঠিত, কিংবা যা মৌলিক উপাদান ও আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত। তাহলে এ কথা বাতিল। এমনকি মাখলুকদের ক্ষেত্রেই এই দাবি করা বাতিল। তাহলে স্রষ্টার ক্ষেত্রে কেমন হতে পারে?!

এ ধরনের কথা সম্ভবত কিছু মুজাসসিমা (দেহবাদী) বলেছে। যেমন হিশামিয়্যা ও কার্রামিয়্যা প্রমুখের কারও কারও নিকট থেকে তাজসিমি (দেহবাদী) আকিদা বর্ণিত হয়েছে। তারা এমন কথা বলে থাকতে পারে। কারণ এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘প্রত্যেক জিসমই অবিভাজ্য কণিকা দিয়ে গঠিত।’ এ সত্ত্বেও তারা নিজেরাই আবার বলে, ‘আল্লাহ হলেন জিসম।’ আমার ধারণা, এটা কার্রামিয়্যা সম্প্রদায়ের কিছু লোকের অভিমত। কারণ ‘অবিভাজ্য কণিকা’ আছে কিনা সে বিষয়ে কার্রামিয়্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে কার্রামিয়্যারা একমত—মহান আল্লাহ হলেন জিসম তথা দেহবিশিষ্ট।”[696]

---

[696] ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু হাদিসিন নুজুল,*** পৃ. ৭৫; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৪২৮।

চতুর্থ অর্থ ও তার বিধান :

কার্রামিয়্যা সম্প্রদায়ের পরিভাষায়, 'জিসম/দেহ' মানে অস্তিত্বশীল, কিংবা স্বনির্ভর, কিংবা এমন সত্তা—যার দিকে ইশারা করা যায়। **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«فَالْمَشْهُورُ عَنْ نُظَّارِ الْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَقُولُ: هُوَ جِسْمٌ، أَنَّهُ يُفَسِّرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ الْمَوْجُودُ أَوِ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، لَا بِمَعْنَى الْمُرَكَّبِ».

"কার্রামিয়্যা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য আরও অনেকে মহান আল্লাহকে 'জিসম তথা দেহবিশিষ্ট' বলেছে। এদের মধ্যকার যুক্তিবিদদের থেকে বর্ণিত হয়েছে জিসমের একটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা মোতাবেক, জিসম মানে অস্তিত্বশীল, কিংবা স্বনির্ভর; জিসম মানে 'বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত সত্তা' নয়।"[697]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন :

«وَقَالَ آخَرُونَ: الْجِسْمُ هُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ وَكُلُّ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ جِسْمٌ وَكُلُّ جِسْمٍ فَهُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُشَارٌ إِلَيْهِ».

"আরেকদল যুক্তিবিদ বলেছেন, জিসম হলো স্বনির্ভর সত্তা। প্রত্যেক স্বনির্ভর সত্তাই হলো জিসম, আর প্রত্যেক জিসমই হলো স্বনির্ভর সত্তা। আর জিসম মানে এমন সত্তা—যার দিকে ইশারা করা যায়।"[698]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

«وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ مُشَارٌ إِلَيْهِ إِشَارَةً حِسِّيَّةً».

---

[697] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৫৪৮।

[698] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৭, পৃ. ৩১৭।

“কালামনির্ভর আকিদার সকল বিদ্বান বলেছেন, জিসম মানে এমন সত্তা—যার দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইশারা করা যায়।”[699]

এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার জন্য ‘জিসম/দেহ’ সাব্যস্ত করার হুকুম বর্ণনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«وَقَدْ يُرَادُ بِلَفْظِ الْجِسْمِ وَالْمُتَحَيِّزِ مَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَيْدِيَ تُرْفَعُ إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ يُقَالُ: هُوَ هُنَا وَهُنَاكَ وَيُرَادُ بِهِ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ وَيُرَادُ بِهِ الْمَوْجُودُ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ عِنْدَ السَّلَفِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ. فَإِذَا سَمَّى الْمُسَمِّي مَا يَتَّصِفُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي جِسْمًا؛ كَانَ كَتَسْمِيَةِ الْآخَرِ مَا يَتَّصِفُ بِأَنَّهُ حَيٌّ عَالِمٌ قَادِرٌ جِسْمًا وَتَسْمِيَةُ الْآخَرِ مَا لَهُ حَيَاةٌ وَعِلْمٌ وَقُدْرَةٌ جِسْمًا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ يُنَازِعُونَ فِي ثَلَاثِ مَقَامَاتٍ: **أَحَدُهَا** أَنَّ تَسْمِيَةَ مَا يَتَّصِفُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بِالْجِسْمِ بِدْعَةٌ فِي الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ؛ فَلَا أَهْلُ اللُّغَةِ يُسَمُّونَ هَذَا جِسْمًا بَلْ الْجِسْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْبَدَنُ كَمَا نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ».

“জিসম এবং ‘মুতাহাইয়্যিজ (স্থান-গ্রহণকারী)’ পরিভাষাদ্বয়ের মাধ্যমে কখনো কখনো এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, যার দিকে ইশারা করা যায়। অর্থাৎ, দোয়ার সময় তাঁর দিকে হাত তোলা যায় এবং বলা যায়, তিনি

[699] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৫৪; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৩৩।

এখানে বা সেখানে আছেন। আবার কখনো কখনো উক্ত পরিভাষাদ্বয়ের মাধ্যমে এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, যেই সত্তা স্বনির্ভর। আবার কখনো কখনো এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, যেই সত্তা অস্তিত্বশীল।

অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাআলা স্বনির্ভর, অস্তিত্বশীল। সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতে, দোয়ার সময় আল্লাহ তাআলার দিকে হাত তোলা হয়। তাঁদের মতে, মহান আল্লাহ আরশের ওপরে আছেন। সুতরাং কেউ যদি এসব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তাকে 'জিসম' নামে ডাকে, তাহলে তা সেই ব্যক্তির মতোই হবে, যে কিনা 'জীবিত, জ্ঞানী ও সক্ষম'—এমন সত্তাকেও 'জিসম' বলে নামকরণ করে। যেমনভাবে কেউ কেউ এমন সত্তাকেও 'জিসম' বলে, যেই সত্তার জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা রয়েছে! আর এটা সুবিদিত যে, এই মতাদর্শের লোকেরা তিনটি বিষয়ে (আহলুস সুন্নাহর) বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। যথা :

প্রথম বিষয় : এসব গুণে গুণান্বিত সত্তাকে 'জিসম' নামে ডাকা; যা মূলত শরিয়ত এবং আরবি ভাষা—উভয় দিক থেকেই বিদাত। কারণ আরবি ভাষাবিদগণ এটাকে 'জিসম' বলেন না। বরং তাঁদের কাছে 'জিসম' মানে হলো 'বাদান তথা দেহ'। যেমনটি বর্ণনা করেছেন একাধিক ভাষাবিদ ইমাম। আরবি ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থগুলোতে এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ বিষয়।"[700]

অর্থ চতুষ্টয়ের সারকথা :

জিসম তথা দেহ বা শরীর শব্দ নিয়ে আমরা যেই আলোচনা করলাম, তার সারকথা হলো—মহান আল্লাহর জন্য 'শরীর বা দেহ'

---

[700] ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু হাদিসিন নুজুল,*** পৃ. ৬৯-৭০; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৪২০।

সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শরীর বা দেহ শব্দের উল্লেখযোগ্য তিনটি আরবি প্রতিশব্দ আছে। যথা : (১) জিসম, (২) জাসাদ, (৩) বাদান। এই তিনটি শব্দের মধ্যে 'জাসাদ' ও 'বাদান' শব্দকে এবং উক্ত শব্দদ্বয়ের মর্মার্থকে বিলকুল আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচ করতে হবে। বলতে হবে, "মহান আল্লাহ 'জাসাদ' এবং 'বাদান' থেকে মহাপবিত্র।"

পক্ষান্তরে 'জিসম' শব্দের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা জরুরি। অর্থাৎ, 'জিসম' শব্দটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না এবং নাকচও করা যাবে না। কেননা শরিয়তে শব্দটিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি, আবার নাকচও করা হয়নি। কিন্তু অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, আভিধানিক অর্থে 'জিসম' শব্দটি আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচ করতে হবে। বলতে হবে, "মহান আল্লাহ আভিধানিক অর্থের 'জিসম' থেকে মহাপবিত্র।" তদ্রূপ দার্শনিক ও আশারি-মাতুরিদিদের পরিভাষায় 'জিসম' শব্দের যেই মর্মার্থ রয়েছে, সেই মর্মার্থ থেকেও মহান আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করতে হবে। স্রেফ কার্রামিয়্যা সম্প্রদায়ের পরিভাষায় (চতুর্থ অর্থে) 'জিসম' শব্দের যেই মর্মার্থগুলো আমরা আলোচনা করেছি, সেই মর্মার্থগুলো আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি। কিন্তু সেগুলোকে 'জিসম' বলি না, এবং এসব মর্মার্থকে জিসম বলাও বৈধ মনে করি না।

এজন্য **শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন :**

«فإن ذكر لفظ (الجسم) في أسماء الله وصفاتِه بدعة، لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالَها أحد من سلفِ الأمة وأئمتها، **لم يقل أحد منهم: إن الله جسم، ولا إن الله ليس بجسم**، ولا إن الله جوهر، ولا

إن الله ليس بجوهر. ولفظ (الجسم) لفظٌ مجمل، فمعناه في اللغة هو البدن، ومن قال: إنّ الله مثل بدن الإنسان فهو مفترٍ على الله، ومن قال: إنّ الله يُماثِله شيء من المخلوقات فهو مفترٍ على الله. ومن قال: إن الله ليس بجسمٍ، وأراد بذلك أنه لا يُماثِله شيء من المخلوقات، فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إنَّ الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة، وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي، بل القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفُ جبريل ونحو ذلك، فهذا مفترٍ على الله فيما نفاه عنه».

"নিশ্চয় আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে *'জিসম'* তথা *'শরীর'* বা *'দেহ'* শব্দ উল্লেখ করা বিদাত। কারণ কিতাব ও সুন্নাহ এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি; আর না বলেছেন এই উম্মতের সালাফ ও ইমামদের কেউ। **তাঁদের কেউ বলেননি, *'আল্লাহর শরীর আছে';* আর না বলেছেন, *'আল্লাহর শরীর নেই।'*** কেউ বলেননি, *'আল্লাহ হলেন জাওহার (substance/স্বতন্ত্র বস্তু)';* আর না বলেছেন, *'আল্লাহ জাওহার নন।'*

'জিসম' তথা *'শরীর'* একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—দেহ। যে ব্যক্তি বলে, *'আল্লাহ হলেন মানুষের শরীরের মতো,'* সে আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করে। আর যে ব্যক্তি বলে, *'আল্লাহ শরীরসম্পন্ন নন।'* আর সে উক্ত কথার দ্বারা এই উদ্দেশ্য করে যে, সৃষ্টিকুলের কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়; তাহলে তার কথার অর্থ বিশুদ্ধ বিবেচিত হবে, যদিও উক্ত শব্দ (অর্থাৎ, *'শরীর'* শব্দটি) বিদাত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে, *'আল্লাহ শরীরসম্পন্ন নন।'* আর সে উক্ত কথার দ্বারা এই উদ্দেশ্য

করে যে, মহান আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে না, তিনি (নিজে) আরবি ভাষার কুরআন বলেননি, বরং আরবি কুরআন হলো মাখলুক (সৃষ্ট) অথবা ফেরেশতা জিবরিলের রচনা; তাহলে আল্লাহ নিজের থেকে যেসব বিষয়কে নাকচ করেছেন, সেসব বিষয়ে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যারোপকারী বিবেচিত হবে।"[701]

এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের বিশিষ্ট আকিদাবিশারদ **শাইখ তামিম আল-কাদি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন :**

«لقد جاء النقل عن بعض الأئمة من أهل السنة أنهم نفوا (الجسم) عن الله تعالى، كالإمام ابن عبد البر، والسجزي والعمراني، والشوكاني وغيرهم. والمتأمل في كلام هؤلاء الأئمة يتبين له بجلاء أنهم لم يقصدوا من نفيهم للجسم ما قصده النفاة من المتكلمين، وإنما أرادوا بذلك نفي أحد أمرين :

١- إما نفي المعنى اللغوي الصحيح للجسم، وهو البدن الكثيف.

٢- وإما نفي المعنى الاصطلاحي الباطل للجسم، وهو ما علقه به المجسمة - وخصوصاً غلاتهم - من معان زائدة حتى على المعنى اللغوي مما يستلزم قدراً من المماثلة بين الحق والخلق».

"আহলুস সুন্নাহর কিছু ইমাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা মহান আল্লাহকে 'জিসম/দেহ' থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র, আস-সিজ্জি, আল-ইমরানি, আশ-শাওকানি প্রমুখ। এই ইমামদের

[701] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***জামিউল মাসায়িল,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২০৬-২০৭।

বক্তব্য গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁরা মহান আল্লাহর 'জিসম' অস্বীকার করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করেননি; যেই কাজটি আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী যুক্তিবিদরা করে থাকে। বরং আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ আল্লাহর 'জিসম' অস্বীকার করার মাধ্যমে দুটো বিষয়ের একটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। যথা :

এক. হয় তাঁরা আরবি ভাষায় 'জিসম' শব্দের যে সঠিক অর্থ আছে, তা থেকে মহান আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। আর আরবি ভাষায় 'জিসম' শব্দের অর্থ—ঘন বা পুরু দেহ।

দুই. অথবা 'জিসম' শব্দের যেসব বাতিল পারিভাষিক অর্থ আছে, তা থেকে তাঁরা মহান আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, মুজাসসিমা তথা দেহবাদী সম্প্রদায়—বিশেষ করে তাদের মধ্যকার চরমপন্থিরা—ভাষাগত অর্থের বাইরে গিয়ে যেসব অতিরিক্ত অর্থ সাব্যস্ত করেছে। যেসব অতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ ও মাখলুকের সাদৃশ্যকে অপরিহার্য করে তোলে। তাঁরা এসব অর্থ থেকে মহান আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।"[702]

---

[702] তামিম বিন আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আল-কাদি, ***কালবুল আদিল্লাহ আলাত তাওয়ায়িফিল মুদিল্লাহ ফি তাওহিদির রুবুবিয়্যাতি ওয়াল আসমায়ি ওয়াস সিফাত*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ নাশিরুন, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৫৮-৯৫৯।

দেহ সাব্যস্তের ব্যাপারে মুহাক্কিক বিদ্বানদের বক্তব্য :

আকিদার সুন্নাহপন্থি মুহাক্কিক বিদ্বানগণ আল্লাহ তাআলার দেহ বা শরীর সাব্যস্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহর অনেকগুলো বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এখন আমরা আরও কতিপয় বিদ্বান থেকে তাঁদের কিছু উল্লেখযোগ্য বক্তব্য পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রখ্যাত ইমাম **আবু নাসর আস-সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেছেন :**

«ألا ترى أن في الشاهد أن الفاعل للأشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع البصير جسم والله سبحانه حي سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم».

"আপনি কি দেখেন না—এই দৃশ্যমান জগতে (অর্থাৎ সৃষ্টজগতে) যেই সত্তা নিখুঁতভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে, যেই সত্তা জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, জীবিত, শ্রবণকারী ও দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই সত্তা হলো জিসম তথা দেহবিশিষ্ট। অথচ আল্লাহ তাআলা চিরজীবী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও কর্মসম্পাদনকারী হওয়া সত্ত্বেও 'জিসম তথা দেহবিশিষ্ট' নন।"[703]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রখ্যাত বিদ্বান **ইমাম সাফফারিনি আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেছেন :**

[703] আস-সিজ্জি, ***রিসালাতুস সিজ্জি ইলা আহলি জাবিদ,*** পৃ. ২৯২।

«فَإِنَّ أَهْلَ الْإِثْبَاتِ الْمُتَّبِعِينَ لِلْمَنْصُوصِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآيَاتِ، يُنَزِّهُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ التَّكْيِيفِ وَالْحَدِّ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ تَعَالَى بِالْجِسْمِ، أَوْ كَيَّفَ فَقَدَ زَاغَ وَأَلْحَدَ».

"নিশ্চয় যাঁরা কুরআনের আয়াত ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিলের অনুসারী হয়ে মহান আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করেন, তাঁরা আল্লাহ তাআলার ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন, এবং মহান আল্লাহকে *'হাদ্দ (সীমা)'* থেকে পবিত্র মনে করেন।[704] তাঁরা বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য *'জিসম'* সাব্যস্ত করেছে, কিংবা তাঁর গুণাবলির ধরন-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বক্রপথ অবলম্বন করেছে।"[705]

৩. ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আহলেহাদিস বিদ্বান **আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩০৭ হি.) বলেছেন :**

---

[704] উল্লেখ্য, সালাফদের কেউ কেউ আল্লাহর 'হাদ্দ' সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ স্পষ্টভাবে নাকচ করে বলেছেন, "আল্লাহর 'হাদ্দ' নেই।" আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়ে সালাফদের মধ্যে মতভেদ আছে মনে হলেও, বাস্তবে এ বিষয়ে সালাফদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। যারা আল্লাহর 'হাদ্দ' সাব্যস্ত করেছেন, তাঁরা উদ্দেশ্য করেছেন—সৃষ্টিকুল থেকে আল্লাহর আলাদা থাকাকে। অর্থাৎ, "আল্লাহর 'হাদ্দ' আছে" কথাটির মানে—মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের ভেতরে নন, সৃষ্টিকুলের সাথে সংমিশ্রিত নন; বরং তিনি সকল সৃষ্টির ওপরে রয়েছেন, তিনি সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর 'হাদ্দ' নাকচ করেছেন, তাঁরা উদ্দেশ্য করেছেন—আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলির ধরন-প্রকৃতি বিষয়ে মাখলুকের জ্ঞানকে। অর্থাৎ, "আল্লাহর 'হাদ্দ' নেই" কথাটির মানে—মহান আল্লাহর সিফাতের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। সালাফদের উল্লিখিত দুটো উদ্দেশ্যই সঠিকন। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৬৩।

[705] আস-সাফফারিনি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৯৯।

«فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته **بدعة**، لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم، ولا إن الله ليس بجسم».

“নিশ্চয় আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ‘জিসম’ তথা ‘শরীর’ শব্দ উল্লেখ করা বিদাত। উক্ত শব্দ না আছে কিতাবে, আর না আছে সুন্নাহয়। আর এই উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের কেউ (আল্লাহর শানে) উক্ত শব্দ বলেননি। তাঁদের কেউ বলেননি, আল্লাহ শরীরসম্পন্ন সত্তা, আবার কেউ বলেননি, আল্লাহ শরীরসম্পন্ন নন।”[706]

৪. ‘জিসম’ তথা ‘শরীর’ শব্দের ব্যাপারে ‘সাফওয়াতুত তাফাসির’ গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মাদ আলি সাবুনিকে (মৃ. ১৪৪২ হি.) খণ্ডন করতে যেয়ে সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি **শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেছেন :**

«ثم ذكر الصابوني-هداه الله-تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم، فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، أو نفاه رسوله ﷺ، ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ، ولم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتها، فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها، لا بنفي ولا إثبات، ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات

[706] মুহাম্মাদ সিদ্দিক হাসান খান বিন হাসান আল-হুসাইনি আল-কিন্নাউজি, ***কাতফুস সামার ফি বায়ানি আকিদাতি আহলিল আসার*** (সৌদি আরব : সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৫১।

الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه، وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له».

“এরপর সাবুনি হাদাহুল্লাহ (আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত দিন) উল্লেখ করেছেন, ‘মহান আল্লাহ শরীর, নয়নতারা, কর্ণকুহর, জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র থেকে মুক্ত।’ বস্তুত এটা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নয়। বরং এটা নিন্দনীয় কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের মতবাদ এবং তাদের অতিরঞ্জিত বক্তব্য। মহান আল্লাহ নিজেকে যেসব বিষয় থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, অথবা তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, তা ব্যতীত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত অন্য কিছু থেকে মহান আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করে না। তদ্রূপ মহান আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছুকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্তও করে না।

কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলগুলোতে এসকল বিষয়ের বিদ্যমানতা-অবিদ্যমানতা সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি (অর্থাৎ, এসকল বিষয় আল্লাহর আছে কি নেই—তা বর্ণিত হয়নি)। তাই এসব বিষয়ে নীরব থাকা এবং সাব্যস্ত বা নাকচ করার মাধ্যমে এসব নিয়ে পর্যালোচনা না করা ওয়াজিব। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর এই বক্তব্যই ওই সকল কাজ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়—*‘কোনো ক্ষেত্রেই মহান*

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন; বরং তিনি মহাপবিত্র, তাঁর কোনো সমকক্ষ ও শরিক নেই।"[707]

৫. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন :

«مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتاً ولا نفياً، ولكن نقول بالنسبة للفظ : لا ننفي ولا نثبت، لا نقول : جسم وغير جسم».

"জিসমিয়্যাহ তথা শরীরবাদ বা দেহবাদের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি। না বলা হয়েছে, 'এর অস্তিত্ব আছে,' আর না বলা হয়েছে, 'এর অস্তিত্ব নেই।' তাই আমরা এই শব্দের ব্যাপারে বলি, 'আমরা এটাকে সাব্যস্ত করি না, আবার নাকচও করি না।' আমরা বলি না, 'আল্লাহর শরীর আছে।' আবার এও বলি না যে, 'আল্লাহর শরীর নেই'।"[708]

৬. সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি এবং সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য, **শাইখ বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২৯ হি.) বলেছেন :**

«الجسم : لم يرد في الوحي إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لا نفيا ولا إثباتا، فهو بدعة، وقد عني شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى بهذا في مباحث مبسوطة لكشف عوار المبتدعة. **وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي**».

---

[707] আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু বাজ, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাওয়্যিআ,*** সংকলন ও তত্ত্বাবধান : মুহাম্মাদ বিন সাদ আশ-শুওয়াইয়ির (সৌদি আরব : রিআসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, তাবি), খ. ৩, পৃ. ৬১।

[708] আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা,*** পৃ. ১৮।

“কুরআন-হাদিসে মহান আল্লাহর শানে ‘জিসম’ বা ‘শরীর’ শব্দের ব্যবহার বর্ণিত হয়নি। না নাকচরণের দিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর না সাব্যস্তকরণের দিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই উক্ত শব্দ আল্লাহর শানে প্রয়োগ করা বিদাত। বিদাতিদের ভ্রান্তি উন্মোচন করার জন্য ‘দুই শাইখুল ইসলাম’ ইবনু তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুমাল্লাহ এই শব্দের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। **মূলত ‘মহান আল্লাহ শরীরসম্পন্ন সত্তা’—এ কথা সর্বপ্রথম বলেছিল হিশাম বিন হাকাম নামক রাফিদি শিয়া।**”[709]

[709] বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ, ***মুজামুল মানাহি আল-লাফজিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২১৭।

দ্বিতীয় বিষয় : আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, মুশাব্বিহা ও মুজাসসিমা সম্প্রদায়ের একদল লোক আল্লাহর হাতকে *'অঙ্গ'* বলে। মহান আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চোখ প্রভৃতি সিফাত সাব্যস্ত করার সময় তারা *'আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'* সাব্যস্ত করে। এমনকি অনেক আহলেহাদিস দাবিদার মৌলানাও মনে করেন, মহান আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে!

বঙ্গীয় আহলেহাদিস সমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিদ্বান মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াভীকে (মৃ. ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.) আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুন। এই মাসআলায় তাঁর ভুল হয়েছিল। মাওলানা আলিয়াভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *"ঈমান ও 'আকীদা"* গ্রন্থে 'আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' সাব্যস্ত করেছিলেন। **তিনি লিখেছেন :**

> "কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাত ও পা এবং চেহারা ও চোখ প্রভৃতি আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহর ঐসব **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** কিরূপ? তাকে কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাবে না। ... **আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রমাণ :** চেহারাঃ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের চৌদ্দটি আয়াতে তাঁর চেহারার প্রমাণ দিয়েছেন।"[710]

অথচ কুরআন-সুন্নাহর কোথাও আল্লাহর হাত, পা, চোখ, চেহারা প্রভৃতি সিফাতকে 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' বলা হয়নি। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও আল্লাহর জন্য 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' সাব্যস্ত করা হয়নি। উপরন্তু মহান আল্লাহর জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তাআলার জন্য ত্রুটি ও অপূর্ণতা ধার্য করা হয়! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'

---

[710] আইনুল বারী আলিয়াবী, ***ঈমান ও 'আকীদা*** (মেহেরপুর : আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬১-৬২।

শব্দের প্রকৃত মর্মার্থ আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আরবি ভাষায় 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দের মর্মার্থ ও বিধান :

আরবি ভাষায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিশব্দ—জাওয়ারিহ (جوارح), আদাউন (أعضاء) প্রভৃতি। এসব শব্দের মর্মার্থ মহান আল্লাহর বড়োত্ব ও মহত্ত্বের সাথে মানানসই নয়।

'জাওয়ারিহ' শব্দের অর্থ ও তার বিধান :

'জাওয়ারিহ' শব্দটি আরবি 'জারিহা' শব্দের বহুবচন (الجوارح جمع جارحة)। *'জাওয়ারিহ'* শব্দ প্রয়োগ করলে—উপার্জন করা, উপকৃত হওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ পায়। আরবি ভাষার ইমাম **আবু নাসর আল-জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৩ হি.) বলেছেন :**

«والجَوارِحُ من السِباعِ والطَير: ذواتُ الصَيدِ. وجوارِحُ الإنسان: أعضاؤه التي يَكْتَسِبُ بها».

"হিংস্র জন্তু ও পাখিদের মধ্যে *'জাওয়ারিহ'* বলা হয় শিকারি প্রাণীদের। আর মানুষের *'জাওয়ারিহ'* বলতে বোঝায় তার সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেগুলোর মাধ্যমে সে কাসব (উপার্জন) করে।"[711]

আরবি ভাষার প্রখ্যাত ইমাম **আবু মানসুর আল-আজহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেছেন :**

«وَقَالَ اللَّيْث: جوارِح الْإِنْسَان: عوامِل جسده من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ، واحدتها جارحة. والجوارِحُ من الطير والسِّباع: ذواتُ الصَّيْد، الْوَاحِدَة جارحة: فالبازي جارحة، وَالْكَلب الضَّاري جارحة: سُمِّيت جوارِح

[711] আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৫৮।

لِأَنَّهَا كواسِبُ أنفُسِها من قَوْلك: جَرَحَ واجتَرَح إِذا اكْتسب. قَالَ الله: ﴿يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ﴾ (الجاثية: ٢١). ... وَقَالَ أَبُو عُبيدة: يُقال: لإناث الخَيْل جوارِحُ، واحدتُها جارحة: لِأَنَّهَا تُكْسِبُ أَرْبَابهَا نِتَاجَها. وَيُقَال: مَا لَهُ جارِحَة أَي مَا لَهُ أُنْثَى ذاتُ رَحِم تحمِل، وَمَا لَهُ جارِحَة أَي مَا لَهُ كاسِب. وَفُلَان يَجْرَحُ لِعِيَالِهِ ويَجْتَرِح، ويَقْرِش ويَقْتَرِش بِمَعْنى وَاحِد».

"লাইস বলেছেন, মানুষের *'জাওয়ারিহ'* বলতে তার দেহের কর্মকারী অঙ্গগুলো বোঝায়; যেমন দুই হাত ও দুই পা। এর একবচন—'জারিহা'। আর পাখি ও হিংস্র জন্তুদের মধ্যে *'জাওয়ারিহ'* বলা হয় শিকারি প্রাণীদের। এর একবচনও—'জারিহা'। সুতরাং বাজপাখি একটি জারিহা, আবার হিংস্র কুকুরও একটি জারিহা। এদেরকে *'জাওয়ারিহ'* বলা হয় এই কারণে যে, তারা নিজেদের জীবিকা নিজেরাই উপার্জন করে। শব্দটি এসেছে *'জারাহা'* ও *'ইজতারাহা'* ক্রিয়া থেকে, যার অর্থ—কাসব তথা উপার্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা মন্দ কাজ উপার্জন করেছে, তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে ওদের মতো গণ্য করব, যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে?' (*সুরা জাসিয়া ৪৫:২১*) ...

আবু উবাইদা বলেছেন, মাদী ঘোড়াগুলোকেও *'জাওয়ারিহ'* বলা হয়, যার একবচন—'জারিহা'। কারণ তারা হলো তাদের মালিকদের জন্য সম্পদ উপার্জনের মাধ্যম। এজন্য বলা হয়ে থাকে, 'তার কোনো জারিহা নেই।' অর্থাৎ, তার এমন কোনো মাদী প্রাণী নেই, যে হলো গর্ভবতী এবং গর্ভে বাচ্চা ধারন করতে সক্ষম। আবার বলা হয়, 'তার কোনো জারিহা নেই।' অর্থাৎ, তার কোনো

কাসিব তথা উপার্জনকারী নেই। তদ্রূপ বলা হয়, অমুক ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য উপার্জন করে—*'ইয়াজরাহু'*, *'ইয়াজতারিহু'*, এবং *'ইয়াকরিশু'*, *'ইয়াকতারিশু'*—সবগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ, উপার্জন করা।"[712]

ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :

«وَالْجَوَارِحُ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ وَالِانْتِفَاعِ».

"*'জাওয়ারিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)'* শব্দে 'কাসব তথা উপার্জন করার' অর্থ আছে, উপকৃত হওয়ার অর্থ আছে।"[713]

এই কথা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহও বলেছিলেন (لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ وَالِانْتِفَاعِ)।[714] কেউ কেউ ভুলবশত মনে করতে পারেন, 'জাওয়ারিহ' শব্দের পরিচয়ে যেই *'কাসব'* তথা *'উপার্জনের'* কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ স্রেফ—কর্মসম্পাদন করা। এটা ভুল ধারণা। কারণ আরবি ভাষায় 'কাসব' মানে—রিজিক অন্বেষণ করা, বা জীবিকা তালাশ করা। এজন্য আরবি ভাষার প্রখ্যাত ইমাম **খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭০ হি.) বলেন :**

«الكَسْبُ: طلب الرزق، ورجل كسوب يَكْسِبُ: يطلب الرزق».

---

[712] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ,*** খ. ৪, পৃ. ৮৬।

[713] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৬৬।

[714] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার,*** পৃ. ২৪৩; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৪, পৃ. ১৭৩।

"আল-কাসব মানে রিজিক তালাশ করা। বলা হয়, অমুক ব্যক্তি কাসুব (রিজিক-তালাশকারী)। সে 'কাসব' করে মানে—সে রিজিক অনুসন্ধান করে।"[715]

আরবি ভাষাশাস্ত্রের ইমাম **আবু নাসর আল-জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৩ হি.) বলেছেন :**

«الكَسْبُ: طلب الرزق. وأصله الجمع، تقول منه: كَسَبْتُ شيئًا واكْتسبْته بمعنًى».

"আল-কাসব মানে রিজিক তালাশ করা। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—জমা করা। 'কাসব' ক্রিয়ামূল থেকে ক্রিয়া বানিয়ে বলা যায়, 'কাসাবতু শাইআন,' 'ইকতাসাবতু শাইআন।' দুটোর অর্থ একই—আমি কিছু উপার্জন করেছি।"[716]

এ কারণে **মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে বলেছেন :**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾.

"হে ইমানদারগণ, তোমরা যা কাসব (উপার্জন) করেছ, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট, তা ব্যয় করো।"[717]

জীবিকা উপার্জন করা, রিজিক তালাশ করা—মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্য থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। তাঁকে রিজিক তালাশ করতে হয় না। বরং তিনি নিজেই সকল সৃষ্টিকে রিজিক দেন। **মহান আল্লাহ বলেন :**

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

---

[715] আল-ফারাহিদি, ***আল-আইন,*** ভুক্তি : كسب, খ. ৫, পৃ. ৩১৫।

[716] আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ,*** ভুক্তি : كسب, খ. ১, পৃ. ২১২।

[717] সুরা বাকারা ২:২৬৭।

“জমিনে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব কেবল আল্লাহর।”[718]

তিনি আরও বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

“নিশ্চয় আল্লাহই রিজিকদাতা, তিনি শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”[719]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, ‘জাওয়ারিহ’ শব্দের মধ্যে—উপার্জন করা, রিজিক তালাশ করা, উপকৃত হওয়া প্রভৃতি অর্থ রয়েছে। মহান আল্লাহ এসব বৈশিষ্ট্য থেকে মহাপবিত্র। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে *‘তিনি উপার্জন করেন বা রিজিক তালাশ করেন বা উপকৃত হন’* বলা গর্হিত অপরাধ। জালিমরা আল্লাহর ব্যাপারে যা বলে, মহান আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। তিনি সম্মানিত, মহাপবিত্র।

মহান আল্লাহর জন্য ‘জারিহা/জাওয়ারিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)’ সাব্যস্ত করার বিধান বর্ণনা করে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :**

«وأما الدَّأب والنصب وإثبات الجارحة فمن خصائص العبد، والله تعالى مُنَزَّه عن ذلك كله متعالٍ عنه. وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين».

“পরিশ্রম করা, পরিশ্রান্ত হওয়া এবং জারিহা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) থাকা—এগুলো বান্দার খাস বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এসব বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এসব বৈশিষ্ট্য

---

[718] সুরা হুদ ১১:৬।

[719] সুরা জারিয়াত ৫১:৫৮।

থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। আর মাখলুকদের খাস বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য সাব্যস্ত করা না-জায়েজ।"[720]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. فليس بصحيح من جهة أنه يكتسب بها، ما لولا ثبوتها له لعدم الاكتساب له مع كونه محتاجًا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات المصيودة، كسباع الطير والبهائم جوارح، لأنها تكتسب الصيود، والبارئ مستغن عن الاكتساب، فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة، مع عدم السبب الموجب للتسمية».

"কালামি যুক্তিবিদরা দাবি করে, মহান আল্লাহর প্রমাণিত সিফাতগুলো (যেমন হাত, চেহারা ইত্যাদি) সাব্যস্ত করলে আল্লাহর জন্য জাওয়ারিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) এবং আদাউন (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তাদের এই দাবি সঠিক নয়। কারণ কারও জন্য 'জাওয়ারিহ' সাব্যস্ত করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, 'তিনি এসবের মাধ্যমে উপার্জন করেন। জাওয়ারিহ না থাকলে তার পক্ষে উপার্জন করা সম্ভব হতো না। কেননা তিনি এসবের প্রতি মুখাপেক্ষী।' এজন্য শিকারি প্রাণীদের 'জাওয়ারিহ' বলা হয়। যেমন শিকারি পাখি, বন্য জন্তু প্রভৃতিকে 'জাওয়ারিহ' বলা হয়। কারণ এরা বিভিন্ন ধরনের শিকার উপার্জন করে। অথচ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা যাবতীয় উপার্জন থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে 'জারিহা'

[720] ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ,*** খ. ২, পৃ. ৫১৭।

(অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) নামকরণ কল্পনাও করা যায় না। কেননা নামকরণের যে কারণ থাকে, তা এখানে অনুপস্থিত।"[721]

'আদাউন' শব্দের অর্থ ও তার বিধান :

'আদাউন' শব্দটি আরবি 'উদবুন' বা 'ইদবুন' শব্দের বহুবচন (الأعضاء جمع عضو)। *'আদাউন'* শব্দ প্রয়োগ করলে—বিভিন্ন অংশ, ভাগ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়। আরবি ভাষার ইমাম **আবু নাসর আল-জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৩ হি.) বলেছেন :**

«العُضْوُ والعِضْوُ: واحد الأعضاء. وعَضَّيتُ الشاة تَعْضِيَةً، إذا جزَّأتها أعضاء. ويقال أيضا: عضيت الشئ تعضية، إذا فرَّقته».

"উদবুন এবং ইদবুন হলো 'আদাউন' শব্দের একবচন। এ কারণে বলা হয়, '**আদ্দাইতুশ** শাতা তাদিয়াতান।' অর্থাৎ, আমি মাদী ছাগলটিকে **কয়েক ভাগে ভাগ করেছি।** অনুরূপভাবে বলা হয়, '**আদ্দাইতুশ** শাইআ তাদিয়াতান।' অর্থাৎ, আমি এই জিনিসকে **বিভক্ত/ভাগ করেছি।**"[722]

আরবি ভাষার প্রখ্যাত ইমাম **ইবনু ফারিস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৫ হি.) বলেছেন :**

«**عضو:** العين والضاد والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تجزئةِ الشَّئ. من ذلك العِضْو والعُضْو. والتَّعضية: أن يُعَضِّىَ الذّبيحة أعضاء. والعِضَةُ: القِطعة من الشئ، تقول: عَضّيْتُ الشئ أى وزَّعته. قال رؤبة: وليس دينُ الله بالمُعَضَّى، أى بالمفرَّق. قال الخليل: وقوله تعالى: ﴿اَلَّذِينَ جَعَلُوا اَلْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ أى عِضَة

---

[721] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

[722] আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ,*** ভুক্তি : عضا, খ. ১, পৃ. ৩৫৮।

عِضة، ففرَّقوه، آمنوا ببعضه وكَفَرُوا ببعضه. والاسم منه التَّعضية. ومنه الحديث: «لا تَعْضِيَةَ فى ميراث». أى لا تَقسِموا ما لا يحتمل القَسْم كالسَّيف والدِّرَّة وما أَشبَهَ ذلك».

"উদবুন শব্দটির মূল ধাতু হলো—আইন, দোয়াদ, ওয়াও। এই শব্দের একটিমাত্র মৌলিক অর্থ আছে। অর্থটি হলো—কোনো কিছুকে খণ্ডিত বা বিভক্ত করা। এই অর্থের কারণেই অঙ্গকে 'উদবুন' বা 'ইদবুন' বলা হয়। এই শব্দের ধাতু থেকে উদ্‌গত 'তাদিয়া' ক্রিয়ামূলের মানে হলো—জবেহ করা প্রাণীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। অনুরূপভাবে 'ইদাহ' মানে কোনো কিছুর একটি অংশ বা টুকরা। আরবি ভাষায় বলা হয়, **'আদ্দাইতুশ** শাইআ।' অর্থাৎ, আমি এই জিনিসকে **ভাগ করে বিতরণ করেছি।** কবি রুবা বলেছেন, 'আল্লাহর দ্বীন **মুআদ্দা** নয়।' অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীনকে **বিভক্ত** করার কোনো সুযোগ নেই। ভাষাবিজ্ঞানী খলিল বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে **ইদিন** করেছে।' (*সুরা হিজর* ১৫:৯১) অর্থাৎ, তারা কুরআনকে **ভাগ-ভাগ করে নিয়েছে;** কিছু অংশের প্রতি ইমান এনেছে, আর কিছু অংশ অস্বীকার করেছে। এই ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল-বিশেষ্য হলো—তাদিয়া। এজন্য হাদিসে এসেছে, 'উত্তরাধিকার বণ্টনে কোনো **তাদিয়া** নেই।' অর্থাৎ, যেসব জিনিস ভাগ করা সম্ভব নয়—যেমন তলোয়ার, বর্ম ইত্যাদি—সেগুলোকে টুকরো করে ভাগ করা যাবে না।"[723]

বাংলা ভাষাতেও *'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'* বললে 'শরীরের বিভিন্ন অংশ বা ভাগ' অর্থ প্রকাশ পায়। বাংলা একাডেমীর ***'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'*** বলা হয়েছে, "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (বিশেষ্য) দেহের বিভিন্ন

[723] ইবনু ফারিস, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** ভুক্তি : عضو, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭।

অংশ।"[724] আর আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে *'তিনি বিভিন্ন ভাগবিশিষ্ট'* অথবা *'তিনি বিভিন্ন অংশবিশিষ্ট'* কিংবা *'তিনি একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত'*—বলা গর্হিত অপরাধ। মহান আল্লাহর জন্য *'আদাউন (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)'* সাব্যস্ত করার বিধান বর্ণনা করে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«فأما تسمية الأعضاء، فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث، لما تعينت له من الصفات الزائدة على تسمية الذات، لأن العضو عبارة عن الجزء؛ ولهذا نقول: عضيته. أي جزيته وقسمته، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١] أي: قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فإذا كان العضو إنما هو مأخوذ من هذا، فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها الجمع، وتقبل التفرقة والتجزئة، فامتنع أن يستحق ما يسمى عضوًا».

"*'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'* বিশেষণটি কেবল সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ সৃষ্টিজীবের 'সত্তা' নামের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এছাড়াও 'অঙ্গ' বলতে মূলত কোনো কিছুর অংশ বোঝায়। এজন্যই আমরা আরবি ভাষায় বলে থাকি, **'আদ্দাইতুহু।'** অর্থাৎ, আমি তাকে বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেছি, বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছি। এ অর্থেই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে **ইদিন** করেছে।' (*সুরা হিজর* ১৫:৯১) অর্থাৎ, তারা কুরআনকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে; কিছু অংশের প্রতি ইমান এনেছে, আর কিছু অংশ অস্বীকার করেছে। যেহেতু 'উদবুন' তথা 'অঙ্গ' শব্দটি মূলত এই অর্থ (অংশ বা খণ্ড) থেকেই নেওয়া হয়েছে, সেহেতু জেনে রাখা উচিত,

[724] বাংলা একাডেমী, ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,*** পৃ. ১০-১১।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ বিভিন্ন অংশ বা খণ্ডবিশিষ্ট নন—যেগুলোকে একত্র করা যায়, আবার যেগুলো আলাদা ও খণ্ডিত হওয়ারও উপযোগী। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য 'উদবুন/অঙ্গ' নামে কিছু সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।"[725]

এছাড়াও আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, শাইখুল ইসলাম **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّبَّ مُرَكَّبٌ مُؤَلَّفٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْرِيقَ وَالِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ فَهَذَا مِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ وَأَجْهَلِهِمْ وَقَوْلُهُ شَرٌّ مِنْ قَوْلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ لِلَّهِ وَلَدًا بِمَعْنَى أَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْهُ جُزْءٌ فَصَارَ وَلَدًا لَهُ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي تَفْسِيرِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ».

"অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দাবি করে, 'মহান আল্লাহ হলেন গঠিত, সংযোজিত।' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাগ, অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার উপযোগী। যে ব্যক্তি এই দাবি করে, সে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কাফির এবং সবচেয়ে বড়ো মূর্খদের অন্যতম। তার এই কথা তাদের কথার চেয়েও নিকৃষ্ট, যারা বলে, 'আল্লাহর সন্তান আছে।' অর্থাৎ, আল্লাহর একটি অংশ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্তানে পরিণত হয়েছে। আমরা একাধিক জায়গায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারমধ্যে সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতের তাফসির অন্যতম।"[726]

---

[725] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৫৯।

[726] ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু হাদিসিন নুজুল,*** পৃ. ৭৫; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৪২৮।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তের ব্যাপারে মুহাক্কিক বিদ্বানদের বক্তব্য :

আকিদার সুন্নাহপন্থি মুহাক্কিক বিদ্বানগণ আল্লাহ তাআলার অঙ্গ সাব্যস্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহর বেশ কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এখন আমরা বিভিন্ন যুগের সুন্নাহপন্থি বিদ্বান থেকে তাঁদের কিছু উল্লেখযোগ্য বক্তব্য পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

১. ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহর জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা কুফর। মুতাজিলি পণ্ডিত বিশর আল-মারিসির খণ্ডন করতে যেয়ে **ইমাম দারিমি বলেছেন :**

«وَأَمَّا دَعْوَاكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: جَارِحٌ مُرَكَّبٌ **فَهَذَا كُفْرٌ لَا يَقُولُهُ أحد من الْمُسلمين.** وَلَكنَّا نُثْبِتُ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْعَيْنَ بِلَا تَكْيِيفٍ، كَمَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ الرَّسُول، وَهَذَا الَّذِي تُكَرِّرُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ جَارِحٌ وَعُضْوٌ وَمَا أَشْبَهَهُ، حَشْوٌ وَخُرَافَاتٌ، وَتَشْنِيعٌ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ: وَقَدْ رَوَيْنَا رِوَايَاتِ السَّمْعِ وَالْبَصرِ وَالْعَيْنِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِأَسَانِيدِهَا وَأَلْفَاظِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَعْنِي بِهَا كَمَا عَنَى وَالتَّكْيِيفُ عَنَّا مَرْفُوعٌ، وَذِكْرُ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ تكلّف مِنْك، وتشنيع».

"আর তুমি দাবি করেছ, তাঁরা বলেছেন, *'তিনি সুগঠিত* ***অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট*** *সত্তা,'* **এটা হলো কুফর—যা কোনো মুসলিম বলতে পারে না।** কিন্তু আমরা কোনো ধরন নির্দিষ্ট না করে তাঁর শ্রবণ, দৃষ্টি ও চোখ সাব্যস্ত করি। যেমনভাবে তিনি তাঁর নাজিলকৃত কিতাবে নিজের জন্য তা সাব্যস্ত

করেছেন এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করেছেন। আর তুমি যেই কথা একের পর এক বলেই চলেছ, *'অঙ্গবিশিষ্ট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি,'*—এগুলো একদম বাজে কথা, কল্পকাহিনী ও কুৎসা। এমন কথা জগতের কেউ বলে না। আমরা শ্রবণ, দর্শন ও চোখের ব্যাপারে এই কিতাবের প্রারম্ভে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সনদ ও মতন-সহ বেশ কিছু রিওয়াইয়াত বর্ণনা করেছি। তিনি যেভাবে বলেছেন, আমরাও সেভাবেই বলি। তিনি যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আমরাও সেই উদ্দেশ্য নিই। আমরা ধরন-নির্দিষ্ট করা থেকে মুক্ত। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ হলো তোমার বাড়াবাড়ি ও কুৎসা।"[727]

২. জগদ্বিখ্যাত সুন্নাহপন্থি মুফাসসির **ইমাম আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন :**

«وننفي عنه التشبيه فنقول : يسمع جل ثناؤه الأصوات، لا بخرق في أذن، ولا جارحة كجوارح بني آدم. وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم. **وله يدان ويمين وأصابع، وليست جارحة،** ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق، لا مقبوضتان عن الخير، **ووجه لا كجوارح بني آدم التي من لحم ودم».**

"আমরা মহান আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যদানকে নাকচ করি। আমরা বলি, মহান আল্লাহ আওয়াজ শ্রবণ করেন; তবে কানের ছিদ্র দিয়ে নয়, আবার বনু আদমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো কোনো অঙ্গ দিয়েও নয়। তদ্রূপ তিনি লোকদেরকে

[727] আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান,*** খ. ২, পৃ. ৬৮৯।

অবলোকন করেন দৃষ্টি দিয়ে। তবে সেই দৃষ্টি বনু আদমের দৃষ্টিসমূহের মতো নয়, যেসব দৃষ্টি (মানুষের দৃষ্টি) তাদের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। **আল্লাহর দুই হাত আছে, ডান হাত আছে এবং আঙুল আছে। কিন্তু এগুলো অঙ্গ নয়।** তাঁর দুই হাত সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদানের জন্য প্রসারিত, কল্যাণপ্রদান করা থেকে মুষ্টিবদ্ধ বা আবদ্ধ নয়। **তাঁর চেহারা আছে, কিন্তু তা বনু আদমের রক্তমাংসে গড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো নয়।"**[728]

৩. সমগ্র আহলুল হাদিস তথা আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে *'শাইখুল মুহাদ্দিসিনা ওয়াল ফুকাহা'* খ্যাত মহান ইমাম **আবু বাকর আল-ইসমায়িলি আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭১ হি.) বলেছেন :**

«وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. **ولا يعتقد فيه الأعضاء، والجوارح».**

"মহান আল্লাহ নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার দুই হাত প্রসারিত; তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। কিন্তু তাঁর দুই হাত কেমন—সেটা নির্ধারণ করে বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ আল্লাহর কিতাবে তাঁর হাতের ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়নি। **আর আল্লাহ তাআলার 'আদাউন (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)' ও**

---

[728] আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি, ***আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ দিন,*** তাহকিক : আলি বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৪২।

‘জাওয়ারিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)’ আছে—এমন বিশ্বাসও রাখা যাবে না।”[729]

৪. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের শ্রদ্ধেয় ইমাম **আবু নাসর আস-সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেছেন :**

«وكذلك السمع والبصر **ليسا من الله تعالى جارحتين**، وهما من المحدث جارحتان. ... **وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة**، وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد».

“তদ্রূপ ‘শোনা’ ও ‘দেখা’—**সিফাতদুটো মহান আল্লাহর দুটো ‘জারিহা/অঙ্গ’ নয়।** কিন্তু সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে ‘শোনা’ ও ‘দেখার’ কাজ দুটো অঙ্গের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ... **মহান আল্লাহর কথা কোনো উপকরণ, কলকব্জা এবং ‘জারিহা/অঙ্গ’ ছাড়াই সম্পন্ন হয়।** কিন্তু সৃষ্টিজীবের কথা সাধারণত উপকরণ, কলকব্জা ও অঙ্গ ছাড়া সম্পন্ন হয় না।”[730]

৫. মহান আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে *‘দ্বিতীয় দারাকুতনি’* খ্যাত মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি **ইমাম খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :**

«وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ الْقُوَّةُ أَوْ النِّعْمَةُ وَلَا مَعْنَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ الْعِلْمُ؛ **وَلَا نَقُولُ إِنَّهَا جَوَارِحُ** وَلَا نُشَبِّهُهَا بِالْأَيْدِي وَالْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ الَّتِي هِيَ جَوَارِحُ وَأَدَوَاتٌ لِلْفِعْلِ».

---

[729] আবু বাকর আহমাদ বিন ইবরাহিম আল-ইসমায়িলি, ***ইতিকাদু আয়িম্মাতিল হাদিস,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়্যিস (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৫১।

[730] আস-সিজ্জি, ***রিসালাতুস সিজ্জি ইলা আহলি জাবিদ,*** পৃ. ২২৯-২৩০।

"আমরা বলি না, 'হাত' সিফাতের অর্থ—শক্তি বা নেয়ামত, আর 'শোনা' ও 'দেখা' সিফাতদ্বয়ের অর্থ—জ্ঞান। **আমরা এটাও বলি না যে, এগুলো আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।** যাদের হাত, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণক্ষমতা 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কর্মসম্পাদনের কলকব্জা' হিসেবে সুবিদিত, তাদের হাত এবং শোনা ও দেখার সাথে আল্লাহর হাত এবং শোনা ও দেখাকে আমরা সাদৃশ্য দিই না।"[731]

৬. *'শাইখুশ শাফিয়িয়্যিন'* খ্যাত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের শ্রদ্ধেয় ইমাম **ইয়াহইয়া আল-ইমরানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৫৮ হি.) বলেছেন :**

«وأن لله وجها ويدين كما أخبر بكتابه، **ولا يفسر ذلك بالجارحة** ولا بالذات والنعمة».

"আল্লাহ তাআলার চেহারা এবং দুই হাত আছে; যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন। **কিন্তু এগুলোকে 'জারিহা' তথা 'অঙ্গ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।** আবার আল্লাহর চেহারাকে 'আল্লাহর সত্তা' এবং আল্লাহর দুই হাতকে 'তাঁর নেয়ামত' বলেও ব্যাখ্যা করা যাবে না।"[732]

৭. *'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'* শব্দের বিশ্লেষণ করে **ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :**

---

[731] ইবনু কুদামা, ***জাম্মুত তাবিল,*** পৃ. ১৫; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ৩৬৪; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫৯; আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৫৩।

[732] ইয়াহইয়া বিন আবুল খাইর আল-ইমরানি, ***আল-ইনতিসার ফির রদ্দি আলাল মুতাজিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার,*** তাহকিক : সাউদ বিন আব্দুল আজিজ আল-খালাফ (রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৯।

«**وَلَكِنْ لَا يُقَالُ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ إِنَّهَا أَعْضَاءٌ، أَوْ جَوَارِحُ، أَوْ أَدَوَاتٌ، أَوْ** أَرْكَانٌ، لِأَنَّ الرُّكْنَ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَا يَتَجَزَّأُ ﷻ، وَالْأَعْضَاءُ فِيهَا مَعْنَى التَّفْرِيقِ وَالتَّعْضِيَةِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]. وَالْجَوَارِحُ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ وَالِانْتِفَاعِ. وَكَذَلِكَ الْأَدَوَاتُ هِيَ الْآلَاتُ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا فِي جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ. **وَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانِي مُنْتَفِيَةٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهَا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى».**

“**কিন্তু এসব সিফাতকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (জাওয়ারিহ/আদাউন), বা উপকরণ, বা রুকন (স্তম্ভ) বলা যাবে না।** কেননা রুকন হলো কোনো বস্তুর অংশবিশেষ। অথচ মহান আল্লাহ হলেন অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। তিনি বিভিন্ন অংশে বিভাজ্য হন না। *‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (আদাউন)’* শব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ ও খণ্ডে বিভাজিত হওয়ার অর্থ রয়েছে। মহান আল্লাহ এ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছেন। এ অর্থেই মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।’ (*সুরা হিজর ১৫:৯১*) আর *‘জাওয়ারিহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)’* শব্দে উপার্জন ও উপকৃত হওয়ার অর্থ আছে। অনুরূপভাবে *‘উপকরণ’* হলো সেসব কলকব্জা বা সরঞ্জাম, যা কোনো কল্যাণ আনয়ন এবং অকল্যাণ দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। **এসব অর্থ মহান আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলার সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে এসব শব্দ শরিয়তে বর্ণিত হয়নি।**”[733]

[733] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৬৬।

উল্লেখ্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তের ব্যাপারে ইমাম ইবনু আবিল ইজ রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, তা মূলত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর আলোচনারই সারকথা।[734]

৮. *'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যার'* ব্যাখ্যা করতে যেয়ে **শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) লিখেছেন :**

«مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين: الأولى: **المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء** وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوّا كبيرا».

"লেখক (আত-তাহাবি) রাহিমাহুল্লাহ এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দুটি দলকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম দল হলো **মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা সম্প্রদায়; যারা আল্লাহর শরীর, দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সাব্যস্ত করে।** তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।"[735]

৯. মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিদা ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান **শাইখ মুহাম্মাদ আমান বিন আলি আল-জামি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪১৬ হি.) বলেছেন :**

«بل الذي عليه سلف هذه الأمة –وهم أعلم وأدق وأقدم– أن قدم الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه وما في معناها من هذه الصفات الخبرية صفات الله على ما يليق به سبحانه، **وليست بجوارح له**».

"বরং এই উম্মতের সালাফগণ, যাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী ও অগ্রবর্তী, তাঁরা যেই মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা হলো—আল্লাহর পা, চেহারা,

---

[734] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

[735] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা : শারহুন ওয়া তালিক*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

হাত, চোখ, আঙুল প্রভৃতি *সিফাতে খাবারিয়্যা* তথা *কুরআন-সুন্নাহনির্ভর সিফাত* মূলত আল্লাহরই সিফাত; যেগুলো তাঁর জন্য যেভাবে উপযুক্ত হওয়ার তেমনই। **কিন্তু এগুলো তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়।**"[736]

১০. সৌদি আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সাবেক সদস্য, শাইখ সালিহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৪৪৩ হি.) আল্লাহর অঙ্গ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। **তিনি বলেছিলেন :**

الشيخ: ليش يقول جارحة؟! ليش ما يقول له يدان؟! شلون يروح لجارحة ومارحة! لا يتشدق يا أخي! يتجنب كلمة. **السائل:** طيب هذا لو أصر ؟!

الشيخ: إذا أصر يكون هذا مبتدع [مبتدعا] في هذا التصرف. هل الصحابة قالوا جارحة؟! هل الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتلامذتهم هل قالوا جارحة؟!

শাইখ : "সে কেন 'অঙ্গ' বলবে? সে কেন বলছে না, তাঁর দুই হাত আছে? সে বলছে অঙ্গের কথা! ভাই, সে যেন বড়ো মুখে কথা না বলে! সে যেন এই শব্দকে বর্জন করে।" **প্রশ্নকারী :** "ভালো কথা। কিন্তু সে যদি এর ওপর অটল থাকে?" **শাইখ :** "সে যদি অটল থাকে, তাহলে এ ধরনের বাড়াবাড়ির কারণে সে বিদাতি হিসেবে পরিগণিত হবে। সাহাবিগণ কি অঙ্গ বলেছেন? ইমামগণ তথা আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ ও তাঁদের ছাত্রবর্গ কি অঙ্গ বলেছেন?!"[737]

---

[736] মুহাম্মাদ আমান বিন আলি আল-জামি, ***আস-সিফাতুল ইলাহিয়্যা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি দুয়িল ইসবাতি ওয়াত তানজিহ*** (মদিনা : আল-মাজলিসুল ইলমি বিল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩২৪।

[737] "হাল ইয়াত্তাসিফুল মাবুদু বিল জারিহা," ***মাজলিস আলুকা,*** ১৪ই অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি., https://web.archive.org/web/20210803135246/https://majles.alukah.net/t178130/.

‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ কি লাফজুন মুজমাল—যা সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না?

অনেকে মনে করেন, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে *‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’* একটি লাফজুন মুজমাল তথা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ। আর ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলির ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হচ্ছে—এগুলো আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না। আমাদের কোনো কোনো সালাফি শাইখও এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন।[738] আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এমনটি মনে করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের পূর্ববর্তী কিবার ইমামদের বক্তব্য দেখে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছি। কারণ মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে *‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’* শব্দের ব্যবহারকে ‘ব্যাখ্যাসাপেক্ষ’ বলে রায় দেওয়া এবং ‘এটা সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না’—বলা তাহকিকি দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়।

কেননা ‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ বলা হলে খারাপ অর্থ প্রকাশ পায়, যা মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। আর মহান আল্লাহকে যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতার গুণ থেকে পবিত্র ঘোষণা করা ওয়াজিব। ইতোমধ্যে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এমনকি আমরা এটাও উল্লেখ করেছি যে, ইমাম দারিমি, ইমাম তাবারি, ইমাম ইসমায়িলি, ইমাম সিজ্জি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি প্রমুখের মতো আহলুস সুন্নাহর মহামতি ইমামগণ মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে *‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’* শব্দের ব্যবহারকে ‘ব্যাখ্যাসাপেক্ষ’ বলে রায় দেননি। তাঁরা কেউ বলেননি, “আমরা মহান

---

[738] সালিহ আলুশ শাইখ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৮৬-২৮৭; আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক, ***তালিকাতুন আলাল মুখালাফাতিল আকাদিয়্যা ফি ফাতহিল বারি শারহি সহিহিল বুখারি*** (রিয়াদ : দারুত তাওহিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮৭।

আল্লাহর জন্য ‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ সাব্যস্তও করব না, আবার নাকচও করব না।” বরং তাঁরা নির্দ্বিধায় নাকচ করেছেন, নিঃসংকোচে মহান আল্লাহকে ‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

‘মহান আল্লাহর জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্তও করা যাবে না, আবার নাকচও করা যাবে না’—বলা যে সঠিক নয়, তা স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন সৌদি আরবের নামজাদা আকিদা-বিশেষজ্ঞ শাইখ ফারিস আল-আজমি হাফিজাহুল্লাহ। **তিনি বলেছেন :**

«مما يخفى على كثير من الناس في مسألة «قاعدة الألفاظ المجملة» أن: لفظ "الجوارح" ليس منها لا سيما عند ابن تيمية تـ728هـ/1328م فهو لم يجعل ولا في موضع واحد الجوارح منها مع ذكره لها ووقوفه على ذلك في كلام المثبتين للصفات مع نفي الجارحية عن بعضها، وفي كلام النفاة للصفات والجوارح، ومع ذلك لم يتعقبهم بكون هذا اللفظ مجملًا مع تعقبه لهم في لفظ الجسمية والتبعيض والتركيب والانقسام وغير ذلك، بل لما سئل عن نفي الجارحة صرح بنفيها ولم يتوقف في لفظ الجارحة كما هي قاعدة الألفاظ المجملة من أنه يمنع اللفظ ويستفصل عن المعنى. والموجب لذلك: أنه يجعل من المعنى الملازم للفظ الجارحة في اللغة ولا ينفك عنه أن فيه معنى الاكتساب والانتفاع تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، كما نبه عليه في مطبوع «الانتصار لأهل الأثر» وغيره، ولذلك في هذا الموضع من كتابه ذكر أن الجوارح أخص من الجسمية لما فيها من الانتفاع والاكتساب الذي ذكرناه.

وهذا يبين لك غلطًا ذائعًا عند بعض السلفية وبعض مخالفيهم من ظنهم أن كل ما لم يرد في الشرع من أمثال هذه الألفاظ أنه يعد من الألفاظ المجملة، وهذا غلط كما رأيت في لفظ الجارحة. وفي قاعدة الألفاظ المجملة فوائد أخرى تترك لمحلها إن شاء الله تعالى. والحاصل: أن جعل الجوارح من الألفاظ المجملة لا يكون إلا تخريجًا على أصول ابن تيمية، لكنه تخريج في مقابل النص، فهو ينص على خلافه، فافهم».

"*'ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলি সংক্রান্ত মূলনীতির'* আলোচনায় অনেকেই একটি বিষয় জানেন না। সেটা হলো—'জাওয়ারিহ তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষত ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) দৃষ্টিতে 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ নয়। কেননা তিনি তাঁর কোনো লেখাতেই 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দটিকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ তিনি জানতেন, যাঁরা আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ স্পষ্টভাবে অঙ্গকে নাকচ করেছেন, মহান আল্লাহকে অঙ্গ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তিনি এটাও জানতেন যে, যারা আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করেছে, তারা গুণাবলির সাথে সাথে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও অস্বীকার করেছে। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সমালোচনা করেননি এই বলে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ। যদিও তিনি 'জিসম/দেহ', 'তাবয়িদ' তথা 'বিভিন্ন অংশে বিভক্তি', 'তারকিব' তথা 'বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত', 'ইনকিসাম' তথা 'বিভিন্ন ভাগে বিভাজ্যতা' প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন।

বরং তাঁকে যখন 'জাওয়ারিহ/অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' নাকচ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি স্পষ্টভাবেই তা নাকচ করেছেন। 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দের ক্ষেত্রে তিনি থেমে গিয়ে এই শব্দ দিয়ে কথক কী বোঝাচ্ছেন, সেটা জানতে চাওয়ার নীতি অনুসরণ করেননি (যেমনটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে)। কেননা আরবি ভাষায় 'জাওয়ারিহ' তথা 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দের একটি অবিচ্ছেদ্য অর্থ রয়েছে। এই অর্থ কখনোই উক্ত শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অর্থটি হলো—উপার্জন করা এবং উপকৃত হওয়া। মহান আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্য থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর একাধিক গ্রন্থে এই কথা জানিয়ে সতর্ক করেছেন। সেসবের মধ্যে 'আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার' নামে মুদ্রিত গ্রন্থটি অন্যতম। এই গ্রন্থের আলোচ্য স্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'জাওয়ারিহ/অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দটি 'জিসম/দেহ' শব্দের থেকেও অধিক খাস। কারণ 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দে 'উপার্জন করা এবং উপকৃত হওয়ার' অর্থ নিহিত রয়েছে।

এই আলোচনা থেকে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কতিপয় সালাফি এবং কিছু এন্টি-সালাফির মধ্যে একটি ভুল ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মনে করে, শরিয়তে যেই পরিভাষাগুলো আসেনি, সেগুলোর সবই হলো লাফজুন মুজমাল তথা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ! অথচ আপনি নিজেই দেখলেন, 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দের ক্ষেত্রে তাদের উক্ত দাবি সঠিক নয়। 'ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলি সংক্রান্ত মূলনীতি' সম্পর্কে আরও কিছু জানার বিষয় আছে। আল্লাহ চাইলে সেসব বিষয়ে উপযুক্ত স্থানে আলোচনা করা হবে। মোটকথা, যারা 'জাওয়ারিহ/অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' শব্দটিকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁরা মূলত ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই

উক্ত বিধান উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের এই উদ্‌ঘাটন খোদ ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যের বিপরীত। তিনি তাঁদের দাবির বিপরীত কথা বলেছেন। সুতরাং, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিয়েন।”[739]

এই আলোচনার শেষে এসে বলতে চাই, মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে—সবসময় ইমাম বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৩২৯ হি.) এই কথা মনে রাখা এবং তা মেনে চলা।

ইমাম বারবাহারি বলেছেন :

«واعلم –رحمك الله–: أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهي بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب، إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله ﷺ لأصحابه. وهو –جل ثناؤه– واحد : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

“আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। জেনে রাখুন, মহান রবের ব্যাপারে বাড়তি কথা বলা নবউদ্ভাবিত কর্ম হিসেবে বিবেচিত। এটা বিদাত ও ভ্রষ্টতা। মহান আল্লাহ কুরআনে নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবিদের কাছে মহান আল্লাহর যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোনো গুণের কথা উল্লেখ করে মহান রবের শানে কথা বলা যাবে না। কেননা তিনি এক। তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।”[740]

---

[739] ফারিস বিন আমির আল-আজমি, ***মিম্মা ইয়াখফা আলা কাসিরিম মিনান্নাস ফি মাসআলাতি কায়িদাতিল আলফাজিল মুজমালা*** (টেলিগ্রাম পোস্ট, প্রকাশিত : ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.), https://t.me/IFALajmi/3236।

[740] আল-বারবাহারি, ***শারহুস সুন্নাহ,*** পৃ. ৭১।

আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করা মানে *‘আল্লাহর অঙ্গ সাব্যস্ত করা’*—দাবির খণ্ডন

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী, মহান আল্লাহর জন্য ‘অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ যখন দাবি করে, *‘সত্যসত্যই মহান আল্লাহর হাত, পা, চেহারা ও চোখ আছে,’* তখন আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের অনেকে অভিযোগ করে বসেন, সত্যসত্যই আল্লাহর জন্য এগুলো সাব্যস্ত করা মানে—আল্লাহর অঙ্গ সাব্যস্ত করা। যেমন বিখ্যাত আশারি পণ্ডিত **আল্লামা ইবনু জামাআহ আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৩ হি.) বলেছেন :**

«اعْلَم أَن الْيَد لُغَة حَقِيقَة فِي الْجَارِحَة الْمَعْرُوفَة وتستعمل مجَازًا فِي معَان مُتعَدِّدَة كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَإِذا ثَبت بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن الْجَوَارِح لما فِيهِ من التجزىء الْمُؤَدِّي إِلَى التَّرْكِيب وَجب حمل اللَّفْظ على مَا يَلِيق بجلاله تَعَالَى من الْمعَانِي المستعملة بَين أهل اللِّسَان وَهِي النِّعْمَة وَالْقُدْرَة وَالْإِحْسَان».

“জেনে রাখুন, প্রকৃত অর্থে ‘হাত’ শব্দটি সুপরিচিত অঙ্গের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রূপক অর্থে ‘হাত’ শব্দটি অন্যান্য অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনটি আমরা সামনে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেছে, মহান আল্লাহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার মানে বিভিন্ন খণ্ড বা ভাগে বিভক্ত হওয়া—যা ‘তারকিব তথা

বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার' দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু এটা আকলি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকৃত 'হাত' শব্দটির এমন অর্থ করা আবশ্যক, যা তাঁর মান-মর্যাদার সাথে মানানসই। আরবিভাষী মানুষদের মধ্যে 'হাত' শব্দের যেই অর্থগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর জন্য উপযুক্ত অর্থ হলো—নেয়ামত, ক্ষমতা ও ইহসান তথা অনুগ্রহ।"[741]

'আল্লাহর হাত' বলতে আহলুস সুন্নাহ কী বোঝায়?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী, আমরা ইবনু জামাআহ এবং তাঁর মতাবলম্বী আশারি-মাতুরিদিদের দাবিকে সঠিক মনে করি না। আরবি ভাষায় 'হাত' বলা হলেই তা 'অঙ্গের' অর্থ দেয় না। আমরা ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, মহান আল্লাহর জন্য 'অঙ্গ' সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ। অথচ মহান আল্লাহ নিজের জন্য 'দুই হাত' সাব্যস্ত করেছেন কুরআনের একাধিক জায়গায়। তাহলে 'আল্লাহর হাত' মানে কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রখ্যাত ইমাম ইবনু কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৬ হি.)। **তিনি জাহমিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডন করতে যেয়ে বলেছিলেন :**

«فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا هما اليدان اللتان تعرف الناس كذلك، قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان)».

"এখন কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আয়াতে 'আল্লাহর দুই হাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? আমরা বলব, এগুলো সেই দুই হাত, যেভাবে মানুষ

---

[741] বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম ইবনু জামাআহ আশ-শাফিয়ি, ***ইদাহুদ দালিল ফি কতয়ি হুজাজি আহলিত তাতিল,*** তাহকিক : ওয়াহবি সুলাইমান আল-আলবানি (মিশর : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

হাতকে চেনে। এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'দুই হাত মানে দুই হাত'।"[742]

এটাই আমাদের বক্তব্য। আল্লাহর হাত মানে আল্লাহর হাত। এই হাত মানে অঙ্গ না, নেয়ামত না, কুদরত-ও না। হাত মানে হাত। এ প্রসঙ্গে **ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন :**

«وقد روي في الخبر: «كلتا يديه يمين»، وليس معنى اليد عندنا الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف، فنحن نُطلقها على ماجاءت ولا نُكيّفها وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتابُ والأخبارُ المأثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة».

"হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহর উভয় হাতই ডান।' আমাদের কাছে আলোচ্য 'হাত' শব্দের অর্থ 'অঙ্গ' নয়। বরং আল্লাহর হাত একটি সিফাত; যা কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। তাই আমরা উক্ত সিফাতকে ঠিক সেভাবেই উল্লেখ করি, যেভাবে তা শরিয়তে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এই সিফাতের কোনো ধরন-প্রকৃতি নির্ধারণ করি না। আমাদের কাছে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস যেখানে এসে থেমেছে, আমরাও সেখানে থেমে যাই। বস্তুত এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শ।"[743]

আমরা মহান আল্লাহর হাতের পরিচয় হিসেবে বলি, হাত আল্লাহ তাআলার সত্তাগত গুণ। কারণ আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন, তিনি

---

[742] ইবনু কুতাইবা, ***আল-ইখতিলাফু ফিল লাফজ,*** পৃ. ৪০।

[743] আবু সুলাইমান হামাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবি, ***আলামুল হাদিস,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন সাদ আলু সুউদ (মক্কা : মারকাজুল বুহুসিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৩৪৭।

নিজের দুই হাত দিয়ে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন।[744] আরবি ভাষায় যখন কেউ বলে, 'আমার দুই হাত দিয়ে আমি এই বস্তু উত্তোলন করেছি,' কিংবা বলে, 'আমার দুই হাত দিয়ে আমি এই কাজ করেছি,' তখন হাত বলতে সত্তাগত হাতই বোঝানো হয়।[745]

সাইয়্যিদুনা ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "মহান আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে চারটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন—**(১)** আরশ, **(২)** কলম,[746] **(৩)** আদম আলাইহিস সালাম, **(৪)** জান্নাতে আদন।"[747]

মহান আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসের বৃক্ষ রোপণ করেছেন।[748] মহান আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে 'তাওরাত' কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন।[749] আল্লাহ তাআলা নিজের হাত দিয়ে নিজের ব্যাপারে লিখেছেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী থাকবে।"[750]

---

[744] সুরা সাদ ৩৮:৭৫।

[745] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪০৫।

[746] যেই কলম সমগ্র সৃষ্টিজগতের তাকদির লিপিবদ্ধ করেছে, এখানে সেই কলমের কথা বলা হয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরতুবি, ***আল-জামি লি আহকামিল কুরআন,*** খ. ২০, পৃ. ১২১।

[747] আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান,*** খ. ১, পৃ. ২৬২; বর্ণনার মান : সহিহ।

[748] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮৯; সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***আত-তালিকুল মুখতাসার আলাল কাসিদাতিন নুনিয়্যা,*** পরিশীলন : আব্দুস সালাম আস-সুলাইমান (প্রকাশনীর নাম ও তারিখবিহীন সফটকপি), পৃ. ১১৮৪।

[749] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৫২।

[750] তিরমিজি, হা. ৩৫৪৩; ইবনু মাজাহ, হা. ১৮৯; বর্ণনার মান : সহিহ।

কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে পুরো পৃথিবীকে কব্জা করবেন।[751] কেয়ামতের দিন পুরো পৃথিবী একটি রুটিতে পরিণত হবে। জান্নাতীদের মেহমানদারি করার জন্য মহান আল্লাহ নিজের হাত দিয়ে সেই রুটিকে ওলটপালট করবেন।[752]

মহান আল্লাহর দুইটি হাত আছে।[753] তাঁর দুই হাত প্রসারিত।[754] মহান আল্লাহর উভয় হাতই ডান।[755] কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর ডান হাত দিয়ে আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেবেন।[756] কেয়ামতের দিন তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে আকাশমণ্ডলীকে ধরবেন।[757]

মহান আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, রাতদিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না।[758] আর আল্লাহর অন্য হাতে আছে মিজান (দাঁড়িপাল্লা), যা কখনও তিনি নীচে নামান, আবার কখনও ওপরে ওঠান।[759] ন্যায়পরায়ণ বান্দাগণ মহান আল্লাহর ডান হাতের দিকে নুরের তৈরি মিম্বারের ওপর অবস্থান করবেন।[760]

---

[751] সুরা জুমার ৩৯:৬৭; সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩৮২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৭; আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান, ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ মিন সহিহিল বুখারি*** (মদিনা : মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪০।

[752] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫২০; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৯২।

[753] সুরা মায়িদা ৫:৬৪; সুরা সাদ ৩৮:৭৫।

[754] সুরা মায়িদা ৫:৬৪।

[755] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮২৭।

[756] সুরা জুমার ৩৯:৬৭; সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩৮২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৭।

[757] সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৮।

[758] সহিহ মুসলিম, হা. ৯৯৩।

[759] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৬৮৪ ও ৭৪১১।

[760] সহিহ মুসলিম, হা. ১৮২৭।

মহান আল্লাহর হাতের তালু আছে।[761] কোনো বান্দা যখন নিজের হালাল সম্পদ থেকে দান করে, তখন আল্লাহ সেই দানকে নিজের ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন। সেই দানটি যদি সামান্য একটি খেজুরও হয়, তবুও তা দয়াময় আল্লাহর হাতের তালুতে লালিতপালিত হতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে সেই ক্ষুদ্র দানটি পাহাড়ের চেয়েও বড়ো হয়ে যায়।[762]

মহান আল্লাহ তাঁর হাতের তালু দিয়ে তিন আঁজলা পরিমাণ 'উম্মতে মুহাম্মাদিকে' জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[763] আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, নবিজির দুই কাঁধের মাঝে মহান আল্লাহ নিজের হাতের তালু রেখেছেন। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বক্ষে আল্লাহ তাআলার 'আঙুলসমূহের অগ্রভাগের'[764] শীতলতা অনুভব করেছেন।[765]

মহান আল্লাহর হাতে আঙুল আছে।[766] সমগ্র মানবজাতির অন্তরগুলো মহান আল্লাহর আঙুলসমূহের মধ্যকার দুই আঙুলের

---

[761] সহিহ মুসলিম, হা. ১০১৪।

[762] সহিহ মুসলিম, হা. ১০১৪।

[763] তিরমিজি, হা. ২৪৩৭; ইবনু মাজাহ, হা. ৪২৮৬; ইবনু হিব্বান, হা. ৭২৪৭; বর্ণনার মান : সহিহ।

[764] হাদিসে 'আনামিল (الأنامل)' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ—আঙুলসমূহের অগ্রভাগ। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু ফারিস, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ,*** খ. ৬, পৃ. ৫৬; আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ,*** খ. ৫, পৃ. ১৮৩৬।

[765] তিরমিজি, হা. ৩২৩৫; বর্ণনার মান : ইমাম তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, তাঁর উস্তাজ ইমাম বুখারি এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

[766] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪১৫; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৬; ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।

মাঝখানে রয়েছে।[767] কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আকাশমণ্ডলীকে তাঁর এক আঙুলে ধরে রাখবেন, সকল জমিনকে আরেক আঙুলে ধরে রাখবেন, সকল পর্বতকে আরেক আঙুলে ধরে রাখবেন, সকল বৃক্ষকে আরেক আঙুলে ধরে রাখবেন, এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলকে আরেক আঙুলে ধরে রাখবেন।[768] এরপর আল্লাহ তাআলা এগুলোকে ঝাঁকুনি দেবেন, আর বলবেন, "আমিই রাজা। আমিই বাদশাহ।"[769]

মহান আল্লাহর হাতের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা ইমান রাখি। কিন্তু এগুলোকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দিই না। কেননা মহান আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই।

আলোচ্য দাবির খণ্ডনে উলামাগণের বক্তব্য :

আশারি-মাতুরিদি সম্প্রদায়ের কেউ কেউ যে দাবি করে, মহান আল্লাহর চেহারা, হাত প্রভৃতি সিফাত সাব্যস্ত করলে 'আল্লাহর অঙ্গ' সাব্যস্ত করা হয়, তাদের দাবি খণ্ডন করেছেন বিভিন্ন যুগের বিদ্বান। এমনকি আশারি সম্প্রদায়ের মুতাকাদ্দিমিন ইমামগণ পর্যন্ত এই দাবির যৌক্তিক খণ্ডন করেছেন। আমরা এখানে বিভিন্ন যুগের চারজন বিদ্বান থেকে আলোচ্য দাবিটির খণ্ডন তুলে ধরছি।

১. আশারি সম্প্রদায়ের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেছেন :**

«ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: ﴿بِيَدَيَّ﴾ يدين ليسا نعمتين؟ فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا

[767] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৫৪।

[768] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪১৪-৭৪১৫; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৮৬।

[769] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪১৩।

جارحة. قيل لهم: ولم قلتم: إنّ اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا في الخلق، فقالوا: (اليد إذ لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة). قيل لهم:

أ - إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل، فكذلك لم نجد حيًا في الخلق إلا جسمًا لحمًا ودمًا فاقضوا بذلك على الله عز وجل، وإلا بتم بقولكم ما وليس لاعتلالكم ناقضين.

ب - وإن أثبتم حيًا لا كالأحياء منا، فلم أنكرتم أن يكون يدا الله اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين، ولا جارحتين، ولا كالأيدي؟

ج - وكذلك يقال لهم: لم تجدوا مدبرًا حكيمًا إلا إنسانًا، ثم أثبتم أن للدنيا مدبرًا حكيمًا ليس كالإنسان، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم، فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا حد جنس من أجل أن ذلك خلاف الشاهد».

“তাদেরকে বলতে হবে, ‘তোমরা কেন অস্বীকার করছ যে, “আমার দুই হাত দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছি”—বলার মাধ্যমে মহান আল্লাহ “দুই হাতই” বোঝাতে চেয়েছেন, “দুই নেয়ামত” নয়?’ তারা যদি জবাব দেয়, ‘হাত যদি নেয়ামত না হয়, তাহলে সেটা অঙ্গ হয়ে যাবে!’ তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ‘তোমরা কেন বলছ যে, হাত যদি নেয়ামত না হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই অঙ্গ হয়ে যাবে?’ যদি তারা আমাদের দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের উদাহরণ এনে

যুক্তি দেয়, 'সৃষ্টিজগতে হাত যদি নেয়ামত না হয়, তাহলে তা কেবল অঙ্গই হয়।' **তাহলে তাদেরকে বলতে হবে—**

ক. তোমরা যদি সৃষ্টিজগতের দৃষ্টান্তকে আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করো, তাহলে আমরা বলব, 'সৃষ্টিজগতে আমরা এমন কোনো হায়াতসম্পন্ন সৃষ্টি দেখি না, যার রক্ত-মাংসের দেহ নেই। তাহলে তোমরা হায়াতসম্পন্ন আল্লাহর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রয়োগ করে বলে দাও, "আল্লাহরও রক্ত-মাংসের দেহ আছে!" তোমরা যদি এ কথা না বলো, তাহলে তোমাদের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়ে যাবে। তোমাদের কথার যথার্থতা থাকবে না। বরং তোমরা নিজেরাই হবে তোমাদের যুক্তির খণ্ডনকারী।'

খ. কিন্তু তোমরা যদি এমন কারও অস্তিত্ব স্বীকার করো, যিনি নিজে হায়াতসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মতো হায়াতসম্পন্ন নন। তাহলে বলো, তোমরা কেন অস্বীকার করছ যে, মহান আল্লাহ নিজের যেই 'দুই হাত' এর কথা বলেছেন, তা আল্লাহরই দুই হাত; উক্ত দুই হাত তাঁর দুই নেয়ামত নয়, দুই অঙ্গ নয়, এবং মাখলুকের হাতের মতো হাত-ও নয়?

গ. একইভাবে তাদেরকে বলতে হবে, 'তোমরা এমন কোনো প্রজ্ঞাবান পরিচালনাকারী সত্তাকে দেখতে পাবে না, যিনি কিনা মানুষ নন। এ সত্ত্বেও তোমরা স্বীকার করো, পুরো দুনিয়াকে পরিচালনাকারী প্রজ্ঞাবান একজন সত্তা আছেন, যিনি মানুষের মতো নন। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমরা "দৃশ্যমান সৃষ্টিজগত থেকে গৃহীত উদাহরণটির" বিরোধিতা করেছ, এবং নিজেদের যুক্তিকেও খণ্ডন করেছ। সুতরাং দৃশ্যমান জগতের সাথে মিল নেই বলে—তোমরা আল্লাহর দুই হাতের অস্তিত্ব অস্বীকার কোরো না; যেই দুই হাত তাঁর

দুই নেয়ামতও নয়, আবার দুই অঙ্গও নয়। তাঁর দুই হাতের সদৃশ কিছুই নেই।'"[770]

২. আশারি সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইমাম **কাদি আবু বাকর আল-বাকিল্লানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৩ হি.) বলেছেন :**

«فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا أنكرتم أَن يكون وَجهه وَيَده جارحة، إِذْ كُنْتُم لم تعقلوا يَد صفة وَوجه صفة لَا جارحة. يُقَال لَهُ: لَا يجب ذَلِك كَمَا لَا يجب إِذا لم نعقل حَيا عَالما قَادِرًا إِلَّا جسما أَن نقضي نَحن وَأَنْتُم على الله تَعَالَى بذلك».

"কেউ যদি বলে, 'আল্লাহর চেহারা ও হাতকে তোমরা অঙ্গ বলতে অস্বীকার করেছ। কারণ তোমরা কোনো হাত সিফাত কিংবা চেহারা সিফাতকে কল্পনাই করতে পারো না, যা কিনা অঙ্গ নয়!' তাহলে তাকে বলতে হবে, 'হাত বা চেহারা সিফাত সাব্যস্ত করলেই সেগুলোকে অঙ্গ বলা জরুরি হয় না। যেমনভাবে "জীবিত, জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান" বলা হলে আমরা কেবল দেহবিশিষ্ট সত্তাকেই বুঝি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা কিংবা আপনারা—চিরজীবী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দেহবিশিষ্ট বলতে বাধ্য হই না।'"[771]

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার ইমাম **আবুল কাসিম ইসমায়িল বিন মুহাম্মাদ আল-আসবাহানি আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৩৫ হি.) বলেছেন :**

«فإن قيل : لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسماً، قيل : فما تقولون يدي الله تعالى؟ فإن قالوا : نقول : بمعنى القدرة، قيل :

---

[770] আল-আশারি, ***আল-ইবানা,*** পৃ. ৪৫৮-৪৫৯।

[771] আল-বাকিল্লানি, ***তামহিদুল আওয়ায়িল,*** পৃ. ২৯৮।

فالقدرة لا تكون إلا عرضاً، ولا تعقل إلا عرضاً، فإن قالوا : إنما تكون جارحة فينا وعلى ما أولتم لا تبقى خصوصية لخلق الله آدم بقدرته فإنه خلق إبليس أيضاً وسائر الكائنات بقدرته. فجوزوا على هذا التقدير أن يقال : إن الله خلق إبليس بيديه».

"কেউ যদি বলে, 'অঙ্গ ও দেহ ছাড়া সত্যিকারের হাত হতে পারে না।' তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার হাত সম্পর্কে কী বলো?' তারা যদি উত্তর দেয়, 'আমরা আল্লাহর হাতকে আল্লাহর ক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করি।' তাহলে তাদেরকে প্রত্যুত্তরে বলতে হবে, '(তোমাদের কালামি যুক্তি অনুযায়ী) ক্ষমতাকে আরাদ বলে। আরাদ না হলে ক্ষমতাকে কল্পনাই করা যায় না।'[772] তারা যদি বলে, 'এটা তো আমাদের ক্ষেত্রে অঙ্গই হয়।'[773] আর তোমরা যে ব্যাখ্যা করেছ, 'আল্লাহর হাত মানে তাঁর ক্ষমতা।' এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে আদম আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করার কোনো স্বাতন্ত্র্যই আর থাকে না। যেহেতু আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজের দুই হাত দিয়ে আদম আলাইহিস

[772] ইলমুল কালাম অনুযায়ী, আরাদ (عَرَض) হলো সেই জিনিস, যা জিসম তথা দেহে অবস্থান করে। সুতরাং আরাদ হলো জিসমের বৈশিষ্ট্য। ইমাম আসবাহানি বলতে চাইছেন, কালামিদের যুক্তি মোতাবেক—আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করলে যদি আল্লাহর অঙ্গ সাব্যস্ত করা হয়ে যায়; তাহলে একইভাবে আল্লাহর ক্ষমতা সাব্যস্ত করলে আল্লাহর জিসম/দেহ সাব্যস্ত করাও জরুরি হয়ে যাবে! কারণ ক্ষমতা হলো আরাদ—যা দেহে অবস্থান করে। অথচ কালামিরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে, মহান আল্লাহর ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা সাব্যস্ত করলে যদি দেহ সাব্যস্ত করা অপরিহার্য না হয়, তাহলে আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করলেও তাঁর অঙ্গ সাব্যস্ত করা অপরিহার্য হবে না।

[773] মূল গ্রন্থে বাক্যটি এভাবেই এসেছে। কিন্তু আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এটি একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। **সম্ভবত বাক্যটি এরকম হবে**—তারা যদি বলে, 'ক্ষমতা আমাদের ক্ষেত্রে আরাদ, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়,' তাহলে আমরা বলব, 'একইভাবে হাত আমাদের ক্ষেত্রে অঙ্গ, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়।'

সালামকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের দাবি অনুযায়ী, এখানে হাত মানে যদি ক্ষমতা হয়, তাহলে আদম আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করার কোনো স্বাতন্ত্র্য অবশিষ্ট থাকে না। কেননা ইবলিস ও অন্যান্য সকল সৃষ্টিকেও তো আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে তোমাদের আলোচ্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী তোমরা এই কথা বলার অনুমোদনও দিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা নিজের দুই হাত দিয়ে ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন!"[774]

৪. ইমাম আসাবাহানির উপরোদ্ধৃত বক্তব্য বর্ণনা করার পর **ইমাম শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন :**

«ولم قلتم أيضاً : إن اليد إنما تكون حقيقة هذه الجارحة، بل إنما اليد لفظ مشترك وهي بحسب ما تضاف إليه، ومن جنس ما توصف بها، فإن كان الموصوف بها حيوانا كانت جارحة، وإن كان تمثالاً من صفراء وحجر كانت من صفراء وحجر، وإن كان تمثالاً عرضا في حائط كانت عرضاً، وإن كان ليس كمثله شيء وليس بجسم كانت ليس كمثلها شيء وليست بجسم.

فإذا قلت مثلاً : عندي صنم من نحاس له يدان ورجلان، هل بقي يفهم أن يديه ورجليه جوارح لحم ودم؟! وإذا قلت : عندي نحت من خشب له رجلان هل يسبق إلى الذهن أنهما جارحتان أيضا؟! وإذا

---

[774] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***ইসবাতুল ইয়াদি লিল্লাহি সুবহানাহু,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন সালিহ আল-বাররাক (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, শাইখ বাররাকের তাহকিকে *'মাজমুউন ফিহি সালাসু রাসায়িল'* নামে প্রকাশিত, তাবি), পৃ. ৪২।

قلت : ما أجسر يد زيد على الكتابة، هل الظاهر من هذا الكلام أن يديه غير جارحتين؟ أم هل إذا قلت : إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وليس بجسم ولا عرض وخلق آدم بيديه، هل يفهم ذو لب أن يديه الكريمتين جسم أو عرض أو جارحة أو شبهها شيء.

وكذلك إذا قلت : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل»، «وإن الله ليس بأعور»، «أو حتى يضع رب العزة فيها قدمه -يعني جهنم-»، «أو عجب ربنا من شاب ليست له صبوة». فكما أنه سبحانه وتعالى لا يتصور في الذهن ولا يمثل في العقل، فكذلك يداه وسائر صفاته لا تصور في الذهن ولا تمثل في العقل.

وكذلك إذا قلت : فلان صاحب يد في المدينة، هل بقي مقصود المتكلم أو السابق إلى ذهن السامع أنها الجارحة في هذا الموطن، أو لما قال الله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق : ٣٧]، هل يفهم منه أن المراد المضغة؟ بل إنما يفهم أن المقصود ما نتج عن اليد والقلب من الصفات المحمودة من التمكن في البلد ونحوه.

وإذا كان كذلك فصفة كل شيء بحسبه؛ فإن سبق إلى ذهننا كيفية الموصوف وتصورناه تصورنا صفاته، وإن لم يسبق إلى ذهننا ولم نتصوره لم يسبق إلى ذهننا فننفيه ولم نتصوره، هذا لا شك فيه. فإن قيل : قد صار العرف أن اليد هي الجارحة المعهودة، قلنا : وكذلك

قد صار العرف أن العلم والسمع والبصر أعراض قائمة بأجسام، فما الفرق؟».

“তোমরা কেন বলো যে, প্রকৃত অর্থে ‘হাত’ শব্দ বলা হলে কেবল অঙ্গই বোঝায়? বরং ‘হাত’ একটি বহুঅর্থবোধক শব্দ। যেই সত্তার সঙ্গে ‘হাত’ যুক্ত হয়, সেই সত্তার ধরন অনুযায়ী ‘হাত’ শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয়। যার ‘হাত আছে’ বলা হচ্ছে, সে যদি সৃষ্টিজীব হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে হাতটি হবে একটি অঙ্গ। পক্ষান্তরে সে যদি তামা বা পাথরের তৈরি কোনো মূর্তি হয়, তাহলে তার হাত-ও তামা বা পাথরের তৈরি বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে যার ‘হাত আছে’ বলা হচ্ছে, সেটা যদি হয় দেওয়ালের ওপরে আঁকা কোনো ‘আরাদ’ ছবি, তাহলে সেই অঙ্কিত হাতটিও হবে একটি আরাদ।[775]

একইভাবে যার ‘হাত আছে’ বলা হচ্ছে, তিনি যদি হন সেই সত্তা, যার কোনো সদৃশ নেই এবং যিনি দেহবিশিষ্ট নন, তাহলে তাঁর হাত-ও হবে সাদৃশ্যহীন—যা দেহবিশিষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি বললাম, ‘আমার কাছে তামার তৈরি একটি মূর্তি আছে, যার দুটি হাত ও দুটি পা আছে।’ আমার এই কথা থেকে কি এটা বোঝা হবে যে, তার হাত-পা রক্ত-মাংসের অঙ্গ? তদ্রূপ আমি যদি বলি, ‘আমার কাছে কাঠের তৈরি একটি ভাস্কর্য আছে, যার দুটি পা আছে।’ তখন কি এটা মনে হবে যে, উক্ত পা-দুটিও দৈহিক অঙ্গ? একইভাবে আমি যদি বলি, ‘লেখার ব্যাপারে জাইদের হাত কতইনা সাহসী!’ তখন কি এই কথার প্রকাশ্য অর্থ দাঁড়াবে, জাইদের দুই হাত অঙ্গ নয়?! তাহলে আমি যখন বলব, ‘আল্লাহ তাআলার সদৃশ কিছুই নেই। তিনি জিসম নন,

[775] আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, আরাদ হলো সেই জিনিস, যা জিসম তথা দেহে অবস্থান করে।

আরাদ-ও নন। তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন।' তখন কি কোনো বিবেকবান মানুষ এরকমটা বুঝবে যে, আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত দুই হাত—জিসম, কিংবা আরাদ, অথবা অঙ্গ, কিংবা অঙ্গের মতো কিছু?!

ঠিক তেমনি, যখন বলা হয়, হাদিসে এসেছে, 'বান্দাদের অন্তর আল্লাহ তাআলার দুই আঙুলের মাঝে রয়েছে।' হাদিসে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা "এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া কানা" নন।' হাদিসে আরও এসেছে, 'আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত জাহান্নামের ওপরে তাঁর পা রাখবেন।' হাদিসে আরও বলা হয়েছে, 'আমাদের রব এমন যুবককে দেখে আশ্চর্য হন, প্রবৃত্তিগত পাপের প্রতি যার কোনো ঝোঁক নেই।' (তখন কেউ কি এসব হাদিস শুনে আল্লাহকে সৃষ্টিজীবের মতো কল্পনা করে?) আল্লাহ তাআলাকে যেভাবে মনের মধ্যে কল্পনা করা যায় না এবং বিবেক দিয়ে কারও সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যায় না; ঠিক তেমনি আল্লাহর দুই হাত এবং তাঁর অন্যান্য সকল সিফাতকেও মনের মধ্যে কল্পনা করা যায় না, বিবেক দিয়ে কারও সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যায় না।

একইভাবে আপনি যদি বলেন, 'অমুক ব্যক্তি এই শহরে "সাহিবু ইয়াদ তথা হাতওয়ালা"।' তাহলে কি এই স্থলে আপনার কথার উদ্দেশ্য এটা দাঁড়াবে যে, অমুক ব্যক্তি এই শহরে অঙ্গওয়ালা? কিংবা আপনার কথা শুনে শ্রোতার মনে প্রথমেই এই মর্মার্থ উদিত হবে যে, অমুক ব্যক্তি এই শহরে অঙ্গওয়ালা? আল্লাহ তাআলা যখন বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে তার জন্য উপদেশ; যার অন্তর আছে।' (*সুরা কাফ ৫০:৩৭*) তখন কি এখান থেকে এটা বোঝা হয় যে, আয়াতে অন্তর মানে মাংসপিণ্ড?! বরং এসব কথা বলে বোঝানো হয়, 'হাত' ও 'অন্তর' থেকে যেসব

প্রশংসনীয় গুণ উৎপন্ন হয়, এখানে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (আরবি ভাষায়) *'অমুক ব্যক্তি এই শহরে হাতওয়ালা'* বলে বোঝানো হয়—উক্ত ব্যক্তি এই শহরে প্রভাবশালী বা ক্ষমতাবান।

বিষয়টি যখন এমনই, তখন মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক সত্তার গুণাবলি তার ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার গুণাবলি বর্ণনা করা হচ্ছে, তার ধরন-প্রকৃতি যদি আমাদের মনে আগে থেকেই উপস্থিত থাকে এবং আমরা তাকে কল্পনা করতে পারি, তাহলে আমরা তার গুণাবলিও কল্পনা করতে পারি। পক্ষান্তরে তার ধরন-প্রকৃতি যদি আমাদের মনে আগে থেকেই উপস্থিত না থাকে, এবং আমরা তাকে কল্পনা করতে না পারি, তাহলে তার গুণাবলি বিষয়ে আমরা (নিজে থেকে) স্বীকৃতি দিতে পারি না এবং তার গুণাবলি কল্পনাও করতে পারি না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি বলা হয়, 'প্রচলিত ভাষারীতিতে "হাত" বলতে সুপরিচিত অঙ্গকেই বোঝানো হয়।' তাহলে আমরা জবাবে বলব, 'একইভাবে প্রচলিত ভাষারীতিতে "জ্ঞান", "শোনা" ও "দেখা" বলতে আরাদ বোঝানো হয়, যেই আরাদগুলো দেহে অবস্থান করে। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়?'"[776]

[776] আজ-জাহাবি, ***ইসবাতুল ইয়াদি লিল্লাহ,*** পৃ. ৪২-৪৪।

আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা

ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ সিফাত বিষয়ক আলোচনায় মহান আল্লাহর হাত সিফাতের কথা বলার পর উল্লেখ করেছেন, দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। সকল সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা হলো—মহান আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। কিন্তু তিনি কীভাবে আরোহণ করেছেন, তা আমরা জানি না। আর তাঁর আরোহণ কোনো মাখলুকের আরোহণের মতো নয়। আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ মূলত আল্লাহর *'সিফাতে ফিলিয়্যা'* তথা *'কর্মগত গুণ।'* তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পরে মহান আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যে আরশের ওপর আরোহণ করেছেন—তা কুরআন ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআন থেকে দলিল :

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾.

"দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।"[777]

২. পূর্বোক্ত আয়াতটি ছাড়াও কুরআনের মোট ছয়টি আয়াতে বলা হয়েছে—*মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পরে আরশের ওপর ওঠেছেন।* **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾.

[777] সুরা তহা ২০:৫।

“এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।”[778]

ইস্তিওয়া আলাল আরশ তথা *আরশের ওপর আরোহণ* সিফাতের কথা ইমাম নাসায়ি সংকলিত *‘আস-সুনানুল কুবরা’* গ্রন্থের একটি হাদিসেও এসেছে। কিন্তু সেই হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে লম্বা ও জটিল বিতর্ক আছে। তাই এ বিষয়ক হাদিস উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

ইজমা থেকে দলিল :

১. সালাফদের যুগের ইমাম **ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

«قَالَ الله تَعَالَى ﴿الرَّحْمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ **إِجْمَاع أهل الْعلم أَنه فَوق الْعَرْش اسْتَوَى** وَيعلم كل شَيْء فِي أَسْفَل الأَرْض السَّابِعَة».

“মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘রহমান আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।’ **আহলুল ইলম তথা আলিমগণের সর্বসম্মত মত হলো—আল্লাহ আরশের ওপরে আরোহণ করেছেন,** এবং তিনি সপ্তম জমিনের সর্বনিম্ন স্থলেরও সকল কিছু সম্পর্কে অবগত আছেন।”[779]

ইমাম ইসহাকের এই বক্তব্য উল্লেখ করার পর **ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) মন্তব্য করেছেন :**

«اسْمَع وَيحك إِلَى هَذَا الإِمَام كَيفَ نقل **الْإِجْمَاع** على هَذِه الْمَسْأَلَة كَمَا نَقله فِي زَمَانه قُتَيْبَة الْمَذْكُور».

---

[778] সুরা আরাফ ৭:৫৪, সুরা ইউনুস ১০:৩, সুরা রাদ ১৩:২, সুরা ফুরকান ২৫:৫৯, সুরা সাজদা ৩২:৪, সুরা হাদিদ ৫৭:৪।

[779] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৮৭; আজ-জাহাবি, ***আল-উলু,*** খ. ১, পৃ. ১৭৯; ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ৩৪১।

“আপনাকে সাবধান করছি! এই ইমামের কথা শুনুন। কীভাবেই না তিনি এই মাসআলায় **ইজমা** বর্ণনা করেছেন! যেমনভাবে তাঁরই যুগের ইমাম কুতাইবা-ও উক্ত ইজমা বর্ণনা করেছিলেন; যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।”[780]

২. ইমাম আবু উমার আত-তালামানকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেছেন :

«**أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ** عَلَى أَنَّ مَعْنَى ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ: أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ وَأَنَّ اللَّهَ **فَوْقَ السَّمَوَاتِ بِذَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ كَيْفَ شَاءَ.** وَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ إنَّ الِاسْتِوَاءَ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ الْمَجِيدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لَا عَلَى الْمَجَازِ».

“**আহলুস সুন্নাহর মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন,** আল্লাহ যে বলেছেন, *‘আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন,’* কুরআনের এ ধরনের আয়াতের অর্থ—আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান। **আর আল্লাহ সত্তাগতভাবে আসমানসমূহের ওপরে আছেন; তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।** মহান আল্লাহ যে বলেছেন, *‘রহমান আরশের ওপর ওঠেছেন,’* এই আয়াতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে—মহিমান্বিত আরশের ওপর আল্লাহ তাআলা সত্যিকার অর্থেই আরোহণ করেছেন, রূপক অর্থে নয়।”[781]

---

[780] আজ-জাহাবি, ***আল-উলু,*** খ. ১, পৃ. ১৭৯।

[781] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ২১৯-২২০; আজ-জাহাবি, ***আল-উলু,*** খ. ১, পৃ. ২৪৬।

৩. ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৩০ হি.) বলেছেন :

«طريقتنا طَرِيقَة السّلف المتبعين للْكتاب وَالسّنة وَ**إِجْمَاع الْأمة**. وَمِمَّا اعتقدوه : ... وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي «الْعَرْشِ وَاسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ» يَقُولُونَ بِهَا وَيُثْبِتُونَهَا مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَالْخَلْقَ بَائِنُونَ مِنْهُ؛ لَا يَحِلُّ فِيهِمْ وَلَا يَمْتَزِجُ بِهِمْ **وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ** دُونَ أَرْضِهِ».

“আমাদের মতাদর্শ হলো সালাফদের মতাদর্শ—যাঁরা কিতাব, সুন্নাহ এবং **উম্মতের ইজমা অনুসরণ করতেন।** তাঁরা যেসব আকিদা পোষণ করতেন তা হলো— ... নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরশ এবং আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সম্পর্কিত যেই হাদিসগুলো প্রমাণিত, তাঁরা সেগুলো বলেন এবং সাব্যস্ত করেন; কোনোরূপ তাকয়িফ (ধরন-নির্দিষ্টকরণ) ও তামসিল (সাদৃশ্যদান) না করে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, এবং সৃষ্টিকুলও তাঁর থেকে আলাদা; তিনি মাখলুকের ভেতরে প্রবেশ করেন না এবং তাদের সাথে মিশ্রিতও হন না। তিনি তাঁর জমিনে নন, **বরং তাঁর আসমানে স্বীয় আরশের ওপর আরোহণ করে আছেন।**”[782]

৪. ইমাম ইবনু কাসির আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) ইস্তিওয়া সিফাতের তাফসিরে সালাফদের যুগের ইমামগণের নাম উল্লেখ করে তাঁদের আকিদা বর্ণনা করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

---

[782] ইবনু তাইমিয়া, ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা,*** খ. ৫, পৃ. ৬৪; আজ-জাহাবি, ***আল-উলু,*** খ. ১, পৃ. ২৪৩; ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪৩৮।

«وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، ليس هذا موضع بسطها. وإنما نسلك فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. وَهُوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ، مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ؛ وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيٌّ عَنِ اللَّهِ، لا يشبهه شيء من خلقه، ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بَلِ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْأَئِمَّةُ، مِنْهُمْ نُعَيْمُ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَشْبِيهٌ. فَمَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ الصَّرِيحَةُ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِ الله، وَنَفَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى النَّقَائِصَ، فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى».

“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।’ এ বিষয়ে মানুষদের বহু মতামত রয়েছে, যা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। আমরা এ ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণের মতাদর্শ অনুসরণ করি। যেমন ইমাম মালিক, আল-আওজায়ি, আস-সাওরি, লাইস ইবনু সাদ, আশ-শাফিয়ি, আহমাদ (বিন হাম্বাল), ইসহাক বিন রাহুইয়াহ এবং অতীত ও বর্তমানের অন্যান্য মুসলিম ইমামগণের মতাদর্শ। তাঁদের মতাদর্শ ছিল—এসব বর্ণনা যেভাবে এসেছে, সেভাবেই তা গ্রহণ করা; কোনো রকম ধরন-নির্ধারণ, সাদৃশ্যপ্রদান এবং অস্বীকার না করে। আর সাদৃশ্যবাদী মুশাব্বিহাদের অন্তরে যেই বাহ্যিক ধারণা উদিত হয়, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না, বরং নাকচ করতে হবে। আল্লাহর

কোনো সৃষ্টি তাঁর অনুরূপ নয়। বস্তুত তাঁর সদৃশ কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

বরং আলোচ্য বিষয়টি ঠিক এরকম, যেমনটি ইমামগণ বলেছেন। যাঁদের একজন হলেন ইমাম বুখারির শিক্ষক নুআইম বিন হাম্মাদ আল-খুজায়ি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য দেয়, সে কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহ নিজেকে যেই গুণে বিশেষিত করেছেন, সেটা যেই ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেও কাফির হয়ে যায়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তাকে যেসব গুণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই।'

সুতরাং, যেই সিফাত সাব্যস্ত করে সুস্পষ্ট আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সেই সিফাতকে আল্লাহর জন্য এমনভাবে সাব্যস্ত করে, যা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এবং মহান আল্লাহকে যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পবিত্র ঘোষণা করে; সে-ই হেদায়েতের পথ অবলম্বন করেছে।"[783]

[783] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৩, পৃ. ৩৮৩।

সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতে আরশের পরিচয়

আরশের আভিধানিক অর্থ—রাজাসন (throne); তথা রাজার আসন। আহলুস সুন্নাহর তাফসিরগ্রন্থ *'তাফসিরুত তাবারিতে'* **ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন :**

«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ الْمَلَائِكَةَ مُحْدِقِينَ مِنْ حَوْلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، وَيَعْنِي بِالْعَرْشِ: السَّرِيرَ».

"মহান আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি ফেরেশতাবর্গকে দেখতে পাবে, তারা রহমানের আরশকে বেষ্টন করে আছে। এখানে *'আরশ'* বলতে বোঝানো হয়েছে রাজাসন।"[784]

এরপর ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ তাবেয়ি তাফসিরকারক ইমাম সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১২৮ হি.) বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। **বর্ণিত হয়েছে :**

عَنِ السُّدِّيِّ، ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] قَالَ: «مُحْدِقِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، قَالَ: الْعَرْشُ: السَّرِيرُ».

সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আর তুমি ফেরেশতাবর্গকে দেখতে পাবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে আছে।" সুদ্দি বলেছেন, "এর মানে তাঁরা আরশের চারপাশ বেষ্টন করে আছেন। আর আরশ মানে রাজাসন।"[785]

আরশের পরিচয় দিতে যেয়ে ইমাম ইবনু কাসির আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) এবং ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :

---

[784] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ২০, পৃ. ২৭১।

[785] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ২০, পৃ. ২৭১।

«هُوَ: سَرِيرٌ ذُو قَوَائِمَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَهُوَ كَالْقُبَّةِ عَلَى الْعَالَمِ، وَهُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ».

“আরশ হলো এমন এক রাজাসন, যার পায়া আছে এবং ফেরেশতাগণ তা বহন করেন। এটি সৃষ্টিজগতের ওপর গম্বুজের মতো, এবং এটি সকল সৃষ্টির ছাদ।”[786]

আরশের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহর আরশের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

প্রথম বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহ তাআলার আরশের পায়া বা খুঁটি আছে। **রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ».

“আমি তখন (কেয়ামতের দিন) দেখতে পাব, মুসা আলাইহিস সালাম আরশের পায়াসমূহের একটি পায়া ধরে আছেন।”[787]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহর আরশ বহনযোগ্য। নির্দিষ্টসংখ্যক সম্মানিত ফেরেশতা আরশ বহন করেন। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

---

[786] ইবনু কাসির, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,*** খ. ১, পৃ. ২০; ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৬৬।

[787] সহিহুল বুখারি, হা. ২৪১২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৩৭৪।

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

“যারা আরশ বহন করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি ইমান রাখে; আর যারা ইমান এনেছে তাদের জন্য তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে।”[788]

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾.

“সেদিন তোমার রবের আরশ বহন করবে আটজন (ফেরেশতা)।”[789]

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহর আরশ জান্নাতুল ফিরদাউসের ওপরে অবস্থিত। **রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ».

“তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটা সবচেয়ে উত্তম এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। এর ওপরে রয়েছে রহমানের আরশ।”[790]

---

[788] সুরা গাফির/মুমিন ৪০:৭।

[789] সুরা হাক্কাহ ৬৯:১৭।

[790] সহিহুল বুখারি, হা. ২৭৯০।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য :

আরশের ছায়া আছে, যেই ছায়াতলে কতিপয় বান্দার আশ্রয় মিলবে। **রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ».

"আল্লাহর জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারীগণ আরশের ছায়ায় অবস্থান করবেন এমন এক দিন—যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।"[791]

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য :

আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে আরশ পানির ওপরে ছিল এবং এখনও রয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেন :**

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾.

"আর তিনিই আসমানরাজি ও জমিন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর আরশ ছিল পানির ওপরে।"[792]

হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, রাতদিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না। তোমরা কি দেখ না?

---

[791] মুসনাদ আহমাদ, হা. ২২৮৩৪, বর্ণনার মান : সহিহ।

[792] সুরা হুদ ১১:৭।

আসমান-জমিন সৃষ্টি করার সসময় থেকে নিয়ে তিনি ব্যাপক খরচ করা সত্ত্বেও তাঁর ডান হাতে যা আছে তাতে কোনো কমতি আসে না! আর তাঁর আরশ হলো পানির ওপরে।”[793]

মহান আরশের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আরশ আল্লাহ তাআলার একটি মহিমান্বিত সৃষ্টি। আরশ—সমগ্র সৃষ্টি নয়; বরং মহান আল্লাহর বিরাট সৃষ্টিজগতের একটি অংশ, যা অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। আরশের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি এই সারকথা মাথায় রাখলে আরশের ব্যাপারে বাতিলপন্থিদের ভ্রান্ত মতগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

---

[793] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪১৯; সহিহ মুসলিম, হা. ৯৯৩; আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১৩, পৃ. ৪১০।

পথভ্রষ্ট ফের্কাদের মতে আরশের পরিচয়

পথভ্রষ্ট ফের্কাদের থেকে আরশের পরিচয় বিষয়ে অনেকগুলো অভিমত বর্ণিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিমত তিনটি—

প্রথম মত : আরশ মানে রাজত্ব। জাহমি,[794] মুতাজিলি,[795] আশারি[796] ও মাতুরিদি[797] সম্প্রদায়ের অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের এই মত কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ রাজত্বের পায়া থাকে না, রাজত্বকে বহন করা যায় না। আর সকল সৃষ্টিই মহান আল্লাহর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আরশ আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টি নয়, বরং তাঁর সৃষ্টিকুলের একটি অংশ।

দ্বিতীয় মত : আরশ এমন নভস্থিত গোলক (celestial sphere), যা পুরো সৃষ্টিজগৎকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। মুসলিম দাবিদার ফিলোসফাররা এই মত ব্যক্ত করেছেন। গ্রিক ফিলোসফাররা এটাকে 'নবম গোলক (الفلك التاسع)', অথবা 'অ্যাটলাস স্ফিয়ার (الفلك الأطلس)' বলতেন।[798]

---

794 আদ-দারিমি, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা,*** পৃ. ৩৩।

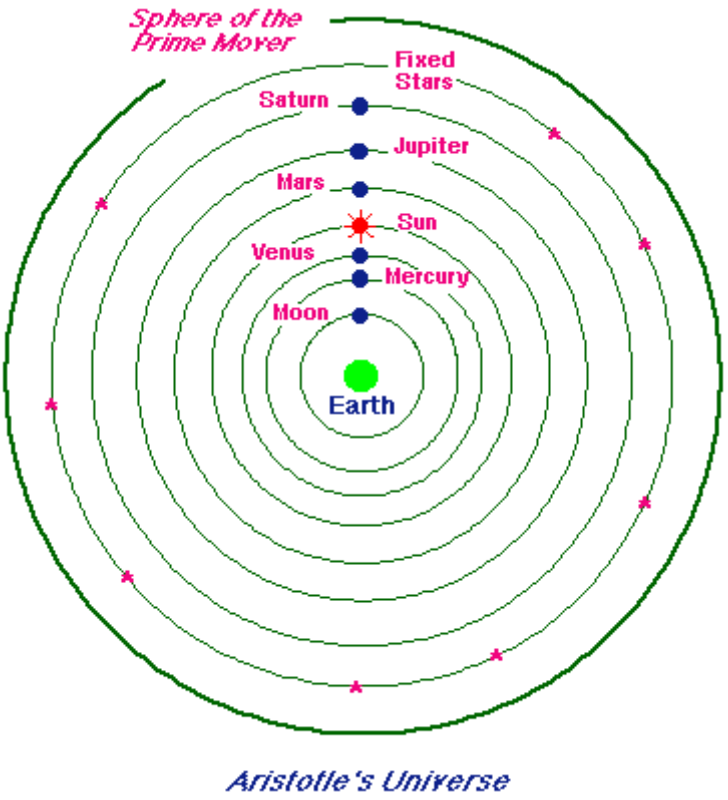
795 মাহমুদ বিন আমর বিন আহমাদ আজ-জামাখশারি, ***আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিদিত তানজিল*** (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫২।

796 সায়িদ বিন আব্দুল লাতিফ ফুদা, ***আশ-শারহুল কাবির আলাল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*** (বৈরুত : দারুজ জাখায়ির, অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি), পৃ. ৮৬৩।

797 আল-মাতুরিদি, ***তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ৪১১, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩।

798 আবু আলি হুসাইন ইবনু সিনা, ***তিসউ রাসায়িল ফিল হিকমাতি ওয়াত তাবিয়িয়্যাত*** (কায়রো : দারুল আরব, ২য় প্রকাশ, তাবি), পৃ. ১২৮।

এদের আকিদা বোঝার জন্য নয়টি গোলকের একটি ডায়াগ্রাম তুলে দিচ্ছি—



ডায়াগ্রামে লেখা *'Sphere of the Prime Mover'* বা সর্বশেষ গোলকটিই হলো অ্যাটলাস স্ফিয়ার বা নবম গোলক।[799] এটাকেই তারা আরশ বলে থাকে! নয়টি গোলকের ডায়াগ্রাম এবং এসবের আরবি বিবরণী *'ইখওয়ানুস সাফা'* নামক ফিলোসফারদের একটি দলের লেখা *'রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা ওয়া খিল্লানিল ওয়াফা'* কিতাবে বিদ্যমান আছে।[800]

---

[799] ডায়াগ্রামের ছবিটি এই ওয়েবপেজে অ্যাভেইলেবল : https://cosmosatyourdoorstep.com/2017/09/15/aristotles-universe/.

[800] ইখওয়ানুস সাফা, ***রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা ওয়া খিল্লানিল ওয়াফা,*** সম্পাদনা : খাইরুদ্দিন আজ-জিরিকলি (উইনজোর : হিন্দাউয়ি ফাউন্ডেশন, প্র. ২০১৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৮।

তাদের এই মত কুরআন-সুন্নাহর সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। কারণ নভস্থিত গোলকের পায়া থাকে না। আর কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আরশের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে এসব গোলকতত্ত্বের কোনো সম্পর্কই নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুমাল্লাহ ফিলোসফারদের এই মতের প্রামাণ্য খণ্ডন করছেন।[801]

তৃতীয় মত : আরশ একটি জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বজাগতিক অবয়ব, যা সকল অবয়বকে পরিবেষ্টন করে আছে। অনেক আশারি বিদ্বান এই মত ব্যক্ত করেছেন।[802]

---

[801] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আর-রিসালাতুল আরশিয়্যা*** (কায়রো : আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৪-২১; ইবনু কাসির, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,*** খ. ১, পৃ. ২০।

[802] আব্দুল গনি বিন ইসমায়িল আন-নাবুলসি, ***রায়িহাতুল জান্নাহ শারহু ইদাআতিদ দুজনাহ ফি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ*** (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তাবি), পৃ. ১৪০; আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ২৯৬।

সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মতে ‘ইস্তিওয়া’ শব্দের অর্থ

আলোচ্য *‘ইস্তিওয়া আলাল আরশ’* তথা *‘আরশের ওপর আরোহণ’* সিফাতের কী অর্থ করেছেন সালাফগণ, তা জানা জরুরি। যাতে করে আমরা বাতিলপন্থিদের অপব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। তবে সালাফগণ থেকে ইস্তিওয়া সিফাতের অর্থ জানার আগে আমরা আরবি ভাষায় ইস্তিওয়া শব্দের ব্যবহারবিধি জানব। আরবি ভাষায় *‘ইস্তিওয়া’* ক্রিয়ামূলের ক্রিয়া দুইভাবে আসে। যথা : **(১)** অব্যয়মুক্ত হয়ে আসে, **(২)** অব্যয়যুক্ত হয়ে আসে।[803]

এক. ‘ইস্তিওয়া’ শব্দটি অব্যয় (preposition) ছাড়া ব্যবহৃত হলে—পরিপূর্ণ হওয়া, পূর্ণাঙ্গ হওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। **যেমন আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

“আর যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, এবং **পরিণত হলো**, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।”[804]

দুই. ‘ইস্তিওয়া’ শব্দটি অব্যয়যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। আরবি ভাষায় ‘ইস্তিওয়া’ শব্দ কেবল তিনটি অব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম অব্যয় : ইলা (إلى); *ইলা* অব্যয়যুক্ত ‘ইস্তিওয়া’ শব্দের দুটো অর্থ হতে পারে— **(১)** ওঠা বা আরোহণ করা, **(২)** ইচ্ছা করা। কুরআনে ‘আসমান-সৃষ্টির ইচ্ছা করা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[805] **যেমন আল্লাহ বলেছেন :**

---

[803] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৩৭২।

[804] সুরা কাসাস ২৮:১৪।

[805] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ১, পৃ. ১০১।

﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾.

"এরপর আল্লাহ আসমান-সৃষ্টির **ইচ্ছা করলেন/আসমানের ওপরে আরোহণ করলেন।**"[806] আহলুস সুন্নাহর মুফাসসিরগণ এই আয়াতের তাফসিরে উল্লিখিত দুটো অর্থই উল্লেখ করেছেন।[807]

দ্বিতীয় অব্যয় : আলা (على); আরবি ভাষায় *'আলা'* অব্যয়যুক্ত 'ইস্তিওয়া' শব্দের মৌলিক তিনটি অর্থ হয়— **(১)** ওঠা বা আরোহণ করা, **(২)** ওপরে অবস্থান নেওয়া, বা থিতু হওয়া, বা স্থির হওয়া, **(৩)** বসা বা উপবেশন করা। যেমন নুহ আলাইহিস সালামের জাহাজের ব্যাপারে **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾.

"আর জাহাজ এসে জুদি পর্বতের ওপর **স্থির হলো।**"[808]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন :

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾.

"যাতে করে তোমরা বাহনের ওপর **স্থির হয়ে বসতে পার।**"[809]

তৃতীয় অব্যয় : ওয়াও (الواو); *'ওয়াও'* অব্যয়যুক্ত ইস্তিওয়া শব্দের অর্থ হয়—সমমানের হওয়া বা সমান-সমান হওয়া। যেমন আরবি ভাষায় বলা হয়ে থাকে :

«اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ».

"পানি ও কাঠ **সমান-সমান** হয়ে গেছে।"[810]

---

[806] সুরা বাকারা ২:২৯, সুরা ফুসসিলাত ৪১:১১।

[807] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ১, পৃ. ৪৫৪-৪৫৭।

[808] সুরা হুদ ১১:৪৪।

[809] সুরা জুখরুফ ৪৩:১২।

[810] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৩৭২।

আরবি ভাষায় ইস্তিওয়া শব্দের ব্যবহারবিধি জানার উপকারিতা হচ্ছে—জাহমি মতাদর্শের লোকেরা যেন ধোঁকা দিতে না পারে। এরা অনেকসময় বলে বসে, "ইস্তিওয়া শব্দের পনেরোটা অর্থ! তাহলে আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনটা নিব?" এদেরকে আমরা বলব, আমরা তো সকল ইস্তিওয়া নিয়ে কথা বলছি না। তোমাদের সাথে আমাদের বিরোধ সুরা তহার ৫ নং আয়াত নিয়ে, সমমনা আরও ছয়টি আয়াত নিয়ে—*'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'* সিফাত নিয়ে; অর্থাৎ *'আলা'* অব্যয়যুক্ত ইস্তিওয়া নিয়ে। ইস্তিওয়া শব্দের সাথে *'আলা'* অব্যয় সংযুক্ত হয়ে আসলে সেটার অর্থ অবশ্যই *'ওঠা ও আরোহণ করা'* হবে। সকল আরবি ভাষাবিদ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।[811]

এমনকি সালাফদের থেকে এ বিষয়ে যতগুলো তাফসির সাব্যস্ত হয়েছে, সবগুলোতেই ওঠার অর্থ আছে। এজন্যই আহলুস সুন্নাহর সুপ্রাচীন তাফসিরকারক ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করা প্রসঙ্গে যত জায়গায় আলোচনা করেছেন, সব জায়গায় *'ওঠা এবং আরোহণ করা'* অর্থ দিয়ে উক্ত সিফাতের তাফসির করেছেন।[812] আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ সরাসরি মহান আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' সিফাতের অর্থ করেছেন। *'সহিহুল বুখারিতে'* দুজন বিখ্যাত তাবেয়ি আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং মুজাহিদ ইবনু জাবর রাহিমাহুল্লাহর বরাতে **ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) লিখেছেন :**

«قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ﴿اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ ارْتَفَعَ ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ خَلَقَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿اسْتَوَى﴾ عَلَا عَلَى الْعَرْشِ».

---

[811] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৩৭২।

[812] আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ১৬, পৃ. ১১, খ. ১৩, পৃ. ৪১১, খ. ১৭, পৃ. ৪৮০, খ. ২২, পৃ. ৩৮৭।

“আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘*“তিনি আসমানের দিকে ইস্তিওয়া করেছেন,”* কথাটির অর্থ—তিনি ওপরে ওঠেছেন। আর *“তিনি আসমানসমূহকে বিন্যস্ত করেছেন,”* কথাটির অর্থ—তিনি আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।’ মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘*“ইস্তিওয়া করেছেন,”* কথাটির অর্থ—তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন’।”[813]

এই উদ্ধৃতি থেকে দুটো ফের্কার খণ্ডন হয়ে যায়—

এক. তাবিলকারী ফের্কা : যারা ইস্তিওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে ‘আরশ দখল করা’ জাতীয় অপব্যাখ্যা করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ দাবি করে, এরকম তাবিল করাই নাকি সালাফদের আকিদা! অথচ ইমাম বুখারির উদ্ধৃতি থেকে সূর্যালোকের স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাদের অপব্যাখ্যা সালাফগণের আকিদাবিরোধী।

দুই. তাফবিদকারী ফের্কা : যারা বলে, ইস্তিওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ করা যাবে না। আবার দাবি করে, তাদের মতো সিফাতের অর্থ না করাই নাকি সালাফদের আকিদা! অথচ আমরা জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি, সালাফগণ ইস্তিওয়া সিফাতের অর্থ করেছেন। সুতরাং তারাও সালাফদের আকিদাবিরোধী। কবির এই কথা যেন এদের জন্যই প্রযোজ্য—

«كُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى ... وَلَيْلَى لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَا».

“সবাই দাবি করে, লাইলার সাথে তারই প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু লাইলা যে তাদের দাবির স্বীকৃতি দেয় না!”[814]

---

[813] আল-বুখারি, ***আস-সহিহুল জামি,*** খ. ৯, পৃ. ১২৪।

[814] মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আর-রিসালাতুত তাবুকিয়্যা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২৭।

সালাফদের থেকে ইস্তিওয়া সিফাতের যেসব অর্থ পাওয়া যায়

সালাফদের থেকে *'ইস্তিওয়া'* শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। এ মর্মে বর্তমান যুগের হাতেগোনা কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আকিদাবিশারদের অন্যতম, মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির আকিদার প্রফেসর, **শাইখ সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন :**

«فقد جاءت روايات كثيرة عن عدد كبير من السلف فسروا فيها صفة الاستواء بناءً على معناها في اللغة، ودخلوا في بيان مدلولها، وأعلنوا فيها التزامهم به ووجوب الأخذ بما يقتضيه من معان. وقد تنوعت المعاني التي نقلت عنهم في صفة الاستواء على العرش **ومما نقل عنهم أنهم فسروها بالعُلُو، والارتفاع، والصعود، والقعود، والاستقرار».**

"অনেক সংখ্যক সালাফ থেকে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে, যেখানে তাঁরা ভাষাগত অর্থের ভিত্তিতে 'ইস্তিওয়া' সিফাতের তাফসির করেছেন। তাঁরা এই সিফাতের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ব্যাখ্যায় তাঁরা ঘোষণা করে দিয়েছেন—এই সিফাতের মর্মার্থকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান, এবং এই সিফাতের স্বীকৃতি যেসব 'অর্থ তথা ব্যাখ্যা' দাবি করে, সেগুলো গ্রহণ করার আবশ্যকতা। আরশের ওপর ইস্তিওয়া প্রসঙ্গে তাঁদের থেকে বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে। **তাঁদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা উক্ত**

সিফাতের তাফসির করেছেন—আরোহণ করা, ওঠা, চড়া, বসা এবং ওপরে অবস্থান নেওয়া।”[815]

এরপর সালাফদের থেকে এ বিষয়ক অনেকগুলো বর্ণনা পেশ করার পর শাইখ সুলতান আল-উমাইরি হাফিজাহুল্লাহ চমৎকার এক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

«ونقل أئمة السنة لتلك التفسيرات، وروايتهم لها دليل على قبولهم ورضاهم بها، ولو كان تفسير الاستواء بتلك المعاني أمرًا منكرا؛ لبادر أئمة السلف إلى إعلان النكير عليه، كما فعلوا مع تفسير الجهمية للاستواء بالاستيلاء».

“সুন্নাহর ইমামগণ *‘ইস্তিওয়া’* সিফাতের এই তাফসিরগুলো বর্ণনা করেছেন এবং (নিয়মমাফিক) রিওয়াইয়াত করেছেন। এটাই এ বিষয়ের প্রমাণ যে, তাঁরা এসব অর্থকে গ্রহণ করেছেন এবং এসবের প্রতি তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। যদি *‘ইস্তিওয়া’* সিফাতকে সেসব অর্থে ব্যাখ্যা করা মন্দ কাজ হতো, তাহলে সালাফদের ইমামগণ অবশ্যই সেই মন্দ কাজের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে আপত্তি জানাতেন। যেমনভাবে তাঁরা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের তাফসিরের বিরুদ্ধে স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন; যখন জাহমিরা *‘ইস্তিওয়া’* সিফাতের অর্থ করেছিল—আরশ দখল করা।”[816]

অনুরূপভাবে সালাফি আকিদার বিশিষ্ট পণ্ডিত, বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফাকিহ ও উসুলবিদ, **আল্লামা**

---

[815] সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি, ***ইদাআতুন ফিত তাহরিরিল আকাদি*** (মারকাজু তাফাক্কুর লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

[816] আল-উমাইরি, ***ইদাআতুন ফিত তাহরিরিল আকাদি,*** পৃ. ১৫৭।

সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৭৮ হি.) বলেছেন :

«وأن قول الجهمية : إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن عز وجل وإنما هو سبحانه وتعالى في كل مكان. أنه قول باطل؛ **لأن استوى في اللغة بمعنى علا وارتفع ارتفاعا خاصا، ويكون معناه أيضًا : علا وارتفع واستقر وجلس».**

"জাহমিরা বলে, আরশের ওপর দয়াময় আল্লাহ ইস্তিওয়া (আরোহণ) করেননি। বরং মহান আল্লাহ রয়েছেন সব জায়গায়। তাদের এই বক্তব্য বাতিল। **কারণ আরবি ভাষায় ইস্তাওয়া মানে—বিশেষভাবে আরোহণ করেছেন এবং ওঠেছেন। এর আরও অর্থ হয়—তিনি আরোহণ করেছেন, ওঠেছেন, স্থায়ী হয়েছেন এবং বসেছেন।"**[817]

কিছুদূর এগিয়ে **আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ হাফিজাহুল্লাহ আরও বলেছেন :**

«**وهناك بعض الآثار يثبتها أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء، منها أثر مجاهد في** قوله عز وجل : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا [الإسراء : 79] وأن يجلسه تعالى على عرشه، لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة، وهذا الأثر كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن، ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال : لا أقول به، **ومن كان من أهل السنة أثبته؛ لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه ما فيه من التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس، فأوضح أن الاستواء**

[817] সালিহ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা,*** পৃ. ২৩১।

بمعنى الجلوس؛ إجلاس النبي ﷺ مع الرب عز وجل على العرش».

“*ইস্তিওয়া* সিফাত সাব্যস্ত করার জন্য সার্বিকভাবে আহলুস সুন্নাহ কতিপয় বর্ণনা সাব্যস্ত করে থাকে। তারমধ্যে তাবেয়ি মুজাহিদের বক্তব্য অন্যতম। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘অবশ্যই আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)।’[818] আয়াতে বর্ণিত *মাকামে মাহমুদের* ব্যাখ্যায় তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদ বলেছেন, *‘আল্লাহ নবিজিকে তাঁর আরশের ওপর বসাবেন।’* কিন্তু এ ব্যাপারে নবিজির বক্তব্য বর্ণিত হয়নি। যখন কুরআনকে সৃষ্টবস্তু বলার ফিতনা সংঘটিত হয়, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতকে ফিতনার জামানায় উল্লিখিত বক্তব্য দিয়ে মানুষদের পরীক্ষা করা হতো। যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা এ বক্তব্য অস্বীকার করে বলত, ‘আমি এ ধরনের কথা বলি না।’ **আর আহলুস সুন্নাহর লোকেরা বক্তব্যটি সাব্যস্ত করত। কারণ এক্ষেত্রে নবিজিকে বসানোর বিষয়টি উদ্দিষ্ট ছিল না। বরং এতে উদ্দিষ্ট বিষয় ছিল—ইস্তিওয়ার সুস্পষ্ট বিবৃতি, যার অর্থ উপবেশন করা তথা বসা। আরশের ওপর মহান রবের সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসানোর বিবৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইস্তিওয়ার মানে উপবেশন করা।”**[819]

---

[818] সুরা ইসরা ১৭:৭৯।

[819] সালিহ আলুশ শাইখ, ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা***, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

আমরা ইস্তিওয়া সিফাতের যেই পাঁচটি অর্থ শাইখদ্বয়ের বক্তব্যে দেখলাম, এখন সালাফদের থেকে সেগুলোর প্রমাণ অত্যন্ত সংক্ষেপে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

❑ প্রথম অর্থ—আরোহণ করেছেন (عَلَا) :

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৩ হি.),[820] ইমাম আবুল আব্বাস সালাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯১ হি.) প্রমুখ।[821]

❑ দ্বিতীয় অর্থ—ওঠেছেন (ارْتَفَعَ) :

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন তাবেয়ি ইমাম আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৩ হি.),[822] তাবেয়ি হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.), রাবি বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪০ হি.) প্রমুখ।[823]

❑ তৃতীয় অর্থ—চড়েছেন (صَعِدَ) :

ইস্তাওয়া শব্দের এই অর্থ করেছেন ইমাম আবু উবাইদা মামার ইবনুল মুসান্না রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৯ হি.) প্রমুখ।[824]

উল্লিখিত তিনটি অর্থের—অর্থাৎ *আলা*, *ইরতাফাআ* ও *সয়িদা শব্দের*—মর্মার্থ একই। বাংলা ভাষাতেও 'আরোহণ করা', 'ওঠা' এবং

---

[820] আল-বুখারি, ***আস-সহিহুল জামি,*** খ. ৯, পৃ. ১২৪।

[821] লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৪৩।

[822] আল-বুখারি, ***আস-সহিহুল জামি,*** খ. ৯, পৃ. ১২৪।

[823] আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** তাহকিক : আসআদ মুহাম্মাদ আত-তাইয়্যিব (সৌদি আরব : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৭৫।

[824] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ২, পৃ. ১৯৭; আজ-জাহাবি, ***কিতাবুল আরশ,*** খ. ২, পৃ. ৯-১১।

‘চড়া’ শব্দত্রয়ের মর্মার্থ অভিন্ন।[825] **শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন :**

«لكن علا وارتفع وصعد : معناها واحد، وأما استقر؛ فهو يختلف عنها».

“*আলা, ইরাতাফাআ* ও *সয়িদা*-র অর্থ একই। আর *‘ইসতাকার্রা’* শব্দের অর্থ আলাদা।”[826]

শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

«فأما علا وارتفع وصعد فمعناها متقارب، وأما الاستقرار فشيء زائد على العلو».

“*আলা, ইরাতাফাআ* ও *সয়িদা*—শব্দগুলো কাছাকাছি অর্থবোধক। আর *‘ইসতাকার্রা’* শব্দটি আরোহণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ জ্ঞাপন করে।”[827]

❑ চতুর্থ অর্থ—ওপরে অবস্থান নিয়েছেন (اسْتَقَرَّ) :

আলোচ্য শব্দের এই অর্থ করেছেন ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর (মৃ. ১০৩ হি.),[828] তাফসিরকারক কালবি ও মুকাতিল,[829] ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.) প্রমুখ।[830]

---

[825] বাংলা একাডেমি, ***বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ২৪৫; অশোক মুখোপাধ্যায়, ***সংসদ সমার্থশব্দকোষ*** (সপ্তদশ মুদ্রণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ১০১।

[826] আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ৩৭৫।

[827] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া*** (সৌদি আরব : মুআসসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি), খ. ২, পৃ. ১৫৬।

[828] ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৩৮৪।

[829] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ২, পৃ. ১৯৭; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫২০।

[830] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫১৯।

❑ পঞ্চম অর্থ—বসেছেন (جَلَسَ/قَعَدَ) :

'ইস্তাওয়া' শব্দের এই অর্থ সাব্যস্ত করেছেন তাবেয়ি ইমাম হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১০ হি.), ইমাম ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৬ হি.),[831] ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব আল-ওয়াররাক (মৃ. ২৫০ হি.)[832]

বাংলা ভাষায় *'ইস্তিওয়া'* সিফাতের কী কী অর্থ করা যায়, সালাফগণের ব্যক্তীকৃত আরবি অর্থগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে কী লেখা উচিত, *'বসেছেন'* অর্থ আহলুস সুন্নাহর বিভিন্ন যুগের উলামাদের থেকে প্রমাণিত কিনা—এসবের প্রামাণ্য আলোচনা আমাদের অনূদিত *'আকিদা ওয়াসিতিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা'* গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছি। তাই এ বিষয়ে আরও বিশদ জানতে বইটি দেখতে পারেন।[833]

---

[831] মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ***, তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান (ই-বুক, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.), বর্ণনা নং : ৪৮, পৃ. ২৩৪; মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ***, তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি (ই-বুক, *কিতাব-অনলাইন ডট কমে* প্রকাশিত সফটকপি), পৃ. ৬৭, **বর্ণনার মান :** হাসান।

[832] আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ***, তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান, বর্ণনা নং : ৪৮, পৃ. ১৮০; আদ-দাশতি, ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ***, তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি, পৃ. ৭০, **বর্ণনার মান :** সহিহ।

[833] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আকিদা ওয়াসিতিয়া ও তার ব্যাখ্যা,*** অনুবাদ ও টীকা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.), পৃ. ২৭৩-৩২১।

‘আরশের ওপর আরোহণ’ সিফাত অস্বীকার করার বিধান

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাত অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

ইমামদের ইমাম হাফিজ ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন :

«مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ قَدِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، **فَهُوَ كَافِرٌ بِرَبِّهِ** يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَأُلْقِيَ عَلَى بَعْضِ الْمَزَابِلِ حَيْثُ لَا يَتَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُعَاهَدُونَ بِنَتَنِ رِيحِ جِيفَتِهِ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ كَمَا قَالَ ﷺ».

“যে ব্যক্তি স্বীকার করে না যে, মহান আল্লাহ সাত আসমানের ওপর তাঁর আরশে আরোহণ করেছেন—**সে তার রবের প্রতি কুফরিকারী কাফির।** তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে, তো ভালো; অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। এরপর তার মৃতদেহ কোনো ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে; যাতে তার পচা লাশের দুর্গন্ধে মুসলিমরা এবং সাধারণ অমুসলিম নাগরিকরা কোনো কষ্ট না পায়। আর তার ধনসম্পদ গণ্য হবে *‘ফাই’* সম্পদ হিসেবে। কোনো মুসলিম তার উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা মুসলিম কখনো কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে

না; যেমনটি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।”[834]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেন :

قَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: «الْجَهْمِيَّةُ الزَّنَادِقَةُ إِنَّما يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى».

“ওয়াহব বিন জারির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৬ হি.) বলেছেন, **‘ধর্মচ্যুত** জাহমিয়া সম্প্রদায় কেবল এটাই বলতে চায় যে, মহান আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেননি’।”[835]

একবার সালাফদের যুগের ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৯৮ হি.) বলা হয়েছিল, “জাহমিরা বলে, কুরআন হলো মাখলুক।” **তখন তিনি বলেছিলেন :**

«إِنَّ الْجَهْمِيَّةَ لَمْ يُرِيدُوا ذَا، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَنْفُوا أَنْ يَكُونَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَأَرَادُوا أَنْ يَنْفُوا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّمَ مُوسَى، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] وَأَرَادُوا أَنْ يَنْفُوا أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى، أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ».

“জাহমিরা আসলে এটা বোঝাতে চায়নি। বরং তারা এর মাধ্যমে—দয়াময় আল্লাহ যে আরশের ওপর আরোহণ করেছেন, সেটা অস্বীকার করতে চেয়েছে। মহান আল্লাহ যে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, সেটা

---

[834] আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আন-নাইসাবুরি, ***মারিফাতু উলুমিল হাদিস,*** তাহকিক : সাইয়্যিদ মুআজ্জাম হুসাইন (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৮৪।

[835] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৩০।

অস্বীকার করতে চেয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।' (*সুরা নিসা :* ১৬৪) কুরআন যে মহান আল্লাহর কথা, তারা সেটা অস্বীকার করতে চেয়েছে। আমি মনে করি, ওদেরকে তওবা করতে বলা হবে। যদি ওরা তওবা করে, তো ভালো; অন্যথায় ওদের গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।"[836]

আর ইমাম বুখারির উস্তাজ **ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ আল-খুজায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৮ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهٌ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য দেয়, সে কাফির হয়ে যায়। আর **আল্লাহ নিজেকে যেই গুণে বিশেষিত করেছেন, সেটা যেই ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেও কাফির হয়ে যায়।** তবে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তাকে যেসব গুণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই।"[837]

---

[836] আল-বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত,*** খ. ১, পৃ. ৬০৮।

[837] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৫৮৭।

‘আরশের ওপর আরোহণ’ সিফাতের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটো দল পথভ্রষ্ট হয়েছে। যথা :

প্রথম সম্প্রদায় : মুশাব্বিহা ফের্কা

যারা আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের ধরন-নির্দিষ্ট করেছেন, নিজে থেকে বিভিন্ন ধরন বর্ণনা করেছে। মুশাব্বিহা কার্রামিয়্যা[838] সম্প্রদায় থেকে এ জাতীয় কথা প্রকাশিত হয়েছে। এদের কেউ কেউ বলত, ‘মহান আল্লাহ আরশের একটা অংশের ওপর আরোহণ করেছেন।’ অথবা বলত, ‘আরশ আল্লাহকে বেষ্টন করে ফেলেছে!’ ‘আল্লাহ আরশে উঠে আরশকে পরিপূর্ণ করে ফেলেছেন!’ নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক।[839] মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলত, আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর জিসম তথা দেহ আছে! কারণ জিসম বা দেহ ছাড়া আরোহণ সম্ভব না! আর আল্লাহর আরোহণ আমাদের আরোহণের মতো! নাউজুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ দলাল।[840]

---

[838] কোনো কোনো গবেষকের মতে, এই শব্দের সঠিক উচ্চারণ হবে—**কিরামিয়্যা।** কিন্তু *‘কার্রামিয়্যা’* উচ্চারণই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে উলামাগণের বচনে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

[839] জাবির বিন ইদরিস বিন আমির, ***মাকালাতুত তাশবিহ ওয়া মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি মিনহা*** (রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪১৬-৪১৭।

[840] আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৪৭২।

দেশীয় অনেক বক্তা হরহামেশাই আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের কেউ যদি আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাদৃশ্য দেন, তাহলে আমি অবাক হব না। আল্লাহুল মুস্তাআন। আমরা ইতঃপূর্বে একাধিকবার বলেছি, আল্লাহর সিফাতের ধরন-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করা, আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া, আল্লাহর জিসম তথা দেহ সাব্যস্ত করা—মহান আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলার অন্তর্গত। যা নিঃসন্দেহে হারাম ও কবিরা গুনাহ। এবং এসব বক্তার অনেক বক্তব্য কুফরি, যার দরুন একজন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় : জাহমিয়া ফের্কা

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি, জাহমিয়া ফের্কার তিনটি স্তর আছে। সকল স্তরের জাহমিয়া সম্প্রদায় মহান আল্লাহর *ইস্তিওয়া* সিফাত অস্বীকার করে। তারা কেউই আল্লাহর *ইস্তিওয়া* সিফাত সাব্যস্ত করে না। প্রধানত খাঁটি জাহমিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায় এই সিফাত সাব্যস্ত করে না। এরা আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের অপব্যাখ্যা করে থাকে। এরা বলে, *'আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন'* মানে—তিনি *ইস্তিলা* করেছেন তথা আরশ দখল করেছেন।[841]

[841] আল-আশারি, ***আল-ইবানা,*** পৃ. ৪১০।

পক্ষান্তরে আশারি[842] ও মাতুরিদি সম্প্রদায়ের[843] একদল—জাহমি-মুতাজিলিদের মতো হুবহু একই অপব্যাখ্যা করে; যেমনটি তাদের কিতাবপত্রে একদম পরিষ্কার লেখা আছে।

আর আরেকদল—তাফবিদ করে; যেমনটি হাফিজ বাইহাকি,[844] ইবনু জামাআহ,[845] বাইজুরি[846] প্রমুখের মতো বিভিন্ন যুগের আশারি বিদ্বান নিজেদের কিতাবপত্রে উল্লেখ করেছেন।

---

[842] আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুওয়াইনি, ***আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদিল্লাতি ফি উসুলিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা ও আলি আব্দুল মুনয়িম (মিশর : দারুস সাআদা, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৬০; আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৫৭; আল-আমিদি, ***গায়াতুল মারাম,*** পৃ. ১৪১; সায়িদ ফুদা, ***শারহু আকিদাতিল ইমাম ইবনিল হাজিব,*** পৃ. ৫৪।

[843] আল-মাতুরিদি, ***তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৪, পৃ. ৪৫২।

[844] আল-বাইহাকি, ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত,*** খ. ২, পৃ. ৩০৩।

[845] ইবনু জামাআহ, ***ইদাহুদ দালিল,*** পৃ. ১০৩।

[846] আল-বাইজুরি, ***তুহফাতুল মুরিদ,*** পৃ. ১৫৭।

‘আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন’ মানে *‘তিনি আরশ দখল করেছেন’* বলে ব্যাখ্যা করা কি আহলুস সুন্নাহর আকিদা?

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের তাবিল করে বাতিলপন্থিরা বলে, এর মানে—আরশ দখল করা। আশারি-মাতুরিদিরা এই অপব্যাখ্যাকে আহলুস সুন্নাহর আকিদা মনে করে। আমরা কিছুপূর্বেই এ বিষয়ে তাদের কিতাবপত্র থেকে রেফারেন্স দিয়েছি। চাইলে আশারিদের বিখ্যাত পণ্ডিত আবু হামিদ আল-গাজালি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৫০৫ হি.) বক্তব্যও দেখতে পারেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। এই সিফাতের অপব্যাখ্যার পক্ষ নিয়ে তিনি কী ডিফেন্সই না করেছিলেন![847] সমকালীন আশারিদের লেখা *‘আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ’* তথা *‘আহলুস সুন্নাহর আকিদা’* শীর্ষক কিতাবেও ইস্তিওয়া সিফাতের একই তাবিল করা হয়েছে।[848]

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, দেওবন্দিদের অফিসিয়াল আকিদাগ্রন্থ *‘আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদে’* প্রথিতযশা দেওবন্দি বিদ্বান **আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৪৬ হি.) বলেছেন :**

---

[847] আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজালি, ***আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪০।

[848] আলি ঘুমা, ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ*** (কায়রো : দারুল মুকাত্তাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.), পৃ. ১২৪।

«وأما ما قال المتأخرون من أئمتنا في تلك الآيات، يُؤولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع، بأنه يمكن أن يكون المراد من الاستواء : الاستيلاء، ومن اليد: القدرة إلى غير ذلك، تقريباً إلى أفهام القاصرين، فحق أيضاً عندنا».

"পরবর্তী যুগে আমাদের যেসব ইমাম এসেছেন, তাঁরা এসব আয়াত (সিফাতের আয়াতসমূহ) সম্পর্কে কথা বলেছেন। তাঁরা এসব আয়াতের এমন বিশুদ্ধ তাবিল করেছেন, যা আরবি ভাষা ও শরিয়তের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বলেছেন, 'ইস্তিওয়া (আরশের ওপর আরোহণ)' মানে হতে পারে—'আরশ দখল করা'। তদ্রূপ 'আল্লাহর হাত' মানে হতে পারে—'আল্লাহর ক্ষমতা'। দুর্বল বোঝশক্তিসম্পন্ন লোকদেরকে বুঝানোর সুবিধার জন্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের নিকটে, এসব ব্যাখ্যাও হক।"[849]

এখন আমরা সালাফদের অনুসারী পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের বক্তব্য থেকে দেখব, তাঁরা কীভাবে এই অপব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন এবং এটাকে ***'জাহমিয়া ও মুতাজিলা ফের্কার আকিদা'*** আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে, আশারি-মাতুরিদিদের আকিদা—মূলত তাদের পূর্বসূরি জাহমি-মুতাজিলিদেরই গোমরাহি আকিদা।

১. সালাফদের যুগের প্রখ্যাত বিদ্বান **ইমাম আব্দুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪০ হি.)** তাঁর *"আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা"* গ্রন্থে **বলেছেন :**

[849] সাহারানপুরি, ***আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ,*** পৃ. ৬৪।

«بَابُ قَوْلِ الْجَهْمِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] زَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ أَنَّ مَعْنَى اسْتَوَى: اسْتَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ اسْتَوَى فُلَانٌ عَلَى مِصْرَ يُرِيدُونَ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ يَكُونُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَيْسَ بِمُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ؟ فَإِذَا قَالَ: لَا. قِيلَ: فَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ قَالَ: مَنْ زَعَمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. فَيُقَالُ لَهُ: يَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ أَنَّ الْعَرْشَ أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَيْسَ اللَّهُ بِمُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْعَرْشَ قَبْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَيْهِ بَعْدَ خَلْقِهِنَّ . . . فَيَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ: الْمُدَّةُ الَّتِي كَانَ «عَلَى» الْعَرْشِ «فِيهَا» قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى بِمُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ فِيهَا».

“পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে জাহমির বক্তব্য, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ‘দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।’ (*সুরা তহা : ৫*) জাহমিয়া সম্প্রদায় দাবি করে, ‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অর্থ—‘ইস্তাওলা’ তথা ‘দখল করেছেন’। তারা আরবদের একটি কথার উদাহরণ দেয়। কথাটি হলো—‘অমুক ব্যক্তি মিশরের ওপর ইস্তিওয়া করেছে,’ অর্থাৎ ‘সে মিসর দখল করেছে।’ এরকম দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তিকে বলতে হবে, ‘মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোনো সৃষ্টির ওপর কি এমন কোনো সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলা তার ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন না?’ যদি সে বলে, ‘না।’ তাহলে তাকে বলতে হবে, ‘যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, তার বিধান কী হবে?’ সে জবাব দেবে, ‘যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে কাফির।’ তখন তাকে বলতে হবে, ‘তোমার দাবি

অনুযায়ী তোমার জন্য এটা মেনে নেওয়া জরুরি হয়ে যায় যে, আরশের ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলা তার ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন না। কারণ মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আরশ সৃষ্টি করেছেন; এরপর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন। সুতরাং তোমার বক্তব্যের অপরিহার্য পরিণতি হলো—এই কথা বলা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে মহান আল্লাহ আরশের ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন না (আরশ তাঁর দখলে ছিল না)!'"[850]

২. ইমাম দারিমি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) মুতাজিলি পণ্ডিত **বিশর আল-মারিসির উদ্দেশে বলেছিলেন :**

«وَكَذَلِكَ تَأَوَّلْتَ فِي الْعَرْشِ كَمَا تَأَوَّلَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ، وَكَنَيْتَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِكَ وَزُعَمَائِكَ وَلَمْ تُصَرِّحْ بِاسْمِهِ: أَنَّ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، **اسْتَوْلَى عَلَيْهِ**».

"অনুরূপভাবে তুমি আরশের ব্যাপারে তাবিল করেছ। যেমন তাবিল করেছিল জাহম ইবন সাফওয়ান (জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান)। আর তুমি তোমার (ফের্কার) কিছু আলিম ও নেতার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছ, কিন্তু তাদের নাম স্পষ্টভাবে বলনি। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে তুমি দাবি করেছ যে, *'তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন'* আয়াতটির তাফসির হবে—**তিনি আরশ দখল করেছেন।**"[851]

---

[850] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৩১৪; আজ-জাহাবি, ***আল-আরশ,*** খ. ২, পৃ. ২৯৭; ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ৩৩১।

[851] আদ-দারিমি, ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ,*** খ. ১, পৃ. ৫৫০-৫৫১।

ইমাম দারিমির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, *'আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন'* মানে *'তিনি আরশ দখল করেছেন'* বলা—আহলুস সুন্নাহর শত্রু মুতাজিলি-পণ্ডিত বিশর আল-মারিসির আকিদা।

৩. আশারি ফের্কার প্রধান **ইমাম আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেছেন :**

«وقد قال قائلون من **المعتزلة والجهمية والحرورية:** إن معنى قول الله ﷻ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ أنه استوى أي **استولى** وملك وقهر، وأن الله ﷻ في كل مكان».

"মুতাজিলা, জাহমিয়া ও হারুরিয়া (খারেজি) সম্প্রদায়ের একদল লোক বলেছে, আল্লাহ যে বলেছেন, *'রহমান আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন,'* এর অর্থ—**তিনি আরশ দখল করেছেন,** আরশের মালিক হয়েছেন, আরশের কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। আর তারা আরও বলেছে, আল্লাহ হলেন সর্বত্র বিদ্যমান।"[852]

৪. আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৪ হি.) অন্যত্র বলেছেন :

«وقالت **المعتزلة** في قول الله ﷻ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] **يعني استولى**».

"মহান আল্লাহ বলেছেন, 'রহমান আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।' (*সুরা তহা : ৫*) এই আয়াতের ব্যাপারে **মুতাজিলিরা** বলে, এর মানে—**তিনি আরশ দখল করেছেন।**"[853]

---

[852] আল-আশারি, ***আল-ইবানা,*** পৃ. ৪১০।

[853] আল-আশারি, ***মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন,*** পৃ. ৪১০।

৫. প্রথম যুগের আশারি বিদ্বানদের আকিদা পরবর্তী যুগের আশারিদের থেকে ভালো ছিল। এজন্য আমরা দেখতে পাই, আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ সিফাতের তাবিল করার কারণে মুতাজিলিদের খণ্ডন করেছেন প্রথম যুগের আশারি পণ্ডিত কাদি আবু বাকর আল-বাকিল্লানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৩ হি.)। **তিনি মুতাজিলি আকিদার খণ্ডন করতে যেয়ে বলেন :**

«ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه. ... لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزاً مقتدرا. وقوله: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه».

"আরশের ওপর আল্লাহর ইস্তিওয়া মানে 'আরশ দখল করা' হওয়া বৈধ নয়। ... কারণ *'ইস্তিলা'* তথা *'দখল করা'* মানে—ক্ষমতাশীল হওয়া, পরাভূত করা। অথচ আল্লাহ সর্বদাই ক্ষমতাশীল, সবাইকে পরাভূতকারী, প্রতাপশালী ও মহাপরাক্রমশালী। পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেছেন, *'এরপর তিনি আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।'* এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়—এই সিফাতটি নতুনভাবে সংঘটিত হয়েছে, যা পূর্বে একসময় ছিল না। সুতরাং তাদের উক্ত ব্যাখ্যা বাতিল সাব্যস্ত হলো।"[854]

৬. মহান আল্লাহ যে সকল কিছুর ওপরে আছেন—সে সম্পর্কিত আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর **ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :**

[854] আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানি, ***কিতাবুত তামহিদ*** (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ২৬২।

«وَهَذِهِ الْآيَاتُ كُلُّهَا وَاضِحَاتٌ فِي إِبْطَالِ قَوْلِ **الْمُعْتَزِلَةِ**، وَأَمَّا ادِّعَاؤُهُمُ الْمَجَازَ فِي الِاسْتِوَاءِ، وَقَوْلُهُمْ فِي **تَأْوِيلِ اسْتَوَى اسْتَوْلَى**، فَلَا مَعْنَى لَهُ؛ لأنه غير ظَاهِرٍ فِي اللُّغَةِ، وَمَعْنَى الِاسْتِيلَاءِ فِي اللُّغَةِ الْمُغَالَبَةُ، وَاللَّهُ لَا يُغَالِبُهُ وَلَا يَعْلُوهُ أَحَدٌ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ».

"মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে বাতিল প্রমাণ করতে এ সমস্ত আয়াত একদম সুস্পষ্ট দলিল। তারা যে *'ইস্তিওয়া'* শব্দে রূপক অর্থের দাবি করে, এবং ***'ইস্তিওয়া'* সিফাতের তাবিল করে বলে, 'এর মানে—আল্লাহ আরশ দখল করেছেন,'** তার কোনো ভিত্তিই নেই। কারণ আরবি ভাষায় তাদের ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হিসেবে বিবেচিত নয়। আরবি ভাষায় *'ইস্তিলা'* তথা *'দখল করা'* শব্দের অর্থ হয়—মোকাবিলা করে জয়লাভ করা বা প্রাধান্য বিস্তার করা। অথচ আল্লাহকে কেউ মোকাবিলা করতে পারে না। কেউ তাঁর ওপরে উঠতে পারে না। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী (সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী)।"[855]

৭. সালাফদের থেকে ইস্তিওয়া সিফাতের অর্থ বর্ণনা করার পর **ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৬ হি.) বলেছেন :**

«وأوّلت **المعتزلة الاستواء بالاستيلاء.** فأمّا أهل السنة يقولون: الِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْإِيمَانُ بِهِ وَيَكِلُ الْعِلْمَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ».

"মুতাজিলা সম্প্রদায় ইস্তিওয়া সিফাতের তাবিল করে বলেছে, এর মানে—তিনি আরশ দখল করেছেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহগণ বলে থাকেন, আরশের ওপর আরোহণ করা মহান আল্লাহর একটি সিফাত। এর কোনো

[855] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩১।

ধরন বর্ণনা করা যাবে না। একজন মানুষের জন্য এই সিফাতের প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব। আর এর ধরন সম্পর্কিত জ্ঞান তিনি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবেন।"[856]

৮. ইস্তিওয়া সিফাতের তাবিল করার ক্ষেত্রে আশারিরা যে মুতাজিলিদের আকিদা গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে খোদ আশারি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাজ্ঞ পণ্ডিত, আকিদা-বিশেষজ্ঞ বিদ্বান শাইখ হাসান মাহমুদ আশ-শাফিয়ি আল-আজহারি ওয়াফফাকাহুল্লাহ (জ. ১৩৪৯ হি./১৯৩০ খ্রি.) সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন। **তিনি বলেছেন :**

«أما الأشاعرة فقد بدؤوا بإثبات الاستواء والعلو والفوقية دون كيف أو تمثيل، ودون تأويل أيضًا كما سبق نقله عن الأشعري، وتابعه في ذلك أصحابه وتلاميذه، وتلاميذ أصحابه كالباقلاني الذي أثبت الاستواء أيضًا، وعارض تأويله بالاستيلاء والملك، وإن كان ينفي المكانية صراحة عن الله تعالى. ... أما بعد الباقلاني فقد جنحوا إلى نفي الجهة والمكان صراحة، وإلى تأويل الاستواء، واقتربوا بهذا من المعتزلة الذين قالوا بذلك من قبل، ولعل أول من عُرف عنه تأويل الاستواء ونفي الجهة من الأشاعرة هو الأستاذ أبو بكر بن فورك -توفى سنة ٤٠٤ هـ، أي بعد وفاة الباقلاني بعامٍ واحد».

"শুরুর দিকে আশারিরা মহান আল্লাহর জন্য 'ইস্তিওয়া', 'উলু (ঊর্ধ্বতা), 'ফাওকিয়্যা (সকল সৃষ্টির ওপরে থাকা)' প্রভৃতি সিফাত সাব্যস্ত করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা সিফাতগুলোর ধরন-প্রকৃতি বর্ণনা করতেন না, মাখলুকের গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য দিতেন না, এবং মহান আল্লাহর

[856] আল-বাগাবি, ***মাআলিমুত তানজিল,*** খ. ২, পৃ. ১৯৭।

এই সিফাতগুলোর তাবিল-ও করতেন না। যেমনটি ইতোমধ্যে আবুল হাসান আল-আশারি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আবুল হাসান আল-আশারির অনুসারীবর্গ ও ছাত্রগণ তাঁর অনুসরণ করেছেন। তদ্রূপ তাঁর ছাত্রদের শিষ্যগণও একই পথে চলেছেন। যেমন আবু বাকর আল-বাকিল্লানি। তিনিও মহান আল্লাহর জন্য 'ইস্তিওয়া' সিফাত সাব্যস্ত করেছিলেন এবং ইস্তিওয়াকে *'আরশ দখল করা'* বা *'রাজত্ব পরিচালনা করা'*—বলে তাবিল করার বিরোধিতা করেছিলেন। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহকে 'স্থান' থেকে পবিত্র ঘোষণা করতেন। ...

তবে বাকিল্লানির পরবর্তী সময়ে আশারিরা স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর 'দিক' এবং 'স্থান' অস্বীকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং 'ইস্তিওয়া' সিফাতের তাবিল করতে শুরু করে। এতে করে তারা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের কাছাকাছি চলে যায়। যেই মুতাজিলিরা ইতঃপূর্বে এমন তাবিলসূচক মত ব্যক্ত করেছিল। আশারিদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম 'ইস্তিওয়া' সিফাতের তাবিল করেছেন এবং মহান আল্লাহর 'দিক' অস্বীকার করেছেন—বলে জানা যায়, তিনি হলেন আল-উস্তাজ আবু বাকর ইবনু ফুরাক। বাকিল্লানি মারা যাওয়ার এক বছর পর তিনি (ইবনু ফুরাক) ৪০৪ হিজরিতে মারা যান।"[857]

আর ইস্তিওয়া সিফাতের তাবিল বিষয়ে সালাফদের অবস্থান স্পষ্ট করে **হাফিজ শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি আশ-শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন :**

[857] হাসান আশ-শাফিয়ি, ***আল-আমিদি ওয়া আরাউহুল কালামিয়্যা,*** পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

«هَذِهِ الصِّفَاتُ مِنَ الاسْتِوَاءِ وَالإِتيَانِ وَالنُّزُوْلِ، قَدْ صَحَّتْ بِهَا النُّصُوْصُ، وَنَقَلَهَا الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهَا بِرَدٍّ وَلاَ تَأْوِيْلٍ، بَلْ أَنْكَرُوا عَلَى مَنْ تَأَوَّلَهَا مَعَ إِصْفَاقِهِم عَلَى أَنَّهَا لاَ تُشبِهُ نُعُوْتَ المَخْلُوْقِيْنَ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ».

“ইস্তিওয়া (আরশের ওপর আরোহণ), আগমন, অবতরণ প্রভৃতি সিফাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল এসেছে এবং খালাফরা (পরবর্তীরা) এসব দলিল সালাফদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এসবকে না প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর না তাবিল তথা ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। বরং যারা এসব সিফাতের তাবিল করেছে, তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। একইসাথে তাঁরা (সালাফগণ) এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, এসব সিফাত মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, এবং আল্লাহর সদৃশ কিছুই নেই।”[858]

[858] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১১, পৃ. ৩৭৬।

আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ থেকে প্রতীয়মান হয়—আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন

আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) এ বিষয়ে সালাফদের যুগের ইমাম ইয়াজিদ বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ২০৬ হি.) বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। **ইমাম বুখারি লিখেছেন :**

وَحَذَّرَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَهْمِيَّةِ وَقَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى عَلَى خِلَافِ مَا يَقِرُّ فِي قُلُوبِ الْعَامَّةِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ».

"ইয়াজিদ বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়া সম্প্রদায় থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, '*দয়াময় আল্লাহ যে আরশের ওপর আরোহণ করেছেন*—এই কথা সাধারণ মানুষের অন্তরে যেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার বিপরীত অর্থে যে ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করে, সে-ই জাহমি।"[859]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) ইমাম ইয়াজিদের এই কথার ব্যাখ্যা তাঁর শিক্ষক ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) থেকে উল্লেখ করেছেন। **ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :**

«والذي يَقِرُ في قلوب العامة: هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها لربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى= نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة، من غير مُوقفٍ

[859] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৩৩।

وَقفهم عليه، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة، حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل مَنْ يُقَيَّض له».

"সাধারণ মানুষের অন্তরে যে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা হলো—আল্লাহ যেই ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, প্রয়োজন ও প্রার্থনার সময় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে রবের কাছে আর্জি জানানো। এ সময় তারা ডান দিকে বা বাম দিকে ফিরে তাকায় না (বরং তাদের অন্তর চলে যায় ওপরের দিকে)। অথচ কেউ তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়নি। কিন্তু এটাই হলো সেই ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতি, যা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এমন কোনো নবজাতক নেই, যে কিনা এই ফিতরাত ছাড়া জন্মগ্রহণ করে। কোনো নবজাতকের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি যতক্ষণ না তাকে জাহমি বানিয়ে দিচ্ছে, কিংবা আল্লাহর সিফাত অস্বীকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ফিতরাতি আকিদার ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে।"[860]

এ থেকে বোঝা গেল, সালাফগণ আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ বিষয়ক আয়াত থেকে আল্লাহর ঊর্ধ্বতাও বুঝতেন। আল্লাহ যে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন, সেটা বুঝতেন। এমনকি এই বুঝের বাইরে গিয়ে কেউ যদি ভিন্ন আকিদা পোষণ করে, তাহলে তাকে 'জাহমি' আখ্যা দিতেন। এজন্য আমরা এখানে আল্লাহর *'ঊর্ধ্বতা'* সিফাত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

[860] ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ৩২৫-৩২৬।

'আরশের ওপর আরোহণ' এবং *'ঊর্ধ্বতা'* সিফাতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য :

প্রথমেই পরিষ্কার করা দরকার, *'আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ'* এবং *'আল্লাহর ঊর্ধ্বতা'* সিফাতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কী।

প্রথমত, 'আল্লাহর ঊর্ধ্বতা' একটি সিফাত জাতিয়্যা তথা সত্তাগত গুণ। যেই গুণ আল্লাহর সত্তা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না, সেটাকে সত্তাগত গুণ বলা হয়। মহান আল্লাহ যে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন, এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না। তিনি অতীতে এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন, বর্তমানে আছেন, এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। যেমনভাবে মহান আল্লাহ অতীতে বড়োত্ব ও ক্ষমতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন, বর্তমানে আছেন, এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।[861]

পক্ষান্তরে 'আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ' একটি সিফাত ফিলিয়্যা তথা কর্মগত গুণ। এটা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তখন যেই কাজ সম্পন্ন করেন, সেটাই তাঁর কর্মগত গুণ। এটা এমন গুণ, যা নতুনভাবে সংঘটিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে—আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পরে।[862]

দ্বিতীয়ত, মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার পাশাপাশি আকল ও ফিতরাত দ্বারাও প্রমাণিত। মানুষের সুস্থ বিবেকও বলে, স্রষ্টা কখনো সৃষ্টির ভেতরে বা নীচে থাকতে পারেন না, এটা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। বরং স্রষ্টা অবশ্যই সৃষ্টির ওপরে থাকবেন। আর মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতিও

---

[861] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫২৩।

[862] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫২৩।

বলে, আল্লাহ ওপরে আছেন। সেজন্য দোয়া করার সময় বান্দার অন্তর স্বভাবজাতভাবে ওপরের দিকে যায়।[863]

পক্ষান্তরে 'আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ' কেবল কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। মানবীয় বিবেক কিংবা ফিতরাতের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন বলেই আমরা এই সিফাত সম্পর্কে জানতে পেরেছি।[864]

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতা ব্যাপক সিফাত। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের ঊর্ধ্বে তথা ওপরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে আরশের ওপর আল্লাহর আরোহণ একটি সুনির্দিষ্ট সিফাত। এই সিফাত আরশের সাথে সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন মর্মে আমাদেরকে জানিয়েছেন। অন্য কোনো সৃষ্টির ওপর তিনি আরোহণ করেছেন কিনা তা জানাননি। তাই সে বিষয়ে আমাদের চুপ থাকতে হবে।[865]

আল্লাহর ঊর্ধ্বতা সিফাতের দলিল :

মহান আল্লাহ যে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন, তা অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য আল্লাহর ঊর্ধ্বতা বিষয়ক দলিল প্রসঙ্গে **ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর *'নুনিয়্যাহ'* কাব্যগ্রন্থে বলেছিলেন :**

«يَا قَوْمَنَا واللهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا ... أَلفًا تَدلُّ عَلَيهِ بَلْ أَلفانِ»

---

[863] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ১২২।

[864] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ১২২।

[865] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১৭, পৃ. ৩৭৬।

“হে আমাদের কওম, আল্লাহর কসম করে বলছি,
আমাদের মতের পক্ষে হাজারটা দলিল আছে; বরং
আমাদের দলিলের সংখ্যা—দুই সহস্র।”[866]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) লিখেছেন :

«قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: فِي الْقُرْآنِ «أَلْفُ دَلِيلٍ» أَوْ أَزْيَدُ: تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالٍ عَلَى الْخَلْقِ وَأَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: فِيهِ «ثَلَاثُمِائَةِ» دَلِيلٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ».

“ইমাম শাফিয়ির মাজহাবের একজন বড়ো পণ্ডিত বলেছেন, ‘কুরআনে এক হাজার বা তারও বেশি দলিল আছে এই মর্মে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের ওপরে আছেন এবং তাঁর বান্দাদের ঊর্ধ্বে রয়েছেন।’ কেউ কেউ বলেছেন, ‘আল্লাহর ঊর্ধ্বতার পক্ষে কুরআনে তিনশো দলিল আছে’।”[867]

মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন, এই আকিদার পক্ষে অত্যন্ত সংক্ষেপে পাঁচ ক্যাটাগরির দলিল পেশ করছি।

১. কিতাব থেকে দলিল : মহান আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾.

“তিনিই সর্বোচ্চ (সবকিছুর ওপরে) এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান।”[868]

২. সুন্নাহ থেকে দলিল : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীর কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন :

---

866 ইবনুল কাইয়্যিম, ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া,*** খ. ২, পৃ. ৪১৬।

867 ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ১২১।

868 সুরা বাকারা ২:২৫৫।

«أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ».

"আল্লাহ কোথায়?" দাসী বলেছিলেন, "আকাশের ওপরে।" তিনি সেই দাসীকে তিরস্কার করেননি। বরং তাঁর মনিবের উদ্দেশে বলেছেন :

«أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

"তুমি একে মুক্ত করে দাও। সে একজন মুমিন নারী।"[869]

৩. ইজমা তথা ঐক্যমত : সকল সালাফ একমত ছিলেন, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন। সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণের কোনো একজনের ব্যাপারেও এমনটি জানা যায় না যে, তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন।

৪. সুস্থ বিবেক থেকেও প্রতীয়মান হয়, *'ওপরে থাকা'* একটি পরিপূর্ণ গুণ। আর মহান আল্লাহ যাবতীয় পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, পূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং ওপরে থাকার গুণটি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা অপরিহার্য।

৫. মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত প্রকৃতি বলে, মহান আল্লাহ ওপরে আছেন। এজন্য মানুষ যখন আপন রবের কাছে প্রার্থনা করে বলে, *'হে আমার রব,'* তখন তার অন্তর কেবল আকাশের দিকেই ধাবিত হয়।[870]

---

[869] সহিহ মুসলিম, হা. ৫৩৭।

[870] আল-উসাইমিন, ***মুজাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ৩৫-৩৬।

ঊর্ধ্বতা সিফাতের প্রকারভেদ :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা—মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতা তিন ধরনের। যথা :

এক. সত্তাগত ঊর্ধ্বতা (علو الذات); মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির ওপরে আছেন।

দুই. মর্যাদাগত ঊর্ধ্বতা (علو القدر); মহান আল্লাহ মর্যাদার দিক থেকেও সকল সৃষ্টির ওপরে রয়েছেন।

তিন. প্রতাপগত ঊর্ধ্বতা (علو القهر); মহান আল্লাহ প্রতাপ ও কর্তৃত্বের দিক থেকেও সকল সৃষ্টির ওপরে রয়েছেন। আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে বের হতে পারে না।[871]

সকল স্তরের জাহমি সম্প্রদায় কেবল আল্লাহর মর্যাদাগত ঊর্ধ্বতা এবং প্রতাপগত ঊর্ধ্বতা সাব্যস্ত করে; সত্তাগত ঊর্ধ্বতা অস্বীকার করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আল্লাহর মর্যাদাগত ঊর্ধ্বতা এবং প্রতাপগত ঊর্ধ্বতার পাশাপাশি আল্লাহর সত্তাগত ঊর্ধ্বতাও সাব্যস্ত করে। কারণ মহান আল্লাহ যে সত্তাগতভাবে আরশের ওপর আছেন, সে ব্যাপারে সালাফগণ একমত ছিলেন। *'ইমামুল মালিকিয়্যা'* খ্যাত বিদ্বান **ইমাম আবু উমার আত-তালামানকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেছেন :**

«أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ بِذَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ».

---

[871] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***মাদারিজুস সালিকিন ফি মানাজিলিস সায়িরিন,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮।

“মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথেই আছেন।’ (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) কুরআনে এ ধরনের আরও আয়াত এসেছে। আহলুস সুন্নাহর মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন, এ জাতীয় আয়াতের অর্থ—মহান আল্লাহর জ্ঞান সকল সৃষ্টির সাথে আছে। **আর তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে আকাশমণ্ডলীর ওপরে রয়েছেন;** তিনি নিজের আরশের ওপর যেভাবে ইচ্ছা আরোহণ করেছেন।”[872]

ইমাম আবু নাসর আস-সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেছেন :

«أَئِمَّتنَا كسفيان الثَّوْريّ وَمَالك وَحَمَّاد بن سَلمَة وَحَمَّاد بن زيد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة والفضيل وَابْن الْمُبَارك وَأحمد وَإِسْحَاق متفقون على أَن الله سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوق الْعَرْش وَعلمه بِكُل مَكَان».

“আমাদের ইমামগণ—যেমন সুফইয়ান আস-সাওরি, মালিক বিন আনাস, হাম্মাদ বিন সালামা, হাম্মাদ বিন জাইদ, সুফইয়ান বিন উয়াইনা, ফুদাইল বিন ইয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বাল এবং ইসহাক বিন রাহুইয়াহ—**এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে আরশের ওপরে আছেন,** আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে।”[873]

---

[872] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫১৯; আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৪৬; ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ২০৪।

[873] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৪৮।

আল্লাহর ঊর্ধ্বতা সিফাত অস্বীকারের বিধান :

মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বতা স্বীকার না করা—জাহমিদের কুফরি আকিদা। আল্লাহর ঊর্ধ্বতা স্বীকার না করলে কেউ মুসলিম থাকবে না। সালাফদের যুগের বিদ্বান **সায়িদ বিন আমির আদ-দুবায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১০ হি.) বলেছেন :**

«الْجَهْمِيَّةُ أَشَرُّ قَوْلًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ، وَقَالُوا هُمْ: لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ شَيْءٌ».

"জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আরশের ওপর রয়েছেন। অথচ এরা (জাহমিরা) বলেছে, 'আরশের ওপর কিছুই নেই'।"[874]

আহলুর রায়দের ইমাম **আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৫০ হি.) আকিদা—**

عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: «قَدْ كَفَرَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥] وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»، قُلْتُ: «فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: لَا أَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ؟» قَالَ: «هُوَ كَافِرٌ، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ فَقَدْ كَفَرَ».

---

[874] আল-বুখারি, ***খলকু আফআলিল ইবাদ,*** পৃ. ৩১।

আবু মুতি আল-বালখি থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, যে বলে, 'আমি জানি না, আমার রব আসমানে, না জমিনে।' আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ জবাব দেন, "সে কাফির। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'দয়াময় আল্লাহ আরশের ওপর আরোহণ করেছেন।' (*সুরা তহা : ৫*) আর তাঁর আরশ রয়েছে সাত আসমানের ঊর্ধ্বে।" আল-বালখি বলেন, আমি বললাম, "সে যদি বলে, আল্লাহ আরশের ওপরেই আছেন। কিন্তু পাশাপাশি সে এটাও বলে যে, আমি জানি না, আরশ আসমানে, না জমিনে?" তিনি জবাব দেন, "সেও কাফির। কেননা সে আল্লাহর আসমানের ওপরে থাকাকে অস্বীকার করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমানের ওপরে থাকাকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায়।"[875]

এমনকি হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট বিদ্বান **ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন :**

«إِخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ رَامَ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ، لِيَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى فَيُكَذِّبَهُ فِيمَا أَخْبَرَهُ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ، فَقَالَ: ﴿يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]. **فَمَنْ نَفَى الْعُلُوَّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ فَهُوَ فِرْعَوْنِيٌّ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ فَهُوَ مُوسَوِيٌّ مُحَمَّدِيٌّ».**

"মহান আল্লাহ ফেরাউনের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন, সে আকাশে উঠতে চেয়েছিল, যাতে মুসা আলাইহিস সালামের ইলাহের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং মুসা আলাইহিস

[875] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

সালামের কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনকে জানিয়েছিলেন, তাঁর মহান ইলাহ আসমানরাজির ওপরে আছেন। ফলে ফিরাউন (তার মন্ত্রীকে) বলেছিল, 'হে হামান, আমার জন্য তুমি নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পথ পাই। আসমানে আরোহণের পথ। যেন আমি দেখে নিতে পারি মুসার মাবুদকে; যদিও আমি তাকে (মুসাকে) মিথ্যাবাদীই মনে করি।' (*সুরা গাফির :* ৩৬-৩৭) **সুতরাং, জাহমিয়া সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তিই আল্লাহর ঊর্ধ্বতা অস্বীকার করে, সে আসলে ফিরআউনি (ফেরাউনের অনুসারী)। আর যে আল্লাহর ঊর্ধ্বতা সাব্যস্ত করে, সে হলো মুসাউয়ি ও মুহাম্মাদি (নবি মুসা ও নবি মুহাম্মাদের অনুসারী)।**"[876]

[876] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৭৫।

ঊর্ধ্বতা ও সাথে থাকা—সিফাতদুটি পরস্পরবিরোধী নয় :

মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন—এই আকিদা যখন প্রচার করা হয়, তখন একদল লোক বলে বসেন, 'কুরআনের আয়াত অনুযায়ী মহান আল্লাহ তো সবার সাথে আছেন।' আমরা যখন জবাবে বলি, 'মহান আল্লাহ ইলমের মাধ্যমে সবার সাথে আছেন, কিন্তু সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন।' তখন তাঁরা বলে বসেন, "আপনারা তাহলে 'সাথে থাকা' সিফাতের তাবিল (ভিন্নার্থ) করলেন। আপনাদের এই তাবিল অবৈধ না হলে আমাদের তাবিলকেও অবৈধ বলতে পারবেন না। আমরা তাবিল করে বলব, মহান আল্লাহ সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক থেকে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন, সত্তাগতভাবে নন।" এ ধরনের যুক্তি ব্যবহার করে 'আরশের ওপর আরোহণ' সিফাতটির অপব্যাখ্যা করেছিলেন বিখ্যাত আশারি বিদ্বান আল্লামা আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৭৮ হি.)।[877]

এজন্য আমরা এখানে প্রমাণ করব, মহান আল্লাহর 'ঊর্ধ্বতা' এবং 'সাথে থাকা' সিফাতদুটো একটি অপরটির বিপরীত নয়। মহান আল্লাহ একই সময়ে সকল সৃষ্টির ওপরে আছেন এবং সকল সৃষ্টির সাথেও রয়েছেন। আমরা কয়েকটি পয়েন্টের আলোকে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারি। যথা :

---

[877] আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুওয়াইনি, ***আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদিল্লাতি ফি উসুলিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা ও আলি আব্দুল মুনয়িম (মিশর : মাতবাআতুস সাআদাহ, প্র. ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৬০।

প্রথম পয়েন্ট :

কুরআন-সুন্নাহর যত জায়গায় বলা হয়েছে, *'মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির সাথে আছেন,'* কিংবা *'অমুক বান্দার সাথে আছেন,'* সকল জায়গায় আলোচনার প্রসঙ্গ (context) থেকেই বোঝা যায়—হয় এখানে ইলমের মাধ্যমে সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে, আর নয়তো সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ সত্তাগতভাবে সৃষ্টির সাথে মিশে রয়েছেন—এমনটি বোঝানো হয়নি।

'সাথে থাকা' সিফাতের প্রকারভেদ :

আকিদার মুহাক্কিক বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহর 'মায়িয়্যা' তথা 'সাথে থাকা' দুই প্রকার।[878] যথা :

প্রথম প্রকার : সার্বজনিকভাবে সাথে থাকা (المَعِيَّةُ العَامَّة)

সাথে থাকার এই প্রকারটি সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে সকল সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করেছেন। সাথে থাকার এই প্রকারটি সুরা হাদিদে উল্লিখিত হয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

878 ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমানি ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান,*** পৃ. ১২২; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ২৪৯; ইবনুল মাওসিলি, ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িক,*** পৃ. ৪৭৯।

“তিনি ছয় দিনে আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশের ওপর আরোহণ করেছেন। তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।”[879]

মাদান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :

«سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] قَالَ: عِلْمُهُ».

“আমি সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৬১ হি.) মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘এর মানে তাঁর জ্ঞান তোমাদের সাথে আছে’।”[880]

আহমাদ বিন মানসুর আর-রামাদি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারির শিক্ষক ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ আল-খুজায়ি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২২৮ হি.) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। **আহমাদ আর-রামাদি বলেন :**

«سَأَلْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ مَا مَعْنَاهَا؟ فَقَالَ: مَعْنَاهَا أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ بِعِلْمِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ

[879] সুরা হাদিদ ৫৭:৪।

[880] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩০৬; আল-আজুর্রি, ***আশ-শারিয়া,*** খ. ৩, পৃ. ১০৭৭; ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৭, পৃ. ১৫৪; আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৪৫

قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]؟، أَرَادَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ».

"আমি নুআইম বিন হাম্মাদকে মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'এর মানে—মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী ইলম থাকার কারণে তাঁর কাছে কোনো গোপন বিষয়ই অজানা নয়। আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।" (*সুরা মুজাদালা ৫৮:৭*) এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চেয়েছেন—পৃথিবীতে, আসমানে, কিংবা তাঁর অন্য যে কোনো সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনো গোপন বিষয় নেই, যা কিনা তাঁর কাছে অজানা।'"[881]

সুরা মুজাদালাতেও এই প্রকারটি আলোচিত হয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

[881] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৭, পৃ. ১৪৬।

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ﴾.

"আপনি কি জানেন না, আসমানরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কেয়ামত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবগত।"[882]

বিখ্যাত তাফসিরকারক, তাবেয়ি বিদ্বান, **ইমাম দাহহাক বিন মুজাহিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০২ হি.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন :**

«هُوَ عَلَى عَرْشِهِ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا».

"আল্লাহ তাআলা আরশের ওপরে রয়েছেন। আর তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহর জ্ঞান তাদের সাথেই আছে।"[883]

আলোচ্য আয়াতটির তাফসিরে **তাফসিরকারক মুকাতিল বিন হাইয়্যান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৫০ হি.) বলেছেন :**

---

[882] সুরা মুজাদালা/মুজাদিলা ৫৮:৭।

[883] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩০৪; আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান,*** খ. ৯, পৃ. ১৩; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ২৬৪।

«هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَلَنْ يَخْلُوَ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ».

"আল্লাহ তাআলা রয়েছেন আরশের ওপরে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই মুক্ত নয় (তাঁর জ্ঞান রয়েছে সর্বত্র)।"[884]

দ্বিতীয় প্রকার : সুনির্দিষ্টভাবে সাথে থাকা (المَعِيَّةُ الخَاصَّة)

সাথে থাকার এই প্রকারটি রসুলগণ ও তাঁদের অনুসারীবর্গের জন্য সুনির্দিষ্ট। তিনি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রসুলগণ ও তাঁদের অনুসারীদের সাথে রয়েছেন। যেমন সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশে আমাদের **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :**

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.

"তুমি চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন।"[885]

মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের উদ্দেশে **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

"আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি; আমি শুনি এবং দেখি।"[886]

মুত্তাকি ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের ব্যাপারে **আল্লাহ তাআলা বলেছেন :**

---

[884] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৪৪; ইবনু কুদামা, ***ইসবাতু সিফাতিল উলু,*** পৃ. ১৭২।

[885] সুরা তাওবা ৯:৪০।

[886] সুরা তহা ২০:৪৬।

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[887]

আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«فَهُوَ مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ دُونَ فِرْعَوْنَ وَمَعَ مُحَمَّدٍ وَصَاحِبِهِ دُونَ أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَمَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ دُونَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ».

"সুতরাং আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের সাথে নন, বরং তিনি আছেন মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের সাথে। তিনি আবু জাহল এবং নবিজির অপরাপর শত্রুদের সাথে নন, বরং তিনি আছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারী জালিমদের সাথে নন, বরং তিনি আছেন তাদের সাথে—যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[888]

সালাফদের যুগের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :

«قال اللَّه في القرآن: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾. وهذا على وجوه: قال اللَّه جل ثناؤه لموسى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا﴾ [طه: ٤٦]. يقول: في الدفع عنكما. وقال: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ

---

[887] সুরা নাহল ১৬:১২৮।

[888] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমানি ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান,*** পৃ. ১২২; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ২৪৯-২৫০।

مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]. يقول: في الدفع عنا. وقال: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. يقول: في النصر لهم على عدوهم. وقال: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥]. في النصر لكم على عدوكم. وقال: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٨]. يقول: بعلمه فيهم».

“মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।’ এই কথাটির একাধিক অর্থ ও প্রয়োগ আছে। মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দুজনের সাথে আছি।’ (*সুরা তহা* ২০:৪৬) অর্থাৎ, তোমাদের দুজনকে রক্ষা ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সাথে আছি। মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি (নবিজি মুহাম্মাদ) ছিলেন দুজনের একজন। তাঁরা উভয়ে যখন গুহায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, “তুমি চিন্তিত হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন”।’ (*সুরা তাওবা* ৯:৪০) অর্থাৎ, আমাদেরকে রক্ষা ও সহায়তার ক্ষেত্রে আমাদের সাথেই আছেন।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘কত ছোটো দল আল্লাহর ইচ্ছায় বড়ো দলকে পরাজিত করেছে! বস্তুত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (*সুরা বাকারা* ২:২৪৯) অর্থাৎ, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ধৈর্যশীল মুমিনদেরকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না, যখন তোমরাই সবল। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন। তিনি তোমাদের

কর্মফল কখনোই ক্ষুণ্ন করবেন না।' (*সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৫*) অর্থাৎ, শত্রুপক্ষের ওপর তোমাদেরকে বিজয়দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে আছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'তারা মানুষের কাছ থেকে (নিজেদের মন্দকর্ম) লুকাতে চায়। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে লুকায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই আছেন।' (*সুরা নিসা ৪:১০৮*) অর্থাৎ, তাদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি তাদের সাথে আছেন।"[889]

দ্বিতীয় পয়েন্ট :

কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমা ও আকলের অসংখ্য দলিল থেকে সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হয়েছে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে রয়েছেন। এসব দলিল থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির সাথে নন; বরং তিনি সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ওপরে থেকেই ইলমের মাধ্যমে সকল সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। এসব দলিলের সামান্য কয়েকটি নমুনা আমরা ইতোমধ্যে আলোকপাত করেছি।

তৃতীয় পয়েন্ট :

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পরস্পরবিরোধমুক্ত কিতাব আল-কুরআনুল কারিমে নিজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সময় 'ঊর্ধ্বতা' ও 'সাথে থাকা' সিফাতদুটোকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সিফাতদুটো যদি সত্যিই পরস্পরবিরোধী হতো, তবে কুরআন কখনোই তাদের একত্র করত না। মহান আল্লাহর কিতাবে যে বিষয়গুলোকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ মনে হয়, সেগুলো আসলে বোঝার সীমাবদ্ধতার কারণে হয়ে থাকে। তাই এসব বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে

[889] আহমাদ বিন হাম্বাল, ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা,*** পৃ. ১৫৮।

বারবার চিন্তাভাবনা ও গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করা উচিত, যেন প্রকৃত সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[890] **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾.

"তারা কি কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তাহলে তারা অবশ্যই এতে অনেক অসংগতি পেত।"[891]

চতুর্থ পয়েন্ট :

আরবি 'মাআ' তথা 'সাথে থাকা' শব্দটি যখন নির্দিষ্ট কোনো সত্তার প্রতি সম্পৃক্ত না হয়ে উল্লিখিত হয়, তখন তার অর্থ হয়—'অনির্দিষ্টভাবে সাথে থাকা'। 'সাথে থাকা' বলতে কোন ধরনের 'সাথে থাকা' বোঝানো হয়েছে, তা নির্ধারণ করে দেয় কথার প্রসঙ্গ।[892] কখনো কখনো আরবি 'মাআ' তথা 'সাথে থাকা' শব্দটি মিশে থাকার অর্থ দেয়, আবার কখনো কখনো 'মিশে না থেকে কাছাকাছি সাথে থাকার' অর্থ দেয়, আবার কখনো কখনো দূরে থেকেও 'সাথে থাকার' অর্থ দেয়। এগুলোর সবই প্রকাশ্য অর্থ, সত্যিকারের অর্থ; রূপক অর্থ নয়।

সুপ্রিয় পাঠক, আমরা আরবি ভাষায় সিদ্ধ—এমন কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। এগুলো ভালোভাবে খেয়াল করলে 'সাথে থাকা' শব্দটির প্রয়োগ ও মর্মার্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

প্রথম উদাহরণ : আরবি ভাষায় বলা যায়—

---

[890] আল-উসাইমিন, ***আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা,*** পৃ. ১০১-১০২।

[891] সুরা নিসা ৪:৮২।

[892] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ৫২১।

«العسل مع اللبن في الكوب».

"গ্লাসটিতে দুধের সাথে মধু আছে।"

এখানে 'সাথে থাকা' শব্দটি মিশে থাকার অর্থ দিয়েছে। কারণ গ্লাসের মধ্যে দুধের সাথে মধু রাখা হলে সেগুলো মিশ্রিতই থাকে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : আরবি ভাষায় বলা যায়—

«كنت مع صديقي نمشي في الأسواق».

"আমি আমার বন্ধুর সাথে বাজারে হাঁটছিলাম।"

এখানে 'সাথে থাকা' মানে 'মিশে যাওয়া' নয়; বরং মিশ্রিত না হয়েই পাশাপাশি/কাছাকাছি 'সাথে থাকা'।

তৃতীয় উদাহরণ : আরবরা বলে থাকেন :

«نسير في الليل والقمر معنا».

"আমরা রাতে নৈশভ্রমণ করছি। আর ভ্রমণকালে চাঁদ আমাদের সাথেই আছে।"[893]

এখানে 'সাথে থাকা' মানে 'মিশে থাকা', কিংবা 'কাছাকাছি সঙ্গে থাকা' নয়। বরং 'সাথে থাকা' মানে—আলোর মাধ্যমে সাথে থাকা। চাঁদ তার আলোর মাধ্যমে আমাদের সাথে থাকে, সত্তাগতভাবে নয়। উপরিউক্ত তিনটি উদাহরণের একটিতেও 'সাথে থাকা' শব্দটি অপ্রকাশ্য কিংবা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে কোনোরূপ তাবিল বা ভিন্নার্থ করা হয়নি। সবগুলো প্রকাশ্য অর্থ। সুতরাং আরবি ভাষার প্রয়োগবিধি অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে 'সাথে থাকা' শব্দের জন্য 'মিশে থাকা' কিংবা 'সত্তাগতভাবে সাথে থাকা' অর্থ করাকে আবশ্যক করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা আরবি ভাষায়

---

[893] সামান্য শব্দের ভিন্নতায় আলোচ্য তৃতীয় উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু তাইমিয়া, ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ৮৪; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-হামাবিয়্যা,*** পৃ. ৫২১।

এই শব্দের কয়েকটি প্রায়োগিক অর্থ রয়েছে; প্রসঙ্গভেদে 'সাথে থাকা' শব্দটির মর্মার্থে বিরাট তারতম্য রয়েছে।

আর চাঁদের মতো একটি মাখলুক যখন একইসাথে ওপরে থেকেও সাথে থাকতে পারে, তখন মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি আরও অধিক সম্ভবপর যে, তিনি সকল সৃষ্টির ওপরে থেকেও ইলমের মাধ্যমে সবার সাথে থাকবেন।[894]

পঞ্চম পয়েন্ট :

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, কোনো মাখলুকের ক্ষেত্রে 'ঊর্ধ্বতা' ও 'সাথে থাকা'—সিফাতদুটো একসঙ্গে থাকা অসম্ভব, তথাপি তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, স্রষ্টার ক্ষেত্রেও তা অসম্ভব হবে। কারণ মহান আল্লাহর সাথে তাঁর কোনো মাখলুকেরই সাদৃশ্য নেই।[895] **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

"তাঁর (আল্লাহর) সদৃশ কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[896]

ষষ্ঠ পয়েন্ট :

আমাদের সালাফ ও সুন্নাহপন্থি ইমামগণ মহান আল্লাহর 'সাথে থাকা' বৈশিষ্ট্যের তাফসির (ব্যাখ্যা) করেছেন। তাঁরা কেউ বলেননি, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। বরং সকল সালাফ

---

[894] মুহাম্মাদ বিন খলিল হাসান আল-হাররাস, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** তাহকিক : আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ (খোবার : দারুল হিজরাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[895] আল-উসাইমিন, ***আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা,*** পৃ. ১০২।

[896] সুরা শুরা ৪২:১১।

ও সুন্নাহপন্থি বিদ্বান একমত—মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রয়েছেন, কিন্তু ইলমের মাধ্যমে সকল সৃষ্টির সাথে আছেন।

ইজমা থেকে দলিল :

১. সালাফদের ইজমায়ি আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

«وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَدُونَهُ حُجُبٌ: مِنْ نَارٍ، وَنُورٍ، وَظُلْمَةٍ، وَمَا هُوَ أَعْلَمُ بِهَا. فَإِنِ احْتَجَّ مُبْتَدِعٌ أَوْ مُخَالِفٌ، أَوْ زَنْدِيقٌ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق: ١٦]، وَبِقَوْلِهِ: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [الحديد: ٤]، وَبِقَوْلِهِ: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ» [المجادلة: ٧]، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ. فَقُلْ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِلْمَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا، يَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَهُوَ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ».

“আল্লাহ তাআলা সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে আরশের ওপরে রয়েছেন। তাঁর নীচে পর্দা রয়েছে—আগুন, আলো ও অন্ধকারের। এবং আরও কিছুর পর্দা আছে, যা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনির (jugular vein) চেয়েও তার অধিক নিকটে রয়েছি।’ (*সুরা কাফ ৫০:১৬*) তিনি আরও বলেছেন, ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।’ (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) তিনি আরও

বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন আলোচনা হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ হিসেবে থাকেন না।' (*সুরা মুজাদালা ৫৮:৭*) **কোনো বিদাতি, কিংবা শরিয়তবিরোধী, কিংবা ধর্মচ্যুত ব্যক্তি যদি কুরআনের এ জাতীয় দ্ব্যর্থবোধক আয়াত দিয়ে দলিল দেয়, তাহলে আপনি বলবেন, এর মানে জ্ঞান। কারণ মহান আল্লাহ সর্বোচ্চ সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে আরশের ওপরে রয়েছেন। তিনি (সেখানে থেকেই) সবকিছু জানেন।** তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো স্থান নেই।"[897]

২. আশারিদের প্রধান ইমাম **আবুল হাসান আল-আশআরি** রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু (মৃ. ৩২৪ হি.) কিংবা তাঁর ছাত্র **ইবনু মুজাহিদ** রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭০ হি.) **বলেছেন :**

«وأجمعوا على ... وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، ... وأنه يعلم السر وأخفى من السر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا».

"**সালাফগণ একমত পোষণ করেছেন,** মহান আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে নন, বরং তিনি তাঁর আকাশমণ্ডলীর ঊর্ধ্বে আরশের ওপরে রয়েছেন। ... তিনি গোপনীয় বিষয় এবং গোপনীয় বিষয়ের চেয়েও অধিক গুপ্ত বিষয় জানেন। আসমান ও জমিনে এমন কিছু নেই, যা কিনা তাঁর কাছে অজানা। এমনকি তিনি সকল সৃষ্টির সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এ বিষয়ের প্রমাণ—মহান আল্লাহর এই বাণী,

[897] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৫৬-৫৭।

‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।’ (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) **আলিমগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘এর মানে মাখলুকরা যেখানেই থাকুক না কেন, মহান আল্লাহর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে’।**”[898]

৩. আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, *‘ইমামুল মালিকিয়্যা’* খ্যাত বিদ্বান, **ইমাম আবু উমার আত-তালামানকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেছেন :**

«أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ بِذَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ».

“মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।’ (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) কুরআনে এ ধরনের আরও আয়াত এসেছে। **আহলুস সুন্নাহর মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন, এ জাতীয় আয়াতের অর্থ—মহান আল্লাহর জ্ঞান সকল সৃষ্টির সাথে আছে।** আর তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে আকাশমণ্ডলীর ওপরে রয়েছেন; তিনি নিজের আরশের ওপর যেভাবে ইচ্ছা আরোহণ করেছেন।”[899]

৪. আমরা ইতঃপূর্বে আরও উল্লেখ করেছি, **ইমাম আবু নাসর আস-সিজ্জি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৪ হি.) বলেছেন :**

---

[898] আল-আশারি, ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর,*** পৃ. ১৩০-১৩২।

[899] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৫১৯; আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৪৬; ইবনুল কাইয়্যিম, ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা,*** পৃ. ২০৪।

«أَئِمَّتنَا كسفيان الثَّوْريّ وَمَالك وَحَمَّاد بن سَلمَة وَحَمَّاد بن زيد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة والفضيل وَابْن الْمُبَارك وَأحمد وَإِسْحَاق متفقون على أَن الله سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوق الْعَرْش وَعلمه بِكُل مَكَان».

"আমাদের ইমামগণ—যেমন সুফইয়ান আস-সাওরি, মালিক বিন আনাস, হাম্মাদ বিন সালামা, হাম্মাদ বিন জাইদ, সুফইয়ান বিন উয়াইনা, ফুদাইল বিন ইয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বাল এবং ইসহাক বিন রাহুইয়াহ—**এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে আরশের ওপরে আছেন, আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে[900]।**"[901]

৫. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :

«وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ عز وجل (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ معهم أينما كَانُوا)، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ. لِأَنَّ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الَّذِينَ حَمَلْتُ عَنْهُمُ التَّأْوِيلَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا فِي

---

[900] কেউ কেউ ভাবতে পারেন, *'মহান আল্লাহর জ্ঞান সব জায়গায় আছে'*—এ কথার মানে কি আল্লাহর সিফাত সৃষ্টিজগতের মধ্যে আছে? মূলত সালাফগণ যখন বলেন, *'মহান আল্লাহর জ্ঞান সব জায়গায় আছে,'* তখন তাঁরা বোঝান, মহান আল্লাহ সকল জায়গার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় পূর্ণরূপে জানেন। এ জাতীয় কথার মাধ্যমে তাঁরা এটা বোঝান না যে, মহান আল্লাহর সত্তাগত সিফাত সৃষ্টিজগতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! মহান আল্লাহর 'ইলম বা জ্ঞান' সিফাতটি আল্লাহর সত্তাতেই আছে। কিন্তু এই সিফাতের প্রভাব আছে সৃষ্টিজগতে। তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানেন। একইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর চোখ দিয়ে দেখেন। আল্লাহ তাআলার 'চোখ' সিফাত, 'দর্শন/দেখা' সিফাত তাঁর সত্তাতেই আছে। কিন্তু এই সিফাতের প্রভাব আছে সৃষ্টিজগতের মধ্যে। এর মানে এটা না যে, তাঁর 'দর্শন' সিফাতটি সৃষ্টিজগতের মধ্যে ঢুকে গেছে!

[901] আজ-জাহাবি, ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার,*** পৃ. ২৪৮।

تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَمَا خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ»

"একদল লোক মহান আল্লাহর এই বাণী দিয়ে (আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে) দলিল পেশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।' (*সুরা মুজাদালা ৫৮:৭*) প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে তাদের মতের পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা সাহাবি ও তাবেয়িদের আলিমগণ—যাঁদের থেকে আমি কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি—**এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তিনি আছেন আরশের ওপরে, আর তাঁর জ্ঞান রয়েছে সর্বত্র।' এ বিষয়ে এমন কোনো ব্যক্তি তাঁদের বিরোধিতা করেনি, যার বক্তব্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।**"[902]

৬. প্রখ্যাত তাফসিরকারক **আল্লামা ইবনু আতিয়্যা আল-আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪২ হি.) বলেছেন :**

«وقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها».

"মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।' (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) অর্থাৎ, **মহান আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞান ও পরিবেষ্টনের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছেন। আলোচ্য আয়াতের এই**

[902] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

ব্যাখ্যার ব্যাপারে পুরো উম্মত ঐক্যমত পোষণ করেছে।"[903]

৭. সুরা মুজাদালার আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রখ্যাত তাফসিরকারক **হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪২ হি.) বলেছেন :**

«ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو ﷻ مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، ثم قال تعالى ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم».

"এজন্য **একাধিক বিদ্বান ইজমা বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'সাথে থাকার' মানে—মহান আল্লাহর জ্ঞান সকল সৃষ্টির সাথে আছে। এ বিষয়ে (আহলুস সুন্নাহর) সকল বিদ্বান একমত।** সুতরাং এই ব্যাখ্যার সত্যতা সন্দেহাতীত। তবে শুধু জ্ঞানই নয়; বরং আল্লাহর শ্রবণও সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে। আল্লাহর দর্শন তথা দৃষ্টিও তাদেরকে সর্বদা অবলোকন করছে। বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। সৃষ্টিকুলের কোনো বিষয়ই আল্লাহর কাছে গোপনীয় নয়। এরপর আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন, 'তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কেয়ামত দিবসে তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবগত।'

---

[903] আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হাক বিন গালিব ইবনু আতিয়্যা আল-আন্দালুসি, ***আল-মুহার্রারুল ওয়াজিজ ফি তাফসিরিল কিতাবিল আজিজ,*** তাহকিক : আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফি মুহাম্মাদ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

(*সুরা মুজাদালা ৫৮:৭*) ইমাম আহমাদ বলেন, 'মহান আল্লাহ এই আয়াতটি শুরু করেছেন তদীয় জ্ঞানের আলোচনা দিয়ে এবং শেষও করেছেন জ্ঞানের আলোচনা দিয়ে'।"[904]

[904] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৮, পৃ. ৭৩।

তাবিলের অভিযোগ ও তার অপনোদন :

আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, কালামনির্ভর আকিদা পোষণকারী একদল লোক দাবি করে থাকেন, "সালাফিরা মহান আল্লাহর 'সাথে থাকা' সিফাতের তাবিল করে বলে, 'এর মানে ইলমের মাধ্যমে সাথে থাকা।' সালাফিরা তাবিল করলে সঠিক, কেবল আমরা তাবিল করলেই দোষী?!"

আমরা তাঁদের কথার জবাবে বলি, কোনো কথার প্রকাশ্য অর্থকে বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ দাঁড় করানোকে **তাবিল** বলে। 'ইলমের মাধ্যমে সাথে থাকার' যে অর্থটি আমরা করে থাকি, সেটা তো নিজেই প্রকাশ্য অর্থ। কারণ আরবি ভাষায় 'মাআ' তথা 'সাথে থাকা' শব্দটির অর্থ স্রেফ 'মিশে থাকাই' হয় না। আরবি ভাষায় এই শব্দের একাধিক অর্থ ও প্রয়োগ রয়েছে, যেগুলো প্রকাশ্য অর্থ হিসেবেই বিদিত। উক্ত শব্দের সেসব প্রয়োগ শোনামাত্র একজন আরবিভাষী শ্রোতা বুঝে যান, এখানে কোন অর্থটি বোঝানো হচ্ছে। আর 'প্রকাশ্য অর্থের' আলোচনায় আমরা এটাও জেনেছি যে, প্রকাশ্য অর্থ কখনো কখনো শব্দের মৌলিক অর্থ থেকে পরিস্ফুটিত হয়, আবার কখনো কখনো পুরো কথার প্রসঙ্গ থেকে পরিস্ফুটিত হয়।

কালামিদের এই অভিযোগের চমৎকার জবাব দিয়েছেন শাইখুল হানাবিলা ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.)। **তিনি বলেছেন :**

«فَإِن قيل فقد تأولتم آيَات وأخبارا فقلتم فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم﴾ [الْحَدِيد ٤] أَي بِالْعلمِ وَنَحْو هَذَا من الْآيَات وَالْأَخْبَار فيلزمكم مَا لزمنا. قُلْنَا نَحن لم نتأول شَيْئا وَحمل هَذِه اللفظات على هَذِه الْمعَانِي لَيْسَ بِتَأْوِيل لِأَن التَّأْوِيل صرف اللَّفْظ

عَن ظَاهره وَهَذِه الْمعَانِي هِيَ الظَّاهِر من هَذِه الْأَلْفَاظ بِدَلِيل أَنه الْمُتَبَادر إِلَى الأفهام مِنْهَا. وَظَاهر اللَّفْظ هُوَ مَا يسْبق إِلَى الْفَهم مِنْهُ حَقِيقَة كَانَ أَو مجَازًا وَلذَلِك كَانَ ظَاهر الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة الْمجَاز دون الْحَقِيقَة كاسم الراوية والظعينة وَغَيرهمَا من الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فَإِن ظَاهر هَذَا الْمجَاز دون الْحَقِيقَة وصرفها إِلَى الْحَقِيقَة يكون تَأْوِيلا يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَكَذَلِكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي لَهَا عرف شَرْعِي وَحَقِيقَة لغوية كَالْوضُوءِ وَالطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج إِنَّمَا ظَاهرهَا الْعرف الشَّرْعِيّ دون الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة. وَإِذا تقرر هَذَا فالمتبادر إِلَى الْفَهم من قَوْلهم الله مَعَك أَي بِالْحِفْظِ والكلاءة وَلذَلِك قَالَ الله تَعَالَى فِيمَا أخبر عَن نبيه ﴿إِذْ يَقُول لصَاحبه لَا تحزن إِن الله مَعنا﴾ [التَّوْبَة ٤٠] وَقَالَ لمُوسَى ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أسمع وَأرى﴾ [طه ٤٦] وَلَو أَرَادَ أَنه بِذَاتِهِ مَعَ كل أحد لم يكن لَهُم بذلك اخْتِصَاص لوُجُوده فِي حق غَيرهم كوجوده فيهم وَلم يكن ذَلِك مُوجبا لنفي الْحزن عَن أبي بكر وَلَا عِلّة لَهُ.

فَعلم أَن ظَاهر هَذِه الْأَلْفَاظ هُوَ مَا حملت عَلَيْهِ فَلم يكن تَأْوِيلا ثمَّ لَو كَانَ تَأْوِيلا فَمَا نَحن تأولنا وَإِنَّمَا السّلف رَحْمَة الله عَلَيْهِم الَّذِي ثَبت صوابهم وَوَجَب اتباعهم هم الَّذين تأولوه فَإِن ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك ومالكا وسُفْيَان وَكَثِيرًا من الْعلمَاء قَالُوا فِي قَوْله ﴿وَهُوَ مَعكُمْ﴾ أَي علمه ثمَّ قد ثَبت بِكِتَاب الله والمتواتر عَن رَسُول الله ﷺ وَإِجْمَاع السّلف أَن الله تَعَالَى فِي السَّمَاء على عَرْشه وَجَاءَت هَذِه اللَّفْظَة مَعَ

قَرَائِن محفوفة بهَا دَالَّة على إِرَادَة الْعلم مِنْهَا وَهُوَ قَوْله ﴿أَلم تَرَ أَن اللّٰه يعلم مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض﴾ [المجادلة ٧] ثمَّ قَالَ فِي آخرهَا ﴿أَن اللّٰه بِكُل شَيْء عليم﴾ فبدأها بِالْعلمِ وختمها بِهِ ثمَّ سياقها لتخويفهم بِعلم اللّٰه تَعَالَى بحالهم وَأَنه ينبئهم بِمَا عمِلُوا يَوْم الْقِيَامَة ويجازيهم عَلَيْهِ. وَهَذِه قَرَائِن كلهَا دَالَّة على إِرَادَة الْعلم فقد اتّفق فِيهَا هَذِه الْقَرَائِن وَدلَالَة الْأَخْبَار على مَعْنَاهَا ومقالة السّلف وتأويلهم فَكيف يلْحق بهَا مَا يُخَالف الْكتاب وَالْأَخْبَار ومقالات السّلف. فَهَذَا لَا يخفى على عَاقل إِن شَاءَ اللّٰه تَعَالَى وَإِن خَفِي فقد كشفناه وبيناه بِحَمْد اللّٰه تَعَالَى».

“কেউ কেউ বলতে পারে, ‘তোমরা তো কিছু আয়াত ও হাদিসের তাবিল করেছ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন।” (*সুরা হাদিদ ৫৭:৪*) তোমরা এই আয়াতের তাবিল করে বলেছ, “এর মানে—মহান আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছেন।” অনুরূপভাবে এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রেও তোমরা তাবিল করেছ। সুতরাং আমরা তাবিল করলে আমাদের জন্য যা অপরিহার্য হয়, তোমরা তাবিল করলে তোমাদের জন্যও সেটাই অপরিহার্য হবে।’

আমরা তাদের কথার জবাবে বলব, আমরা কোনো কিছুরই তাবিল করিনি। এসব শব্দের এরকম অর্থ করা তাবিল নয়। কেননা কোনো শব্দের প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অপ্রকাশ্য অর্থ দাঁড় করানোকে **তাবিল** বলে। অথচ এসব

শব্দের ক্ষেত্রে আলোচ্য অর্থগুলোই প্রকাশ্য অর্থ। কারণ এসব শব্দ বলা হলে শ্রোতার মনে উক্ত অর্থগুলোই প্রথমে উদিত হয়। কোনো শব্দ শোনামাত্র শ্রোতার মনে প্রথমে যেই অর্থ উদিত হয়, সেটাকে ওই শব্দের ***'প্রকাশ্য অর্থ'*** বলা হয়; চাই সেই প্রকাশ্য অর্থটি প্রকৃত অর্থ হোক, কিংবা রূপক অর্থ। এজন্য প্রথাগতভাবে প্রচলিত কিছু রূপক নাম আছে। যেমন রাবিয়া, জায়িনা প্রভৃতি।[905] এসব নামের রূপক অর্থটিই প্রকাশ্য অর্থ, প্রকৃত অর্থ নয়। তাই এসব নামের রূপক অর্থ না করে প্রকৃত অর্থ করলে সেটা তাবিল হিসেবে গণ্য হবে; যেই তাবিল হলো দলিলের মুখাপেক্ষী (কারণ সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া তাবিল করা জায়েজ নয়)। অনুরূপভাবে কিছু শব্দের ভাষাগত প্রকৃত অর্থের পাশাপাশি একটি করে শরয়ি পারিভাষিক অর্থও আছে। যেমন ওজু, তাহারাত (পবিত্রতা), সালাত, সাওম, জাকাত, হজ প্রভৃতি। এসব শব্দের শরয়ি পারিভাষিক অর্থটিই প্রকাশ্য অর্থ, ভাষাগত প্রকৃত অর্থ নয়।

এই আলোচনা যখন সুসাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন মনে রাখা উচিত, মানুষ যখন বলে, 'আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন,' তখন এই কথাটি শোনামাত্র শ্রোতার মনে প্রথমে যেই অর্থটি উদিত হয়, তা হলো—মহান আল্লাহ হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তোমার সাথে আছেন। মহান

[905] আরবি ভাষায় 'রাবিয়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ—এমন পাত্র, যেখান থেকে পশুপাখি পানি পান করে। কিন্তু প্রথাগত প্রচলন অনুযায়ী শব্দটির অর্থ—মশক। তদ্রূপ 'জায়িনা' শব্দের প্রকৃত অর্থ—আরোহণ-উপযোগী উষ্ট্রী। কিন্তু প্রথাগতভাবে শব্দটি 'মহিলা/নারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ এসব প্রথাগত প্রচলিত অর্থকে *'মাজাজ'* তথা *'রূপক'* আখ্যা দিয়েছেন। যদিও অনেক প্রাজ্ঞ উসুলবিদ এ ধরনের অর্থকে 'রূপক' না বলে *'হাকিকা উরফিয়্যা'* তথা *'প্রথাগত প্রকৃত অর্থ'* বলে থাকেন।

আল্লাহ তাঁর নবির ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন, 'স্মরণ করো, যখন তিনি (নবিজি মুহাম্মাদ) তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।' (*সুরা তাওবা ৯:৪০*) আর মুসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশে মহান আল্লাহ বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি; আমি শুনি এবং দেখি।' (*সুরা তহা ২০:৪৬*) মহান আল্লাহ যদি এসব কথার মাধ্যমে বোঝাতেন, *'তিনি সত্তাগতভাবে প্রত্যেকের সাথে আছেন,'* তাহলে এতে তাঁদের জন্য কোনো বিশেষত্ব থাকত না। কেননা তাঁদের মতো অন্য মাখলুকদের সাথেও তো তিনি আছেন। *'তিনি সত্তাগতভাবে প্রত্যেকের সাথে আছেন,'* এটাই যদি তিনি উদ্দেশ্য করতেন, তাহলে নবিজির কথা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুঃখ দূরীভূত হওয়ার কারণ হতো না; এবং নবিজির কথার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিও থাকত না।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল, এই শব্দগুলোর যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলোই উক্ত শব্দাবলির প্রকাশ্য অর্থ। সুতরাং এই ব্যাখ্যাগুলো **তাবিল** নয়। (তর্কের খাতিরে) এসব ব্যাখ্যাকে যদি 'তাবিল' ধরেও নেওয়া হয়, তাতে কী হয়েছে? আমরা তো এই তাবিল করিনি। বরং যেই সালাফগণ রাহিমাহুমুল্লাহর কথার সঠিকতা প্রমাণিত এবং যাঁদের অনুসরণ করা ফরজ, তাঁরা নিজেরাই এসব তাবিল করেছেন। কারণ *'আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন'*—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস, দাহহাক, মালিক,

সুফইয়ান এবং আরও অনেক আলিম বলেছেন, 'মহান আল্লাহর জ্ঞান তোমাদের সাথে আছে।'

উপরন্তু আল্লাহর কিতাব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত) সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমার মাধ্যমে সুপ্রমাণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ আসমানের ঊর্ধ্বে স্বীয় আরশের ওপরে আছেন। এছাড়াও আলোচ্য 'সাথে থাকা' শব্দটি এমনসব ইঙ্গিতবহ প্রমাণ-সহ এসেছে, যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এখানে 'জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকাই' উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন সুরা মুজাদালার আয়াতটির শুরুতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি কি জানেন না, আসমানরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন?' এরপর আয়াতের শেষাংশে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পুরোপুরি অবগত।' (*সুরা মুজাদালা ৫৮:৭*) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আয়াতটি শুরু করেছেন জ্ঞানের আলোচনা দিয়ে এবং শেষও করেছেন জ্ঞানের আলোচনা দিয়ে। এতদ্ব্যতীত আয়াতটির সামগ্রিক প্রেক্ষাপট হলো—মহান আল্লাহ মুনাফিকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছিলেন। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন, তাদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত; তিনি কেয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা কী কী কাজ করেছে, এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেবেন।

এসব ইঙ্গিতবহ প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়, এখানে 'জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকাকেই' উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এই ব্যাখ্যার পক্ষে একসঙ্গে মিলিত হয়েছে—অনেকগুলো ইঙ্গিতবহ প্রমাণ, এ বিষয়ক আয়াত ও হাদিসগুলোর মর্মার্থ এবং সালাফদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ব্যাখ্যা। সুতরাং যেসব ব্যাখ্যা কিতাব, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের বিপরীত, সেসব ব্যাখ্যাকে কীভাবে আমাদের আলোচিত ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে? উক্ত বিষয়টি কোনো বিবেকবান মানুষের কাছেই অস্পষ্ট থাকার কথা নয় ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারও কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকেও থাকে, তথাপি আমরা তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।”[906]

[906] ইবনু কুদামা, ***জাম্মুত তাবিল,*** পৃ. ৪৫-৪৬।

অধ্যায় ৭

বড়ো কুফর নয় এমন গুনাহকারীকে কাফির না বলা

মূলপাঠ



وَأَلَّا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ : مَنْ أَصَابَ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ. وَلَا تَكْفِيرَ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، إِنَّمَا الْكُفْرُ فِي تَرْكِ الخَمْسِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ».

আমরা খারেজিদের মতো একথা বলি না যে, “কেউ কোনো কবিরা গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায়।” কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না। কেবল সেই পাঁচটি বিষয় পরিত্যাগ করলেই কুফর হয়, যেসবের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি ভিত্তির ওপর— **(১)** এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল, **(২)** নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, **(৩)** জাকাত প্রদান করা, **(৪)** রমজান মাসের রোজা রাখা, **(৫)** বাইতুল্লাহর হজ করা।”[907]

[907] সহিহুল বুখারি, হা. ৫০; সহিহ মুসলিম, হা. ৮।

ব্যাখ্যা



ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এখানে সপ্তম মূলনীতির আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কারণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার অন্যতম মূলনীতি—বড়ো কুফর নয় এমন গুনাহকারীকে 'কাফির' না বলা। আমরা প্রথমে লেখকের কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করব। তারপর বিস্তারিত আলোচনায় যাব ইনশাআল্লাহ।

লেখক বলেছেন, **"আমরা খারেজিদের মতো একথা বলি না যে, 'কেউ কোনো কবিরা গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায়'।"** তিনি এখানে আহলুস সুন্নাহর সাথে খারেজিদের আকিদার পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। খারেজিরা 'বড়ো কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহ' করলে ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় এবং তাকে *'কাফির'* আখ্যা দেয়।

এরপর লেখক বলেছেন, **"কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না।"** লেখকের এই কথা ব্যাপক। তাঁর কথার বাহ্যিক অর্থ দাঁড়ায়—কোনো পাপের কারণেই কাউকে কাফির বলা যায় না। কিন্তু তিনি এই ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য করেননি। বরং তিনি উদ্দেশ্য করেছেন—বড়ো কুফর ছাড়া কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, কীভাবে বোঝা গেল যে, লেখক এটাই উদ্দেশ্য করেছেন? এর উত্তরে বলা যায়, লেখকের এই কথা সালাফদের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সালাফগণ এটাকে সঠিকভাবেই বুঝতেন। যেমনভাবে আমরা সঠিক মর্মার্থ উল্লেখ করলাম। কারণ এ বিষয়ে সমগ্র আহলুস সুন্নাহ একমত পোষণ

করেছে যে, বড়ো কুফর ছাড়া অন্য কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে না। অধিকন্তু লেখকের পরবর্তী বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, তিনি এই উদ্দেশ্যেই কথাটি বলেছেন। কারণ পরবর্তী বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পরিত্যাগ করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। সুতরাং তিনি এমন পাপের অস্তিত্ব আছে মনে করেন, যেসবের দরুন একজন মানুষ কাফির হয়ে যায়।

তারপর লেখক বলেছেন, **“কেবল সেই পাঁচটি বিষয় পরিত্যাগ করলেই কুফর হয়, যেসবের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি ভিত্তির ওপর— (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাকাত প্রদান করা, (৪) রমজান মাসের রোজা রাখা, (৫) বাইতুল্লাহর হজ করা’।”**

অর্থাৎ, কেউ যদি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভই পরিত্যাগ করে, তাহলে সে কাফির বিবেচিত হবে। কেউ যদি এমন পাপ করে, যার দরুন তার দেওয়া তাওহিদের সাক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে কাফির বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ আল্লাহকে গালি দিলে, কিংবা দ্বীনের কোনো বিষয়কে ঠাট্টাবিদ্রুপ করলে—তার তাওহিদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়।

পাপের প্রকারভেদ

পাপ কতটুকু গুরুতর এবং ইমানবিরোধী, সেই বিবেচনায় উলামাগণ পাপকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

প্রথম ভাগ : এমন পাপ, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের পাপকে বড়ো কুফর বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরিক করা, দ্বীনের অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ : এমন বড়ো পাপ, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। এ ধরনের পাপকে 'কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহ' বলা হয়। এ জাতীয় পাপ ব্যক্তিকে 'ফাসিক মুসলিম' তথা 'পাপী মুসলিম' সাব্যস্ত করে। যেমন ব্যভিচার করা, চুরি করা, মদ্যপান করা, পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করা ইত্যাদি।

তৃতীয় ভাগ : ছোটো পাপ; যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকেও বের করে দেয় না, আবার ফাসিকও সাব্যস্ত করে না। যেমন অন্যায়ভাবে রেগে যাওয়া, শরিয়ত লঙ্ঘন করে বেগানা নারীর চেহারা দেখা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত তিন প্রকার পাপের কথা **মহান আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন :**

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾.

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরি, ফাসেকি ও অবাধ্যতাকে করেছেন অপ্রিয়।”[908]

উক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক **ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মারওয়াজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯৪ হি.) বলেন :**

«لَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي بَعْضُهَا كُفْرًا وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ، نَوْعٌ مِنْهَا كُفْرٌ، وَنَوْعٌ فِسْقٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، وَنَوْعٌ عِصْيَانٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ وَلَا فُسُوقٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلَّهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ».

“যেহেতু কিছু গুনাহ কুফর, আর কিছু গুনাহ কুফর নয়, সেহেতু মহান আল্লাহ গুনাহসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং গুনাহর তিনটি প্রকার করেছেন। এক প্রকার গুনাহ হলো কুফর; আরেক প্রকার গুনাহ হলো ফিসক (ফাসেকি/পাপাচারি) কিন্তু কুফর নয়; আবার আরেক প্রকার গুনাহ হলো অবাধ্যতা—যা না কুফরি, আর না ফাসেকি। মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এগুলোর সবকিছুকেই মুমিনদের কাছে অপছন্দনীয় করেছেন।”[909]

ইমামু আহলিস সুন্নাহ **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«وفصل بين الفسوق والعصيان وفي ذلك دلالة على أن من المعاصي ما لا يفسق به وإنما يفسق بارتكاب ما يكون منها من الكبائر أو الإصرار على ما يكون منها من الصغائر».

---

[908] সুরা আল-হুজুরাত ৪৯:৭।

[909] আল-মারওয়াজি, ***তাজিমু কাদরিস সালাত,*** খ. ১, পৃ. ৩৬২।

> "আল্লাহ ফাসেকি ও সাধারণ অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এমনও পাপ আছে, যেগুলোর কারণে কাউকে ফাসিক বলা যায় না। কেবল তখনই কাউকে ফাসিক বলা যায়—যখন কেউ বড়ো পাপে লিপ্ত হয়, কিংবা ছোটো পাপের ওপর অটল থাকে।"[910]

বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত দুই প্রকারভুক্ত গুনাহগুলোকে একত্রে *'কবিরা গুনাহ (বড়ো পাপ)'* এবং শেষোক্ত তৃতীয় ভাগের গুনাহগুলোকে *'সগিরা গুনাহ (ছোটো পাপ)'* বলা হয়। কবিরা গুনাহ ও সগিরা গুনাহর পার্থক্য নিয়ে আমি এখানে গভীর আলোচনা করব না। সহজে বোঝার জন্য মুহাক্কিক উলামাগণের আলোচনার সারকথা বলছি। **যেই পাপ থেকে বড়ো করে নিষেধ করা হয়েছে, সেটাই কবিরা গুনাহ।** যেমন দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, কিংবা লানত করা হয়েছে, কিংবা পরিপূর্ণ ইমান না থাকার কথা তথা ইমান কমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিংবা *'আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন'* বলা হয়েছে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেই পাপ থেকে এরকম বড়ো করে নিষেধ করা হয়নি, বরং স্বাভাবিকভাবে নিষেধ করা হয়েছে, সেটা সগিরা গুনাহ।[911]

---

[910] আবু বাকর আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি, ***শুআবুল ইমান,*** তাহকিক : মুখতার আহমাদ নদভী (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০০।

[911] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ৬৫০; ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৫২৬।

কুফর নয় এমন গুনাহকারীকে কাফির বলার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী কুফর নয় এমন গুনাহ সংঘটনকারীকে কাফির বলা যাবে না। আর যে ব্যক্তি গুনাহই করেননি, তাঁকে তো আরও কাফির বলা যাবে না। কবিরা গুনাহগার যে কাফির নয়, তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত। এ বিষয়ে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি দলিল পেশ করছি।

প্রথম দলিল :

শির্ক নয় এমন গুনাহ করলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ শির্কের চেয়ে নিম্নস্তরের গুনাহকারী কাফির হলে, পরকালে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আশ্বাস পেত না। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য সব (গুনাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।”[912]

পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

“নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কেউ যদি (নিজের) মুক্তির বিনিময়ে পৃথিবী ভর্তি সোনাও

[912] সুরা আন-নিসা ৪:৪৮।

দেয়, তবুও তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। ওদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; এবং ওদের জন্য কোনোই সাহায্যকারী নেই।"[913]

দ্বিতীয় দলিল :

শরিয়তের বিভিন্ন দলিলে কবিরা গুনাহগারদের মুমিন বলা হয়েছে। **মহান আল্লাহ বলেছেন :**

﴿وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.

"যদি মুমিনদের দুটো দল পারস্পরিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"[914]

এমনকি মহান আল্লাহ হত্যাকারীকে নিহতের 'ভাই' বলেছেন।[915] বলা বাহুল্য, নিহতের ভাই মানে রক্তসম্পর্কীয় ভাই নয়, বরং মুমিন ভাই। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, কেবল মুমিনরাই একে অপরের ভাই।[916]

তৃতীয় দলিল :

কবিরা গুনাহগাররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত পাবে। কবিরা গুনাহগাররা কাফির হলে নবিজির শাফায়াত পেত না। **নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :**

«شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

---

[913] সুরা আলে ইমরান ৩:৯১।

[914] সুরা আল-হুজুরাত ৪৯:৯।

[915] সুরা আল-বাকারা ২:১৭৮।

[916] সুরা আল-হুজুরাত ৪৯:১০।

“আমার উম্মতের কবিরা গুনাহগারদের জন্য রয়েছে আমার শাফায়াত।”[917]

চতুর্থ দলিল :

কবিরা গুনাহগারদের জন্য শরিয়তে *‘হুদুদ’* তথা *‘দণ্ডবিধির’* ব্যবস্থা রয়েছে। কবিরা গুনাহগার কাফির হলে স্রেফ শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো না। এই বিষয়ে খারেজিদের খণ্ডন করতে যেয়ে সালাফদের যুগের ইমাম **আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৪ হি.) বলেছেন :**

«قَدْ وَجَدْنَا اللَّهَ تبارك وتعالى يُكَذِّبُ مَقَالَتَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي السَّارِقِ بِقَطْعِ الْيَدِ وَفِي الزَّانِي وَالْقَاذِفِ بِالْجَلْدِ، وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ يُكَفِّرُ صَاحِبَهُ مَا كَانَ الْحُكْمُ عَلَى هَؤُلَاءِ إِلَّا الْقَتْلُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». أَفَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا كُفَّارًا لَمَا كَانَتْ عُقُوبَاتُهُمُ الْقَطْعُ وَالْجَلْدُ؟»

“আমরা দেখেছি, মহান আল্লাহ খারেজিদের মতাদর্শকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। কারণ তিনি চোরের ক্ষেত্রে হাত কর্তন এবং ব্যভিচারী ও ব্যভিচারের অপবাদদাতার ক্ষেত্রে চাবুকাঘাতের দণ্ড দিয়েছেন। যদি কোনো গুনাহ ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয়, তাহলে উক্ত গুনাহ সংঘটনকারীদের শাস্তি হতো স্রেফ মৃত্যুদণ্ড। কারণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তোমরা তাকে হত্যা করো (মুসলিম থেকে কাফির হয়ে গেলে হত্যা করো)।’[918] অথচ আপনি কি দেখেন না? তারা যদি

---

[917] আবু দাউদ, হা. ৪৭৩৯; তিরমিজি, হা. ২৪৩৫; বর্ণনার মান : সহিহ।

[918] সহিহুল বুখারি, হা. ৩০১৭।

কাফির হতো, তাহলে তাদের শাস্তি স্রেফ হাতকর্তন ও চাবুকাঘাত হতো না (বরং মৃত্যুদণ্ড হতো)।”[919]

পঞ্চম দলিল :

সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহ একমত পোষণ করেছেন, কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহ সংঘটনকারী কাফির না। সুতরাং তাকে কাফির বলা যাবে না। ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) এ বিষয়ে সমগ্র আহলুস সুন্নাহর আকিদার সারকথা উল্লেখ করেছেন। **তিনি বলেছেন :**

«ويعتقد أهل السنة أن المؤمن و إن أذنب ذنوبًا كثيرة صغائر وكبائر، فإنه لا يكفر بها، و إن خرج عن الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله ﷻ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا غانمًا غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، و إن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، و إذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار».

“আহলুস সুন্নাহর ব্যক্তিবর্গ আকিদা পোষণ করেন, একজন মুমিন যদি অনেক কবিরা ও সগিরা গুনাহ করে, তবুও এসব গুনাহর কারণে সে কাফির হয় না। সে যদি দুনিয়াবি জীবনে তওবা না করেও মারা যায়, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাওহিদ এবং শির্ক-কুফরমুক্ত ইমানের ওপর অটল থাকে,

---

[919] আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাবি, ***কিতাবুল ইমান ওয়া মাআলিমুহু ওয়া সুনানুহু ওয়া ইসতিকমালুহু ওয়া দারাজাতুহু,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছেই সোপর্দিত হবে। তার কৃত পাপ থাকার পরেও এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সে পাপের ওপর অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও, সেসবের কোনো সাজা ও জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াই আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন। আবার আল্লাহ চাইলে তাকে সাজা দিতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত জাহান্নামের শাস্তি দিতে পারেন। তবে তিনি তাকে শাস্তি দিলেও তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন না। বরং তাকে মুক্ত করে দেবেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতে প্রবেশ করাবেন।"[920]

সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করে **ইমাম ইবনুল কাত্তান আল-ফাসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২৮ হি.) বলেছেন :**

«وأجمع المسلمون من أهل السنة أن مؤمني أهل القبلة الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبجميع ما أمر الله تعالى ورسوله بالإيمان به، غير خارجين من الإسلام بكبائرهم، ولا مكفرين بها. وأجمعوا أن أحكام الإسلام جارية على القاتل والزاني وشارب الخمر وسائر الكبائر، مخاطبون باسم الإيمان مشتملة عليهم أحكامه. وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، غير كافر بها».

"আহলুস সুন্নাহর সকল মুসলিম একমত পোষণ করেছেন, আমাদের কিবলার অনুসারী মুসলিম দাবিদাররা—যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমগ্র ও রসুলগণের

[920] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ২৭৬।

প্রতি ইমান এনেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যেসবের প্রতি ইমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন সেসবের প্রতিও ইমান এনেছে—তাদের কবিরা গুনাহর কারণে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে না এবং তাদেরকে কাফির বলাও যাবে না। আহলুস সুন্নাহর মুসলিমগণ একমত—হত্যাকারী, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী এবং অন্যান্য কবিরা গুনাহকারীর জন্য ইসলামের বিধান প্রযোজ্য হবে; তাদেরকে ইমানের নামেই ডাকা হবে, এবং তাদের জন্য ইমানের বিধিবিধান কার্যকর হবে। সাহাবিবর্গ, তাবেয়িবৃন্দ এবং তাঁদের পরে আগত (সুন্নাহপন্থি) মুসলিমগণের সবাই একমত—একজন মুমিন তার ইমানের কারণে মুমিন, এবং কবিরা গুনাহর কারণে ফাসিক বিবেচিত হয়; কিন্তু (কবিরা গুনাহর কারণে) সে কাফির হয়ে যায় না।"[921]

কবিরা গুনাহগারকে কী বলা হবে সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতভেদ :

কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহকারী কাফির না হওয়ার ব্যাপারে পুরো আহলুস সুন্নাহ একমত হলেও, কবিরা গুনাহগারকে কী বলা হবে তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন—

প্রথম মত : কবিরা গুনাহগারকে *'অপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন'* বলা হবে। অর্থাৎ, সে মুমিন, কিন্তু অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী; এভাবে বলা হবে। এই অভিমত জাবির বিন আব্দুল্লাহ,

---

[921] আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ ইবনুল কাত্তান আল-ফাসি, ***আল-ইকনা ফি মাসায়িলিল ইজমা,*** তাহকিক : হাসান ফাওজি আস-সায়িদি (কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫।

ইবনুল মুবারাক, ইসহাক বিন রাহুইয়াহ, আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[922]

দ্বিতীয় মত : কবিরা গুনাহগারকে *'মুমিন'* বলা যাবে না, বরং শুধু *'মুসলিম'* বলতে হবে। দুটো মতই ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।[923]

স্মর্তব্য যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা থেকে সতর্ক করেছেন। **হাদিসে এসেছে :**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ إِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেউ তার ভাইকে কাফির বললে, (উক্ত কুফরি ফতোয়া) তাদের দুজনের একজনের ওপর বর্তাবে। সে যা বলেছে, তা যদি সঠিক হয়, তো ভালো। অন্যথায় যে বলেছে তার ওপরই ওই কথা ফিরে যাবে।"[924]

কাফির না হওয়া সত্ত্বেও কাউকে কাফির বলা, কিংবা কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহকারীকে কাফির আখ্যা দেওয়া—একটি নিকৃষ্ট বিদাত। এটা আহলুস সুন্নাহ ও বিদাতিদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী

---

[922] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ২৪১; আল-উমাইরি, ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩২৪।

[923] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম,*** তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও ইবরাহিম বাজিস (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১১১।

[924] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬।

বিষয়। **এজন্য ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :**

«وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ وَإِنْ عَظُمَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَخَالَفَهُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ».

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত; যারা মূলত আহলুল ফিকহি ওয়াল আসার (ফিকহ ও হাদিসের অনুসারী)। তাঁরা সবাই একমত পোষণ করেছেন, কুফর নয় এমন গুনাহ যত বড়োই হোক না কেন, তা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এ বিষয়ে বিদাতি গোষ্ঠীর লোকেরা আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে।"[925]

[925] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ১৭, পৃ. ২২।

কবিরা গুনাহগারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা

বড়ো কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহ সংঘটনকারীকে কাফির বলার ক্ষেত্রে তিনটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে। যথা :

প্রথম দল : খারেজি সম্প্রদায়

খারেজিদের মতে, কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহকারী—কাফির এবং সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। বর্তমান যুগের অনেক খারেজি মুখে এই আকিদা স্বীকার না করলেও দেখা যায়, তারা কোনো একটা কবিরা গুনাহর কারণে কিংবা হয়তো সগিরা গুনাহ অথবা 'গুনাহই না' এমন বিষয়ের কারণে অমুক-তমুককে কাফির বলে দেয়। তাদের এই কাজও নিকৃষ্ট খারেজিদের কাজ এবং তাদের বিশ্বাসও খারেজিদের বিশ্বাস। আর তাইতো খারেজিদের ব্যাপারে সাহাবি **ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছিলেন :**

«إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».

"এরা এমন কিছু আয়াতকে মুমিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে, যা নাজিল হয়েছে কাফিরদের ব্যাপারে!"[926]

খারেজিদের আকিদা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে সালাফদের যুগের ইমাম **আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৪ হি.) বলেছেন :**

---

[926] সহিহুল বুখারিতে বর্ণিত সনদবিহীন হাদিস, অধ্যায় : ৮৮, পরিচ্ছেদ : ৬। বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন সনদে হাদিসটি তাফসিরুত তাবারিতে এসেছে। **দ্রষ্টব্য :** আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১২, পৃ. ২৮৬।

«لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ؛ الَّذِينَ مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ بِالتَّأْوِيلِ، فَكَفَّرُوا النَّاسَ بِصِغَارِ الذُّنُوبِ وَكِبَارِهَا».

"কেননা এটা সেই খারেজিদের মতাদর্শ; যারা (শরিয়তের) তাবিল করে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। তারা কবিরা ও সগিরা গুনাহর কারণে মানুষদের কাফির আখ্যা দিয়েছে।"[927]

সালাফদের ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন :**

«كَمْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّفَاعَةِ وَالْحَوْضِ، فَهَؤُلَاءِ يُكَذِّبُونَ بِهَا وَيَتَكَلَّمُونَ، وَهُوَ قَوْلُ صِنْفٍ مِنَ الْخَوَارِجِ، وَإِنَّ اللَّهَ **تَعَالَى لَا يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَحَدًا بَعْدَ إِذْ أَدْخَلَهُ**، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَدَلَ عَنَّا مَا ابْتَلَاهُمْ بِهِ».

"শাফায়াত ও হাওজে কাওসার সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কত হাদিসই না বর্ণিত হয়েছে! অথচ এরা সেগুলোকে অস্বীকার করে, আর যুক্তি হাজির করে। এটা খারেজিদের এক দলের অভিমত। **তারা (খারেজিরা) বলে, মহান আল্লাহ জাহান্নামে কাউকে একবার প্রবেশ করানোর পর আর কখনো বের করবেন না।** যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সেই মতাদর্শ থেকে রক্ষা করেছেন, যা দিয়ে তিনি ওদেরকে দুর্যোগে ফেলেছেন।"[928]

খারেজিদের সম্পর্কে ইমাম আহমাদের ছাত্র **ইমাম হার্ব আল-কিরমানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.) বলেছেন :**

---

[927] ইবনু সাল্লাম, ***কিতাবুল ইমান,*** পৃ. ৭৬।

[928] আল-লালাকায়ি, ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ,*** খ. ৬, পৃ. ১১৮৩।

«وهم يقولون: من كذب كذبة، أو أتى صغيرة، أو كبيرة من الذنوب، فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا».

“তারা বলে, যে ব্যক্তি একটি মিথ্যা বলে, কিংবা কোনো ছোটো গুনাহ করে, অথবা কোনো বড়ো গুনাহ করে, তারপর তওবা না করেই মারা যায়—সে কাফির। সে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।”[929]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ খারেজিদের মৌলিক আকিদা বর্ণনা করেছেন। **তিনি লিখেছেন :**

«فَأَصْلُ قَوْلِ الْخَوَارِجِ أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالذَّنْبِ، وَيَعْتَقِدُونَ ذَنْبًا مَا لَيْسَ بِذَنْبِ، وَيَرَوْنَ اتِّبَاعَ الْكِتَابِ دُونَ السُّنَّةِ الَّتِي تُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ - وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً - وَيُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ وَيَسْتَحِلُّونَ مِنْهُ لِارْتِدَادِهِ عِنْدَهُمْ مَا لَا يَسْتَحِلُّونَهُ مِنْ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ».

“খারেজিদের মূল আকিদা হলো—তারা পাপের কারণে মুসলিমদের কাফির আখ্যা দেয়। আর তারা এমন অনেক কিছুকে পাপ মনে করে, যা আসলে পাপই নয়। তারা মনে করে, কুরআন অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু তারা সেই সুন্নাহর অনুসরণকে ঠিক মনে করে না, যা কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। যদিও উক্ত সুন্নাহ বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর মারফতে বর্ণিত হয়ে থাকে। যে তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাকে কাফির মনে করে। আর উক্ত বিরোধী ব্যক্তি তাদের মতানুযায়ী মুরতাদ হওয়ায়—তার এমনকিছু বিষয় (জান-মাল) তারা হালাল মনে করে, যা কিনা তারা প্রকৃত কাফিরের ক্ষেত্রেও হালাল মনে করে না।”[930]

---

[929] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** পৃ. ৮৮।

[930] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ৩৫৫।

দ্বিতীয় দল : মুতাজিলা সম্প্রদায়

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহকারী কাফিরও নয়, আবার মুসলিমও নয়; বরং সে দুটো স্তরের মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তারা কবিরা গুনাহগারের কাছ থেকে 'মুসলিম' পরিচয় ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু কাফিরও বলে না। এ ক্ষেত্রে তারা খারেজি সম্প্রদায় ও আহলুস সুন্নাহ উভয়ের সাথে মতবিরোধ করেছে। তাদের এই আকিদা মুতাজিলি বিদ্বান কাদি আব্দুল জাব্বার আল-মুতাজিলি-সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।[931]

কিন্তু পরকালে কবিরা গুনাহগারের কী অবস্থা হবে, সে বিষয়ে মুতাজিলিদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আশারি মতাদর্শের ফের্কাতত্ত্ববিদ আব্দুল কাহির আল-বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৯ হি.) উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ মুতাজিলির মতে, কবিরা গুনাহগার তওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। এই আকিদার ক্ষেত্রে তারা খারেজিদের সাথে মিলে গেছে এবং আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন শাবিব আল-বাসরি, আস-সালিহি, আল-খালিদি প্রমুখ মুতাজিলি পণ্ডিত পরকালে কবিরা গুনাহগারদের ব্যাপারে *'তাওয়াক্কুফ (কোনো মত না দিয়ে ক্ষান্ত থাকা)'* অবলম্বন করেছেন। তবে তাঁরা মনে করেন, তওবা ছাড়াও কবিরা গুনাহগারদের ক্ষমা করা মহান আল্লাহর জন্য বৈধ।[932] জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর জন্য নিজে থেকে কোনো কাজকে বৈধ, কিংবা ওয়াজিব

---

[931] আব্দুল জাব্বার, ***শারহুল উসুলিল খমসা,*** পৃ. ৬৯৭।

[932] আবু মানসুর আব্দুল কাহির বিন তাহির আল-বাগদাদি, ***আল-ফারক বাইনাল ফিরাক ওয়া বায়ানুল ফিরকাতিন নাজিয়া*** (বৈরুত : দারুল আফাকিল জাদিদা, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৯৬।

কিংবা হারাম সাব্যস্ত করা—মুতাজিলিদের গোমরাহি আকিদার ফসল।[933]

সর্বোপরি, খারেজি ও মুতাজিলি উভয় সম্প্রদায়ের উক্ত কদর্য আকিদা আমাদের উল্লিখিত পাঁচটি শক্তিশালী দলিলের আলোকে বাতিল সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এদের বাতিল আকিদা ও আমল থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

তৃতীয় দল : মুরজিয়া সম্প্রদায়

সমগ্র মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতি অনুযায়ী, কুফর নয় এমন কবিরা গুনাহকারী পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন; তার ইমান আর ফেরেশতা জিবরাইল-মিকাইলের ইমান সমান! কারণ মুরজিয়াদের মৌলিক আকিদা হলো—আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত না এবং ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। যেহেতু আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত না, সেহেতু ব্যক্তি যতই কুকর্ম করুক না কেন, কাফির না হওয়ার মতো কাজ না করা অবধি সে মুরজিয়াদের কাছে পরিপূর্ণ ইমানদার সাব্যস্ত হয়! কিন্তু কবিরা গুনাহগারের ব্যাপারে সাধারণত মুরজিয়ারা হুবহু এই কথা বলে না যে, "তারা পরিপূর্ণ ইমানদার," কিংবা "তাদের ইমান জিবরাইল-মিকাইলের সমান।" কিন্তু তাদের আকিদার লাজিম বা অপরিহার্য বিষয় ওটাই দাঁড়ায়। এজন্য অনেক বিদ্বান তাদের আকিদার লাজিম হিসেবে ওটাকেই তাদের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[934]

তবে জাহমিয়া সম্প্রদায় কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অনেক মুরজিয়া কবিরা গুনাহগারকে পরিপূর্ণ ইমানদার বলেছে—এরকম

---

933 আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম মুখালাফাতা আহলিল জাহিম,*** তাহকিক : নাসির আব্দুল কারিম আল-আকল (বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩১০।

934 আল-বাদর, ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু,*** পৃ. ৩২৫।

কথা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যে পাওয়া যায়।[935] আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

অপরদিকে, আশারি ফের্কার অনেক মুরজিয়া বিদ্বান এ মর্মে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন যে, কবিরা গুনাহগার আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার জাহান্নামের শাস্তিও দিতে পারেন। আর কবিরা গুনাহগাররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতও পাবে। তাঁদের এসব বক্তব্য আহলুস সুন্নাহর আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের আরেকদল বিদ্বান এক্ষেত্রে তাওয়াক্কুফ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা জানি না, মুসলিম দাবিদার কবিরা গুনাহগাররা জাহান্নামে যাবে, না যাবে না। তারা সবাই জাহান্নামে যেতে পারে, আবার তাদের একজনও জাহান্নামে না যেতে পারে, আবার তাদের সবাই না গেলেও কেউ কেউ যেতে পারে! যেমন কাদি আবু বাকর আল-বাকিল্লানি ও অন্যান্য আশারি বিদ্বান এই মত ব্যক্ত করেছেন।[936]

বলা বাহুল্য, মুরজিয়াদের আলোচ্য বাতিল মতগুলো তাদের মৌলিক আকিদার ওপর নির্ভরশীল। আর আমরা তাদের মৌলিক আকিদার ব্যাপারে সমগ্র সালাফের কেমন কঠোর অবস্থান ছিল—তা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

---

[935] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৩৫৪।

[936] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা,*** খ. ৫, পৃ. ২৮৪।

শাহাদাতাইন পরিত্যাগের বিধান

লেখক ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পরিত্যাগ করাকে বড়ো কুফর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা পাঁচটি স্তম্ভ পরিত্যাগের বিস্তারিত বিধান আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ইসলামের প্রথম স্তম্ভ *'শাহাদাতাইন'* তথা *'দুই সাক্ষ্য'* পরিত্যাগ করা বড়ো কুফর। কেউ যদি দুই সাক্ষ্য না দিয়ে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, তাহলে তার দাবি বাতিল। সে ব্যক্তি কোনোভাবেই মুসলিম নয়। এ ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :

«اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ».

"মুসলিমরা একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন তথা দুই সাক্ষ্য দেয়নি, সে কাফির।"[937]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

«فَأَمَّا «الشَّهَادَتَانِ» إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا عِنْدَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَجَمَاهِيرِ عُلَمَائِهَا وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُرْجِئَةِ وَهُمْ جهمية الْمُرْجِئَةِ: كَجَهْمِ وَالصَّالِحِيِّ وَأَتْبَاعِهِمَا إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ كَانَ كَافِرًا فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَصْلِ هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ».

"কেউ যদি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শাহাদাতাইন উচ্চারণ না করে, তবে সে মুসলিমদের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী

[937] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৩০৭।

কাফির। এই উম্মতের সালাফগণ, ইমামবর্গ ও অধিকাংশ আলিমের মতে সে অন্তরেও কাফির এবং প্রকাশ্যেও কাফির। কিন্তু মুরজিয়া সম্প্রদায়ের একটি দল—যেমন জাহম ইবনু সাফওয়ান, আস-সালিহি ও তাদের অনুসারীরা—মত দিয়েছে যে, যদি কেউ স্রেফ অন্তরে (শাহাদাতাইনকে) সত্যায়নকারী হয়, তাহলে সে প্রকাশ্যে কাফির, কিন্তু অন্তরে কাফির নয়! এই মতবাদের মূল উৎস সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদ ইসলামে উদ্ভাবিত একটি নতুন বিষয়; যেই মতবাদ ইমামদের কেউ ব্যক্ত করেননি।"[938]

[938] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬০৯।

নামাজ পরিত্যাগের বিধান

মুসলিমদের ইজমা তথা সর্ববাদিসম্মত অভিমত অনুযায়ী নামাজের আবশ্যকতা অস্বীকার করে নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির। **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

«أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ».

"কেউ যদি নামাজের আবশ্যকতায় বিশ্বাস না রেখে নামাজ পরিত্যাগ করে, তাহলে সে কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও ইজমার (ঐক্যমতের) ভিত্তিতে কাফির।"[939]

পক্ষান্তরে নামাজের আবশ্যকতা স্বীকার করার পরে অবহেলা বা অলসতা করে নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির, না পাপী মুসলিম—তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে **ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন :**

«اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدًا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام. ... وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدًا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام».

"কোনো মুসলিম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, তার বিধান সম্পর্কে আহলুল হাদিসগণ মতভেদ

[939] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২২, পৃ. ৪০।

করেছেন। তাকে এ কারণে (নামাজ পরিত্যাগের কারণে) কাফির বলেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এবং সালাফের একদল আলিম। তারা নামাজ পরিত্যাগকারীকে নামাজ ছাড়ার কারণে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছেন। ... আর ইমাম শাফিয়ি, তাঁর অনুসারীবর্গ এবং সালাফদের আরেকদল আলিম রাহিমাহুমুল্লাহর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ব্যক্তি নামাজকে ওয়াজিব মনে করে, ততক্ষণ তাকে কাফির বলা যাবে না। তাকে কেবল হত্যা করা অবশ্যক হবে; যেমন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদকে হত্যা করা আবশ্যক।"[940]

যাঁরা বলেছেন, নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির, তাঁরা আবার প্রসিদ্ধ দুটো মতে মতভেদ করেছেন—

প্রথম মত : এক ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করলেই কাফির হয়ে যাবে। সালাফদের একদল বিদ্বান এই মত পোষণ করতেন। **ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন :**

«وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ ﷺ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ».

"ওমর, আব্দুর রহমান বিন আওফ, মুআজ বিন জাবাল, আবু হুরাইরা এবং অন্যান্য সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ফরজ নামাজও ছেড়ে দেয়, এমনকি সেই ফরজ নামাজের

[940] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ২৭৮-২৭৯।

ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, সে কাফির, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)।”[941]

ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :

«وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا وَقَالَ لَا أُصَلِّي فَهُوَ كَافِرٌ».

“ইবরাহিম আন-নাখয়ি, হাকাম বিন উতাইবা, আইয়ুব আস-সিখতিয়ানি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বাল এবং ইসহাক বিন রাহুইয়াহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ওজর ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নামাজও ছেড়ে দেয়, এমনকি সেই ফরজ নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়; এবং তা আদায় কিংবা কাজা করতে অস্বীকার করে বলে, *‘আমি নামাজ পড়ব না,’* সে কাফির।”[942]

দ্বিতীয় মত : এক-দুই ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করলেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হবে না; যতক্ষণ না সে বিলকুল সকল নামাজ পরিত্যাগ করছে। **এ মর্মে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেছেন :**

---

[941] আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি, ***আল-মুহাল্লা বিল আসার,*** তাহকিক : আব্দুল গাফফার আল-বিন্দারি (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ২, পৃ. ১৫।

[942] আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি, ***আল-ইস্তিজকার,*** তাহকিক : সালিম মুহাম্মাদ আতা ও মুহাম্মাদ আলি মুআওয়্যাদ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪৯।

«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّي قَطُّ، وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الْإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا؛ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُصَلُّونَ تَارَةً، وَيَتْرُكُونَهَا تَارَةً، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا، وَهَؤُلَاءِ تَحْتَ الْوَعِيدِ، وَهُمْ الَّذِينَ جَاءَ فِيهِمْ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّنَنِ حَدِيثُ عبادة عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.﴾ فَالْمُحَافِظُ عَلَيْهَا الَّذِي يُصَلِّيهَا فِي مَوَاقِيتِهَا، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالَّذِي يُؤَخِّرُهَا أَحْيَانًا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يَتْرُكُ وَاجِبَاتِهَا، فَهَذَا تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُ لِهَذَا نَوَافِلُ يُكَمِّلُ بِهَا فَرَائِضَهُ».

“যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অটল থাকে, কখনোই নামাজ পড়ে না এবং এ অবস্থায় মারা যায়; সে মুসলিম হতে পারে না। তবে অধিকাংশ মানুষ কখনো নামাজ পড়ে, আবার কখনো নামাজ ছাড়ে। তারা নামাজের হেফাজতকারী বান্দা নয়। নামাজের হেফাজত না-করা লোকদের ব্যাপারে যেই হুঁশিয়ারি এসেছে, এরা সেই হুঁশিয়ারির আওতাভুক্ত। এরা সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে *‘সুনান’* কিতাবগুলোতে বর্ণিত উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে এগুলোর হেফাজত করে (নিয়মিত আদায় করবে), তার জন্য আল্লাহর নিকট জান্নাতে প্রবেশের অঙ্গীকার রয়েছে।

আর যে এগুলোর হেফাজত করে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন।' অতএব, নামাজের হেফাজতকারী ব্যক্তি সে-ই, যে নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করে; যেমনভাবে মহান আল্লাহ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যে কখনো নামাজকে সময়ের পর আদায় করে, কিংবা এর ওয়াজিব অংশগুলো ছেড়ে দেয়, সে মহান আল্লাহ ইচ্ছাধীন। তবে তার নফল নামাজ থাকতে পারে, যেসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার ফরজ নামাজের ঘাটতি পূর্ণ করে দেবেন।"[943]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

«أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل. فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي ﷺ وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، و إذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه. فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال. ... الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم».

"আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়, তার কোনো আমল গ্রহণ করা হবে না। যেমনভাবে শির্কের সাথে কোনো আমল গ্রহণ করা হয় না। কারণ নামাজ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি (তাবুর মধ্যস্থ প্রধান স্তম্ভ)। যেমনটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। আর শরিয়তের বাকি কাজগুলো

[943] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২২, পৃ. ৪৯।

তাবু বাঁধার রশি ও ঠেকনা ইত্যাদির মতো। যদি কোনো তাঁবুর প্রধান স্তম্ভ না থাকে, তাহলে তার অন্য অংশগুলো থেকে কোনো উপকার হাসিল হয় না। সুতরাং অন্যান্য আমল গ্রহণের শর্ত হলো নামাজ কবুল হওয়া। যদি নামাজ প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে তার অন্যান্য আমলও প্রত্যাখ্যাত হবে। ... নামাজ ছেড়ে দেওয়ার দুটি ধরন আছে। এক হলো সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া, কখনোই নামাজ না পড়া। এভাবে নামাজ ছাড়লে সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে যায়। আরেকটি হলো কোনো নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্টভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া; এটি কেবল সেই দিনের আমল পণ্ড করে (সকল আমল পণ্ড করে না)।”[944]

[944] মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***আস-সালাত,*** তাহকিক : আদনান বিন সফাখান আল-বুখারি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১০৮-১০৯।

নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির না বলা কি মুরজিয়াদের আকিদা?

যারা নামাজ-পরিত্যাগকারীকে 'পাপী মুসলিম' বলেছেন, ইমানের পরিচয় বিষয়ে তাঁদের আকিদা শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে *'মুরজিয়া'* আখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যারা আহলুস সুন্নাহর কাউকে এই অবস্থান গ্রহণের দরুন *'মুরজিয়া'* বলে, তারা নিজেরাই বিরাট গোমরাহি নিয়ে আছে। তারা সালাফদের আকিদা-মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আমরা কিছুপূর্বে উল্লেখ করেছি, ইমাম সাবুনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) সমগ্র সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকিদা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হবে কিনা তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ মতভেদ করেছেন।[945]

নামাজ-পরিত্যাগকারীর বিধান বলার ক্ষেত্রে কখন একজন ব্যক্তি মুরজিয়া হয়, আর কখন মুরজিয়া হয় না—তা জেনে রাখা জরুরি। আমরা অত্যন্ত সহজভাবে বলতে পারি, নামাজ-ত্যাগকারীকে কাফির বলা বা না-বলার তিনটি প্রধান অবস্থা রয়েছে। যথা :

প্রথম অবস্থা : নামাজ-ত্যাগকারীকে কাফির না বলার ক্ষেত্রে মুরজিয়াদের আকিদাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা। যেমন এরকম যুক্তি পেশ করা যে, 'নামাজ একটি আমল, আর আমল ত্যাগ করলে কেউ কাফির হয় না,' কিংবা 'কাফির হয় কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে, তাই নামাজের মতো আমল ত্যাগ করলে কাফির হয় না,' কিংবা 'আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং আমলের অন্তর্ভুক্ত নামাজ ত্যাগ করলে ইমান নষ্ট হয়ে কাফির হয়ে যায় না।' এ ধরনের মুরজিয়া আকিদাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করলে ব্যক্তি মুরজিয়া সাব্যস্ত হবে।

---

[945] আস-সাবুনি, ***আকিদাতুস সালাফ,*** পৃ. ২৭৮-২৭৯।

দ্বিতীয় অবস্থা : নামাজ-ত্যাগকারীকে কাফির বলার ক্ষেত্রে খারেজিদের আকিদাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা। যেমন এরকম যুক্তি দেওয়া যে, 'নামাজ পরিত্যাগ করা একটি পাপ, আর পাপ করলেই ব্যক্তি কাফির!' কিংবা এরকম বলা যে, 'কোনো একটি ফরজ আমল ছাড়লেই কাফির; আর নামাজ যেহেতু আমল, সেহেতু নামাজ ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি কাফির।' যে ব্যক্তি এ জাতীয় যুক্তি দিয়ে নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির বলে, সে খারেজি।

তৃতীয় অবস্থা : নামাজ-ত্যাগকারীকে কাফির বলা কিংবা না-বলার ক্ষেত্রে খারেজি ও মুরজিয়াদের আকিদাকে যুক্তি হিসেবে পেশ না করা। বরং ইমানের পরিচয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদা রেখেই কুরআন-সুন্নাহর দলিল দিয়ে নামাজ-ত্যাগকারীকে 'পাপী মুসলিম' বলা। কিংবা ইমানের পরিচয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকিদা রেখেই কুরআন-সুন্নাহর দলিল দিয়ে নামাজ-ত্যাগকারীকে 'কাফির' বলা। যেমনটি আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ করেছেন; যা আমরা ইমাম সাবুনির বক্তব্য থেকে জেনেছি। এ ধরনের দলিল পেশকারী ব্যক্তিকে 'খারেজি' কিংবা 'মুরজিয়া' বলা যাবে না।

'নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়' অভিমতটি উল্লেখ করার পর ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) আলোচ্য বিশদ বিবরণটি উল্লেখ করেছেন। **তিনি লিখেছেন :**

«هَذَا قَوْلٌ قَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ يَقُولُ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَقَالَتْ بِهِ الْمُرْجِئَةُ أَيْضًا (إِلَّا أَنَّ الْمُرْجِئَةَ) تَقُولُ (الْمُؤْمِنُ) الْمُقِرُّ مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَئِمَّةِ (أَهْلِ) السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ فَإِنَّ الْمُرْجِئَةَ قَالَتْ تارك الصلاة مؤمن مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ إِذَا كَانَ مُقِرًّا غَيْرَ جَاحِدٍ وَمُصَدِّقًا غَيْرَ

مُسْتَكْبِرٍ وَحُكِيَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْمُرْجِئَةِ وَهُوَ قَوْلُ جَهْمٍ وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق لا مؤمن وَلَا كَافِرٌ وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَقَالَتِ الصُّفْرِيَّةُ وَالْأَزَارِقَةُ مِنَ الْخَوَارِجِ هُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ وَقَالَتِ الْإِبَاضِيَّةُ هُوَ كَافِرٌ غَيْرَ أَنَّ دَمَهُ وَمَالَهُ مُحَرَّمَانِ وَيُسَمُّونَهُ كَافِرَ نِعْمَةٍ فَهَذَا جَمِيعُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ».

“অনেক ইমাম এই মত ব্যক্ত করেছেন; যারা (ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদায়) বলে থাকেন যে, ইমান হলো কথা ও কাজ। মুরজিয়ারাও নামাজ-ত্যাগকারীর ব্যাপারে এই মত ব্যক্ত করেছে। কিন্তু (ইমানের পরিচয় বিষয়ক আকিদায়) মুরজিয়ারা বলে, ‘একজন ব্যক্তি যদি কেবল মুখে ইসলামের স্বীকৃতি দেয়, তাহলে সে পরিপূর্ণ ইমানদার।’ আমরা ইতোমধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণের মধ্যে নামাজ-ত্যাগকারীর বিধান বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে নামাজ-ত্যাগকারীর বিধান প্রসঙ্গে বিদাতিদের বক্তব্য আলাদা। যেমন মুরজিয়া বলেছে, ‘যদি কোনো ব্যক্তি অস্বীকারকারী না হয়ে স্বীকারকারী হয় এবং (ইমান আনয়নে) অহংকারকারী না হয়ে সত্যায়নকারী হয়, তাহলে সে নামাজ ছেড়ে দিলেও পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী মুমিন।’ এই মতবাদ আবু হানিফা ও যাবতীয় মুরজিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। এবং এটা জাহম বিন সাফওয়ানেরও মতবাদ। মুতাজিলা সম্প্রদায় বলেছে, ‘নামাজ ত্যাগকারী হলো ফাসিক; না মুমিন, আর না কাফির। তবে সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে; যদি না (মৃত্যুর আগে) তওবা করে।’ খারেজিদের *‘সুফরিয়্যা’* ও *‘আজারিকা’* উপদলের

লোকেরা বলেছে, 'নামাজ-ত্যাগকারী কাফির; তার জান-মাল হালাল।' খারেজিদের *'ইবাদিয়্যা'* উপদলের লোকেরা বলেছে, 'নামাজ-ত্যাগকারী কাফির; তবে তার জান-মাল হারাম।' তারা নামাজ-ত্যাগকারীকে বলে 'নেয়ামতের কাফির'। নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে আহলুল কিবলা (কাবাঘরকে কিবলা মানেন এমন মুসলিম-দাবিদারগণ) যেসব মতভেদ করেছে—এগুলো হলো সেসবের সারকথা।"[946]

এ কারণে সালাফদের যুগের ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ২৩৮ হি.) বক্তব্যেও আমরা এই মানহাজ দেখতে পাই। **ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ تَرْكُهَا لَا يَكُونُ كُفْرًا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ - يَعْنِي تَارِكَهَا وَقَالَ ذَلِكَ - وَأَمَّا إِذَا صَلَّى وَقَالَ ذَلِكَ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ».

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়; এমনকি জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে মাগরিব হয়ে যায়, অথবা মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে অর্ধরাত্রি হয়ে যায়—সে মহান আল্লাহর প্রতি কুফরকারী কাফির। তাকে তিন দিন তওবা করতে বলা হবে। যদি সে ফিরে না আসে এবং বলে যে, *'নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফর নয়,'* তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, যে নামাজ পরিত্যাগ করে ওই কথা বলেছে, তাকে হত্যা করা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি

[946] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ,*** খ. ৪, পৃ. ২৪২-২৪৩।

নামাজ পড়ে, কিন্তু বলে যে, *'নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফর নয়,'* তাহলে এটা একটি ইজতিহাদনির্ভর বিষয়।"[947]

যেসব মাসআলায় সুসাব্যস্ত বা অকাট্য ইজমা নেই, সেগুলোকে *'ইজতিহাদনির্ভর তথা মুজতাহিদ বিদ্বানদের গবেষণানির্ভর মাসআলা'* বলা হয়। ইজতিহাদনির্ভর মাসআলায় সুন্নাহপন্থি বিদ্বানদের কোনো একটি মত গ্রহণ করার কারণে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা যায় না।[948] এমনকি সুন্নাহপন্থি উলামাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কোনো একটি মতের অনুসারীকে দোষারোপ করা এবং বয়কট করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) প্রদত্ত ফতোয়া—**

«وَسُئِلَ: عَمَّنْ يُقَلِّدُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ: فَهَلْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ أَمْ يُهْجَرُ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْمَلُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْجَرْ وَمَنْ عَمِلَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا قَلَّدَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ».

প্রশ্ন : "যে ব্যক্তি ইজতিহাদনির্ভর মাসায়েলে কোনো আলিমের অনুসরণ করে, তাকে দোষারোপ করা কিংবা বয়কট করা যাবে কি? অনুরূপভাবে দুটো মতের কোনো

---

[947] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমান,*** পৃ. ২৪১-২৪২; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

[948] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩০, পৃ. ৭৯-৮০।

একটি অনুযায়ী যে আমল করে, তার সাথেও এরূপ আচরণ করা যাবে কি?”

উত্তর : “যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। ইজতিহাদনির্ভর মাসায়েলে যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিমের অভিমত অনুযায়ী আমল করে, তাকে দোষারোপ ও বয়কট করা যাবে না। দুটো মতের কোনো একটি অনুযায়ী যে আমল করে, তাকেও দোষারোপ করা যাবে না। যদি কোনো মাসআলায় দুটো মত থাকে এবং ব্যক্তির কাছে দুটোর একটি মত প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তিনি উক্ত মত অনুযায়ী আমল করবেন; অন্যথায় মতভেদপূর্ণ মতামতের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভর করা যায়—এমন কোনো আলিমের অনুসরণ করবেন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।”[949]

পক্ষান্তরে যারা সমুদয় আমল পরিত্যাগকারীকে *‘কাফির’* বলে না, তাদের মতাদর্শকে ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়াহ রাহিমাহুল্লাহ ‘ইজতিহাদনির্ভর’ বলেননি। বরং তাদেরকে *‘মুরজিয়া’* আখ্যা দিয়েছেন। **ইমাম ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন :**

«غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة».

“মুরজিয়ারা এতটাই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এটা পর্যন্ত তাদের মতাদর্শ হয়ে গেছে। মুরজিয়াদের একদল লোক বলে, ‘কেউ যদি ফরজ নামাজ, রমজানের রোজা, জাকাত,

---

[949] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ২০, পৃ. ২০৭।

হজ এবং অন্যান্য সকল ফরজ ইবাদতকে অস্বীকার না করে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমরা তাকে কাফির বলব না। তার ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হবে। কারণ সে মুখে স্বীকার করে।' এরা হলো সেই দল, যাদের *'মুরজিয়া'* হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"[950]

উল্লেখ্য, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও যারা নামাজ-পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' বলেন না, তাঁদেরকে অন্যায়ভাবে 'মুরজিয়া' আখ্যা দেয় একদল খারেজি ও রাফিদি শিয়া। বিদাতিরা যে অন্যায়ভাবে আহলুস সুন্নাহকে বিভিন্ন মন্দ উপাধীতে ভূষিত করে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে **আল্লামা আবুল ফাদল আব্বাস বিন মানসুর আস-সাকসাকি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৮৩ হি.) বলেন :**

«وتسميها **المنصورية** وهم أتباع عبدالله بن زيد : مرجئة لقولها إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم. ... ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل : وجميع ذلك غير صحيح في حقها. بل هي الفرقة الهادية المهدية واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة».

"আব্দুল্লাহ বিন জাইদের অনুসারী 'মানসুরিয়্যা' সম্প্রদায় আহলুস সুন্নাহর লোকদেরকে 'মুরজিয়া' বলে আখ্যায়িত করে। কারণ আহলুস সুন্নাহর সেসব ব্যক্তি মনে করেন, নামাজের আবশ্যকতা অস্বীকার না করে যদি কেউ নামাজ পরিত্যাগ করে, তাহলে সে মুসলিমই থাকে (কাফির হয়ে

---

[950] আল-কিরমানি, ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি,*** খ. ৩, পৃ. ১০১৫; ইবনু রজব, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ১, পৃ. ২৩।

যায় না)। ... মানসুরিয়্যা সম্প্রদায় দাবি করে, নামাজ-পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' না বললে প্রমাণিত হয়, কাফির-না-বলা ব্যক্তিদের নিকটে, ইমান হলো স্রেফ আমলবিহীন কথা তথা আমলবিহীন বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি! আহলুস সুন্নাহর ক্ষেত্রে তাদের এসব দাবির একটিও সঠিক নয়। বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হলো সুপথপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রদর্শক দল। তাদের আকিদাই সঠিক আকিদা। তাদের ইমানই সেই সুস্পষ্ট ইমান, যেই ইমানের কথা কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে, সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলিমগণ যেই ইমানের ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।"[951]

আর 'মানসুরিয়্যা' সম্প্রদায় হলো রাফিদি শিয়াদের একটি কুখ্যাত উপদল। এদের ভ্রান্ত আকিদাগুলোর মধ্যে খারেজি আকিদাও পাওয়া যায়।[952] খারেজি আকিদায় প্রভাবিত প্রখ্যাত সৌদি দায়ি **'সাফার আল-হাওয়ালি'** আসলাহাহুল্লাহ-ও এই ভ্রান্ত মতবাদটি ছড়িয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত ডক্টরাল থিসিসে **লিখেছেন :**

«بل مذهب السلف أن تارك العمل بالكلية كافر؛ إذ انعقد إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على تكفير تارك الصلاة، ولم يخالف في ذلك أحد حتى ظهرت المرجئة وتأثر بها بعض أتباع الفقهاء الآخرين، دون علم بأن مصدر الشبهة وأساسها هو الإرجاء».

"বরং সালাফের মতাদর্শ ছিল—সমুদয় আমল পরিত্যাগকারী কাফির। কারণ নামাজ-পরিত্যাগকারীকে

---

[951] আবুল ফাদল আব্বাস বিন মানসুর আস-সাকসাকি, ***আল-বুরহান ফি মারিফাতি আকায়িদি আহলিল আদইয়ান,*** তাহকিক : বাসসাম আলি সালামা (জারকা : মাকতাবাতুল মানার, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫-৯৬।

[952] আল-কিরমানি, ***ইজমাউস সালাফ ফিল ইতিকাদ,*** খ. ৮২-৮৩।

‘কাফির’ বলার ক্ষেত্রে সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম একমত ছিলেন। এ বিষয়ে কেউই তাঁদের বিরোধিতা করেনি। যতক্ষণ না মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যখন মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান হয় এবং ‘মুরজিয়া নয়’ এমন ফাকিহদের কতিপয় অনুসারী মুরজিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হন, তখন নামাজ-পরিত্যাগকারীকে ‘কাফির’ না বলার মতটি উদ্ভূত হয়। মুরজিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা জানত না, নামাজ-পরিত্যাগকারীকে ‘কাফির’ না বলার যে সংশয় রয়েছে, সেটার উৎস ও মূল ভিত্তিই হলো—ইরজায়ি আকিদা।”[953]

নামাজ-পরিত্যাগকারীকে কাফির বলার ব্যাপারে সাফার আল-হাওয়ালির এই দাবি সর্বৈব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। সালাফদের একদল প্রাজ্ঞ ইমাম নামাজ-পরিত্যাগকারীকে কাফির বলেননি, বরং পাপী মুসলিম বলেছেন। এছাড়াও এই বিষয়ে কারা বিপথগামী হয়েছে, এবং কেন হয়েছে, আর কারা বিপথগামী হননি, এবং কেন হননি—তা আমরা ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহর বিস্তারিত আলোচনা থেকে জেনেছি। হয়তো এজন্যই সাফার আল-হাওয়ালির বিভিন্ন ভ্রান্তি পর্যালোচনা করে শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) রায় দিয়েছিলেন, সাফার আল-হাওয়ালির মধ্যে খারেজিদের বিদাত রয়েছে।[954] আমরা সাফার আল-হাওয়ালির যেই বই থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম, সেই বই সম্পর্কে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ১৪২০ হি.) জিজ্ঞেস করা হলে **তিনি বলেছিলেন :**

---

[953] সাফার বিন আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালি, ***জাহিরাতুল ইরজা ফিল ফিকরিল ইসলামি*** (কায়রো : দারুল কালিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৮৫।

[954] আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আজ-জাহরানি, ***ইতহাফুল বাশার বি কালামিল উলামায়ি ফি সালমান ওয়া সাফার*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি), পৃ. ২১।

"বর্তমান যুগে একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা তাদের বিভিন্ন মানহাজগত বিষয়ে সালাফদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে, এদেরকে আমি 'সমকালীন খারেজি' কিংবা 'নব্য খারেজি' বলতে পারি।"[955]

বর্তমান সময়ের কিবার উলামাগণ আমাদের ব্যক্তীকৃত অভিমতই পেশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের অন্যতম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিজাহুল্লাহর (জ. ১৩৫৩ হি.) একটি ফতোয়া উল্লেখ করছি। **সম্পূর্ণ ফতোয়াটি নিম্নরূপ—**

السؤال: من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر، فهل هذا القائل أخرج العمل من مسمى الإيمان فكان قوله موافقًا لقول المرجئة؟

الجواب: لا، ليس هذا بصحيح؛ لأن الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من أهل العلم، وفيهم الذين يقولون: إن العمل جزء من الإيمان، فلا يعتبر من قال ذلك مُرجئًا؛ لأنهم رأوا أنه لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه، فليس كل من قال: تارك الصلاة لا يكفر -وهو قول أكثر أهل العلم- يكون مرجئًا وعليه تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني ﵀ بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله بعدم التكفير! وهذا من الغلط، ولو كان هذا صحيحًا لكان كل الذين قالوا من المتقدمين بأن تارك الصلاة لا يكفر هم من المرجئة! وهذا لا يمكن أن يكون أبدًا.

---

[955] আজ-জাহরানি, ***ইতহাফুল বাশার বি কালামিল উলামায়ি ফি সালমান ওয়া সাফার,*** পৃ. ২৪।

প্রশ্ন : "যে ব্যক্তি বলে, 'নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়,' সে ব্যক্তি কি উক্ত কথার মাধ্যমে ইমানের গণ্ডি থেকে আমলকে বের করে দিয়েছে? সুতরাং তার কথা কি মুরজিয়াদের মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?"

উত্তর : "না, এটা সঠিক নয়। কেননা বিরাটসংখ্যক আলিম বলেছেন, 'নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়।' আর তাঁদের মধ্যেই এমন আলিম আছেন, যাঁরা স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমল ইমানের একটি অংশ।' সুতরাং এ কথা বলার কারণে—নামাজ-ত্যাগকারীকে 'কাফির' না বলার কারণে—কাউকে মুরজিয়া বলা যায় না। কেননা তাঁরা বেশ কিছু দলিলের ভিত্তিতে এবং দলিল থেকে প্রাপ্ত সমঝের আলোকে মনে করেছেন, 'নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়।' অধিকাংশ আলিমের মতে, নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়। সুতরাং যারা নামাজ-পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' বলেন না, তাঁরা সবাই মুরজিয়া নন। এ বিষয়েই আজকাল এক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ মুরজিয়াদের মতবাদ লালন করতেন—এটা বলা হচ্ছে। কারণ তিনি নামাজ-পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' বলতেন না। অথচ তাদের এই কাজ ভুল। তাদের দাবি যদি সঠিক হতো, তাহলে পূর্ববর্তী যুগের যেসব আলিম বলেছেন, 'নামাজ-পরিত্যাগকারী কাফির নয়,' তাঁরা সবাই মুরজিয়া বিবেচিত হতেন! অথচ এটা কখনোই সম্ভব নয়।"[956]

---

[956] আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ***শারহু সুনানি আবি দাউদ*** (ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি), ট্রান্সক্রিপ্ট নং : ২৫১, পৃ. ৪৩।

নামাজ পরিত্যাগকারীকে *'কাফির'* আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা :

এক. নামাজ-পরিত্যাগকারীকে কাফির হিসেবে উলামাগণের যেসব বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের কিতাবপত্রে, এটার দ্বারা *'আত-তাকফির আল-মুতলাক'* তথা *'অনির্দিষ্ট কাফির ঘোষণা'* উদ্দেশ্য। এসব বক্তব্য দেখে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে 'কাফির' বলতে হলে অবশ্যই 'কাফির বলার' শরয়ি শর্তাবলি পূরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ক সমুদয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।[957] যারা এগুলো জানে না, তারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করার কোনো অধিকার রাখে না।

দুই. কোনো ব্যক্তি যদি এমন দেশে প্রতিপালিত হয়, যেখানকার বিদ্বানগণ সাধারণত নামাজ-পরিত্যাগকারীকে *'কাফির'* ঘোষণা দেন না, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করলে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করা যাবে না। কেননা সেই ব্যক্তি তার দেশের বিদ্বানদের তাকলিদ করতে পারে। শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এই কথা উল্লেখ করেছেন।[958] কারণ তাকফিরের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো তাকলিদ। এ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর কাছে বিশ্বস্ত কোনো বিদ্বানের তাকলিদ করে এই মত মানেন যে, নামাজ পরিত্যাগ করলে কাফির হয়ে যায় না, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করা যাবে না—নামাজ পরিত্যাগ করলে।

তিন. প্রসিদ্ধ মাজহাবগুলোর মধ্যে প্রধানত হাম্বালি মাজহাবের অভিমত হচ্ছে—নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির। কিন্তু হাম্বালি

---

[957] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৫৭৩; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১২, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮।

[958] আল-উসাইমিন, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল,*** খ. ২, পৃ. ১৩৮।

মাজহাবের *'মুতামাদ (অফিসিয়াল পজিশন)'* অনুযায়ী, নামাজ পরিত্যাগকারীকে 'কাফির' ঘোষণা দেওয়া হবে দুটি শর্তে—

১. রাষ্ট্রের মুসলিম শাসক কিংবা তাঁর প্রতিনিধি—যেমন শরিয়া কোর্টের বিচারপতি—তাকে নামাজ পড়তে বলবেন।

২. সে ওই নামাজটি না পড়ে ছেড়ে দেবে। তারপর পরবর্তী নামাজের ওয়াক্ত আসবে এবং বেনামাজি লোকটি এত দেরি করবে যে, দ্বিতীয় নামাজ পড়ার সময়ও প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তখন শাসক বা তাঁর প্রতিনিধি তাকে *'কাফির'* হিসেবে রায় দেবেন। পক্ষান্তরে যদি তাকে নামাজ পড়তে না ডাকা হয়, তাহলে তাকে *'কাফির'* আখ্যা দেওয়া যাবে না।[959]

স্মর্তব্য যে, হাম্বালি মাজহাব অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি অলসতা বা গাফিলতির কারণে নামাজ ছেড়ে দেয়, আর তার ইচ্ছাও থাকে না সময়মতো নামাজ পড়ার কিংবা পরে কাজা আদায় করার, এবং মুসলিম শাসকও তাকে নামাজে ডাকেননি—তাহলে বাহ্যিকভাবে তাকে *'কাফির'* বলা হবে না। তার সাথে মুসলিমের মতোই আচরণ করা হবে। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে কাফির। কেয়ামতের দিন তাকে কাফিরদের সাথেই ওঠানো হবে এবং মুসলিমদের থেকে আলাদা করা হবে।[960]

---

[959] আহমাদ বিন নাসির আল-কুআইমি, ***ফাইদুল জালিল আলা মাতনিদ দালিল*** (রিয়াদ : মাদারুল কাবাস, ২য় প্রকাশ, ১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০১।

[960] ইবনু তাইমিয়া, ***শারহু উমদাতিল ফিকহ,*** খ. ২, পৃ. ৯২।

জাকাত পরিত্যাগের বিধান

মুসলিমরা সবাই একমত—জেনেশুনে জাকাতের আবশ্যকতা অস্বীকার করে জাকাত পরিত্যাগকারী কাফির। **হাফিজ নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন :**

«فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضَ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ كَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ».

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এই যুগে জাকাতের আবশ্যকতা অস্বীকার করবে, সে মুসলিমদের সর্বসম্মত মতানুসারে কাফির।"[961]

পক্ষান্তরে জাকাতের আবশ্যকতা স্বীকার করার পর জাকাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির, না পাপী মুসলিম—তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ চারটি মতে মতভেদ করেছেন। যথা :

প্রথম মত : জাকাত পরিত্যাগকারী কাফির। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে জাকাত পরিত্যাগ করে, এবং জাকাত আদায় না করেই মারা যায়, তাহলে সে কাফির হিসেবেই মারা গেছে বিবেচিত হবে। এটা একদল সালাফের মত। ইমাম আহমাদ থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে।[962]

দ্বিতীয় মত : জাকাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে জাকাত পরিত্যাগ করে, এবং জাকাত আদায় না করে মারা যায়, তাহলে সে 'পাপী মুসলিম' হিসেবে মারা গেছে বিবেচিত

---

[961] আন-নববি, ***আল-মিনহাজ,*** খ. ১, পৃ. ২০৫।

[962] আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ***আস-সুন্নাহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৭৩; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৫৫৪; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬১০।

হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত; প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের অফিসিয়াল মত।[963]

তৃতীয় মত : জাকাত পরিত্যাগকারী যদি জাকাত না দেওয়ার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সে কাফির হবে; অন্যথায় কাফির হবে না। এটি ইমাম আহমাদের একটি প্রসিদ্ধ অভিমত।[964]

চতুর্থ মত : জাকাত পরিত্যাগকারী যদি জাকাত না দেওয়ার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবুও সে কাফির হবে না। এটিও ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত একটি অভিমত।[965]

---

[963] মুওয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি, ***আল-মুগনি,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি ও আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ (রিয়াদ : দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৮; আবুল হাসান আলি বিন সুলাইমান আল-মার্দাওয়ি, ***আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ,*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি ও আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ (কায়রো : দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৪।

[964] ইবনু কুদামা, ***আল-মুগনি,*** খ. ৪, পৃ. ৮; ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৫৫৬; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬১১।

[965] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফাতাওয়াল কুবরা,*** খ. ৩, পৃ. ৪৪৬।

রোজা পরিত্যাগের বিধান

রমজান মাসের রোজা একটি ফরজ ইবাদত। সমগ্র মুসলিম উম্মত একমত—জেনেশুনে রমজান মাসের রোজার আবশ্যকতা অস্বীকার করে রমজানের রোজা পরিত্যাগকারী কাফির। **আল্লামা কাসানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেছেন :**

«وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَرْضِيَّةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لَا يَجْحَدُهَا إِلَّا كَافِرٌ».

“নিশ্চয় পুরো উম্মত একমত পোষণ করেছে—রমজান মাসের রোজা ফরজ; কাফির লোক ছাড়া কেউ রমজানের রোজার আবশ্যকতা অস্বীকার করে না।”[966]

পক্ষান্তরে রমজানের রোজার আবশ্যকতা স্বীকার করার পর রমজানের রোজা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির, না পাপী মুসলিম—তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন। যথা :

প্রথম মত : রমজানের রোজা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির। ইমাম আহমাদ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।[967] ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহও এই মত ব্যক্ত করেছেন, যেমনটি সামনে আলোচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় মত : রমজানের রোজা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির নয়; বরং পাপী মুসলিম। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত; এবং হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত।[968]

---

966 আবু বাকর ইবনু মাসউদ আল-কাসানি, ***বাদায়িউস সানায়ি ফি তারতিবিশ শারায়ি*** (মিশর : মাতবাআতু শারিকাতিল মাতবুয়াতিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩২৭ হি.-১৩২৮ হি.), খ. ২, পৃ. ৭৫।

967 ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ২৫৯।

968 আল-মার্দাওয়ি, ***আল-ইনসাফ,*** খ. ৩, পৃ. ৩৪।

হজ পরিত্যাগের বিধান

মুসলিমরা সবাই একমত—জেনেশুনে হজের আবশ্যকতা অস্বীকার করে হজ পরিত্যাগকারী কাফির। **শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন :**

«فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَرَ حَجَّ الْبَيْتِ وَاجِبًا عَلَيْهِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ».

"সুতরাং যে ব্যক্তিই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাবাগৃহের হজকে নিজের ওপর ফরজ মনে করে না, সে মুসলিমদের সর্বসম্মত মতানুসারে কাফির; যেমনটি কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়েছে।"[969]

পক্ষান্তরে হজের আবশ্যকতা স্বীকার করার পর ফরজ হজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির, না পাপী মুসলিম—তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন। যথা :

প্রথম মত : ফরজ হজ পরিত্যাগকারী কাফির। ইমাম আহমাদ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।[970]

দ্বিতীয় মত : ফরজ হজ পরিত্যাগকারী কাফির নয়; বরং পাপী মুসলিম। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত এবং হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত।[971]

---

[969] আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি, ***আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ,*** তাহকিক : আলি বিন হাসান, আব্দুল আজিজ বিন ইবরাহিম ও হামদান বিন মুহাম্মাদ (সৌদি আরব : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২৫।

[970] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ইমানুল আওসাত,*** পৃ. ৫৫৪; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৭, পৃ. ৬১০।

[971] আল-মার্দাওয়ি, ***আল-ইনসাফ,*** খ. ৩, পৃ. ৩৪।

নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজের কাজা আদায় করার বিধান

মূলপাঠ



فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهُ : مَنْ لَمْ يَتَشَهَدْ، وَلَمْ يُصَلِّ، وَلَمْ يَصُمْ، لأَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ وَقْتِهِ، وَلَا يُجْزِئُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَفْرِيطِهِ فِيهِ عَامِدًا عَنْ وَقْتِهِ.

এই পাঁচটির মধ্যে সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয় কেউ পরিত্যাগ করলে তার সাথে বিতর্ক করা যাবে না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুই সাক্ষ্য দেয়নি, নামাজ আদায় করেনি এবং রোজা রাখেনি। কারণ এগুলোর কোনোটিই নির্ধারিত সময়ের পর বিলম্ব করা যায় না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময় পার করে দেয়, সে পরে কাজা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَأَمَّا الزَّكَاة فَمَتَى مَا أَدَّاهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَكَانَ آثِمًا فِي الْحَبْسِ.

পক্ষান্তরে জাকাতের ক্ষেত্রে, যখনই সে তা আদায় করবে, তার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে জাকাত আটকে রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে।

وَأَمَّا الحَجُّ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَوَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ = وَجَبَ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ.

আর হজের ক্ষেত্রে, যার ওপর হজ ফরজ হয়ে যায় এবং হজ করার সামর্থ্যও তার আছে, তার ওপর তা ফরজ বলেই বিবেচিত হবে। আর (যে বছর হজ ফরজ হয়েছে) সে বছরই হজ করা তার জন্য

আবশ্যক নয়। যতক্ষণ না সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হজ বিলম্ব করার আর কোনো উপায় বাকি থাকে না।

مَتَى أَدَّاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا، وَلَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي تَأْخِيرِهِ إِذَا أَدَّاهُ، كَمَا كَانَ آثِمًا فِي الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لمُسْلِمِينَ مَسَاكِينَ حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَكَانَ آثِمَا حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِذَا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَّى.

ফলে যখনই সে হজ আদায় করবে, তখনই তা আদায় হয়ে যাবে। আর সে এতে দেরি করলেও গুনাহগার হবে না, যদি শেষ পর্যন্ত তা আদায় করে নেয়। তবে জাকাতের ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে সে গুনাহগার হবে। কারণ জাকাত হলো দরিদ্র মুসলিমদের অধিকার, যা সে তাদেরকে না দিয়ে আটকে রেখেছিল। সুতরাং তাদের কাছে জাকাত না পৌঁছা অবধি সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। কিন্তু হজ হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যকার একটি বিষয়। যখনই সে তা আদায় করে, তখনই সে আদায় সম্পন্ন করেছে বিবেচিত হয়।

وَإِنْ هُوَ مَاتَ وَهُوَ وَاجِدٌ مُسْتَطِيعٌ وَلَمْ يَحُجَّ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ يَحُجَّ. وَيَجِبُ لأَهلِهِ أَنْ يَحُجُّوْا عَنْهُ، وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا عَنْهُ؛ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

পক্ষান্তরে সে যদি হজ না করেই সক্ষম ও সামর্থ্যবান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে (পরকালে গিয়ে) কামনা করবে, যেন তাকে হজ আদায়ের জন্য পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হয়। আর উক্ত মৃতের পক্ষ থেকে হজ করা তার পরিবারের জন্য ওয়াজিব। আমরা আশা করি, উক্ত হজ তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন তার ওপর কোনো ঋণ থাকলে, এবং তার মৃত্যুর পর অন্যরা তা পরিশোধ করলে, সেটা আদায় হয়ে যায়। **সম্পূর্ণ মূলপাঠ সমাপ্ত।**

ব্যাখ্যা



ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের ঠিক কোনগুলো পরিত্যাগ করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, আর কোনগুলো পরিত্যাগ করলে কাফির হয় না, এবং চারটি স্তম্ভ তথা নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের কাজা আদায়ের বিধান কী—সেসব বিষয়েই লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে আলোকপাত করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন, **"এই পাঁচটির মধ্যে সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয় কেউ পরিত্যাগ করলে তার সাথে বিতর্ক করা যাবে না।"** ইমাম হুমাইদি বলতে চাইছেন, পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এমন তিনটি স্তম্ভ আছে, যা কেউ পরিত্যাগ করলে তার সাথে বিতর্ক করা যাবে না। এসব স্তম্ভ পরিত্যাগের ব্যাপারে সে যেসব মত পোষণ করে, সেসব বিষয়ে তার সাথে কোনো তর্কবিতর্ক করা যাবে না। কেননা এগুলো একদম সুস্পষ্ট বিষয়। এখানে বিতর্ক করার কিছু নেই।

সেই তিনটি স্তম্ভ কোনটি? লেখক রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, **"অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়নি, নামাজ আদায় করেনি এবং রোজা রাখেনি।"** ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ মনে করেন, কেউ যদি শাহাদাতাইন তথা দুই সাক্ষ্য পরিত্যাগ করে, কিংবা ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করে, কিংবা রমজান মাসের রোজা পরিত্যাগ করে, তাহলে সে কাফির।[972]

এরপর ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা পরিত্যাগ করলে কেন কাফির হয়, তার ব্যাখ্যা দিয়ে ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

[972] সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি, ***শারহুল উসুলিস সুন্নাহ*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, বারনামাজুদ দারসিল ওয়াহিদ ফিল হারামাইন, বারনামাজের তারিখ : ১৪৩৭-১৪৩৮ হি.), পৃ. ২৪।

“কারণ এগুলোর কোনোটিই নির্ধারিত সময়ের পর বিলম্ব করা যায় না।” তিনি বলতে চাইছেন, ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজার সুনির্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময় পার হয়ে গেলে উক্ত সময়ের নির্ধারিত নামাজ ও রোজা আর আদায় করা যায় না। পক্ষান্তরে জাকাত ও হজ পরবর্তীতেও আদায় করার সুযোগ আছে। তাই জাকাত ও হজ পরিত্যাগ করলে ব্যক্তি কাফির হবে না। ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ সালাফদের যুগের একজন মহান ইমাম। অবশ্যই তাঁর এই বুঝের গুরুত্ব রয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, নামাজ ও রোজা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে সালাফদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আর তাঁদের এসব মতেরও গুরুত্ব রয়েছে। এসবের কোনো মতই গোমরাহি নয়। অবশ্যই এগুলো মত ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি থেকে মুক্ত।

তারপর ইমাম হুমাইদি লিখেছেন, **“আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময় পার করে দেয়, সে পরে কাজা আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।”** অর্থাৎ, ফরজ নামাজ কিংবা ফরজ রোজা তার নির্ধারিত সময়ের পরে কাজা হিসেবে সম্পাদন করা হলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, এমনকি সেই নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, সে ব্যক্তিকে উক্ত নামাজের কাজা আদায় করতে হবে কিনা তা নিয়ে সালাফগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন—

প্রথম মত : অবশ্যই কাজা আদায় করতে হবে। কাজা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব। অধিকাংশ সালাফ এই মত পোষণ করেছেন; এবং এটাই আবু হানিফা, মালিক ইবনু আনাস, আশ-শাফিয়ি, ও

আহমাদ বিন হাম্বালের অভিমত।[973] এমনকি কোনো কোনো বিদ্বান এই মতের পক্ষে ইজমা (মতৈক্য) দাবি করেছেন।[974]

দ্বিতীয় মত : কাজা আদায় করতে হবে না এবং কাজা আদায় করলেও তা গৃহীত হবে না। একদল সালাফ এই মত পোষণ করেছেন।[975] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন।[976]

অনুরূপভাবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রমজান মাসের রোজা ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে সেই রোজার কাজা আদায় করতে হবে কিনা তা নিয়ে সালাফগণ দুটো মতে মতভেদ করেছেন—

প্রথম মত : অবশ্যই কাজা আদায় করতে হবে। কাজা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব। অধিকাংশ সালাফ এই মত পোষণ করেছেন। এটা হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত।[977] কোনো কোনো বিদ্বান এই মতের পক্ষে ইজমা বর্ণনা করেছেন।[978]

দ্বিতীয় মত : কাজা আদায় করতে হবে না এবং কাজা আদায় করলেও তা গৃহীত হবে না। একদল সালাফ এই মত পোষণ করেছেন।[979]

---

[973] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সালাত,*** পৃ. ১২৩-১২৪।

[974] আন-নববি, ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব,*** খ. ৩, পৃ. ৭১।

[975] ইবনুল কাইয়্যিম, ***আস-সালাত,*** পৃ. ১২৪।

[976] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফাতাওয়াল কুবরা,*** খ. ৫, পৃ. ৩২০।

[977] মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি, ***কাশশাফুল কিনা আনিল ইকনা*** (সৌদি আরব : মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১-১৪২৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ২২০।

[978] ইবনু আব্দিল বার্র, ***আল-ইস্তিজকার,*** খ. ১, পৃ. ৭৭।

[979] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফাতাওয়াল কুবরা,*** খ. ৫, পৃ. ৩২০; ইবনু রজব, ***ফাতহুল বারি,*** খ. ৫, পৃ. ১৩৪।

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ জাকাতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, তিনি মনে করেন, জাকাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়। কেন কাফির নয়? এর কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, **"পক্ষান্তরে জাকাতের ক্ষেত্রে, যখনই সে তা আদায় করবে, তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে জাকাত আটকে রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে।"** অর্থাৎ জাকাত পরিত্যাগকারী মূলত ফকির-মিসকিন প্রমুখ হকদারের হক আটকে রাখে। এই কাজের জন্য সে গুনাহগার হয়। কিন্তু সে যদি পরবর্তীতে উক্ত জাকাত আদায় করে, তাহলে তা গৃহীত হবে। জাকাত আটকে রাখার ফলে সে কাফির হবে না। **হাফিজ নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন :**

«إِذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إخْرَاجِهَا وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي وَلَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا فَقَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ عَلَى التَّرَاخِي».

"যখন জাকাত ফরজ হয় এবং তা আদায় করার সামর্থ্য থাকে, তখন তা সত্বর আদায় করে ফেলা ওয়াজিব। কেউ যদি এক্ষেত্রে দেরি করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। এ কথাই ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ এবং অধিকাংশ আলিম বলেছেন। আল-আবদারি এটাকে অধিকাংশ আলিমের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের (শাফিয়ি) মাজহাবের কতিপয় বিদ্বান আবু হানিফা থেকে তাঁর মত বর্ণনা করেছেন যে, জাকাত বিলম্বেও আদায় করা যায়; অর্থাৎ সত্বর নয়। আল-আবদারি বলেছেন, আবু

হানিফার মাজহাবের বিদ্বানগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; কারখি বলেছেন, 'জাকাত সত্বর আদায় করতে হবে,' পক্ষান্তরে আবু বাকর আর-রাজি বলেছেন, 'বিলম্বেও আদায় করা যাবে'।"[980]

তারপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ হজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, **"আর হজের ক্ষেত্রে, যার ওপর হজ ফরজ হয়ে যায় এবং হজ করার সামর্থ্যও তার আছে, তার ওপর তা ফরজ বলেই বিবেচিত হবে। আর (যে বছর হজ ফরজ হয়েছে) সে বছরই হজ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।"** অর্থাৎ ইমাম হুমাইদি মনে করেন, হজ ফরজ হলে তা সত্বর আদায় করা আবশ্যক না। কেউ চাইলে পরবর্তীতে নিজের সুবিধামতো বিলম্বেও হজ আদায় করতে পারবেন। এটা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। এ বিষয়ে দুটো প্রসিদ্ধ মত আছে—

প্রথম মত : হজ ফরজ হলে তা সত্বর আদায় করা আবশ্যক নয়। তবে সত্বর আদায় করা সুন্নাতি আমল, উত্তম কাজ। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরও অনেক বিদ্বান এই মত পোষণ করেছেন।[981] ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এই মত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মত : হজ ফরজ হলে তা সত্বর আদায় করা আবশ্যক; বিলম্ব করা না-জায়েজ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল-সহ অধিকাংশ বিদ্বান এই মত পোষণ করেছেন।[982] এটাই হাম্বালি মাজহাবের অফিসিয়াল মত।[983]

---

[980] আন-নববি, ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব,*** খ. ৫, পৃ. ৩৩৫।

[981] ইবনু কুদামা, ***আল-মুগনি,*** খ. ৫, পৃ. ৩৬।

[982] ইবনু তাইমিয়া, ***আল-ফাতাওয়াল কুবরা,*** খ. ৫, পৃ. ৩৮১।

[983] আল-মার্দাওয়ি, ***আল-ইনসাফ,*** খ. ৮, পৃ. ৫০।

এরপর ইমাম হুমাইদি বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন সত্বর হজ করা আবশ্যক হয়ে যায়; বিলম্বে আদায় করার সিদ্ধতা আর বহাল থাকে না। তিনি বলেছেন, **"যতক্ষণ না সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হজ বিলম্ব করার আর কোনো উপায় বাকি থাকে না।"** ইমাম হুমাইদি বলতে চাইছেন, যদি কারও পরিস্থিতি এমন হয় যে, হজ বিলম্ব করলে পরবর্তীতে তিনি তা আদায় করতে ব্যর্থ বা অপারগ হবেন, তাহলে তা সত্বরই আদায় করে নিতে হবে। বিলম্ব করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে শাফিয়ি মাজহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত **আল্লামা খতিব আশ-শারবিনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৭৭ হি.) বলেছেন :**

«لَكِنَّ التَّأْخِيرَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَ بِنَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ، فَلَوْ خَشِيَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ الْعَضْبَ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَمِثْلُهُ مَنْ خَشِيَ هَلَاكَ مَالِهِ».

"তবে হজকে বিলম্ব করা কেবল তখনই বৈধ, যখন ভবিষ্যতে তা আদায় করার দৃঢ় সংকল্প থাকে; যেমনটি নামাজের অধ্যায়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হজকে বিলম্ব করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো—তা যেন কোনো মানতকৃত হজ, কিংবা কাজা হজ, কিংবা অসুস্থতাজনিত অপারগতার আশঙ্কার দরুন সংকীর্ণ না হয়ে পড়ে। সুতরাং কারও ওপর হজ বা ওমরা ফরজ হয়ে গেলে সে যদি অসুস্থতাজনিত অপারগতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য হজকে বিলম্ব করা হারাম হবে। কারণ *'সময়সীমা প্রসারিত এমন'* ফরজ ইবাদতকে কেবল

তখনই বিলম্ব করা বৈধ, যখন প্রবল ধারণা থাকবে যে, নির্ধারিত সময়ে তা নিরাপদে আদায় করা সম্ভব হবে। *'আল-মাজমু'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, আল-মুত্তাওয়াল্লি বলেছেন, 'একইভাবে কেউ যদি আশঙ্কা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে (তাহলে সেক্ষেত্রেও হজকে বিলম্বে আদায় করা অবৈধ হয়ে যাবে)'।"[984]

এরপর ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"ফলে যখনই সে হজ আদায় করবে, তখনই তা আদায় হয়ে যাবে। আর সে এতে দেরি করলেও গুনাহগার হবে না, যদি শেষ পর্যন্ত তা আদায় করে নেয়।"** ইমাম শাফিয়ির মাজহাব মোতাবেক হজ-বিলম্বকারী ব্যক্তি তখন গুনাহগার হবে না, যখন সে কিছুপূর্বে উল্লিখিত শর্তাবলি মেনে তা বিলম্ব করবে। অন্যথায় হজ বিলম্ব করার জন্য তাকে গুনাহগার হতে হবে। যেমনটি আমরা আল্লামা খতিব আশ-শারবিনি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকে জানলাম।

তারপর ইমাম হুমাইদি বলেছেন, **"তবে জাকাতের ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে সে গুনাহগার হবে। কারণ জাকাত হলো দরিদ্র মুসলিমদের অধিকার, যা সে তাদেরকে না দিয়ে আটকে রেখেছিল। সুতরাং তাদের কাছে জাকাত না পৌঁছা অবধি সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। কিন্তু হজ হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যকার একটি বিষয়। যখনই সে তা আদায় করে, তখনই সে আদায় সম্পন্ন করেছে বিবেচিত হয়।"** এগুলো একদম স্পষ্ট বিষয়। আমরা ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে ব্যাখ্যাধর্মী আলোচনা করেছি।

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ক আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, **"পক্ষান্তরে সে যদি হজ**

---

[984] শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খতিব আশ-শারবিনি, ***মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ,*** তাহকিক : আলি মুহাম্মাদ ও আদিল আহমাদ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২০৭।

না করেই সক্ষম ও সামর্থ্যবান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে (পরকালে গিয়ে) কামনা করবে, যেন তাকে হজ আদায়ের জন্য পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হয়।” এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

দাহহাক বিন মুজাহিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللَّهَ إِنَّمَا سَأَلَ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ؛ قَالَ: «سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآنًا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) : (وأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إِلَى قَوْلِهِ : (واللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)». قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا». قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالْبَعِيرُ».

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “যার কাছে তার রবের কাবাগৃহে হজ করতে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে, অথচ সে হজ করেনি; অথবা এতটা সম্পদ আছে যার দরুন তার ওপর জাকাত ফরজ হয়, কিন্তু সে জাকাত আদায় করেনি; সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার গুজারেশ করবে।” এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে ওঠলেন, “হে ইবনু আব্বাস, আল্লাহকে ভয় করুন। কেবল কাফিররাই দুনিয়াতে ফিরে আসার গুজারেশ করবে (অন্যরা নয়)।” তখন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, “আমি তোমাকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাচ্ছি : ‘হে ইমানদারগণ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে মহান

আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন না করে। যারা তা করবে (উদাসীন হবে), তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের যে কারও নিকটে মৃত্যু আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে খরচ করো। অন্যথায় (মৃত্যু সমাগত হলে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চেয়ে) সে বলবে, "হে আমার রব, আপনি আমাকে আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-সদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!" কিন্তু যখন কারও নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) চলে আসবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।' (*সুরা মুনাফিকুন* : ৯-১১)" লোকটি বললেন, "কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে জাকাত ওয়াজিব হয়?" তিনি বললেন, "দুশো দিরহাম বা ততোধিক সম্পদ।" লোকটি আবার বললেন, "কী থাকলে হজ ফরজ হয়?" তিনি বললেন, "(হজ করার মতো) পাথেয় ও যানবাহন থাকলে।"[985]

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) তাঁর তাফসিরগ্রন্থে এই হাদিস উল্লেখ করার পর **বলেছেন :**

«ورواية الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا انْقِطَاعٌ».

"ইবনু আব্বাস থেকে দাহহাক বর্ণিত এই বর্ণনায় বিচ্ছিন্নতা আছে।"[986]

অর্থাৎ, হাদিসটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। কেননা দাহহাক রাহিমাহুল্লাহ সাহাবি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদিস শোনেননি। তবে হাদিসে যে হজের অংশটুকু আলোচিত হয়েছে, তা

---

[985] সুনানুত তিরমিজি, হা. ৩৩১৬, বর্ণনার মান : দুর্বল।

[986] ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** খ. ৮, পৃ. ১৫৮।

অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) হাদিসে বর্ণিত হজের অংশটুকুর মান *'হাসান'* বলে রায় দিয়েছেন।[987]

এরপর ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবের সর্বশেষ মাসআলা আলোচনা করেছেন—**"আর উক্ত মৃতের পক্ষ থেকে হজ করা তার পরিবারের জন্য ওয়াজিব। আমরা আশা করি, উক্ত হজ তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন তার ওপর কোনো ঋণ থাকলে, এবং তার মৃত্যুর পর অন্যরা তা পরিশোধ করলে, সেটা আদায় হয়ে যায়।"**

কারণ হাদিসে এসেছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "আমার মা হজের মানত করেছিলেন। কিন্তু তিনি হজ আদায় না করেই মারা গেছেন। আমি কি তাঁর তরফ থেকে হজ করব?" নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাঁর পক্ষ থেকে তুমি হজ আদায় কর। এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত? যদি তোমার মায়ের ওপর ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং

---

[987] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা ওয়াল মাওদুআ ওয়া আসারুহাস সাইয়্যিউ ফিল উম্মাহ*** (রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৬৪-১৬৬।

আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য।”[988]

এই হাদিসের ভিত্তিতে সালাফগণ রায় দিয়েছেন, কেউ যদি ফরজ হজ আদায় না করে মারা যায়, তাহলে তার সম্পদ থেকে সেই হজ আদায় করা ওয়াজিব। চাই তিনি হজ আদায়ের অসিয়ত করে মারা যান, কিংবা অসিয়ত না করেই মারা যান। এটা শাফিয়ি[989] ও হাম্বালি[990] মাজহাবের অফিসিয়াল মত। পক্ষান্তরে আবু হানিফা ও মালিক রাহিমাহুমাল্লাহর মতানুযায়ী, হজ আদায়ের অসিয়ত করে মারা গেলে, কেবল তখনই তার তরফ থেকে হজ করা যাবে।[991] আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

---

[988] সহিহুল বুখারি, হা. ১৮৫২ ও ৭৩১৫।

[989] আন-নববি, ***আল-মাজমু,*** খ. ৭, পৃ. ৯৮।

[990] আল-বুহুতি, ***কাশশাফুল কিনা,*** খ. ৬, পৃ. ৫০।

[991] ইবনু হাজম, ***আল-মুহাল্লা,*** খ. ৫, পৃ. ৪১।

উপসংহার

এটাই ছিল আমাদের নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যা। আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি বিনিআমিহি তাতিম্মুস সালিহাত; যাবতীয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সেই মহান আল্লাহর সমীপে, যাঁর অশেষ অনুগ্রহে সমুদয় ভালো কাজ সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহর ফজল ও করমে আমি অধম ১১ই আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এই কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লেখার কাজ আরম্ভ করেছিলাম এবং ১৬ই জুমাদাস সানি ১৪৪৭ হিজরি মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে লেখা শেষ করলাম। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন যাবৎ এই গ্রন্থের পরিশীলন করলাম—সংযোজন-বিয়োজন করলাম। পরিশীলন শেষ হলো ১৫ই রমজান ১৪৪৭ হিজরি মোতাবেক ৫ই মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে। এর সবই মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিকের ফল। নিশ্চয় তিনি মহানুভব ও মহান দাতা। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন।

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিভাষাকোষ

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত যেসব পরিভাষার ব্যাখ্যা মূল আলোচনায় স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়নি, সেগুলোকে আমরা এখানে একটি পরিভাষাকোষে একত্র করেছি। পাশাপাশি কিছু পরিভাষার অর্থ গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও—বহুল ব্যবহারের কারণে—সেই অভিধাগুলোর মর্মার্থ এখানে পুনরায় তুলে ধরেছি। পাঠকদের সুবিধার্থে পরিভাষাকোষটিকে আমরা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছি।

অলি-আউলিয়া

শরিয়তের পরিভাষায়, প্রত্যেক তাকওয়াবান মুমিনকেই আল্লাহর অলি বলা হয়। এ অনুযায়ী নবি-রসুলগণও আল্লাহর অলি। পক্ষান্তরে আকিদাশাস্ত্রের পরিভাষায়, নবি নন এমন প্রত্যেক তাকওয়াবান মুমিনই আল্লাহর **অলি।**[992] আর অলি শব্দের বহুবচন 'আউলিয়া' (الأولياء جمع ولي)।

আশারি

যিনি আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৩২৪ হি.) নামে প্রচলিত আকিদার মাজহাব অনুসরণ করেন, তাঁকে **আশারি** বলা হয়। আশারি শব্দের বহুবচন 'আশায়িরা', বা 'আশআরিয়্যা' (الأشاعرة أو الأشعرية جمع أشعري)। অনেকে আরবি উচ্চারণের কাছাকাছি থাকার জন্য শব্দটিকে 'আশআরি' লিখে থাকেন।

যুগে যুগে আশারি সম্প্রদায়ের বিবর্তন হয়েছে। প্রথম স্তরের আশারিগণ কুল্লাবিয়্যা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। আবুল হাসান আল-আশারি, তাঁর ছাত্রবর্গ এবং কাছাকাছি যুগের আশারি মুহাদ্দিসগণ এই স্তরভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় স্তরের আশারিগণ ব্যাপকভাবে

---

[992] আল-উসাইমি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা,*** পৃ. ৯৩-৯৪।

মুতাজিলি আকিদার দিকে ঝুঁকেছিলেন। আব্দুল কাহির আল-বাগদাদি, আল-কুশাইরি, আল-জুওয়াইনি প্রমুখ দ্বিতীয় স্তরভুক্ত ছিলেন। আর তৃতীয় স্তরের আশারিগণ এরিস্টটলের ফিলোসফি চর্চাকারী মুসলিম দাবিদার ফিলোসফারদের আকিদার দিকে ঝুঁকেছিলেন। আল-গাজালি, আশ-শাহরাস্তানি, আর-রাজি, আল-আমিদি প্রমুখ তৃতীয় স্তরভুক্ত ছিলেন।[993]

এ কারণে বলা হয়, প্রথম যুগের আশারিদের চেয়ে পরবর্তী যুগের আশারিদের বিদাত অধিক ভয়ানক, অধিক বিভ্রান্ত। বলা হয়ে থাকে, আবুল হাসান আল-আশারি রাহিমাহুল্লাহ কুল্লাবিয়্যা মতাদর্শ পরিত্যাগ করে ইমাম আহমাদের আকিদা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আসলেই ইমাম আহমাদের আকিদায় ফিরে এসেছিলেন কিনা, আসলেও পুরোপুরি ফিরে এসেছিলেন কিনা—তা নিয়ে সালাফি গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে।[994]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হচ্ছে হকপন্থি দল; এই উম্মতের তিয়াত্তরটি ফের্কার মধ্যে একমাত্র—ফিরকাতুন নাজিয়া তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। তারা যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাই তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ' বলা হয়।[995] আর তারা যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের

---

[993] মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শিহরি, ***আল-মাদারিসুল আশআরিয়্যা দিরাসাতুন মুকারানা*** (রিয়াদ : দারুল ফাদিলা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৩-২৪।

[994] আশ-শিহরি, ***আল-মাদারিসুল আশআরিয়্যা,*** পৃ. ৭১-৭৩।

[995] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ,*** খ. ৪, পৃ. ১২২।

ওপর এবং সাহাবিগণের আদর্শের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাই তাদেরকে 'আহলুল জামাআহ' বলা হয়।[996]

ইজতিহাদ

ইসলামি শরিয়ত বিষয়ে প্রাজ্ঞ কোনো ব্যক্তি যখন শরয়ি দলিলসমূহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিজের চেষ্টাপ্রচেষ্টা প্রয়োগ করেন, তখন সেই কর্মপ্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা হয়। যাতে করে তিনি অকাট্যভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানতে পারেন—অমুক বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধান আসলে কী।[997] আর যিনি শরয়ি বিধান জানার জন্য নিয়মমাফিক চেষ্টাপ্রচেষ্টা করেন, তাঁকে বলা হয় **মুজতাহিদ।**[998]

ইজতিহাদের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। স্রেফ একজন মুজতাহিদ ব্যক্তিই ইজতিহাদ করার অধিকার রাখেন। আম্মি তথা সাধারণ মানুষ (layman) ইজতিহাদ করতে পারেন না। ইজতিহাদ করার বেশ কিছু শর্ত আছে, যেই শর্তগুলো পূরণ হলে একজন ব্যক্তি মুজতাহিদ হতে পারেন। যার মধ্যে ইজতিহাদের একটি শর্তেরও অবিদ্যমানতা পাওয়া যাবে, তিনি মুজতাহিদ হিসেবে বিবেচিত হবেন না।[999]

---

[996] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-জিবরিন, ***তাসহিলুল আকিদাতিল ইসলামিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫।

[997] মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি, ***মুজাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহ আলা রওদাতিন নাজির*** (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৪৮৫।

[998] আল-উসাইমিন, ***আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল,*** পৃ. ৮৫।

[999] আশ-শানকিতি, ***মুজাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহ,*** পৃ. ৪৮৫-৪৮৬; আল-উসাইমিন, ***আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল,*** পৃ. ৮৫-৮৬।

ইবাদিয়্যা

খারেজি সম্প্রদায়ের একটি উপদল ইবাদিয়্যা। ইবাদিয়্যা শব্দের একবচন ইবাদি (الإباضية جمع إباضي)। আব্দুল্লাহ বিন ইবাদের (মৃ. ৮৬ হি.) দিকে সম্পৃক্ত করে এদেরকে 'ইবাদিয়্যা' বলা হয়। এরা মনে করে, আহলুল কিবলার মধ্য থেকে যারা তাদের বিরোধী, তারা কাফির; তবে মুশরিক নয়। আর কবিরা গুনাহগারকে তারা 'নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাকারী কাফির' বলে, 'মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত কাফির' বলে না।[1000]

ইমামিয়্যা

শিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপদল ইমামিয়্যা। এর একবচন ইমামি। এদের বিশ্বাস—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে এবং নাম ধরে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পুরো মুসলিম উম্মাহর ইমাম (নেতা) হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর থেকে পরবর্তী ইমামদেরকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[1001]

তারা মনে করে, উম্মতের নেতৃত্ব শুধু বারো ইমামের মধ্যে সীমাবদ্ধ—আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু, এরপর তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, এবং এভাবে ধারাবাহিকভাবে সর্বশেষ ইমাম পর্যন্ত।[1002] তাদের বিশ্বাসমতে, প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদি হাজার

[1000] আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল,*** খ. ১, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

[1001] গালিব বিন আলি আল-আওয়াজি, ***ফিরাকুন মুআসিরা তানতাসিবু ইলাল ইসলাম ওয়া বায়ানু মাওকিফিল ইসলামি মিনহা*** (জেদ্দা : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাতুজ জাহাবিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

[1002] আল-আওয়াজি, ***ফিরাকুন মুআসিরা,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৯-৩৫০।

বছরেরও বেশি সময় ধরে গায়েব অবস্থায় আছেন এবং একদিন ফিরে এসে উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।[1003]

ইমামত তথা নেতৃত্বের ব্যাপারে তাদের এসব আকিদার কারণে তাদেরকে 'ইমামিয়্যা' বলা হয়। বারো ইমামে বিশ্বাসী বলে তাদেরকে 'বারো ইমামিয়া (الاثنا عشرية)' নামেও অভিহিত করা হয়। এরা অনেকগুলো জঘন্য কুফরি আকিদায় বিশ্বাসী এবং মাননীয় সাহাবিগণকে গালাগালকারী। বর্তমান ইরানের অফিসিয়াল রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ—বারো ইমামিয়া মতবাদ। ইরানের পাশাপাশি ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানেও বারো ইমামিয়া মতাদর্শের লোকজন বসবাস করে।[1004]

ইলমুল কালাম

গ্রিক ফিলোসফির তথাকথিত ইসলামিক ভার্শনকে ইলমুল কালাম তথা কালামশাস্ত্র বলে। যৌক্তিক কথামাত্রই তা কালামশাস্ত্র নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাহয় প্রচুর যৌক্তিক কথা রয়েছে। বরং গ্রিক ফিলোসফি, সার্বজনিক যৌক্তিক নীতিমালা এবং শরিয়তের কথামালা থেকে তৈরি করা—এমন অভিযোজিত (adapted) যৌক্তিক প্রমাণাদির সংকলনকে ইলমুল কালাম বলে, যা দিয়ে এই শাস্ত্রচর্চাকারীরা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করত। কিন্তু এসব নির্দিষ্ট যৌক্তিক প্রমাণকে গ্রহণ করার ফলে তারা মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।[1005] আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফগণ ইলমুল

[1003] আল-আওয়াজি, ***ফিরাকুন মুআসিরা,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৯।

[1004] আল-আওয়াজি, ***ফিরাকুন মুআসিরা,*** খ. ১, পৃ. ৩৫৪।

[1005] মুস্তাফা মুহাম্মাদ হিলমি, ***মানহাজু উলামায়িল হাদিসি ওয়াস সুন্নাতি ফি উসুলিদ্দিন*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৫৩-৮৪ ও ১৯৮-১৯৯; ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ আলি আল-গাফিস, ***শারহুল কাওয়ায়িদিস সাবয়ি মিনাত তাদমুরিয়্যা,***

কালাম চর্চা করতে নিষেধ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তীব্র কঠোরতা আরোপ করেছেন।

ওরিয়েন্টালিস্ট

ওরিয়েন্টালিস্ট (orientalist) শব্দটি ইংরেজি orient থেকে এসেছে, যার অর্থ—প্রাচ্য বা পূর্ব। পশ্চিমা গবেষকরা যখন মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেন এবং এই অধ্যয়নকে সংশ্লিষ্ট সমাজগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন; তখন সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারাকে বলা হয় ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ (الاستشراق)। আর যিনি এই কাজ করেন, তিনি হলেন ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদ।[1006]

আকিদা ও মানহাজের আলোচনায় এই পরিভাষাটি বিশেষভাবে সেই পশ্চিমা গবেষকদের বোঝায়, যারা পশ্চিমা ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে ইসলামকে অধ্যয়ন করেন। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের উদ্দেশ্য থাকে—গবেষণার নামে ইসলামকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করা এবং দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে সংশয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা।[1007]

(ই-বুক, মুদ্রণবিহীন ডক ফাইল, তাবি), পৃ. ১১-১৩, বইয়ের লিংক : https://t.me/yosfe555/1466.

[1006] ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সগির, ***আল-ইস্তিশরাক ওয়া মাওকিফুহু মিনাস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*** (মদিনা : কিং ফাহাদ গ্লোরিয়াস কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সে, তাবি), পৃ. ৬।

[1007] আস-সগির, ***আল-ইস্তিশরাক,*** পৃ. ৮-৯।

ওয়াকিফা

যারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে *'আল্লাহর কথা'* বলার পর *'ওয়াক্‌ফ'* করে; অর্থাৎ থেমে যায়। বলে না যে, 'কুরআন আল্লাহর মাখলুক।' আবার এটাও বলে না যে, 'কুরআন আল্লাহর মাখলুক নয়।' এদেরকে 'ওয়াকিফা' বলা হয়। এরা প্রকাশ্যে ওয়াক্‌ফ করলেও মনে মনে অনেকেই সেই মাখলুকবাদী জাহমিদের আকিদা পোষণ করত, যারা স্পষ্টভাবে কুরআনকে মাখলুক বলে থাকে। তাই সালাফগণ ওয়াকিফা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।[1008]

কাদারিয়া

ভাগ্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে 'কাদারিয়া (القدرية)' বলা হয়। এদের একাধিক স্তর আছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কালামশাস্ত্র

কালামশাস্ত্রের পরিচয় দেখুন 'ইলমুল কালাম' শীর্ষক ভুক্তিতে।

কালামি

ইলমুল কালাম তথা কালামশাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়কে 'কালামি' বলা হয়। যেমন কালামশাস্ত্রভিত্তিক দলকে 'কালামি ফের্কা' বলা হয়, কালামশাস্ত্রভিত্তিক আকিদাকে 'কালামি আকিদা' বলা হয়। অনুরূপভাবে কালামি আকিদা পোষণকারীকেও 'কালামি (الكلامي)' বা 'মুতাকাল্লিম (المتكلم)' বলা হয়।

[1008] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১২, পৃ. ৩৫৮।

কুল্লাবিয়্যা

বসরার প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম—আব্দুল্লাহ বিন সায়িদ ইবনু কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ২৪৫ হি.) আকিদা অনুসরণকারীদের 'কুল্লাবিয়্যা' বলা হয়। কুল্লাবি শব্দের বহুবচন কুল্লাবিয়্যা (الكلابية جمع كلابي)। বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত হারিস আল-মুহাসিবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৩ হি.) এবং আবুল আব্বাস আল-কালানিসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যুসন অজ্ঞাত) কুল্লাবি আকিদা অনুসরণ করতেন। কুল্লাবিরা পথভ্রষ্ট ফের্কা, তাদের আকিদাও বিদাতি আকিদা। এ সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে কুল্লাবিদের আকিদা আশারিদের চেয়ে ভালো।[1009] কথিত আছে, হারিস আল-মুহাসিবি রাহিমাহুল্লাহ এই আকিদা থেকে ফিরে এসেছিলেন।[1010]

খারেজি

সাহাবিদের যুগে উদ্ভূত এক প্রাচীন ফের্কার নাম 'খারেজি ফের্কা'। খারেজিরা যেহেতু মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে 'খুরুজ (বিদ্রোহ)' করার আকিদা পোষণ করে, তাই তাদেরকে 'খারেজি' বলা হয়।[1011] কেউ কেউ বলেন, খারেজিদের প্রথম দিকের দল যেহেতু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে 'খুরুজ' করেছিল, তাই তাদেরকে 'খারেজি' বলা হয়।[1012] খারেজিদের উল্লেখযোগ্য মৌলিক আকিদা আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

[1009] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ১৯১-১৯২।

[1010] ইবনু তাইমিয়া, ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল,*** খ. ২, পৃ. ৬।

[1011] আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল,*** খ. ১, পৃ. ১১৪।

[1012] আল-আশারি, ***মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন,*** খ. ১, পৃ. ১১২।

জাবারিয়া

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীত জাবারিয়া সম্প্রদায়। তাকদির সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয় এবং বান্দাকে নিজের কাজে 'মজবুর তথা পুরোপুরি বাধ্য' মনে করে, তাদেরকে জাবারিয়া বলা হয়। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জাহমিয়া

জাহম বিন সাফওয়ান নামক পথভ্রষ্ট ধর্মচ্যুত ব্যক্তির মৌলিক আকিদা কিংবা তার বাতিল আকিদার অংশবিশেষ যারা পোষণ করে, সাধারণত তাদেরকে 'জাহমিয়া সম্প্রদায়' বলা হয়। আর একজন ব্যক্তি হলে, তাকে বলা হয়—জাহমি। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের তিনটি স্তর আছে। এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

জিন্দিক

'জিন্দিক' শব্দটি অনারব। ইসলাম বিজয়লাভের পরবর্তী সময়কালে শব্দটিকে ফার্সি ভাষা থেকে আরবি করা হয়েছে। আমাদের সালাফগণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[1013] জিন্দিক শব্দের বহুবচন জানাদিকা (الزنادقة جمع زنديق)। সালাফ ও ইমামদের শব্দপ্রয়োগ থেকে 'জিন্দিক' শব্দের কয়েকটি অর্থ ও ব্যবহার জানা যায়। যেমন :

[1013] ইবনু তাইমিয়া, ***বুগইয়াতুল মুরতাদ,*** পৃ. ৩৩৮।

এক. জানাদিকা বলতে দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী অগ্নিপূজক সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারীদের বোঝানো হয়।[1014]

দুই. জিন্দিক মানে মুনাফিক—যে নিজের কুফরকে গোপন রেখে ইসলামকে জাহির করে।[1015] এটাই 'জিন্দিক' অভিধার সবচেয়ে মশহুর প্রয়োগ।

তিন. সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গেছে এমন বিদাতি লোককেও 'জিন্দিক' বলা হয়।[1016]

ট্রান্সক্রাইব

কোনো অডিয়ো বা ভিডিয়ো কন্টেন্টকে টেক্সটে রূপান্তর করা। অর্থাৎ, অডিয়ো শুনে তা লিখে নেওয়া।

তাবি

রেফারেন্স দিতে যেয়ে অনেক সময় শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর মানে—তারিখবিহীন।

তাবেয়ি

তাবেয়ি শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুসারী। পরিভাষায়, যিনি মুমিন অবস্থায় কোনো সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম

[1014] আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মালাতি, ***আত-তাম্বিহু ওয়ার রদ্দু আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদা,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি (মিশর : আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, তাবি), পৃ. ৯১-৯২।

[1015] ইবনু তাইমিয়া, ***বুগইয়াতুল মুরতাদ,*** পৃ. ৩৩৮।

[1016] আব্দুর রহিম বিন সুমায়িল আস-সুলামি, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি), ট্রান্সক্রিপ্টেড ফাইলের স্ক্রিপ্ট নং : ১০, পৃ. ২৭।

হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি হলেন তাবেয়ি (التابعي: من لقي الصحابي مؤمنا، ومات على الإسلام)।[1017] অর্থাৎ, তাবেয়িগণ হলেন সাহাবিগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ; যাঁরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ পাননি, কিন্তু সাহাবিগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

তাবে-তাবেয়ি

তাবে-তাবেয়ি শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুসারীর অনুসারী। পরিভাষায়, যিনি মুমিন অবস্থায় কোনো তাবেয়ির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলিম হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি হলেন তাবে-তাবেয়ি।[1018]

দেওবন্দি

ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের দেওবন্দ শহরে অবস্থিত একটি মাদারাসা—দারুল উলুম দেওবন্দ। যারা উক্ত মাদরাসার আদর্শ অনুসরণ করেন এবং নিজেদেরকে উক্ত মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত করেন, তাঁদেরকে দেওবন্দি বলা হয়। দেওবন্দি মতাদর্শের কয়েকজন শীর্ষনেতা ও চিন্তাবিদ হলেন—মৌলানা কাসিম নানুতুবি, মৌলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, মৌলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি, মৌলানা আশরাফ আলি থানভী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী প্রমুখ

[1017] আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***নুজহাতুন নাজর ফি তাওদিহি নুখবাতিল ফিকার,*** তাহকিক : আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম (১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.), পৃ. ১৯৩।

[1018] সুবহি ইবরাহিম আস-সালিহ, ***উলুমুল হাদিসি ওয়া মুসতালাহুহ : আরদ ওয়া দিরাসা*** (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৫শ প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫৭।

রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহুম।[1019] বাই ডিফল্ট, দেওবন্দিগণ সাধারণত আশারি-মাতুরিদি আকিদা পোষণ করেন। কারণ এটাই দেওবন্দিদের অফিসিয়াল আকিদা।[1020] কিন্তু এ সত্ত্বেও একদল দেওবন্দি মহান আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সালাফদের আকিদাই পোষণ করেন।

নাসিবি

রাফিদি শিয়াদের বিপরীত আরেক পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী হলো—নাসিবি ফের্কা। নাসিবি শব্দের বহুবচন 'নাসিবা' অথবা 'নাওয়াসিব' (الناصبة أو النواصب جمع ناصبي)। রাফিদি শিয়াদের বিরোধিতা করতে যেয়ে নাসিবিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারকে ঘৃণা করেছে এবং তাঁদের সাথে শত্রুতা করেছে। এরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পক্ষাবলম্বীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছে (نصبوا العداوة لعليٍّ ومَن والاه); বিধায় এদেরকে 'নাসিবি' বলা হয়। এদের পরিচয় সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

ফালাসিফা

ফাইলাসুফ শব্দের বহুবচন ফালাসিফা (الفلاسفة جمع فيلسوف); যার অর্থ—দার্শনিক, ফিলোসফার। সাধারণত দার্শনিকরা কেবল বিবেক দ্বারা প্রমাণিত বিষয় বিশ্বাস করে। দার্শনিকদের অনেক উপদল আছে। আকিদা বিষয়ক আলোচনায় শুধু 'ফালাসিফা' শব্দ উল্লিখিত

[1019] একদল গবেষক, ***মাওসুআতুল ফিরাকিল মুনতাসিবাতি লিল ইসলাম,*** গবেষণা-তত্ত্বাবধান : আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ (আদ-দুরারুস সানিয়্যা ওয়েবসাইট, অনলাইনে প্রকাশিত, প্র. ১৪৩৩ হি.), খ. ৮, পৃ. ৪৪৫-৪৫১।

[1020] সাহারানপুরি, ***আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ,*** পৃ. ৪০-৪১।

হলে 'ওয়াকিং ফিলোসফারদের (الفلاسفة المشائية)' বোঝানো হয়।[1021] অর্থাৎ, গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদেরকে। এরিস্টটল হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর ছাত্রদের দর্শন শেখাতেন বলে তাদেরকে 'ওয়াকিং ফিলোসফার্স' বলা হয়।[1022] প্রক্লেস (Proclus), আলেকজান্ডার (Alexander), দামিসটিয়াস (Themistius) প্রমুখ দার্শনিক ছিলেন এরিস্টটলের সবচেয়ে প্রখ্যাত অনুসারী।[1023]

দার্শনিক আল-ফারাবি (মৃ. ৩৩৯ হি.) মুসলিমদের মধ্যে এরিস্টটলের দর্শন নিয়ে আসেন এবং উক্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় শিক্ষক (The Second Teacher) বলা হয়। পরবর্তীতে ইবনু সিনা (Avicenna) এসে এরিস্টটলের দর্শনকে আরও পরিশীলন ও ব্যাখ্যা করেন। এ কারণে তাঁকে 'তৃতীয় শিক্ষক' বলা হয়। আর এরিস্টটল হলেন প্রথম শিক্ষক।[1024] অনুরূপভাবে *'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'* কিতাবের লেখক দার্শনিক ইবনু রুশদ-ও (Averroes) ওয়াকিং ফিলোসফারদের অনুসরণ করতেন।[1025]

আকিদা বিষয়ে ফিলোসফারদের আকিদা—আশারি-মাতুরিদি, মুতাজিলি ও খাঁটি জাহমিদের আকিদার চেয়েও ভয়ংকর। এজন্য

[1021] মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি, ***শারহুত তাদমুরিয়্যা*** (কুয়েত : দারু ইলাফ আদ-দুওয়ালিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৭।

[1022] জামিল সালিবা, ***আল-মুজামুল ফালসাফি*** (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লুবনানি, প্র. ১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

[1023] ইবনু তাইমিয়া, ***আর-রদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন,*** পৃ. ৩৩৬।

[1024] আস-সাফফারিনি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ২৭৯।

[1025] ইবনু তাইমিয়া, ***দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাকল,*** খ. ৬, পৃ. ২১০-২৪২।

মুসলিম দাবিদার বিভিন্ন ফিলোসফারকে যুগে যুগে আলিমগণ কাফির ফতোয়া দিয়েছেন।[1026]

ফের্কা

ফের্কা মানে মানুষদের একটি গোষ্ঠী, বা দল, বা সম্প্রদায়। শরিয়তের আলোচনায় 'ফের্কা' শব্দ ব্যবহৃত হলে, বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর ৭৩টি ফের্কার কোনো একটিকে উদ্দেশ্য করা হয়। হাদিস থেকে জানা যায়, এই উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি বাহাত্তরটি দল জাহান্নামে যাবে।[1027] সেই একটি দলকে 'আল-ফিরকাতুন নাজিয়া' তথা 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল' বলা হয়।

বাতিনিয়্যা

শিয়াদের 'ইসমায়িলিয়্যা' উপদলকে 'বাতিনিয়্যা' বলা হয়। কারণ এরা মনে করে, শরিয়তের প্রতিটি প্রকাশ্য অর্থ বা বিধানের একটি বাতিন (গোপন অর্থ) আছে।[1028] এ কথা বলে তারা শরিয়তের নানারকম উদ্ভট ও কদর্য অপব্যাখ্যা দাঁড় করায়। উদাহরণস্বরূপ তারা দাবি করে, নামাজ মানে গুপ্তরহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, রমজানের রোজা মানে গুপ্তরহস্যকে লুকিয়ে রাখা, আর বাইতুল্লাহর হজ মানে

[1026] আজ-জাহাবি, ***সিয়ারু আলামিন নুবালা,*** খ. ১৭, পৃ. ৫৩৫; আব্দুল লাতিফ বিন আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ, ***মিসবাহুজ জালাম ফির রদ্দি আলা মান কাজ্জাবাশ শাইখাল ইমাম ওয়া নাসাবাহু ইলা তাকফিরি আহলিল ইমানি ওয়াল ইসলাম,*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ আলু হামাদ (সৌদি আরব : সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৮২।

[1027] আবু দাউদ, হা. ৪৫৯৬; তিরমিজি, হা. ২৬৪০; ইবনু মাজাহ, হা. ৩৯৯১; বর্ণনার মান : সহিহ।

[1028] আশ-শাহরাস্তানি, ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল,*** খ. ১, পৃ. ১৯২।

তাদের পির-মাশায়েখদের কাছে সফর করা![1029] এরকম অসংখ্য উদ্ভট বাতিনি অপব্যাখ্যা করার কারণে এদেরকে 'বাতিনিয়্যা' বলা হয়।

বিব্লিয়োগ্রাফি

বিব্লিয়োগ্রাফি তথা প্রমাণপঞ্জি হলো যাবতীয় সোর্স বা উৎসের একটি সুবিন্যস্ত ও বিস্তারিত তালিকা; যেই সোর্সগুলো একজন লেখক তাঁর গবেষণাপত্র, গ্রন্থ, কিংবা প্রবন্ধ লেখার কাজে সরাসরি ব্যবহার করেছেন।[1030] গবেষণাপত্রে সরাসরি রেফারেন্স দেওয়া হয়নি, কিন্তু গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট—এমন কিতাবপত্রের তালিকাও কখনো কখনো বিব্লিয়োগ্রাফিতে উল্লেখ করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে এ জাতীয় সোর্সের তালিকা আলাদাভাবে উল্লেখ করে জানিয়ে দিতে হয়—এই গবেষণাপত্রে এসব সোর্স রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

মাখলুকিয়্যা

যারা সরাসরি কুরআনকে মাখলুক বলে, তাদেরকে 'মাখলুকিয়্যা' তথা 'মাখলুকবাদী' বলা হয়।[1031]

মাতুরিদি

যিনি আবু মানসুর আল-মাতুরিদি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৩৩৩ হি.) কালামি আকিদা অনুসরণ করেন তাঁকে **মাতুরিদি** বলা হয়। মাতুরিদি শব্দের বহুবচন 'মাতুরিদিয়া/মাতুরিদিয়্যা' (الماتريدية جمع ماتريدي)।

[1029] ইবনু তাইমিয়া, ***আত-তাদমুরিয়্যা,*** পৃ. ৪৮; ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ৩, পৃ. ২৯।

[1030] "বিব্লিয়োগ্রাফি," ***এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা,*** তারিখবিহীন, https://www.britannica.com/topic/bibliography.

[1031] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১২, পৃ. ৩৫৯।

মাতুরিদি আকিদার সাথে আশারি আকিদার প্রচুর মিল আছে। কিন্তু বেশ কিছু মৌলিক ইস্যুতে মতভেদও আছে। সপ্তম হিজরি শতকের আগে আশারি-মাতুরিদি বিদ্বানগণ একে অপরকে বিদাতি বলতেন। আশারিরা মাতুরিদিদের বিদাতি বলতেন, আবার মাতুরিদিরা আশারিদের বিদাতি বলতেন। পরবর্তীতে তাঁরা—আশারি-মাতুরিদি উভয় গোষ্ঠীকে 'আহলুস সুন্নাহ' দাবি করতে আরম্ভ করেন।[1032]

মুজতাহিদ

মুজতাহিদের পরিচয় দেখুন 'ইজতিহাদ' শীর্ষক ভুক্তিতে।

মুজাসসিমা

মুজাসসিম শব্দের বহুবচন মুজাসসিমা (المجسمة جمع مجسم)। যারা সরাসরি মহান আল্লাহর 'দেহ বা শরীর' আছে বলে দাবি করে, তাদেরকে 'মুজাসসিমা তথা দেহবাদী' বলা হয়। পক্ষান্তরে জাহমি সম্প্রদায়ের লোকজন যেসব প্রমাণিত সিফাত অস্বীকার করে, সেগুলো কোনো সুন্নাহপন্থি ব্যক্তি সাব্যস্ত করলে তাকে তারা অন্যায়ভাবে 'দেহবাদী' আখ্যা দেয়। জাহমিদের দাবি সঠিক হলে সোনালী তিন যুগের সালাফগণকে দেহবাদী আখ্যা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। একারণে তাদের দাবি পুরোপুরি ভ্রান্ত এবং বাতিল।

মুতাওয়াতির

যেই খবর বা হাদিস অনির্দিষ্ট সংখ্যার বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয় এবং হাদিসটি নিজে থেকেই নিজের সত্যতা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে

[1032] মুহাম্মাদ মুহাম্মাদি বিন মুহাম্মাদ আন-নুরিস্তানি, ***মাওয়াকিফুত তাফতাজানি আল-ইতিকাদিয়্যা ফি কিতাবিহি শারহিল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা*** (আল-জাহরা : দারু ইলাফ আদ-দুওয়ালিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪৯-৪৫৫।

দেয়, সেই হাদিসকে মুতাওয়াতির বলা হয়। কোনো হাদিসকে মুতাওয়াতির হতে হলে সেটা 'বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত' হতে হয়। মুতাওয়াতির হাদিসের মোট চারটি বা পাঁচটি শর্ত মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করে থাকেন।[1033]

মুতাজিলা

মুতাজিলি শব্দের বহুবচন মুতাজিলা (المعتزلة جمع معتزلي)। মুতাজিলা একটি সুপ্রাচীন ও বড়োসড়ো কালামি সম্প্রদায়। এদের প্রধান নেতা ওয়াসিল ইবনু আতা (মৃ. ১৩১ হি.) বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১১০ হি.) মজলিসে এই বিদাতি আকিদা প্রকাশ করেছিল—কবিরা গুনাহগার ব্যক্তি মুমিনও না, আবার কাফিরও না; বরং উভয় স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। এই বিদাতি আকিদা শুনে ইমাম হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ তাকে নিজের মজলিস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তখন সে ইমাম হাসানের মজলিস *'ইতিজাল (পরিত্যাগ)'* করে মসজিদের এক স্তম্ভের কাছে গিয়ে নিজের বৈঠক চালু করেছিল। যেহেতু সে ইমাম হাসানের মজলিস *'ইতিজাল'* করেছিল, তাই তাকে ও তার অনুসারীদেরকে **'মুতাজিলা'** নামে নামকরণ করা হয়।[1034]

মুশাব্বিহা

মুশাব্বিহ শব্দের বহুবচন মুশাব্বিহা (المشبهة جمع مشبه)। অভিধাটি 'তাশবিহ' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ—সাদৃশ্য দেওয়া, উপমা দেওয়া। পরিভাষায়, যারা মহান আল্লাহকে অথবা তাঁর

[1033] আল-আসকালানি, ***নুজহাতুন নাজার,*** পৃ. ৮৫-৮৭।

[1034] আল-বাগদাদি, ***আল-ফারক বাইনাল ফিরাক,*** পৃ. ৯৮।

সিফাতকে মাখলুকের সাথে কিংবা মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়, তাদেরকে 'মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদী' বলা হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এদের প্রকৃত পরিচয় আলোচনা করা হয়েছে।

রাফিদি

রাফিদি শব্দের বহুবচন 'রাফিদা' বা 'রাওয়াফিদ' (الرافضة أو الروافض جمع رافضي)। রাফিদি সম্প্রদায় মূলত শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বড়ো উপদল। এরা জাইদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিবকে (মৃ. ১২২ হি.) প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ তারা জাইদ বিন আলিকে সাইয়্যিদুনা আবু বকর ও সাইয়্যিদুনা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। তিনি তাঁদের দুজনের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু রাফিদিদের বিশ্বাস ছিল—সাইয়্যিদুনা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুই প্রথম খলিফা হওয়ার হকদার। ফলে তারা প্রথম দুই খলিফা আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিন্দা-সমালোচনা করত। কুফায় জাইদ বিন আলি যখন রাফিদিদের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলেন না, তখন তারা জাইদ বিন আলির কথা *'রফদ (রিফিউজ/প্রত্যাখ্যান)'* করেছিল এবং তাঁর বায়াত তথা আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। তারা জাইদ বিন আলির কথা 'রফদ' করার কারণে তখন থেকে তাদেরকে 'রাফিদি সম্প্রদায়' বলা হয়।[1035] রাফিদিদের ভয়ংকর কুফরি আকিদার সামান্য নমুনা আমরা এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

[1035] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাহ,*** খ. ২, পৃ. ৯৬; ইবনু কাসির, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,*** খ. ১৩ , পৃ. ১০৬-১০৭।

লাওহে মাহফুজ

আভিধানিক অর্থে, লাওহে মাহফুজ মানে সুরক্ষিত ফলক। শরিয়তের পরিভাষায়, লাওহে মাহফুজ মানে এমন ফলক—যেখানে সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে; আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে।[1036] লাওহে মাহফুজ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন, "বরং এটা মহিমান্বিত কুরআন; যা লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত) আছে।"[1037]

লাফজিয়্যা

একদল লোক মনে করে, মহান আল্লাহ যেই কুরআন অবতীর্ণ করেননি, সেটা আল্লাহর কথা এবং সেটা মাখলুক নয়। কিন্তু তিনি যেই কুরআন স্বীয় রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেই কুরআন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনগণ তেলাওয়াত করেছেন, সেটা মাখলুক! যারা এ ধরনের আকিদা পোষণ করে, তাদেরকে ***'লাফজিয়্যা'*** বলা হয়।[1038]

শিয়া

কোনো বিষয়ে একদল লোক জমায়েত হলে সেই দলটিকে আরবি ভাষায় *'শিয়া'* বলা হয়। পক্ষান্তরে আকিদাগত সম্প্রদায় হিসেবে *'শিয়া'* গোষ্ঠীকে **'শিয়া'** বলার কারণ—তারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে *'মুশায়াআহ (সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন)'* করার দাবি করে এবং তাঁকে সকল সাহাবির চেয়ে উত্তম মনে করে। অথচ সর্বোত্তম সাহাবি

[1036] ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ২, পৃ. ৩৪৪।

[1037] সুরা বুরুজ ৮৫:২১-২২।

[1038] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১২, পৃ. ৩৫৯।

হলেন—আবু বকর, তারপর ওমর, তারপর উসমান, তারপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেকগুলো উপদল আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফির, আবার কেউ কেউ মুসলিম।[1039]

সুফি

আস-সুফিয়্যা তথা সুফি ফের্কা একটি প্রসিদ্ধ বিদাতি গোষ্ঠী, যাদের উদ্ভব হয়েছিল তৃতীয় হিজরি শতকে।[1040] সুফিগণ শরিয়তের সীমা অতিক্রম করে অতিরিক্ত দুনিয়াবিমুখতা চর্চা করতেন। তাঁরা প্রথম দিকে কেবল এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও বিদাত বৃদ্ধি পায়। তাঁরা বিভিন্ন তরিকা ও উপদলে বিভক্ত হন। তাঁদেরকে কেন *'সুফি'* নামকরণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে নানা মনীষীর নানা মত আছে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মনে করেন, প্রাক্কালীন দুনিয়াবিমুখ সুফিগণ বেশিরভাগ 'সুফ (صوف) তথা পশমের' তৈরি পোশাক পরতেন। তাই তাঁদেরকে 'সুফি' ডাকা আরম্ভ হয়।[1041]

উল্লেখ্য, আহলুস সুন্নাহর কিছু বিদ্বানকেও সুফি বলা হয়েছে তাঁদের প্রবল দুনিয়াবিমুখতার কারণে। যেমন বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ি ফুদাইল ইবনু ইয়াদ, তাবে-তাবেয়ি ইবরাহিম বিন আদহাম প্রমুখকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া 'সুফি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[1042]

[1039] ইবনু তাইমিয়া, ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ,*** খ. ৩, পৃ. ৪৭০।

[1040] আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যা লিশ শাবাবিল ইসলামি, ***আল-মাওসুআতুল মুইয়াসসারা ফিল আদইয়ানি ওয়াল মাজাহিবি ওয়াল আহজাবিল মুআসিরা,*** পরিশীলন : মানি বিন হাম্মাদ আল-জুহানি (রিয়াদ : দারুন নাদওয়াতিল আলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২০ হি.), খ. ১, পৃ. ২৪৯।

[1041] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ২৯।

[1042] ইবনু তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া,*** খ. ১১, পৃ. ৫৩৪, ৬০৪, ৬২৯।

তাই গণহারে সকল সুফিকে 'বিদাতি' বলা সমীচীন নয়। এজন্য বর্তমান যুগে তরিকাপন্থি সুফিদের কথা বিবেচনা করে আমরা সুফিদেরকে দলগতভাবে বিদাতি গোষ্ঠী বললেও গণহারে সকল সুফিকে 'বিদাতি' আখ্যা দিই না।

সুমানিয়্যা

সুমানিয়্যা একটি মূর্তিপূজারি গোষ্ঠী। ভারতের সোমনাথ অঞ্চলের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে 'সুমানিয়্যা' বলা হয়।[1043] তারা কেবল বিবেক ও ইন্দ্রীয় দ্বারা প্রমাণিত বিষয় মানত এবং এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করত। আমাদের এই জগৎকে শুরুহীন আদি মনে করত। তাদের কেউ কেউ পুনর্জন্মবাদেও বিশ্বাস করত।[1044] জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা জাহম বিন সাফওয়ানের সাথে এদেরই একটা দলের বিতর্ক হয়েছিল।[1045]

হাদ্দাদি

হাদ্দাদি শব্দের বহুবচন হাদ্দাদিয়্যা (الحدادية جمع حدادي)। মিশরের 'মাহমুদ হাদ্দাদ' নামের এক লোকের দিকে সম্পৃক্ত করে 'হাদ্দাদিয়্যা' ফের্কার নামকরণ করেছেন সালাফি উলামাগণ। কারণ মাহমুদ হাদ্দাদ ও তার মানহাজ অবলম্বনকারী ব্যক্তিরা বিদাতি বলার ক্ষেত্রে চরমপন্থা করেছে। খারেজিরা যেমন 'অন্যায়ভাবে কাফির বলে' চরমপন্থা করে, তেমনি হাদ্দাদিরা 'অন্যায়ভাবে বিদাতি বলে' চরমপন্থা

[1043] মুহাম্মাদ বিন আলি আত-থানবি, ***মাওসুআতু কাশশাফি ইস্তিলাহাতিল ফুনিনি ওয়াল উলুম,*** ফার্সি থেকে আরবিতে ভাষান্তর : আব্দুল্লাহ আল-খালিদি (বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭০৯।

[1044] আল-বাগদাদি, ***আল-ফারক বাইনাল ফিরাক,*** পৃ. ২৫৩, ৩১২, ৩৪৬।

[1045] ইবনু বাত্তাহ, ***আল-ইবানা,*** খ. ৬, পৃ. ৮৬।

করে। যিনি বিদাতি ফতোয়া পাওয়ার হকদার নন, তাঁকে অন্যায়ভাবে বিদাতি বলা—হাদ্দাদি মতাদর্শ।[1046]

তদ্রূপ যেই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মুজতাহিদ বিদ্বানদের মধ্যে ভ্যালিড ইখতিলাফ আছে, সেই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর একটি ভ্যালিড মত গ্রহণ করার কারণে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা এবং তাঁকে বয়কট-বর্জন করাও—হাদ্দাদি মতাদর্শ। মনে রাখা জরুরি, হাদ্দাদিরা সুশৃঙ্খল নীতিমালা ও বিশুদ্ধ মূলনীতি অনুসরণ না করে হকপন্থি উলামাদের ড্রপ করে দেওয়ার ফন্দিফিকির করে।[1047]

আহলুস সুন্নাহর অনেক সমকালীন কিবার আলিমকে হাদ্দাদিরা 'বিদাতি' আখ্যা দিয়েছে। সেসব কিবার আলিমের অন্যতম—শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি, শাইখ ইবনু বাজ, শাইখ আলবানি, শাইখ ইবনু উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুদাইয়্যান, শাইখ সালিহ আল-লুহাইদান, শাইখ সালিহ আল-ফাওজান, শাইখ আহমাদ আন-নাজমি, শাইখ জাইদ বিন হাদি আল-মাদখালি, শাইখ রাবি বিন হাদি আল-মাদখালি প্রমুখ।[1048]

[1046] রাবি বিন হাদি উমাইর আল-মাদখালি, ***মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ফাতাওয়া ফাদিলাতিশ শাইখিল আল্লামা রাবি বিন হাদি উমাইর আল-মাদখালি*** (কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, তাবি), খ. ৯, পৃ. ৪৭০।

[1047] সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ আর-রুহাইলি, ***আল-ইলাম বিল আইম্মাতিল আরবাআতিল আলাম*** (আলজিয়ার্স : দারুল মিরাসিন নববি, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২০৩।

[1048] আব্দুল্লাহ বিন আমির আল-আহমাদি, ***আন-নুকুলাতুস সালাফিয়্যা ফির রদ্দি আলাত তায়িফাতিল হাদ্দাদিয়্যা*** (কায়রো : আদ-দারুল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৭।

বিব্লিয়োগ্রাফি

১. আল-কুরআনুল কারিম।

২. আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি (মৃ. ১৭০ হি.)। ***আল-আইন।*** তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুরায়ি। বৈরুত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, তাবি।

৩. আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর আল-হুমাইদি (মৃ. ২১৯ হি.)। ***উসুলুস সুন্নাহ।*** তাহকিক : মিশআল মুহাম্মাদ আল-হাদ্দাদি। আল-জাহরা : দারু ইবনিল আসির, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৪. আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনুজ জুবাইর আল-হুমাইদি (মৃ. ২১৯ হি.)। ***মুসনাদুল হুমাইদি।*** তাহকিক : হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি। দামেস্ক : দারুস সাক্কা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।

৫. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাবি (মৃ. ২২৪ হি.)। ***কিতাবুল ইমান ওয়া মাআলিমুহু ওয়া সুনানুহু ওয়া ইসতিকমালুহু ওয়া দারাজাতুহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

৬. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাবি (মৃ. ২২৪ হি.)। ***গরিবুল হাদিস।*** তাহকিক : হুসাইন মুহাম্মাদ শারাফ। কায়রো : আল-হাইআতুল আম্মাহ লি শুউনিল মাতাবিয়িল আমিরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।

৭. আবুল হাসান আব্দুল আজিজ বিন ইয়াহইয়া আল-কিনানি আল-মাক্কি (মৃ. ২৪০ হি.)। ***আল-হাইদাতু ওয়াল ইতিজার ফির রদ্দি আলা মান কালা বি খলকিল কুরআন।*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ফাকিহি। মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৮. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াজ জানাদিকা।*** তাহকিক : সাবরি বিন সালামা শাহিন। রিয়াদ : দারুস সাবাত, তাবি।

৯. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***উসুলুস সুন্নাহ।*** আল-খার্জ : দারুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.।

১০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আত-তারিখুল আওসাত।*** তাহকিক : মাহমুদ ইবরাহিম জাইদ। আলেপ্পো ও কায়রো : দারুল ওয়ায়ি ও মাকতাবাতু দারিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.।

১১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আস-সহিহ আল-জামি।*** পরিশীলন : মুহাম্মাদ আজ-জুহাইর আন-নাসির। বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.।

১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***খলকু আফআলিল ইবাদ।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আমিরা। রিয়াদ : দারুল মাআরিফিস সুউদিয়্যা, তাবি।

১৩. আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আস-সিজিস্তানি (মৃ. ২৭৫ হি.)। ***মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ রিওয়াইয়াতু আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি।*** তাহকিক : আবু মুয়াজ তারিক আওয়্যাদাল্লাহ। মিশর : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৪. ইসহাক বিন ইবরাহিম ইবনু হানি আন-নাইসাবুরি (মৃ. ২৭৫ হি.)। ***মাসায়িলু আহমাদ ইবনি হাম্বাল রিওয়াইয়াতু ইবনি হানি।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আলি আল-আজহারি। কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.।

১৫. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি (মৃ. ২৭৬ হি.)। ***আল-ইখতিলাফু ফিল লাফজ ওয়ার রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা ওয়াল মুশাব্বিহা।*** তাহকিক : উমার বিন মাহমুদ আবু উমার। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.।

১৬. ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাবি (মৃ. ২৭৭ হি.)। ***আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ।*** তাহকিক : আকরাম দিয়া আল-উমারি। বাগদাদ : মাতবাআতুল ইরশাদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৪ খ্রি.।

১৭. আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা আত-তিরমিজি (মৃ. ২৭৯ হি.)। ***আল-জামিউস সহিহ।*** তাহকিক ও টীকা : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি ও ইবরাহিম আতওয়া। মিশর : শারিকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.।

১৮. হার্ব বিন ইসমায়িল আল-কিরমানি (মৃ. ২৮০ হি.)। ***ইজমাউস সালাফি ফিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : সাদ আজ-জাতারি। কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

১৯. আবু মুহাম্মাদ হার্ব বিন ইসমায়িল বিন খালাফ আল-কিরমানি (মৃ. ২৮০ হি.)। ***মাসায়িলু হার্ব আল-কিরমানি।*** তাহকিক : ফায়িজ বিন আহমাদ বিন হামিদ হাবিস। অন্তর্জালিক সংস্করণ, প্র. ১৪২২ হি.।

২০. আবু সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি (মৃ. ২৮০ হি.)। ***আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা।*** তাহকিক : বদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বদর। কুয়েত : দারু ইবনিল আসির, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

২১. আবু সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আদ-দারিমি (মৃ. ২৮০ হি.)। ***নাকদুল ইমাম আবি সায়িদ উসমান বিন সায়িদ আলাল মারিসিয়্যিল জাহমিয়্যিল আনিদ ফিমা ইফতারা আলাল্লাহি মিনাত তাওহিদ।*** তাহকিক : রশিদ বিন হাসান আল-আলমায়ি। মাকাতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

২২. আবু মুহাম্মাদ সাহল বিন আব্দুল্লাহ আত-তুসতারি (মৃ. ২৮৩ হি.)। ***তাফসিরুত তুসতারি।*** সংকলক : আবু বাকর মুহাম্মাদ আল-বালাদি। তাহকিক : মুহাম্মাদ বাসিল। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.।

২৩. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৯০ হি.)। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কাহতানি। দাম্মাম : দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

২৪. মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মারওয়াজি (মৃ. ২৯৪ হি.)। ***তাজিমু কাদরিস সালাত।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল জাব্বার। মদিনা : মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.।

২৫. আবু বাকর জাফার বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরইয়াবি (মৃ. ৩০১ হি.)। ***সিফাতুন নিফাক ওয়া জাম্মুল মুনাফিকিন।*** তাহকিক : আবু আব্দুর রহমান আল-মিসরি। মিশর : দারুস সাহাবাতি লিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

২৬. আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। ***আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ দিন।*** তাহকিক : আলি বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

২৭. আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

২৮. আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন সার্রি আজ-জাজ্জাজ (মৃ. ৩১১ হি.)। ***মাআনিল কুরআন ওয়া ইরাবুহু।*** তাহকিক : আব্দুল জালিল আব্দুহ। বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

২৯. আবু বাকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-হাম্বালি (মৃ. ৩১১ হি.)। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

৩০. আবু বাকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-বাগদাদি আল-হাম্বালি (মৃ. ৩১১ হি.)। ***আহকামু আহলিল মিলালি ওয়ার রিদ্দাহ মিনাল জামিয়ি লি মাসায়িলিল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল।*** তাহকিক : সাইয়্যিদ কাসরাবি হাসান। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

৩১. আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনু খুজাইমা আন-নাইসাবুরি (মৃ. ৩১১ হি.)। ***কিতাবুত তাওহিদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রব।*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ বিন ইবরাহিম আশ-শাহওয়ান। রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

৩২. আবু জাফার আত-তাহাবি (মৃ. ৩২১ হি.)। ***আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা।*** বৈরুত : দারু ইবনি হাজম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৩৩. আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশারি (মৃ. ৩২৪ হি.)। ***আল-ইবানা আন উসুলিদ দিয়ানা।*** তাহকিক : সালিহ বিন মুকবিল আল-উসাইমি। রিয়াদ : দারুল ফাদিলা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

৩৪. আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশারি (মৃ. ৩২৪ হি.)। ***মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লিন।*** তাহকিক : নাইম জারজুর। আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।

৩৫. আবুল হাসান আলি বিন ইসমায়িল আল-আশআরি (মৃ. ৩২৪ হি.)। ***রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর বিবাবিল আবওয়াব।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ শাকির আল-জুনাইদি। মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, প্র. ১৪১৩ হি.।

৩৬. আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি (মৃ. ৩২৭ হি.)। ***আল-জারহু ওয়াত তাদিল।*** হায়দ্রাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.।

৩৭. আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি (মৃ. ৩২৭ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম।*** তাহকিক : আসআদ মুহাম্মাদ আত-তাইয়্যিব। সৌদি আরব : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

৩৮. আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল-কুলাইনি (মৃ. ৩২৯ হি.), ***আল-কাফি।*** বৈরুত : দারু সাব ও দারুত তাআরুফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০১ হি.।

৩৯. আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলি আল-বারবাহারি (মৃ. ৩২৯ হি.)। ***শারহুস সুন্নাহ।*** তাহকিক : খালিদ বিন কাসিম আর-রাদ্দাদি। মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

৪০. আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাতুরিদি (মৃ. ৩৩৩ হি.)। ***তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ।*** তাহকিক : মাজদি বাসলুম। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।

৪১. আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-আজুর্রি আল-বাগদাদি (মৃ. ৩৬০ হি.)। ***আশ-শারিয়া।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন সুলাইমান আদ-দুমাইজি। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

৪২. আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমাদ আত-তাবারানি। ***আল-মুজামুল আওসাত।*** তাহকিক : আবু মুআজ তারিক আওয়্যাদাল্লাহ। কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৪৩. আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি (মৃ. ৩৭০ হি.)। ***তাহজিবুল লুগাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরয়িব। বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.।

৪৪. আবু বাকর আহমাদ বিন ইবরাহিম আল-ইসমায়িলি (মৃ. ৩৭১ হি.)। ***ইতিকাদু আয়িম্মাতিল হাদিস।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়্যিস। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.।

৪৫. আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মালাতি (মৃ. ৩৭৭ হি.)। ***আত-তাম্বিহু ওয়ার রদ্দু আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি। মিশর : আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, তাবি।

৪৬. আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন আলি আল-কুম্মি (মৃ. ৩৮১ হি.)। ***কিতাবুল খিসাল।*** পরিশীলন : আলি আকবার আল-গিফারি। কুম্ম, ইরান : মুআসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি, তাবি।

৪৭. আবুল হাসান আলি বিন উমার আদ-দারাকুতনি (মৃ. ৩৮৫ হি.)। ***কিতাবুস সিফাত।*** তাহকিক : আলি বিন নাসির আল-ফাকিহি। প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

৪৮. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি আল-মালিকি (মৃ. ৩৮৬ হি.)। ***আকিদাতুস সালাফ : মুকাদ্দিমাতু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি লি কিতাবিহি আর-রিসালা।*** তাহকিক : বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ। রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি।

৪৯. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি (মৃ. ৩৮৬ হি.)। ***আন-নাওয়াদির ওয়াজ জিয়াদাত আলা মা ফিল মুদাওয়্যানাতি মিন গইরিহা মিনাল উম্মাহাত।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হাজ্জি। বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.।

৫০. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জাইদ আল-কাইরাওয়ানি (মৃ. ৩৮৬ হি.)। ***আল-জামি ফিস সুনানি ওয়াল আদাবি ওয়াল মাগাজি ওয়াত তারিখ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আবুল আজনাফ ও উসমান বাত্তিখ। বৈরুত ও তিউনিসিয়া : মুআসসাসাতুর রিসালা ও আল-মাকতাবাতুল আতিকা, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

৫১. আবু আব্দুল্লাহ উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু বাত্তাহ আল-উকবারি (মৃ. ৩৮৭ হি.)। ***আল-ইবানা আন শারিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াতি ওয়া মুজানাবাতুল ফিরাকিল মাজমুমা।*** তাহকিক : রিদা বিন নাসান মুতি। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.।

৫২. আবু আব্দুল্লাহ উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু বাত্তাহ আল-উকবারি (মৃ. ৩৮৭ হি.)। ***আশ-শারহু ওয়াল ইবানা আলা উসুলিস সুন্নাতি ওয়াদ দিয়ানা।*** তাহকিক : আদিল বিন আব্দুল্লাহ আলু হামদান। বৈরুত : শারিকাতু দারিল লুলুআ, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪৪ হি./২০২২ খ্রি.।

৫৩. আবু সুলাইমান হামাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবি (মৃ. ৩৮৮ হি.)। ***আলামুল হাদিস।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন সাদ আলু সুউদ। মক্কা : মারকাজুল বুহুসিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

৫৪. আবু নাসর ইসমায়িল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারি (মৃ. ৩৯৩ হি.)। ***আস-সিহাহ তাজুল লুগাতি ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যা।*** তাহকিক : আহমাদ আব্দুল গফুর আত্তার। বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

৫৫. আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস আর-রাজি (মৃ. ৩৯৫ হি.)। ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ।*** তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন। দামেস্ক : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

৫৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জামানিন আল-মালিকি (মৃ. ৩৯৯ হি.)। ***উসুলুস সুন্নাহ।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুখারি। মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.।

৫৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি জামানিন আল-মালিকি (মৃ. ৩৯৯ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিজ।*** তাহকিক : হুসাইন বিন উক্কাশা ও মুহাম্মাদ বিন মুস্তাফা আল-কানজ। কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৫৮. আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন হাসান আল-হালিমি (মৃ. ৪০৩ হি.)। ***আল-মিনহাজ ফি শুআবিল ইমান।*** তাহকিক : হিলমি মুহাম্মাদ ফুদা। বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

৫৯. আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানি (মৃ. ৪০৩ হি.)। ***তামহিদুল আওয়ায়িল ফি তালখিসিদ দালায়িল।*** তাহকিক : ইমাদুদ্দিন আহমাদ হাইদার। লেবানন : মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

৬০. আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন তাইয়্যিব আল-বাকিল্লানি (মৃ. ৪০৩ হি.)। ***কিতাবুত তামহিদ।*** বৈরুত : আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৯৫৭ খ্রি.।

৬১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। ***আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন।*** তাহকিক : মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতা। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.।

৬২. আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আন-নাইসাবুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। ***মারিফাতু উলুমিল হাদিস।*** তাহকিক : সাইয়্যিদ মুআজ্জাম হুসাইন। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.।

৬৩. কাদি আব্দুল জাব্বার আল-হামদানি (মৃ. ৪১৫ হি.)। ***আল-মুখতাসার ফি উসুলিদ্দিন।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইমারা। কায়রো : দারুশ শুরুক, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি., *'রাসায়িলুল আদলি ওয়াত তাওহিদ'* নামে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্গত একটি পুস্তিকা।

৬৪. আব্দুল জাব্বার আল-মুতাজিলি (মৃ. ৪১৫ হি.)। ***শারহুল উসুলিল খমসা।*** তাহকিক : আব্দুল কারিম উসমান। কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

৬৫. আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আল-লালাকায়ি (মৃ. ৪১৮ হি.)। ***শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** তাহকিক : আহমাদ বিন সাদ আল-গামিদি। সৌদি আরব : দারু তাইবা, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.।

৬৬. আবু আলি হুসাইন ইবনু সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.)। ***তিসউ রাসায়িল ফিল হিকমাতি ওয়াত তাবিয়িয়্যাত।*** কায়রো : দারুল আরব, ২য় প্রকাশ, তাবি।

৬৭. আবু মানসুর আব্দুল কাহির বিন তাহির আল-বাগদাদি (মৃ. ৪২৯ হি.)। ***আল-ফারক বাইনাল ফিরাক ওয়া বায়ানুল ফিরকাতিন নাজিয়া।*** বৈরুত : দারুল আফাকিল জাদিদা, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.।

৬৮. আবু নুআইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আসবাহানি (মৃ. ৪৩০ হি.)। ***হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া।*** মিশর : মাতবাআতুস সাআদাহ, প্র. ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি.।

৬৯. আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুওয়াইনি (মৃ. ৪৩৮ হি.)। ***আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদিল্লাতি ফি উসুলিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা ও আলি আব্দুল মুনয়িম। মিশর : দারুস সাআদা, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.।

৭০. আবু নাসর উবাইদুল্লাহ বিন সায়িদ আস-সিজ্জি (মৃ. ৪৪৪ হি.)। ***রিসালাতুস সিজ্জি ইলা আহলি জাবিদ ফির রদ্দি আলা মান আনকারাল হারফা ওয়াস সওত।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বাকারিম। মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৭১. আবু উসমান ইসমায়িল বিন আব্দুর রহমান আস-সাবুনি (মৃ. ৪৪৯ হি.)। ***আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস।*** তাহকিক : নাসির বিন আব্দুর রহমান আল-জুদাই। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

৭২. আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি (মৃ. ৪৫৬ হি.)। ***আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল।*** কায়রো : মাকতাবাতুল খানজি, তাবি।

৭৩. আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ ইবনু হাজম আল-আন্দালুসি (মৃ. ৪৫৬ হি.)। ***আল-মুহাল্লা বিল আসার।*** তাহকিক : আব্দুল গাফফার আল-বিন্দারি। বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি।

৭৪. আবু বাকর আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি (মৃ. ৪৫৮ হি.)। ***আল-আসমা ওয়াস সিফাত।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-হাশিদি। জেদ্দা : মাকতাবাতুস সাওয়াদি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

৭৫. আবু বাকর আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি (মৃ. ৪৫৮ হি.)। ***শুআবুল ইমান।*** তাহকিক : মুখতার আহমাদ নদভী। রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.।

৭৬. কাদি আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-ফার্রা আল-হাম্বালি (মৃ. ৪৫৮ হি.)। ***আল-উদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ।*** তাহকিক : আহমাদ আল-মুবারাকি। প্রকাশনার নামবিহীন, ২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

৭৭. আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ।*** তাহকিক : মুস্তাফা আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি। মরক্কো : মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয়, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৮৭ হি.।

৭৮. আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আল-ইনতিকা ফি ফাদায়িলিস সালাসাতিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা মালিক ওয়াশ শাফিয়ি ওয়া আবি হানিফা।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তাবি।

৭৯. আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আল-ইস্তিজকার।*** তাহকিক : সালিম মুহাম্মাদ আতা ও মুহাম্মাদ আলি মুআওয়্যাদ। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

৮০. আবু বাকর আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি (মৃ. ৪৬৩)। ***আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াইয়া।*** পরিশীলন : আবু আব্দুল্লাহ আস-সাওরাকি। হায়দ্রাবাদ : জামইয়্যাতু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৭ হি.।

৮১. আবু বাকর আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ।*** তাহকিক : আদিল বিন ইউসুফ আল-গারাজি। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.।

৮২. আবু বকর আহমাদ বিন আলি আল-খতিব আল-বাগদাদি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***তারিখু বাগদাদ।*** তাহকিক : বাশার আওয়াদ মারুফ। বৈরুত : দারুল গারবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

৮৩. আবুল হাসান আলি বিন আহমাদ আল-ওয়াহিদি আন-নাইসাবুরি (মৃ. ৪৬৮ হি.)। ***আত-তাফসিরুল বাসিত।*** রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.।

৮৪. আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুয়াইনি (মৃ. ৪৭৮ হি.)। ***লুমাউল আদিল্লাহ ফি কাওয়ায়িদি আকায়িদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** তাহকিক : ফাওকিয়্যা হুসাইন মাহমুদ। বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

৮৫. আবুল মাআলি আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুওয়াইনি (মৃ. ৪৭৮ হি.)। ***আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদিল্লাতি ফি উসুলিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা ও আলি আব্দুল মুনয়িম। মিশর : মাতবাআতুস সাআদাহ, প্র. ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.।

৮৬. আবু ইসমায়িল আল-হারাউয়ি (মৃ. ৪৮১ হি.)। ***জাম্মুল কালামি ওয়া আহলিহি।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল। মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি. - ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

৮৭. আবুল ইউসর আল-বাজদাবি (মৃ. ৪৯৩ হি.)। ***উসুলুদ দিন।*** তাহকিক : হ্যান্স পিটার লেনজ। কায়রো : আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৮৮. কাদি আবু সাদ মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-হাকিম আল-জুশামি (মৃ. ৪৯৪ হি.)। ***উয়ুনুল মাসায়িল।*** তাহকিক : রমাদান এলদিরিম। কায়রো : দারুল ইহসান, ১ম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.।

৮৯. আবুল কাসিম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আর-রাগিব আল-আসফাহানি (মৃ. ৫০২ হি.)। ***আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন।*** তাহকিক : সাফওয়ান আদনান আদ-দাউদি। দামেস্ক : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.।

৯০. আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজালি (মৃ. ৫০৫ হি.)। ***কাওয়ায়িদুল আকায়িদ।*** তাহকিক : মুসা মুহাম্মাদ আলি। বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

৯১. আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজালি (মৃ. ৫০৫ হি.)। ***আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

৯২. আবুল খাত্তাব মাহফুজ বিন আহমাদ আল-কালওয়াজানি (মৃ. ৫১০ হি.)। ***আত-তামহিদ ফি উসুলিল ফিকহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আলি বিন ইবরাহিম। মক্কা : মারকাজুল বাহসিল ইলমি, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

৯৩. আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন বিন মাসউদ ইবনুল ফার্রা আল-বাগাবি (মৃ. ৫১৬ হি.)। ***মাআলিমুত তানজিল ফি তাফসিরিল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুর রাজ্জাক আল-মাহদি। বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.।

৯৪. আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনু আবি ইয়ালা আল-হাম্বালি (মৃ. ৫২৬ হি.)। ***তাবাকাতুল হানাবিলা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকি। বৈরুত : দারুল মারিফা, প্র. ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.।

৯৫. আবুল কাসিম ইসমায়িল বিন মুহাম্মাদ আত-তাইমি আল-আসবাহানি (মৃ. ৫৩৫ হি.)। ***আল-হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ ওয়া শারহু আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন রাবি আল-মাদখালি ও মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আবু রহিম। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

৯৬. নাজমুদ্দিন উমার বিন মুহাম্মাদ আন-নাসাফি (মৃ. ৫৩৭ হি.)। ***আত-তাইসির ফিত তাফসির।*** তাহকিক : মাহির আদিব হাবুশ। ইস্তাম্বুল : দারুল লুবাব লিদ্দিরাসাত ওয়া তাহকিকিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

৯৭. মাহমুদ বিন আমর বিন আহমাদ আজ-জামাখশারি (মৃ. ৫৩৮ হি.)। ***আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিদিত তানজিল।*** বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি.।

৯৮. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হাক বিন গালিব ইবনু আতিয়্যা আল-আন্দালুসি (মৃ. ৫৪২ হি.), ***আল-মুহার্রারুল ওয়াজিজ ফি তাফসিরিল কিতাবিল আজিজ,*** তাহকিক : আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফি মুহাম্মাদ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), খ. ৫, পৃ. ২৫৭।

৯৯. হুসাইন বিন ইবরাহিম আল-জাওরাকানি (মৃ. ৫৪৩ হি.)। ***আল-আবাতিল ওয়াল মানাকির ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহির।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আল-ফুরাইওয়ায়ি। রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ভারত : মুআসসাসাতু দারিদ দাওয়াতিত তালিমিয়্যাতিল খাইরিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

১০০. কাদি ইয়াদ বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি (মৃ. ৫৪৪ হি.)। ***ইকমালুল মুলিম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম।*** তাহকিক : ইয়াহইয়া ইসমায়িল। মিশর : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১০১. আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি (মৃ. ৫৪৮ হি.)। ***আল-মিলাল ওয়ান নিহাল।*** মুআসসাসাতুল হালাবি কর্তৃক প্রকাশিত, তাবি।

১০২. ইয়াহইয়া বিন আবুল খাইর আল-ইমরানি (মৃ. ৫৫৮ হি.)। ***আল-ইনতিসার ফির রদ্দি আলাল মুতাজিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার।*** তাহকিক : সাউদ বিন আব্দুল আজিজ আল-খালাফ। রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১০৩. আবু বাকর ইবনু মাসউদ আল-কাসানি (মৃ. ৫৮৭ হি.)। ***বাদায়িউস সানায়ি ফি তারতিবিশ শারায়ি।*** মিশর : মাতবাআতু শারিকাতিল মাতবুয়াতিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩২৭ হি.-১৩২৮ হি.।

১০৪. জামালুদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাজনাবি আল-হানাফি (মৃ. ৫৯৩ হি.)। ***কিতাবু উসুলিদ্দিন।*** তাহকিক : উমার ওয়াফিক আদ-দাউক। বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১০৫. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি ইবনুল জাওজি আল-হাম্বালি (মৃ. ৫৯৭ হি.)। ***জাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির।*** তাহকিক : আব্দুর রাজ্জাক আল-মাহদি। বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.।

১০৬. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি ইবনুল জাওজি আল-হাম্বালি (মৃ. ৫৯৭ হি.)। ***মানাকিবুল ইমাম আহমাদ।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। কায়রো : দারু হাজার, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.।

১০৭. আব্দুল গনি বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি (মৃ. ৬০০ হি.)। ***আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : আহমাদ বিন আতিয়্যা আল-গামিদি। মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১০৮. আব্দুল গনি বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি (মৃ. ৬০০ হি.)। ***আল-কামাল ফি আসমায়ির রিজাল।*** তাহকিক : শাদি বিন মুহাম্মাদ আলু নুমান। কুয়েত : আল-হাইআতুল আম্মাহ লিল ইনায়াতি বি তিবাআতি ওয়া নাশরিল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ এবং শারিকাতু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.।

১০৯. আবুস সাআদাত মুবারাক বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আসির আশ-শাইবানি (মৃ. ৬০৬ হি.)। ***আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল আসার।*** তাহকিক : তাহির আহমাদ ও মাহমুদ মুহাম্মাদ। বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

১১০. ফাখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাজি (মৃ. ৬০৬ হি.)। ***আল-আরবায়িন ফি উসুলিদ্দিন।*** তাহকিক : আহমাদ হিজাজি আস-সাক্কা। কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আজহারিয়্যা, তাবি।

১১১. ফাখরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাজি (মৃ. ৬০৬ হি.)। ***আল-ইশারা ফি ইলমিল কালাম।*** তাহকিক : হানি মুহাম্মাদ হাজিম। আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা, তাবি।

১১২. মুওয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি (মৃ. ৬২০ হি.)। ***ইসবাতু সিফাতিল উলু।*** তাহকিক : আহমাদ বিন আতিয়্যা আল-গামিদি। মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

১১৩. মুওয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি (মৃ. ৬২০ হি.)। ***আল-মুগনি।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি ও আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ। রিয়াদ : দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১১৪. মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি (মৃ. ৬২০ হি.)। ***জাম্মুত তাবিল।*** তাহকিক : বাদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাদর। কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.।

১১৫. মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি (মৃ. ৬২০ হি.)। ***রওদাতুন নাজির ওয়া জুন্নাতুল মুনাজির।*** তাহকিক : শাবান মুহাম্মাদ ইসমায়িল। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

১১৬. আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ ইবনুল কাত্তান আল-ফাসি (মৃ. ৬২৮ হি.)। ***আল-ইকনা ফি মাসায়িলিল ইজমা।*** তাহকিক : হাসান ফাওজি আস-সায়িদি। কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

১১৭. আবুল হাসান আলি বিন আবু আলি আল-আমিদি (মৃ. ৬৩১ হি.)। ***গায়াতুল মারাম ফি ইলমিল কালাম।*** তাহকিক : হাসান মাহমুদ আব্দুল লাতিফ। কায়রো : আল-মাজলিসুল আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়্যা, তাবি।

১১৮. মাজদুদ্দিন আব্দুস সালাম ইবনু তাইমিয়া (মৃ. ৬৫২ হি.), শিহাবুদ্দিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া (মৃ. ৬৮২ হি.) ও তাকিউদ্দিন আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ।*** সংকলন : আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হার্রানি। তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ। দামেস্ক : দারুল কিতাবিল আরাবি, তাবি।

১১৯. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন উমার আল-কুরতুবি (মৃ. ৬৫৬ হি.)। ***আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম।*** দামেস্ক ও বৈরুত : দারু ইবনি কাসির ও দারুল কালিমিত তাইয়্যিব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১২০. মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি (মৃ. ৬৬৫ হি.)। ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ।*** তাহকিক : মুসলাত বিন বুনদার ও আদিল আলু হামদান। ই-বুক, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৬ হিজরি।

১২১. মুহাম্মাদ ইবনু আবিল কাসিম আদ-দাশতি আল-হাম্বালি (মৃ. ৬৬৫ হি.)। ***ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহ ওয়া বি আন্নাহু কয়িদুন ওয়া জালিসুন আলাল আরশ।*** তাহকিক : উসামা আল-উতাইবি। ই-বুক, কিতাব-অনলাইন ডট কমে প্রকাশিত সফটকপি।

১২২. মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর আর-রাজি (মৃ. ৬৬৬ হি.)। ***মুখতারুস সিহাহ।*** তাহকিক : ইউসুফ আশ-শাইখ মুহাম্মাদ। বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ৫ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবি (মৃ. ৬৭১ হি.)। ***আল-জামি লি আহকামিল কুরআন।*** তাহকিক : আহমাদ আল-বারাদুনি ও ইবরাহিম আত্তাফাইয়্যিশ। কায়রো : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.।

১২৪. আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নাবাবি (মৃ. ৬৭৬ হি.)। ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব।*** কায়রো : ইদারাতুত তাবাআতিল মুনিরিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৪৪-১৩৪৭ হি.।

১২৫. আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নাবাবি (মৃ. ৬৭৬ হি.)। ***আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।*** বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.।

১২৬. আবুল ফাদল আব্বাস বিন মানসুর আস-সাকসাকি (মৃ. ৬৮৩ হি.)। ***আল-বুরহান ফি মারিফাতি আকায়িদি আহলিল আদইয়ান।*** তাহকিক : বাসসাম আলি সালামা। জারকা : মাকতাবাতুল মানার, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১২৭. মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররাম ইবনু মানজুর আল-আনসারি (মৃ. ৭১১ হি.)। ***লিসানুল আরব।*** বৈরুত : দারু সাদির, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি.।

১২৮. নাজমুদ্দিন আবুর রাবি সুলাইমান বিন আব্দুল কাউয়ি আত-তুফি (মৃ. ৭১৬ হি.)। ***শারহু মুখতাসারির রওদা।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

১২৯. হুসাইন বিন মাহমুদ আল-মুজহিরি (মৃ. ৭২৭ হি.)। ***আল-মাফাতিহ ফি শারহিল মাসাবিহ।*** তাহকিক : নুরুদ্দিন তালিবের তত্ত্বাবধানে গঠিত মুহাক্কিক-পর্ষদ। কুয়েত : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.।

১৩০. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আত-তাদমুরিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আওদা আস-সাআবি। রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

১৩১. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আত-তিসয়িনিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আল-আজলান। রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৩২. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আর-রিসালাতুল আরশিয়্যা।*** কায়রো : আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.।

১৩৩. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা।*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ। রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৩৪. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন হাসান কায়িদ। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৩৫. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ইমান।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি।।আম্মান : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১৩৬. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ইমানুল আওসাত।*** তাহকিক : আলি বিন বাখিত আজ-জাহরানি। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, প্র. ১৪২৩ হি.।

১৩৭. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-জাওয়াবুস সহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ।*** তাহকিক : আলি বিন হাসান, আব্দুল আজিজ বিন ইবরাহিম ও হামদান বিন মুহাম্মাদ। সৌদি আরব : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৩৮. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

১৩৯. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা।*** তাহকিক : হামাদ আত-তুওয়াইজিরি। রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

১৪০. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমানি ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান।*** তাহকিক : আব্দুল কাদির আল-আরনাউত। দামেস্ক : মাকতাবাতু দারিল বায়ান, প্র. ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

১৪১. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রসুল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ। সৌদি আরব : সৌদিয়ান ন্যাশনাল সিকিউরিটি, তাবি।

১৪২. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম মুখালাফাতা আহলিল জাহিম।*** তাহকিক : নাসির আব্দুল কারিম আল-আকল। বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৪৩. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***কায়িদাতুন জামিআ ফি তাওহিদিল্লাহি ওয়া ইখলাসিল ওয়াজহি ওয়াল আমালি লাহু ইবাদাতান ওয়া ইস্তিআনাতান।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুসাইরি। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১৪৪. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***জামিউল মাসায়িল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৪৫. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***জাওয়াবুল ইতিরাদাতিল মিসরিয়্যা আলাল ফুতইয়া আল-হামাবিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৪৬. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম। সৌদি আরব : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সুউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

১৪৭. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যা ফি তাসিসি বিদায়িহিমিল কালামিয়্যা।*** মদিনা : কিং ফাহাদ গ্লোরিয়াস কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.।

১৪৮. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***বুগইয়াতুল মুরতাদ ফির রদ্দি আলাল মুতাফালসিফাতি ওয়াল কারামিতাতি ওয়াল বাতিনিয়্যা।*** তাহকিক : মুসা আদ-দুওয়াইশ। মদিনা : মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৪৯. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মাজমুউল ফাতাওয়া লি শাইখিল ইসলাম।*** সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম। মদিনা : কিং ফাহাদ গ্লোরিয়াস কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

১৫০. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি নাকদি কালামিশ শিআতিল কাদারিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম। রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সুউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

১৫১. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***শারহু উমদাতিল ফিকহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৫২. আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল আসফাহানিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন রিয়াদ আল-আহমাদ। বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.।

১৫৩. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***শারহু হাদিসিন নুজুল।*** বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৫ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.।

১৫৪. বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম ইবনু জামাআহ আশ-শাফিয়ি (মৃ. ৭৩৩ হি.)। ***ইদাহুদ দালিল ফি কতয়ি হুজাজি আহলিত তাতিল।*** তাহকিক : ওয়াহবি সুলাইমান আল-আলবানি। মিশর : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

১৫৫. আল-খতিব ওয়ালিউদ্দিন আত-তিবরিজি (মৃ. ৭৪১ হি.)। ***মিশকাতুল মাসাবিহ।*** ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, সাহারানপুরির টীকা-সহ, প্র. ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি.।

১৫৬. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***আল-আরশ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি। মদিনা : ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ অ্যাট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

১৫৭. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***আল-উলুয়্যু লিল আলিয়্যিল গাফফার ফি ইদাহি সহিহিল আখবারি ওয়া সাকিমিহা।*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ। রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৫৮. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮)। ***ইসবাতুল ইয়াদি লিল্লাহি সুবহানাহ।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন সালিহ আল-বাররাক। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, শাইখ বাররাকের তাহকিকে *'মাজমুউন ফিহি সালাসু রাসায়িল'* নামে প্রকাশিত, তাবি।

১৫৯. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম।*** তাহকিক : উমার আব্দুস সালাম আত-তাদমুরি। বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১৬০. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***সিয়ারু আলামিন নুবালা।*** বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

১৬১. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***তাজকিরাতুল হুফফাজ।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

১৬২. মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আর-রিসালাতুত তাবুকিয়্যা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উজাইর শামস। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আত-তিবইয়ান ফি আইমানিল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন সালিম আল-বাত্তাতি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রব্বিল আলামিন।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া ফিল ইনতিসারি লিল ফিরকাতিন নাজিয়া।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আল-আরিফি, নাসির আল-হানিনি, আব্দুল্লাহ আল-হুজাইল প্রমুখ। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৬. মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আস-সালাত।*** তাহকিক : আদনান বিন সফাখান আল-বুখারি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা।*** তাহকিক : হুসাইন বিন উক্কাশা। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, বৈরুত : দারু ইবনু হাজম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২০ খ্রি.।

১৬৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা আলা হারবিল মুয়াত্তিলাতি ওয়াল জাহমিয়্যা।*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৬৯. মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া জাখিরাতুশ শাকিরিন।*** তাহকিক : ইসমায়িল বিন গাজি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৭০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ।*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৭১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***মাদারিজুস সালিকিন ফি মানাজিলিস সায়িরিন।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইসলাহি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৭২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***শিফাউল আলিল ফি মাসায়িলিল কাদায়ি ওয়াল কাদারি ওয়াল হিকমাতি ওয়াত তালিল।*** তাহকিক

: জাহির বিন সালিম বালফাকিহ। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৭৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বাকার ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ।*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

১৭৪. তাকিউদ্দিন আলি বিন আব্দুল কাফি আস-সুবকি (মৃ. ৭৫৬ হি.)। ***ফাতাওয়াস সুবকি।*** দারুল মাআরিফ, তাবি।

১৭৫. আলাউদ্দিন মুগালতাই বিন কালিজ আল-হানাফি (মৃ. ৭৬২ হি.)। ***ইকমালু তাহজিবিল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ উসমান। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.।

১৭৬. আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। দারু হাজার, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

১৭৭. আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দিন। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

১৭৮. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল মাওসিলি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালা আলাল জাহমিয়্যাতি ওয়াল মুয়াত্তিলা।*** তাহকিক : সাইয়্যিদ ইবরাহিম। কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

১৭৯. ইবরাহিম বিন মুসা আশ-শাতিবি আল-গারনাতি (মৃ. ৭৯০ হি.)। ***আল-ইতিসাম।*** তাহকিক : সালিম বিন ইদ আল-হিলালি। সৌদি আরব : দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

১৮০. আবু সায়িদ মাসউদ বিন উমার আত-তাফতাজানি (মৃ. ৭৯২ হি.)। ***শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা।*** করাচি : মাকতাবাতুল মাদিনা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি., জামউল ফাওয়াইদ নামক টীকা-সহ।

১৮১. আবু সায়িদ মাসউদ বিন উমার আত-তাফতাজানি (মৃ. ৭৯২ হি.)। ***শারহুল মাকাসিদ।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

১৮২. আলাউদ্দিন আলি বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি (মৃ. ৭৯২ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** তাহকিক : শুওয়াইব আল-আরনাউত ও আব্দুল্লাহ বিন মুহসিন আত-তুর্কি। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১০ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১৮৩. আবু আব্দুল্লাহ বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আজ-জারকাশি (মৃ. ৭৯৪ হি.)। ***আল-বাহরুল মুহিত ফি উসুলিল ফিকহ।*** জর্ডান : দারুল কুতবি, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

১৮৪. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজাব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আল-উসাইমিন। রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.।

১৮৫. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম।*** তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও ইবরাহিম বাজিস। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১৮৬. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি।*** তাহকিক : মাহমুদ বিন শাবান ও অন্যান্য। মদিনা : মাকতাবাতুল গুরাবায়িল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১৮৭. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***নুজহাতুল আসমা ফি মাসআলাতিস সামা (‘রাসায়িলুল হাফিজ ইবনি রজাব আল-হাম্বালি’-র অন্তর্গত)।*** তাহকিক : আবু মুসআব তালআত বিন ফুআদ আল-হুলওয়ানি। কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

১৮৮. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***ফাদলু ইলমিস সালাম আলা ইলমিল খালাফ (রাসায়িলুল হাফিজ ইবনি রজাব আল-হাম্বালি-র অন্তর্গত)।*** তাহকিক : আবু মুসআব তালআত বিন ফুআদ আল-হুলওয়ানি। কায়রো : দারুল ফারুক আল-হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

১৮৯. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ ইবনু রজাব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***লাতায়িফুল মাআরিফ ফি মা লিমাওয়াসিমিল আমি মিনাল ওয়াজায়িফ।*** তাহকিক : আমির বিন আলি ইয়াসিন। রিয়াদ : দারু ইবনি খুজাইমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।

১৯০. আবু হাফস উমার বিন আলি ইবনুল মুলাক্কিন আশ-শাফিয়ি (মৃ. ৮০৪ হি.)। ***মুখতাসার ইস্তিদরাকিল হাফিজিজ জাহাবি আলা মুস্তাদরাকি আবি আব্দিল্লাহ আল-হাকিম।*** তাহকিক : সাদ বিন আব্দুল্লাহ আলু হুমাইদ। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.।

১৯১. আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা।*** তাহকিক : আদিল আহমাদ ও আলি মুহাম্মাদ। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.।

১৯২. আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***তাকরিবুত তাহজিব।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়ামা। সিরিয়া : দারুর রশিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

১৯৩. আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***তাহজিবুত তাহজিব।*** হায়দ্রাবাদ : মাতবাআতু দারিল মাআরিফিন নিজামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩২৬ হি.।

১৯৪. আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***নুজহাতুন নাজর ফি তাওদিহি নুখবাতিল ফিকার।*** তাহকিক : আব্দুল মুহসিন আল-কাসিম। ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.।

১৯৫. আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি।*** পরিশীলন : মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব। বৈরুত : দারিল মারিফা, আব্দুল আজিজ ইবনু বাজের টীকা-সংবলিত, প্র. ১৩৭৯ হি.।

১৯৬. আহমাদ বিন মুসা আল-খায়ালি (মৃ. ৮৬১ হি.)। ***হাশিয়াতুন আলা শারহিস সাদ আলাল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা।*** তুরস্ক : মাতবাআতু মাহমুদ বেগ, প্র. ১৩২২ হি.।

১৯৭. আবুল হাসান আলি বিন সুলাইমান আল-মার্দাওয়ি (মৃ. ৮৮৫ হি.)। ***আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি ও আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ। কায়রো : দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

১৯৮. জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি (মৃ. ৯১১ হি.)। ***সওনুল মানতিকি ওয়াল কালাম আন ফান্নাইল মানতিকি ওয়াল কালাম।*** তাহকিক : আলি সামি আন-নাশশার ও সুআদ আলি আব্দুর রাজ্জাক। মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়্যা, তাবি।

১৯৯. আবুল বাকা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতুহি আল-হাম্বালি (মৃ. ৯৭২ হি.)। ***শারহুল কাওকাবিল মুনির।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ জুহাইলি ও নাজিহ হাম্মাদ। রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

২০০. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনু হাজার আল-হাইতামি (মৃ. ৯৭৪ হি.)। ***আশরাফুল ওয়াসায়িল ইলা ফাহমিশ শামায়িল।*** তাহকিক : আহমাদ বিন ফারিদ আল-মাজিদি। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

২০১. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খতিব আশ-শারবিনি (মৃ. ৯৭৭ হি.)। ***মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ।*** তাহকিক : আলি মুহাম্মাদ ও আদিল আহমাদ। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

২০২. আবুল হাসান আলি বিন সুলতান আল-কারি (মৃ. ১০১৪ হি.)। ***মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ।*** বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

২০৩. বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম আল-লাক্কানি (মৃ. ১০৪১ হি.)। ***হিদায়াতুল মুরিদ লি জাওহারাতিত তাওহিদ।*** তাহকিক : মারওয়ান হুসাইন আল-আজহারি। কায়রো : দারুল বাসায়ির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

২০৪. মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি (মৃ. ১০৫১ হি.)। ***আর-রওদুল মুরবি বি শারহি জাদিল মুস্তাকনি।*** তাহকিক : খালিদ আল-মুশাইকিহ, আব্দুল আজিজ আল-ইদান ও আনাস আল-ইয়াতামা। কুয়েত : দারু রাকায়িজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৮ হি.।

২০৫. মানসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি (মৃ. ১০৫১ হি.)। ***কাশশাফুল কিনা আনিল ইকনা।*** সৌদি আরব : মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১-১৪২৯ হি.।

২০৬. আব্দুল গনি বিন ইসমায়িল আন-নাবুলসি (মৃ. ১১৪৩ হি.)। ***রায়িহাতুল জান্নাহ শারহু ইদাআতিদ দুজনাহ ফি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ।*** দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তাবি।

২০৭. মুহাম্মাদ বিন আলি আত-থানবি (মৃ. ১১৫৮ হি.)। ***মাওসুআতু কাশশাফি ইস্তিলাহাতিল ফুনিনি ওয়াল উলুম।*** ফার্সি থেকে আরবিতে ভাষান্তর : আব্দুল্লাহ আল-খালিদি। বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।

২০৮. আবুল আওন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি (মৃ. ১১৮৮ হি.)। ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা ওয়া সাওয়াতিউল আসরারিল আসারিয়্যা লি শারহিদ দুর্রাতিল মুদিয়্যা ফি আকদিল ফিরকাতিল মারদিয়্যা।*** দামেস্ক : মুআসসাসাতুল খাফিকিনা ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.।

২০৯. হামাদ বিন নাসির ইবনু মুআম্মার আন-নাজদি (মৃ. ১২২৫ হি.)। ***আত-তুহফাতুল মাদানিয়্যা ফিল আকিদাতিস সালাফিয়্যা।*** তাহকিক : আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দিল কারিম। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.।

২১০. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ-দুসুকি (মৃ. ১২৩০ হি.)। ***হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা শারহিস সানুসি লি উম্মিল বারাহিন।*** কায়রো : মাতবাআতু ইসা আল-বাবি আল-হালাবি, তাবি।

২১১. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজদি (মৃ. ১২৪২ হি.)। ***জাওয়াবু আহলিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি নাকদি কালামিশ শিয়াতিজ জাইদিয়্যা ('আর-রাসায়িলু ওয়াল মাসায়িলুন নাজদিয়্যা' অমনিবাসের অন্তর্গত)।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১২ হি.।

২১২. শিহাবুদ্দিন মাহমুদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আলুসি (মৃ. ১২৭০ হি.)। ***আল-আজবিবাতুল ইরাকিয়্যা আলাল আস্‌ইলাতিল লাহুরিয়্যা।*** বাগদাদ : মাতবাআতুল হুমাইদিয়্যা, প্র. ১৩০১ হি.।

২১৩. ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আল-বাইজুরি (মৃ. ১২৭৬ হি.)। ***তুহফাতুল মুরিদ আলা জাওহারাতিত তাওহিদ।*** তাহকিক : আলি ঘুমা। কায়রো : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

২১৪. আব্দুল লাতিফ বিন আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ (মৃ. ১২৯৩ হি.)। ***মিসবাহুজ জালাম ফির রদ্দি আলা মান কাজ্জাবাশ শাইখাল ইমাম ওয়া নাসাবাহু ইলা তাকফিরি আহলিল ইমানি ওয়াল ইসলাম।*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ আলু হামাদ। সৌদি আরব : সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

২১৫. মুহাম্মাদ সিদ্দিক হাসান খান বিন হাসান আল-হুসাইনি আল-কিন্নাউজি (মৃ. ১৩০৭ হি.)। ***কাতফুস সামার ফি বায়ানি আকিদাতি আহলিল আসার।*** সৌদি আরব : সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৫১।

২১৬. মাহমুদ শুকরি বিন আব্দুল্লাহ আল-আলুসি (মৃ. ১৩৪২ হি.)। ***সব্বুল আজাব আলা মান সাব্বাল আসহাব।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আল-বুখারি। রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

২১৭. খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (মৃ. ১৩৪৬ হি.)। ***মাবাহিস ফি আকায়িদি আহলিস সুন্নাহ আল-মুসাম্মা আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আদাম আল-কাওসারি। আম্মান : দারুল ফাতহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

২১৮. মুহাম্মাদ আনওয়ার বিন মুআজ্জাম শাহ আল-কাশ্মিরি (মৃ. ১৩৫২ হি.)। ***ফাইদুল বারি আলা সহিহিল বুখারি।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বদর আলম মিরাঠী। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।

২১৯. মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি (মৃ. ১৩৭১ হি.)। ***মাকালাতুল কাওসারি।*** কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, তাবি।

২২০. আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি (মৃ. ১৩৭৬ হি.)। ***আত-তাওদিহ ওয়াল বায়ান লিশাজারাতিল ইমান।*** আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, তাবি।

২২১. আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদি (মৃ. ১৩৭৬ হি.)। ***তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান।*** তাহকিক : আব্দুর রহমান আল-লুওয়াইহিক। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.।

২২২. হাফিজ বিন আহমাদ বিন আলি আল-হাকামি (মৃ. ১৩৭৭ হি.)। ***মাআরিজুল কবুল বি শারহি সুল্লামিল উসুল ইলা ইলমিল উসুল।*** তাহকিক : উমার বিন মাহমুদ আবু উমার। দাম্মাম : দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।

২২৩. আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমি (মৃ. ১৩৮৬ হি.)। ***আত-তানকিল বিমা ফি তানিবিল কাওসারি মিনাল আবাতিল।*** পরিশীলন : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, জুহাইর আশ-শাবিশ ও আব্দুর রাজ্জাক হামজা। বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

২২৪. সাইয়্যিদ কুতুব (মৃ. ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.)। ***আল-আদালাতুল ইজতিমায়িয়্যা ফিল ইসলাম।*** কায়রো : দারুশ শুরুক, ত্রয়োদশ প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

২২৫. সাইয়্যিদ কুতুব (মৃ. ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.)। ***কুতুব ওয়া শাখসিয়্যাত।*** কায়রো : দারুশ শুরুক, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

২২৬. ফালিহ বিন মাহদি আলু মাহদি (মৃ. ১৩৯২ হি.)। ***আত-তুহফাতুল মাহদিয়্যা শারহুল আকিদাতিত তাদমুরিয়্যা।*** মদিনা : মাতাবিউল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি.।

২২৭. মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি (মৃ. ১৩৯৩ হি.)। ***মুজাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহ আলা রওদাতিন নাজির।*** রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.।

২২৮. মুহাম্মাদ বিন খলিল হাসান আল-হাররাস (মৃ. ১৩৯৫ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** তাহকিক : আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ। খোবার : দারুল হিজরাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.।

২২৯. জামিল সালিবা (মৃ. ১৩৯৬ হি.)। ***আল-মুজামুল ফালসাফি।*** বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লুবনানি, প্র. ১৯৮২ খ্রি.।

২৩০. আবুল আলা মওদুদি (মৃ. ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.)। ***আল-খিলাফাহ ওয়াল মুলক।*** কুয়েত : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.।

২৩১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (মৃ. ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.)। ***খেলাফত ও রাজতন্ত্র।*** অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন ২০০১ খ্রি.।

২৩২. সুবহি ইবরাহিম আস-সালিহ (মৃ. ১৪০৭ হি.)। ***উলুমুল হাদিসি ওয়া মুসতালাহুহ : আর্‌দ ওয়া দিরাসা।*** বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৫শ প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.।

২৩৩. আয়াতুল্লাহ আল-উজমা আল-খুমাইনি (মৃ. ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.)। ***কিতাবুত তাহারাত।*** মাতবাআতু মুআসসাসাতিল উরুজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.।

২৩৪. মুহাম্মাদ আমান বিন আলি আল-জামি (মৃ. ১৪১৬ হি.)। ***আস-সিফাতুল ইলাহিয়্যা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ফি দুয়িল ইসবাতি ওয়াত তানজিহ।*** মদিনা : আল-মাজলিসুল ইলমি বিল জামিয়াতিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.।

২৩৫. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু বাজ (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাওয়্যাআ।*** সংকলন ও তত্ত্বাবধান : মুহাম্মাদ বিন সাদ আশ-শুওয়াইয়ির। সৌদি আরব : রিআসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, তাবি।

২৩৬. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা : শারহুন ওয়া তালিক।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

২৩৭. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***জিলালুল জান্নাহ ফি তাখরিজিস সুন্নাহ।*** বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।

২৩৮. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা ওয়াল মাওদুআ ওয়া আসারুহাস সাইয়্যিউ ফিল উম্মাহ।*** রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

২৩৯. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।*** মদিনা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি.।

২৪০. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আকিদা ওয়াসিতিয়া ও তার ব্যাখ্যা।*** অনুবাদ ও টীকা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা। রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.।

২৪১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আল-উসুল মিন ইলমিল উসুল।*** দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওজি, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

২৪২. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আল-কওলুল মুফিদ আলা কিতাবিত তাওহিদ।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি.।

২৪৩. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা।*** মদিনা : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

২৪৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***তালিকুন মুখতাসার আলা কিতাবি লুমআতিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ। রিয়াদ : মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

২৪৫. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***নুবজাতুন ফিল আকিদাতিল ইসলামিয়্যা।*** মক্কা : দারুস সিকাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

২৪৬. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***ফাতহু রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, তাবি।

২৪৭. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল।*** সংকলন ও বিন্যাস : ফাহদ বিন নাসির আস-সুলাইমান। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪১৩ হি.।

২৪৮. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***মুজাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** রিয়াদ: মাদারুল ওয়াতান, প্র. ১৪২৬ হি.।

২৪৯. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***লিকাউল বাবিল মাফতুহ।*** ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি, https://shamela.ws/book/7687/1712।

২৫০. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহু নাজমিল ওয়ারাকাত ফি উসুলিল ফিকহ।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, তাবি।

২৫১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.।

২৫২. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা।*** রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.।

২৫৩. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল কাফিয়াতিশ শাফিয়া।*** সৌদি আরব : মুআসসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিজরি।

২৫৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা।*** কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.।

২৫৫. বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ (মৃ. ১৪২৯ হি.)। ***মুজামুল মানাহি আল-লাফজিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

২৫৬. মুহাম্মাদ সায়িদ রমাদান আল-বুতি (মৃ. ১৪৩৪ হি.)। ***কুবরাল ইয়াকিনিয়্যাতিল কাওনিয়্যা উজুদুল খালিকি ওয়া ওয়াজিফাতুল মাখলুক।*** দামেস্ক : দারুল ফিকর, ৪৩শ প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.।

২৫৭. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-জিবরিন (মৃ. ১৪৩৮ হি.)। ***তাসহিলুল আকিদাতিল ইসলামিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

২৫৮. গালিব বিন আলি আল-আওয়াজি (মৃ. ১৪৩৮ হি.)। ***ফিরাকুন মুআসিরা তানতাসিবু ইলাল ইসলাম ওয়া বায়ানু মাওকিফিল ইসলামি মিনহা।*** জেদ্দা : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাতুজ জাহাবিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

২৫৯. আব্দুল আমির আল-আসাম (মৃ. ১৪৪০ হি.)। ***আল-মুসতালাহুল ফালসাফি ইনদাল আরাব।*** কায়রো : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.।

২৬০. মুহাম্মাদ আল-আমিন বিন আব্দুল্লাহ আল-হারারি (মৃ. ১৪৪১ হি.)। ***তাফসিরু হাদায়িকির রাওহি ওয়ার রাইহান ফি রাওয়াবি উলুমিল কুরআন।*** বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

২৬১. আইনুল বারী আলিয়াবী (মৃ. ১৪৪১ হি.)। ***ঈমান ও 'আকীদা।*** মেহেরপুর : আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি.।

২৬২. অশোক মুখোপাধ্যায় (মৃ. ২০২৩ খ্রি.)। ***সংসদ সমার্থশব্দকোষ।*** সপ্তদশ মুদ্রণ, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

২৬৩. রাবি বিন হাদি উমাইর আল-মাদখালি (মৃ. ১৪৪৭ হি.)। ***মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ফাতাওয়া ফাদিলাতিশ শাইখিল আল্লামা রাবি বিন হাদি উমাইর আল-মাদখালি।*** কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, তাবি।

২৬৪. আয়াতুল্লাহ আলি আল-খামিনি (মৃ. ১৪৪৭ হি.)। ***আল-খাওয়াস ওয়াল লাহাজাতুল মাসিরিয়্যা।*** বৈরুত : দারুল হাদি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.।

২৬৫. হাসান মাহমুদ আশ-শাফিয়ি (জ. ১৩৪৯ হি.)। ***আল-আমিদি ওয়া আরাউহুল কালামিয়্যা।*** কায়রো : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।

২৬৬. মুস্তাফা মুহাম্মাদ হিলমি (জ. ১৩৫১ হি.)। ***মানহাজু উলামায়িল হাদিসি ওয়াস সুন্নাতি ফি উসুলিদ্দিন।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.।

২৬৭. আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক (জ. ১৩৫১ হি.)। ***আত-তাওদিহাতুল জালিয়্যা ফি শারহিল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা।*** রিয়াদ : মুআসসাসাতু ওয়াকফিশ শাইখ আব্দির রহমান আল-বাররাক, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.।

২৬৮. আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-বাররাক (জ. ১৩৫১ হি.)। ***তালিকাতুন আলাল মুখালাফাতিল আকাদিয়্যা ফি ফাতহিল বারি শারহি সহিহিল বুখারি।*** রিয়াদ : দারুত তাওহিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.।

২৬৯. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান (জ. ১৩৫২ হি.)। ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ মিন সহিহিল বুখারি।*** মদিনা : মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.।

২৭০. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (জ. ১৩৫৩ হি.)। ***শারহু সুনানি আবি দাউদ।*** ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি।

২৭১. সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান (জ. ১৩৫৪ হি.)। ***আত-তালিকুল মুখতাসার আলাল কাসিদাতিন নুনিয়্যা।*** পরিশীলন : আব্দুস সালাম আস-সুলাইমান। প্রকাশনীর নাম ও তারিখবিহীন সফটকপি।

২৭২. সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান (জ. ১৩৫৪ হি.)। ***ইআনাতুল মুস্তাফিদ বি শারহি কিতাবিত তাওহিদ।*** বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

২৭৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (জ. ১৩৬৭ হি.)। ***আক্বীদা ইসলামিয়াহ।*** রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.।

২৭৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (জ. ১৩৬৭ হি.)। ***আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ।*** রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.।

২৭৫. সাফার বিন আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালি (জ. ১৩৬৯ হি.)। ***জাহিরাতুল ইরজা ফিল ফিকরিল ইসলামি।*** কায়রো : দারুল কালিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

২৭৬. আলি ঘুমা (জ. ১৩৭১ হি.)। ***আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ।*** কায়রো : দারুল মুকাত্তাম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.।

২৭৭. আব্দুর রহমান বিন সালিহ আল-মাহমুদ (জ. ১৩৭৩ হি.)। ***আল-কাদা ওয়াল কদার ফি দুয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ওয়া মাজাহিবুন নাসি ফিহি।*** রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

২৭৮. ইয়াহইয়া বিন ইবরাহিম আল-ইয়াহইয়া (জ. ১৩৭৬ হি.)। ***মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফি তারিখিত তাবারি।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.।

২৭৯. ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সগির (জ. ১৩৭৭ হি.)। ***আল-ইস্তিশরাক ওয়া মাওকিফুহু মিনাস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা।*** মদিনা : কিং ফাহাদ গ্লোরিয়াস কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, তাবি।

২৮০. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ (জ. ১৩৭৮ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** মানসুরা : দারুল মাওয়াদ্দা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১১ খ্রি.।

২৮১. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলুশ শাইখ (জ. ১৩৭৮ হি.)। ***শারহুল ফাতওয়া আল-হামাবিয়্যা আল-কুবরা।*** কায়রো : মাকতাবাতু দারিল হিজাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.।

২৮২. আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর (জ. ১৩৮২ হি.)। ***জিয়াদাতুল ইমানি ওয়া নুকসানুহু ওয়া হুকমুল ইসতিসনায়ি ফিহি।*** রিয়াদ : দারু কুনুজি ইশবিলিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.।

২৮৩. আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর (জ. ১৩৮২ হি.)। ***তাজকিরাতুল মুতাসি শারহু আকিদাতিল হাফিজ আব্দিল গনি আল-মাকদিসি।*** দারু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

২৮৪. আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর (জ. ১৩৮২ হি.)। ***আল-আসারুল মাশহুর আনিল ইমাম মালিক ফি সিফাতিল ইস্তিওয়া দিরাসাতুন তাহলিলিয়্যা।*** মদিনা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা, প্র. ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

২৮৫. সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ আর-রুহাইলি (জ. ১৩৮৬ হি.)। ***আল-ইলাম বিল আইম্মাতিল আরবাআতিল আলাম।*** আলজিয়ার্স : দারুল মিরাসিন নববি, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।
২৮৬. সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ আর-রুহাইলি (জ. ১৩৮৬ হি.)। ***দিরাসাতুন ফিল মানহাজ।*** ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই মাকতাবুল ইমামিল মুজানি, তাবি।
২৮৭. সায়িদ বিন আব্দুল লাতিফ ফুদা (জ. ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.)। ***শারহু আকিদাতিল ইমাম ইবনিল হাজিব।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি।
২৮৮. সায়িদ বিন আব্দুল লাতিফ ফুদা (জ. ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.)। ***আশ-শারহুল কাবির আলাল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** বৈরুত : দারুজ জাখায়ির, অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি।
২৮৯. আব্দুর রহিম বিন সুমায়িল আস-সুলামি (জ. ১৩৮৯ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** ই-বুক, ট্রান্সক্রাইবড বাই ইসলামওয়েব ডট নেট, তাবি।
২৯০. ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ আল-গাফিস (জ. ১৩৯১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** ই-বুক, দারসের ট্রান্সক্রিপ্ট, তাবি।
২৯১. ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ আলি আল-গাফিস (জ. ১৩৯১ হি.)। ***শারহুল কাওয়ায়িদিস সাবয়ি মিনাত তাদমুরিয়্যা।*** ই-বুক, মুদ্রণবিহীন ডক ফাইল, তাবি, https://t.me/yosfe555/1466।
২৯২. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, ২য় নুসখা, প্র. ১৪৪০ হি.।
২৯৩. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***শারহু কিতাবিত তাওহিদ।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, ১ম নুসখা, প্র. ১৪৩৬ হি.।
২৯৪. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি, ***শারহুল উসুলিস সুন্নাহ।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, বারনামাজুদ দারসিল ওয়াহিদ ফিল হারামাইন, বারনামাজের তারিখ : ১৪৩৭-১৪৩৮ হি.।
২৯৫. আহমাদ বিন নাসির আল-কুআইমি (জ. ১৩৯৩ হি.)। ***ফাইদুল জালিল আলা মাতনিদ দালিল।*** রিয়াদ : মাদারুল কাবাস, ২য় প্রকাশ, ১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি.।
২৯৬. মুযাফফর বিন মুহসিন (জ. ১৪০৫ হি.) (সম্পা.)। ***প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম।*** ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড রিফরমেশন সেন্টার, প্র. ২০১৮ খ্রি.।
২৯৭. আবু আব্দুল্লাহ আদিল বিন আব্দুল্লাহ আলু হামদান। ***আল-জামি ফি আকায়িদি ওয়া রাসায়িলি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল আসার।*** রিয়াদ : দারুল মানহাজ, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.।
২৯৮. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-গিজ্জি। ***আল-মাসাদিরুল আসলিয়্যাতুল মাতবুআহ লিল আকিদাতিল আশআরিয়্যা।*** বৈরুত : মারকাজু নামা লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.।
২৯৯. আব্দুল্লাহ বিন আমির আল-আহমাদি। ***আন-নুকুলাতুস সালাফিয়্যা ফির রদ্দি আলাত তায়িফাতিল হাদ্দাদিয়্যা।*** কায়রো : আদ-দারুল আসারিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.।
৩০০. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কারনি। ***উসুলুল মুখালিফিনা লি আহলিস সুন্নাহ ফিল ইমান।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.।
৩০১. আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ। ***সিফাতুল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা আল-ওয়ারিদাতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ।*** দারুল হিজরাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.।
৩০২. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আজ-জাহরানি। ***ইতহাফুল বাশার বি কালামিল উলামায়ি ফি সালমান ওয়া সাফার।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি।
৩০৩. গাজি বিন মুরশিদ আল-উতাইবি। ***তাকরিবুল হুসুল আলা লাতায়িফিল উসুল মিন ইলমিল উসুল।*** দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.।
৩০৪. জাবির বিন ইদরিস বিন আমির। ***মাকালাতুত তাশবিহ ওয়া মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি মিনহা।*** রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.।

৩০৫. তামিম বিন আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আল-কাদি। ***কালবুল আদিল্লাহ আলাত তাওয়ায়িফিল মুদিল্লাহ ফি তাওহিদির রুবুবিয়্যাতি ওয়াল আসমায়ি ওয়াস সিফাত।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ নাশিরুন, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৩০৬. মাহির আমির আব্দুল কারিম। ***আল-ইনতিসার লিত তাদমুরিয়্যা।*** মারকাজু তাফাক্কুর লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, তাবি।

৩০৭. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)।*** ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৩০৮. মুহাম্মাদ বাকারিম মুহাম্মাদ বা-আব্দুল্লাহ। ***ওয়াসাতিয়্যাতু আহলিস সুন্নাহ বাইনাল ফিরাক।*** দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

৩০৯. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়্যিস। ***শারহুর রিসালাতিত তাদমুরিয়্যা।*** রিয়াদ : দারু আতলাসিল খাদরা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৩১০. মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি। ***শারহুত তাদমুরিয়্যা।*** কুয়েত : দারু ইলাফ আদ-দুওয়ালিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.।

৩১১. মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আলু খুদাইর। ***আল-ইমান ইনদাস সালাফ ওয়া আলাকাতুহু বিল আমাল ওয়া কাশফু শুবুহাতিল মুআসিরিন।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদি নাশিরুন, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

৩১২. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শিহরি। ***আল-মাদারিসুল আশআরিয়্যা দিরাসাতুন মুকারানা।*** রিয়াদ : দারুল ফাদিলা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.।

৩১৩. মুহাম্মাদ বিন সালিম আদ-দুসারি। ***রফউল লায়িমা আন ফাতওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা।*** মক্কা : দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, তাবি।

৩১৪. মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আল-কুসাইরি। ***বারাআতু আহলিল হাদিসি ওয়াস সুন্নাহ মিন বিদআতিল মুরজিআহ।*** রিয়াদ : দারুল মুহাদ্দিস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.।

৩১৫. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদি বিন মুহাম্মাদ আন-নুরিস্তানি। ***মাওয়াকিফুত তাফতাজানি আল-ইতিকাদিয়্যা ফি কিতাবিহি শারহিল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা।*** আল-জাহরা : দারু ইলাফ আদ-দুওয়ালিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৩১৬. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান (সম্পা.)। ***সহজ শরহে আকাইদ।*** ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৮ হি.।

৩১৭. সহিদুল ইসলাম, তসলিমা আফরীন ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। ***ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রথম পত্র : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।*** ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই, ২০২৫ খ্রি.।

৩১৮. সাইফ বিন আলি আল-আসরি। ***আল-কওলুত তামাম বি ইসবাতিত তাফবিদি মাজহাবান লিস সালাফিল কিরাম।*** জর্ডান : দারুল ফাতহ, তাবি।

৩১৯. সালিহ বিন আব্দুল আজিজ সিন্ধি। ***শারহু আকিদাতিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস।*** ই-বুক, দারসের ট্রান্সক্রিপ্ট, তাবি।

৩২০. সালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সুওয়াইয়্যিহ। ***আল-ফুরুক বাইনা আকিদাতিস সালাফ ওয়া আকিদাতিল মুরজিআহ ফিল ইমান।*** রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৩২১. সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি। ***আল-উকুদুজ জাহাবিয়্যা আলা মাকাসিদিল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** সৌদি আরব : দারু মাদারিজ, ২য় প্রকাশ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.।

৩২২. সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি। ***আল-বারাহিনুল জালিয়্যা ফিদ দিফায়ি আন উসুলিল মাদরাসাতিস সালাফিয়্যা।*** ই-বুক, ইন্টারনেটে প্রকাশিত আর্টিকেলের পিডিএফ, তাবি।

৩২৩. সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি। ***ইদাআতুন ফিত তাহরিরিল আকাদি।*** মারকাজু তাফাক্কুর লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৩২৪. সুলতান বিন আব্দুর রহমান আল-উমাইরি। ***কানুনুত তাসিসিল আকাদি।*** মারকাজু তাকবিন লিদ্দিরাসাতি ওয়াল আবহাস, ১ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.।

৩২৫. সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ আদ-দুবাইখি। ***আহাদিসুল আকিদা আল্লাতি ইউহিমু জাহিরুহা আত-তাআরুদা ফিস সহিহাইন দিরাসাতুন ওয়া তারজিহ।*** তায়েফ : মাকতাবাতু দারিল বায়ানিল হাদিসা, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

৩২৬. আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যা লিশ শাবাবিল ইসলামি। ***আল-মাওসুআতুল মুইয়াসসারা ফিল আদইয়ানি ওয়াল মাজাহিবি ওয়াল আহজাবিল মুআসিরা।*** পরিশীলন : মানি বিন হাম্মাদ আল-জুহানি। রিয়াদ : দারুন নাদওয়াতিল আলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২০ হি.।

৩২৭. ইখওয়ানুস সাফা। ***রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা ওয়া খিল্লানিল ওয়াফা।*** সম্পাদনা : খাইরুদ্দিন আজ-জিরিকলি। উইনজোর : হিন্দাউয়ি ফাউন্ডেশন, প্র. ২০১৭ খ্রি.।

৩২৮. একদল গবেষক। ***মাওসুআতুল ফিরাকিল মুনতাসিবাতি লিল ইসলাম।*** গবেষণা-তত্ত্বাবধান : আলাবি বিন আব্দুল কাদির আস-সাক্কাফ। আদ-দুরারুস সানিয়্যা ওয়েবসাইট, অনলাইনে প্রকাশিত, প্র. ১৪৩৩ হি.।

৩২৯. বাংলা একাডেমি। ***বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।*** ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৩০. বাংলা একাডেমী। ***বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।*** ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৩১. মাসিক আত-তাহরীক। ১৭তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৪।

৩৩২. হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড। ***পাঠ্যতালিকা ২০২৫।*** রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, তাবি।